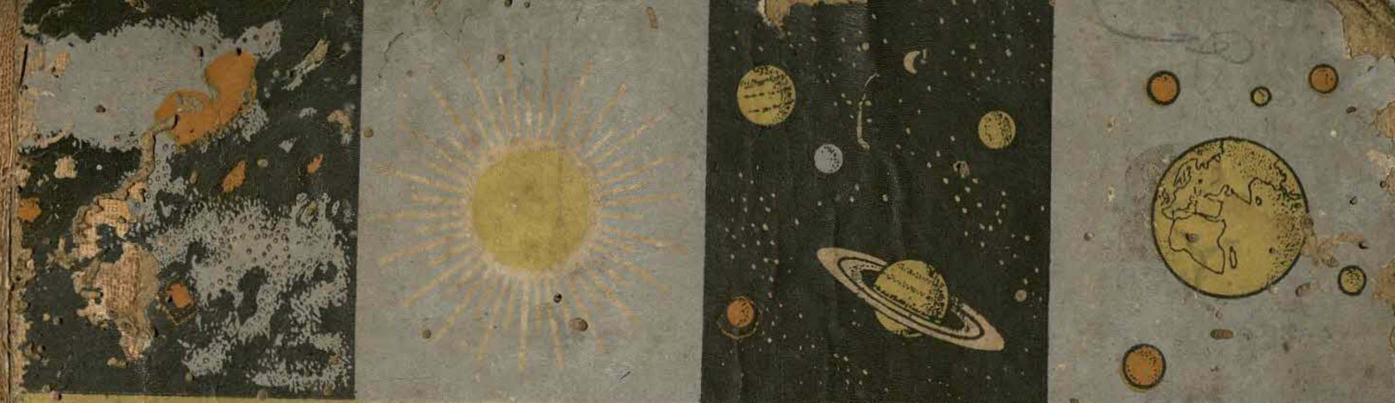




ছোটদের বিশ্বকোষ

প্রথম খণ্ড





মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ছোটদের

বিশ্বকোষ

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম খণ্ড
মূল্য বারো টাকা

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

আমাদের চোখের সামনে পৃথিবী আজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে সভ্যতার রথচক্র। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একটির পর একটি এত নতুন নতুন তথ্য এসে জড় হচ্ছে যে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পক্ষেও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা বেশ কষ্টসাধ্য বলা যেতে পারে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তো কথাই নেই! অথচ সত্যিকার মানুষ হতে হ'লে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই খানিকটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা উচিত; অর্থাৎ এ যুগের মানুষ হিসেবে পরিচয় দেবার যোগ্যতা ছেলেবেলা থেকেই অর্জন করা দরকার। তাই, ছেলেমেয়েদের যাতে কৈশোর থেকেই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছুটা মোটামুটি ধারণা করিয়ে দেওয়া যায়, তারই প্রচেষ্টা হিসেবে এই 'ছোটদের বিশ্বকোষ' সম্পাদনায় আমরা হাত দিয়েছি।

পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলিতে এ ধরনের বই ইতিপূর্বেই একাধিক বেরিয়েছে, আরও বেরুচ্ছে এবং বেরোবে। আমাদের বাংলা ভাষায়ও যে আমরাই এ ব্যাপারে পথিকৃৎ এ দাবী আমরা করব না। বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ৺যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত ইতিপূর্বেই ছোটদের জন্য এই ধরনের একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ সম্পাদনা করে বাংলা শিশুসাহিত্যের এবং বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানের তো আর শেষ নেই! নিত্য নতুন তথ্যে ক্রমাগতই তার পরিপুষ্টি হচ্ছে। কাজেই সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যুগোপযোগী আরও এ ধরনের বইএর প্রয়োজন আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করছিলাম। তারই পরিণতি এই ছোটদের বিশ্বকোষ বা ছোটদের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া কথাটি পাশ্চাত্য শব্দ। এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে অনেকে অনেক নতুন শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে 'বিশ্বকোষ' শব্দটিই অর্থের দিক্ দিয়ে যুক্তিসম্মত মনে হওয়ায় আমরা বইটির নামকরণ করেছি 'ছোটদের বিশ্বকোষ'।

আমাদের পরিকল্পনা-মত আমরা চারটি খণ্ডে বইটি শেষ করতে চাই। অভিধানের মত বর্ণানুক্রমিক ভাবে লিখতে গেলে গ্রন্থের কলেবর বিরাট হয়ে যাবার আশঙ্কায় আমরা সে পথে না গিয়ে বইটিকে বিষয়বস্তু হিসেবে ভাগ করে নিয়েছি। নানা বাধাবিপত্তি উত্তীর্ণ হয়ে এই প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করা হ'ল। পরবর্তী খণ্ডগুলিও পর পর যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশ করা হবে। প্রথম খণ্ডে স্থানাভাবে অনেকগুলি বিষয় দেওয়া সম্ভব হ'ল না—পরবর্তী খণ্ডে আমরা সেগুলি দেবার ব্যবস্থা করেছি।

যাঁরা এই বইএর বিভিন্ন বিষয় লিখবার জন্য কলম ধরেছেন তাঁরা সকলেই নিজের নিজের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং তার ওপর শিশুসাহিত্যের দক্ষ লেখক। পণ্ডিত বা সুসাহিত্যিক হলেই সব সময়ে তিনি যে ছোটদের উপযোগী করে লিখতে পারেন না—দীর্ঘ দিনের

অভিজ্ঞতা থেকে তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করেছি। অনেক বিদ্বান্ এবং সুলেখকও ছোটদের জন্য লিখতে গিয়ে বিষয়বস্তুকে অনাবশ্যক দুরূহ ও দুর্বোধ্য করে ফেলেন। তাই লেখক নির্বাচনে আমরা খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছি। ছেলেমেয়েদের কতটুকু জানা উচিত —কতটুকু তথ্য দিলে তারা তা গ্রহণ করতে পারবে—কোন্‌টা তাদের পক্ষে অনাবশ্যক, এবং বুঝবার পক্ষে কষ্টকর,—শিশুসাহিত্যিককে তা অবশ্যই জানতে হবে। একেই আমরা বলি মাত্রাজ্ঞান। এই মাত্রাজ্ঞানের অভাব হলে শিশুসাহিত্য সৃষ্টি নিরর্থক হয়ে পড়ে।

ছোটদের রচনা শুধু সহজবোধ্য হলেই হয় না, তা যতটা সম্ভব চিত্তাকর্ষকও হওয়া দরকার। স্কুলপাঠ্য বইগুলি, যতই তথ্যবহুল হোক না কেন, বেশীর ভাগই ছোটদের কাছে চিত্তাকর্ষক ব'লে মনে হয় না, আর সেই কারণেই ঐগুলি সম্পর্কে তাদের একটা ভীতি আছে। সত্যিকার সাহিত্য আর পাঠ্যপুস্তকে এইখানেই তফাৎ।

এ'রকম একখানি ব্যয়বহুল গ্রন্থ প্রকাশ করার ঝুঁকি নেবেন এ রকম বিদগ্ধ প্রকাশক বাংলা দেশে খুব বেশী নেই। সুখের বিষয় মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিমিটেডের মত একটি বিশিষ্ট প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা এ ভাবে এগিয়ে না এলে এই রকম একটি সুবিপুল গ্রন্থ প্রকাশ করা কখনই সম্ভব হ'ত না। এদিক্ দিয়ে তাঁরা শুধু ছোটদেরই নয়, সমস্ত বাংলাভাষী সমাজেরই ধন্যবাদভাজন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য যে রকম আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে সম্পাদকদের সাহায্য করেছেন তার তুলনা নেই।

সম্পাদনা ব্যাপারে আরও কয়েকজন কৃতবিদ্য শিশুসাহিত্যিক আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছেন। তাঁদের অকৃত্রিম সাহায্য না পেলে এ গ্রন্থ প্রকাশ দুঃসাধ্য হ'ত।

এমন একটি বিরাট গ্রন্থে, বিশেষ করে ছোটদের জন্য সহজবোধ্য ও সরস করে লিখতে গেলে, কিছু ভুল-ত্রুটী থাকা অসম্ভব নয়। সে রকম কিছু চোখে পড়লে বিদগ্ধ পাঠক্ তা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা আমরা সাধ্যমত সংশোধন করে নেবার চেষ্টা করব।

কলকাতার সোভিয়েৎ কনস্যুলেট তথ্যবিভাগ এবং ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ অব্ আমেরিকার তথ্যবিভাগ মহাশূন্য-অভিযান সম্পর্কে নানা তথ্য ও অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে এবং তা এই গ্রন্থে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর একখানি আলোকচিত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। এই সুযোগে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ ছাড়া শিল্পী লালা শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাস, শ্রীসিতাংশুনাথ সেনগুপ্ত ও শ্রীসরস্বতী প্রেসের কর্তৃপক্ষকে, তাঁরা বইখানিকে নিজেদের মনে করে নিয়ে এর অঙ্গসজ্জার জন্য যে পরিশ্রম করেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭৩

1806

সম্পাদকমণ্ডলী

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল　অধ্যাপক শ্রীসন্তোষ বসু　শ্রীঅমলেন্দু সেন

শ্রীবিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায়　ডাঃ শ্রীননীগোপাল মজুমদার

প্রথম খণ্ডের লেখক-পরিচিতি

মহাকাশের কথা
পৃথিবীর কথা
গাছপালার কথা
জীবজন্তুর কথা
মানুষের কথা
দেশ বিদেশের কথা
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
মহাশূন্যের পথে
দেশবিদেশের সেরা বই

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস্-সি.

ছোটদের সুবিখ্যাত মাসিক পত্র 'রামধনুর' সম্পাদক ও শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ; কলকাতা আশুতোষ কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ; ছোটদের বহু গ্রন্থের প্রণেতা ; শিশু-সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ; বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ১৩৬৯ (কৃষ্ণনগর) ও ১৩৭২ (জলপাইগুড়ি) অধিবেশনের শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি ; 'সায়ান্স ফর চিলড্রেন' প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সহ-সভাপতি।

অঙ্কশাস্ত্রের কথা
সাধারণ বিজ্ঞানের কথা

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি.এস্-সি, এ. আই. সি.

শিশুসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ; কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগারের ভূতপূর্ব রাসায়নিক গবেষক ; পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প সংগ্রহ-শালার অধ্যক্ষ ; ১৩৭২ সালের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য-রচয়িতা হিসেবে ফটিক-স্মৃতি পদক-প্রাপ্ত ; শিশুসাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ; সায়ান্স ফর চিলড্রেনের অন্যতম পত্রিকাধ্যক্ষ।

ইতিহাসের কথা

অধ্যাপক শ্রীসন্তোষ বসু, এম. এ.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা-বিজ্ঞানের (মিউ-জিয়লজী) অধ্যাপক ; ভারতীয় চারুশিল্প, লোকশিল্প ও সংগ্রহশালা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর লেখক।

ভাষা ও লিপির কথা

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি. এস্-সি.

সাংবাদিক ; শিশুসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ও বিভিন্ন শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-প্রণেতা।

দেশ বিদেশের ছড়া

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত, এম. এ.

বাংলা শিশুসাহিত্যে ছড়া ও কবিতা-লেখক হিসেবে খ্যাতিমান্ ; শিশুসাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক ; কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার।

বিশ্বসাহিত্যের কথা	**শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি. এ.** শিশুসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ; ভারত সরকার কর্তৃক সদ্য-সাক্ষরদের জন্য রচিত গ্রন্থের গ্রন্থকাররূপে পুরস্কৃত ; ১৩৭১ সালের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য-রচয়িতা হিসেবে ফটিক-স্মৃতি পদক-প্রাপ্ত ; প্রায় শতাধিক শিশুসাহিত্য-গ্রন্থের প্রণেতা শিশুসাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি।
ধর্মের কথা	**শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম. এ., বি. এল.** শিশুসাহিত্যের সুপরিচিত লেখক ; সদ্যসাক্ষরদের জন্য রচিত গ্রন্থের জন্য পর পর দু'বছর ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।
এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা	**শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বি. এস-সি., বি.ই., সি.ই.** খ্যাতনামা সাহিত্যিক ; এঞ্জিনীয়ারিং (প্রয়োগবিজ্ঞান) বিষয়ে সহজপাঠ্য গ্রন্থের প্রণেতা ; হাওড়া ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ভূতপূর্ব প্রধান এঞ্জিনীয়ার ; বর্তমানে কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিশনের প্রধান এঞ্জিনীয়ার।
আমাদের শরীরের কথা	**ডাঃ শ্রীননীগোপাল মজুমদার,** **এম. বি., ডি. সি. এইচ. (লণ্ডন), সি. এ. পি.** একাধারে শিশুসাহিত্যিক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুচিকিৎসক ; ভূতপূর্ব যাত্রী-সম্পাদক ও শিশুসাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক ; পশ্চিম বঙ্গ শিশুকল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক।
খেলাধুলার কথা	**অধ্যাপক শ্রীঅমলকুমার মিত্র, এম্. এ. (এড), সাঁহিত্যভারতী** বিভিন্ন ক্রীড়া-পত্রিকার খেলাধূলা বিভাগের নিয়মিত লেখক ; আগরতলা এম. বি. বি. কলেজের শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক।
চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা	**ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, এম. এ., এম. বি., ডি. টি. এম.** প্রবীণ চিকিৎসক ; লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ; বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ভূতপূর্ব সভাপতি ; সুবক্তা ও সুপণ্ডিত ; সাহিত্য-সমাজে খ্যাতনামা।

শিল্পী-পরিচিতি

শিল্প-সম্পাদক	**শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী** লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী ; ভারত সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র-পুস্তকের রচয়িতা ও শিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত ; ছোটদের বহু সচিত্র গ্রন্থ প্রণেতা ও শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি।
সহকারী চিত্রশিল্পী	**লালা শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাস ও শ্রীসিতাংশুনাথ সেনগুপ্ত** বিশিষ্ট চিত্রকর।

সূচীপত্র—



মহাকাশের কথা

আমরা কোথায় আছি

পৃথিবীর ছোট্ট মানুষ আমরা, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আরাম করে থাকতে কতটুকুই বা জায়গার দরকার আমাদের ? অথচ কী বিরাট রাজ্যের মধ্যে আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভাবতেও অবাক্ লাগে। এ সম্বন্ধে একটা গল্প মনে পড়ছে। সেই গল্প দিয়েই শুরু করা যাক।

ছাদের ওপরে মাদুর বিছিয়ে গল্পের আসর জমেছে। বক্তা হচ্ছেন দিদিমা আর শ্রোতা হচ্ছে ছোট ছোট নাতি-নাতনীর দল।

"কিসের গল্প বলব ?"—দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন।

"রাক্ষসের গল্প—রাক্ষসের গল্প শুনব।"—সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল উৎসাহী শ্রোতার দল।

দিদিমা শুরু করলেন : "রাক্ষসের ছেলে হয়েছে, রাক্ষুসী মায়ের ইচ্ছে বেশ ঘটা করে ছেলের 'ভাত' হয়। তারই তোড়জোড় চলছে রাক্ষসপুরীতে। অনেক রাক্ষস খাবে, আর আমাদের তুলনায় ওদের খাওয়াটাও একটু বেশী ; তাই আয়োজনও তেমনি। উঠোনে গোটা পঞ্চাশেক হাতী বাঁধা। উনুনে কড়াই চাপানো হয়েছে, তাতে তেলও ঢালা হয়েছে। তেল একটু গরম হলেই আস্ত হাতীগুলোকে নুন-হলুদ মেখে তার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। গরম গরম হাতীর ঝোল, ভারি উপাদেয়। রাঁধুনীর জিভ দিয়ে শুদ্ধু জল পড়ছে টপ্ টপ্ করে।"

সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়ায় গল্প বেশ এগিয়ে চলছিল, হঠাৎ নাতিদের মধ্যে একজনের মনে কেমন খটকা লাগল, সে প্রশ্ন করল, "ও মা! অতগুলি হাতী একসঙ্গে কড়াইএ ছেড়ে দেবে! কড়াইটা বুঝি খুব বড় ছিল ?"

"ওঃ, খু-ব বড়।" দিদিমা সংক্ষেপে জবাব দিলেন।

কিন্তু অত সংক্ষেপে এড়িয়ে গেলেই কি হয় ? সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে লাগল শ্রোতারা। "কত বড় ? আমাদের বাড়ীর সামনেকার এই মাঠটার মত হবে ?"



উঠোনে গোটা পঞ্চাশেক হাতী বাঁধা, উনুনে কড়াই চাপানো হয়েছে

"না, আরও বড়।"

"তবে ? এই গোটা শহরটার মত বুঝি ?"

"না না, তার চাইতেও বড়। ঐ আকাশটার মত বড়।"—দিদিমা বুদ্ধিমতীর মত চট্ করে কড়াইএর সঠিক মাপটা বলে দিলেন। শ্রোতারাও চট্ করে বুঝে ফেলল এক মুহূর্তেই। গল্পের স্রোত আবার এগিয়ে চলল সবেগে।

আকাশ কত বড় সে সম্বন্ধে দিদিমার মত একটা মোটামুটি ধারণা অনেকেরই আছে। ঐ যেখানে মস্ত মাঠটা শেষ হয়েছে—দূরে ঝাপসা গাছের সারি, তারই ওপারে, ভাল বাংলায় যাকে আমরা বলি দিক্‌চক্রবাল,—তারই গা থেকেই তো শুরু হয়েছে আকাশ! তারপর আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে এসে নীল চাঁদোয়ার মত ঢেকে রেখেছে আমাদের। ঐ মাপের একটা কড়াই পেলে তাতে পঞ্চাশটা কেন, হাজার কয়েক হাতীর ঝোলও নিঃসন্দেহে চাপানো যেতে পারে।

কিন্তু তোমরা, আমার বন্ধুরা, যারা এ বই পড়তে বসেছ, তারা নিশ্চয়ই ঐ বুড়ী দিদিমা আর তাঁর নাতি-নাতনীদের চাইতে একটু বেশী খবর রাখ। আকাশটা যে সত্যি, দেখে যেমন মনে হয়, একটা নীল চাঁদোয়া নয় তাও নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে। আকাশ সত্যি কত বড় তা অনুমান করতে গেলেও মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। কত বড় বড় পণ্ডিত, জ্যোতির্বিদ্ বছরের পর বছর ধরে কত উপায়ে এর আয়তন মাপতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেছেন। এজন্য কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরী হয়েছে, কত বিচিত্র রকমের আঁকজোঁক, হিসেবপত্র কষা চলেছে, কিন্তু আকাশের সীমানা কোথায় সে সন্ধান মেলে নি আজও পর্যন্ত।

তবে সন্ধান মিলুক আর না মিলুক, এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত—প্রায় অবিশ্বাস্য সব খবর যোগাড় করেছেন তাও কম আশ্চর্যজনক নয়। আমাদের দৃষ্টির বাইরে এই দূর আকাশকে বলা হয় মহাকাশ। এই মহাকাশকে যদি সমুদ্রের সঙ্গে

তুলনা করা যায় তা হলে আমাদের এই পৃথিবী হবে তারই বুকের এক ফোঁটা জল। আর আমরা, সেই পৃথিবীর বুকে যে কয়েকশ' কোটি লোক বাস করছি, তারা বোধ হয় তা হলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণুর চাইতেও ছোট।

মহাকাশ কত বড়

দূর আকাশের যে জিনিসটি আমাদের বিশেষ করে চোখে লাগে সেটি হচ্ছে সূর্য। এটি এত উজ্জ্বল যে দিনের বেলা ওর দিকে ভাল করে তাকানোই যায় না, সকালে কিংবা সন্ধ্যায় ওকে মনে হয় একটা লাল থালার মত। আসলে কিন্তু এই সূর্য পৃথিবীর চাইতে অনেক—অনেক বড়। তেরো লক্ষ পৃথিবী একত্র করলে তবেই তা আকারে সূর্যের সমান হবে। দূরের জিনিস সব সময়ে ছোট দেখায়। সূর্য অনেক দূরে আছে বলেই তাকে অতটুকু থালার মত দেখায়। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সাধারণতঃ ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সাধারণতঃ বলছি এই জন্য যে ঋতুভেদে এই দূরত্বটা সামান্য বাড়ে-কমে। সূর্যকে মাঝখানে রেখে আমাদের পৃথিবী তার চারদিকে ঘুরছে। শুধু পৃথিবী নয়, পৃথিবীর মত ঐ রকম আরও কতকগুলি জ্যোতিষ্ক পদার্থ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। তাদের আমরা বলি গ্রহ। এই গ্রহগুলি যতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ততদূর পর্যন্ত মোটামুটি সূর্যের রাজত্ব বলা চলে। বাংলায় একে বলা হয় সৌরজগৎ। কিন্তু মহাকাশের তুলনায় এই সৌরজগতের সীমানাও কিছুই নয়। পৃথিবী যদি হয় সমুদ্রের একটি জলকণা তা হলে এই সৌরজগৎকে বড় জোর বলা যায় গোষ্পদ।

সৌরজগতের বাইরে যে বিশাল মহাকাশ, সেখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য আলোকবিন্দু—যাদেরকে আমরা বলি তারা বা নক্ষত্র। খালি চোখে আমরা পৃথিবীর এক-এক গোলার্ধ থেকে প্রায় হাজার তিনেক তারা দেখতে পাই কিন্তু দূরবীণ দিয়ে দেখলে দেখা যায় তার বহুগুণ বেশী। খুব শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই কম করে প্রায় দেড়শ' কোটি তারার সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের ধারণা—তারার সংখ্যা ওর চাইতে আরও বহু—বহুগুণ বেশী। এই তারাগুলিকে দূরবীণ দিয়েও এক-একটি আলোর বিন্দু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না—মহাকাশ যুড়ে তারা শুধু ঝিক্‌মিক্ করে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন যে এদের সবগুলিই এক-একটি সূর্য—এবং আকারে এক-একটি আমাদের সূর্যের চাইতেও অনেক বড়। কোন কোনটা অনেক—অনেক বড়, লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি গুণ বড়। নানা রকম তথ্য-প্রমাণের সাহায্যেই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। 'মীরা' নামে একটা তারা আছে,—তার মধ্যে নাকি আমাদের এই পৃথিবীর মত ৩৯০০ কোটি পৃথিবীকে ভরে রাখা যায়। 'কালপুরুষ' রাশির নাম হয় তো তোমাদের অনেকেই শুনেছ। 'রাশি' মানে তারার ঝাঁক বা তারাপুঞ্জ। এই ঝাঁকের মধ্যে একটি তারার কথা জানা গেছে যার মধ্যে সাড়ে ছয় কোটি কোটি পৃথিবীকে ভরে রাখা যায়। এই রকম 'সপ্তর্ষি' নামে যে একটি তারার ঝাঁক আছে তারও ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সৌরজগতের মত গোটা পঁচিশেক সৌরজগৎ সহজেই গুঁজে দেওয়া যায়। 'হারকিউলিস' নামে আর একটি তারার ঝাঁক আছে—যার এক কোণা থেকে

আর এক কোণার দূরত্ব মাইল দিয়ে মাপলে হয় ৩৬০০০ কে ৫৮৭৬০৬৮৮০০০০ দিয়ে গুণ করলে যত হয় তত। পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়ে, অঙ্ক কষে এই দূরত্বের হিসেব বার করেছেন।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জায়গা হচ্ছে এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ। ডাঙ্গা অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সেটি উঁচুতে প্রায় ৫ মাইল। আর সূর্য, আগেই বলেছি, পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল উঁচুতে বা দূরে রয়েছে। আলোর গতি হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। সূর্য যখন প্রথম পৃথিবীর আকাশে দেখা দেয় ঠিক তখনই তাকে আমরা দেখতে পাই না, দেখতে পাই তার প্রায় আট মিনিট পরে। অর্থাৎ ঐ প্রচণ্ড বেগে ছুটেও সূর্যের আলোর পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে লাগে ৮ মিনিট। আর আমাদের সবচেয়ে কাছের তারাটি থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে কতটা সময় লাগে জান?—চার বছর তিন মাস। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যে ২ লক্ষ ৭২ হাজার বার যাওয়া-আসা করতে হলে যতটা পথ পার হতে হ'ত এই তারাটিতে একবার মাত্র যেতে হলেই ততটা পথ পার হতে হবে। "সবচেয়ে কাছের" কথাটি লক্ষ্য ক'র। ওর বেলাই যদি এই রকম হয় তবে দূরের তারাগুলি না জানি কত দূরে! অতখানি দূরত্ব তো আর মাইল দিয়ে মাপা সহজ নয়, তাই বিজ্ঞানীরা ওদের দূরত্ব মাপবার জন্য একটা নতুন মাপকাঠি বার করেছেন। তাকে বলা হয় 'আলোক-বর্ষ' বা 'লাইট-ইয়ার'। এক আলোক-বর্ষ মানে—আলো সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ছুটে এক বছরে যতটা পথ পার হতে পারে ততটা পথ। মাইলের হিসেবে একটি আলোক-বর্ষ প্রায় ৬ লক্ষ কোটি মাইলের সমান। মহাকাশে এমন বহু তারা আছে যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে হাজার হাজার বছর কেটে যায়। একটি তারার সন্ধান পাওয়া গেছে পৃথিবী থেকে যেটির দূরত্ব একলক্ষ আট হাজার ছ'শ' আলোক-বর্ষ।

কথাটা ভাবতে কেমন লাগছে, না? ঐ যে ছোট্ট তারাটি দূর আকাশে মিটমিট করে জ্বলছে এবং ওর যে আলোটুকু আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি আসলে সেটা ওর আজকের আলো নয়। লক্ষ বছর আগে একদিন সে আলো ঐ তারাটি থেকে রওনা হয়েছিল, তার পর ছুটতে ছুটতে আজ প্রথম এসে হাজির হয়েছে আমাদের চোখের সামনে। ঐ আলো যেদিন রওনা হয়েছিল সেদিন পৃথিবীতে মানুষের কোন অস্তিত্ব ছিল না, হয়তো সেকালকার সেই অতিকায় সরীসৃপরাই তখন পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াত। কিংবা, কে জানে, তারাও হয়তো তখনও আসে নি, হয়তো আরও আদিম স্তরের প্রাণীরা তখন রাজত্ব করত পৃথিবীর বুকে। কবে, কোন্ আদিকালে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বসুন্ধরার বুক থেকে, কিন্তু সেদিনের সেই তারার আলো এখনও সমানে ছুটে চলেছে মহাকাশের বুক চিরে।

শুধু গ্রহ-তারাই নয়, আরও কত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক পদার্থ মহাকাশ যুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে—ছুটে বেড়াচ্ছে। যেমন ধর নীহারিকা—যাকে ইংরেজীতে বলে 'নেবুলা'। নীহারিকা নামটি শুনতে বেশ মিষ্টি, আমরা মেয়েদের নামকরণের সময়ও নামটি এখনও প্রায়ই ব্যবহার করি। কিন্তু আসলে ওগুলি হচ্ছে জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড।

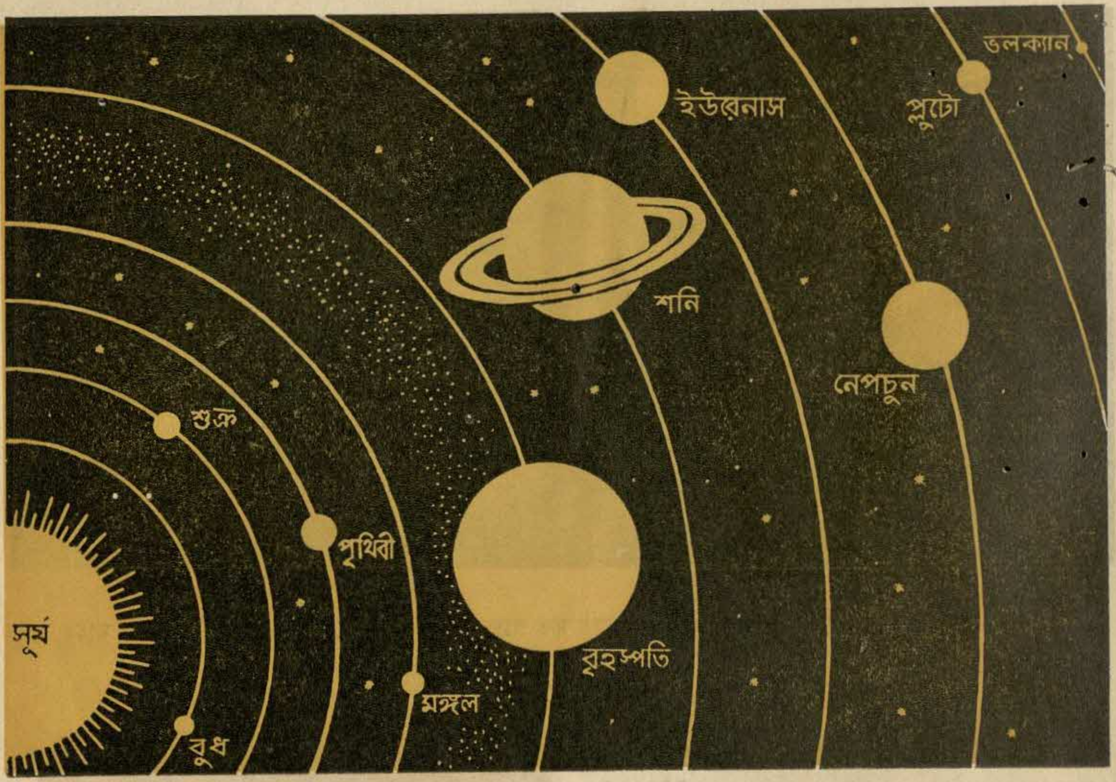


নীহারিকা : অতিকায় জলন্ত গ্যাসের পিণ্ড ঘূর্ণিবায়ুর মত পাক খেতে খেতে মহাকাশের কোটি কোটি মাইল জায়গা যুড়ে শুধু জলছে আর জলছে আর জলছে

অতিকায় পিণ্ড! বিরাট শরীর নিয়ে ঘূর্ণিবায়ুর মত পাক খেতে খেতে মহাকাশের কোটি কোটি মাইল জায়গা যুড়ে শুধু জ্বলছে আর জ্বলছে আর জ্বলছে! এক-একটা নীহারিকা আকারে কত বড় হতে পারে তার একটা উদাহরণ দেই, শোন : একটা নীহারিকা আছে, বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন 'অ্যাণ্ড্রোমিডা'। হিসেব কষে জানা গেছে এটির ওজন আমাদের সূর্যের চাইতে তিন হাজার কোটিগুণ বেশী। অথচ ওর শরীর এত হাল্কা গ্যাস দিয়ে তৈরী যে তার এক মাইল লম্বা আর এক মাইল চওড়া একটা ফালি কেটে নিতে পারলে, তা সে যতই পুরু হোক না কেন, তুমি-আমিও হয়তো অনায়াসে তা ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। অত হাল্কা জিনিসের মোট ওজন যদি অত বেশী হয় তবে কল্পনা করতে পার আকাশের কতখানি জায়গা যুড়ে সেটা ছড়িয়ে আছে? বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে বলেছেন এর একদিক্ থেকে আর একদিকে আলো পৌঁছতেই লাগে চল্লিশ হাজার বছর। আর অ্যাণ্ড্রোমিডার মত নীহারিকা নাকি আকাশে আরও কত যে আছে তার ঠিক নেই!

এ পর্যন্ত মহাকাশের সব চেয়ে দূরের যে জিনিসটি দেখা গেছে সেটিও নাকি একটি নীহারিকা। সেটি থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে লাগে ১৫ কোটি বছর। কিন্তু মহাকাশ সেখানেই শেষ হয় নি—তারও ওদিকে কতখানি জায়গা যুড়ে ছড়িয়ে আছে কে বলবে? বিজ্ঞানীরা অবশ্য তা বার করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নি, কিন্তু সন্ধান পাওয়া দূরে থাক আজ পর্যন্ত তা অনুমান করাও সম্ভব হয় নি।

ভাগ্যিস দিদিমা এ সব কথা জানেন না, জানলে কি লজ্জায়ই না পড়তেন!



সূর্য আর গ্রহদের নিয়ে তার রাজত্ব—সৌরজগৎ

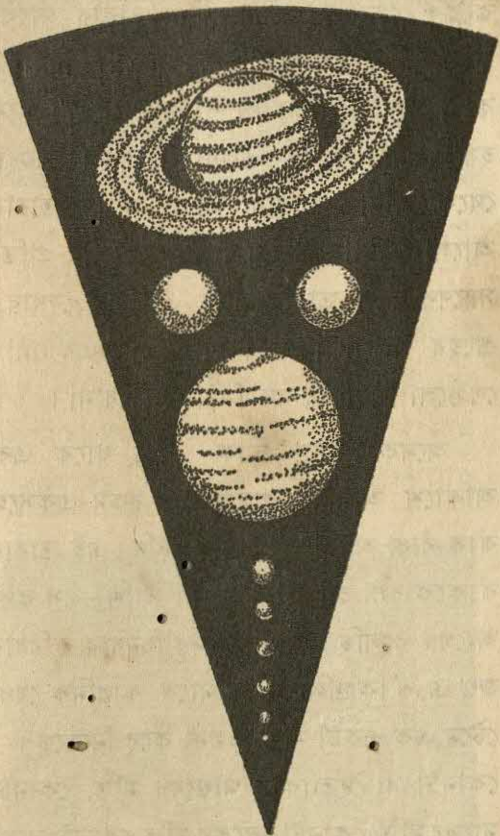
মহাকাশের বাসিন্দা

এত বড় যে মহাকাশ তার বাসিন্দার সংখ্যাও যে নেহাৎ কম হতে পারে না এ তো সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। সত্যি, মহাকাশের বাসিন্দার সংখ্যা অগণিত। কিন্তু সকলেই এক জাতের নয়। এদের মধ্যে আমাদের কাছাকাছি যারা আছে তাদের কথা আগে একটু বলে নি।

আমাদের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী হচ্ছে চাঁদ। চাঁদকে পৃথিবীর প্রজাও বলা যায়, কারণ চাঁদ আমাদের পৃথিবীর চারদিকে নিয়ত ঘুরপাক খাচ্ছে—যেমন পৃথিবী ঘুরপাক খাচ্ছে সূর্যের চারদিকে। পৃথিবীকে যদি সূর্যের প্রজা বলা যায় তবে চাঁদকে পৃথিবীর প্রজা বলতে বাধা কি? 'প্রজা' কথাটা ব্যবহার করছি বুঝবার সুবিধার জন্য, কিন্তু আসলে পৃথিবীকে বলা হয় সূর্যের গ্রহ তা আগেই বলেছি। সেই ভাবে চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর উপগ্রহ। চাঁদের কথা আরও ভাল করে পরে আলোচনা করব।

পৃথিবীর মত আরও যে সব গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তাদের সংখ্যা গুটি নয়-দশ। এদের মধ্যে সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে বুধ (মার্কারি)। তারপর একে একে শুক্র (ভেনাস), পৃথিবী (আর্থ), মঙ্গল (মার্স), বৃহস্পতি (জুপিটার), শনি (স্যাটার্ন), ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো এবং অল্প কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত ক্ষুদে গ্রহ ভলক্যান্। এ ছাড়া মঙ্গল আর বৃহস্পতির

মাঝখানে খুব ছোট ছোট গ্রহের একটা ঝাঁকও আছে,—তাকে বলা হয় গ্রহ-কণিকা। অনেক গ্রহের আবার নিজস্ব চাঁদ বা উপগ্রহও আছে—কারও একটি, কারও দু'টি, কারও বা আরও



বিরাট গোল সূর্য থেকে একটা ফালি কেটে নিলে তার তুলনায় বিভিন্ন গ্রহ আকারে কত বড় দেখাবে

বেশী। সূর্যের তুলনায় বিভিন্ন গ্রহ আকারে কত বড় তা ছবিতে দেখান হ'ল।

পৃথিবী থেকে এই সব গ্রহের কোন্‌টার দূরত্ব কত? তোমরা এখানে ওখানে যেতে হলে সাধারণতঃ রেলগাড়ী চড়েই যেতে অভ্যস্ত, কাজেই সেই রেলগাড়ীর হিসেবেই একটা হিসেব দেবার চেষ্টা করি। ধরা যাক্ একটা খুব দ্রুতগামী রেলগাড়ী ঘণ্টায় ষাট্ মাইল বেগে পৃথিবী থেকে ছুটতে সুরু করল—মহাকাশে পাতা কাল্পনিক রেল লাইনের ওপর দিয়ে। তা হলে গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে আগে সে পৌঁছবে শুক্রগ্রহে। কিন্তু তাতেও, কোথাও না থেমে ছুটলেও, তার লাগবে ৫৩ বছর। তারপর মঙ্গল; সেখানে পৌঁছতে লাগবে ৭৫ বছর। এইভাবে বুধে যেতে লাগবে ১১০ বছর, বৃহস্পতিতে যেতে ৭৪০ বছর, শনি গ্রহে যেতে ১৪৭০ বছর, ইউরেনাসে যেতে ৩১৬০ বছর, নেপচুনে যেতে ৫০৫৫ বছর লাগবে। এই থেকেই ঐ সব গ্রহ পৃথিবী থেকে কত দূরে তার খানিকটা আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ঐ ভাবে যদি সূর্যের দিকে ছোটা যায় তা হলে ১৭৭ বছর পরে সূর্যে পৌঁছান যেতে পারে, অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় যে সূর্যের কাছে গিয়েও গায়ে তার উত্তাপের আঁচটিও লাগবে না।

ঐ ভাবে চাঁদের দিকে রওনা হলে কিন্তু সাড়ে পাঁচ মাসেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া যাবে। অবশ্য মানুষ আরও দ্রুতবেগে মহাকাশে ছুটবার উপায় বার করেছে, সে প্রসঙ্গে আমরা যথা সময়ে আসব। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে মানুষ যে সত্যি একদিন চাঁদে গিয়ে হাজির হবে এ আশা করাটা খুব অন্যায় নয়।

গ্রহের রাজ্য—সূর্যের রাজ্য ছাড়িয়ে নক্ষত্র বা তারার রাজ্য। তারারা গ্রহদের তুলনায় আকারে অনেক বড়, কিন্তু অনেক দূরে আছে ব'লে আমাদের চোখে গ্রহ আর তারাগুলো একই রকম দেখায়—সবই ছোট ছোট আলোর



মহাকাশে পাতা কাল্পনিক রেল লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে চললে···

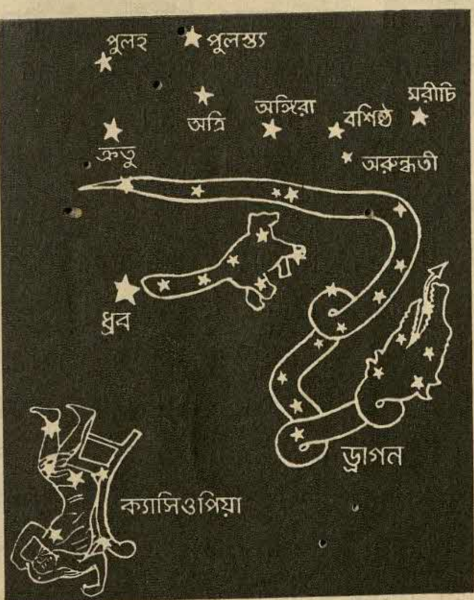
বিন্দুর মত, তবে কোনটা বেশী উজ্জ্বল, কোনটা কম। বৃহস্পতি, শুক্র—এগুলিকে খুব জ্বলজ্বলে তারার মত মনে হয়। শুক্রকে তো মুখেও বলা হয় শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা (আসলে ও-দুটো কিন্তু একই)। তা হলে তারা আর গ্রহ চিনব কি করে? চেনা খুব কঠিন নয়। তারার আলো কখনও স্থির থাকে না—সব সময়েই মিটমিট করে, অর্থাৎ খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখলে মনে হয় একবার জ্বলছে, একবার নিবছে। বহুদূর থেকে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে তারার আলোকে আসতে হয় বলেই আলোর প্রতি-সরণের ফলে তারাগুলিকে ঐ রকম দেখায়। গ্রহের আলো কিন্তু স্থির, অর্থাৎ একটানা। সেগুলো তারাদের মত মিটমিট করে না।

অনেক তারা ঝাঁক বেঁধে থাকে এবং আকাশে আমরা তাদের ঐ রকম একসঙ্গে ঝাঁক-বাঁধা অবস্থাতেই ঘুরতে দেখি। এই তারার ঝাঁককে বলা হয় তারাপুঞ্জ বা রাশি—সে কথা আগেই বলেছি। মানুষ এদের চিনবার সুবিধার জন্য ঐ ঝাঁকগুলির মাঝে মাঝে কাল্পনিক রেখা টেনে এক একটা মূর্তি কল্পনা করে নিয়েছে।—কোনটা বা দৈত্যাকার মানুষের মূর্তি, কোনটা মাছের মূর্তি, কোনটা ধনুকের মূর্তি, কোনটা বৃষের বা মেষের মূর্তি। সেই অনুযায়ী এদের এক-একটা নামও দেওয়া হয়েছে। যেমন দৈত্যাকার মানুষটির নাম কালপুরুষ তারাপুঞ্জ বা কালপুরুষ রাশি। ইংরেজীতে বলে 'ওরায়ন'। এর হাতে বাঁকানো ধনুক, কোমরে কোমরবন্ধ,—তা থেকে তলোয়ার ঝুলছে। এমন কি সঙ্গে একটা কুকুরও রয়েছে—যার নাম দেওয়া হয়েছে লুব্ধক বা সিরিয়াস্। এই লুব্ধকই হচ্ছে আকাশের



বিভিন্ন তারার ঝাঁকের ভিতর দিয়ে কাল্পনিক রেখা টেনে মানুষ কল্পনা করেছে নানা রকম মূর্তি

উজ্জ্বলতম তারা। এইভাবে সপ্তর্ষি (ইংরেজী নাম গ্রেট বেয়ার বা বড় ভাল্লুক), কুম্ভ, মীন, বৃষ, মেষ, বৃশ্চিক, ধনু ইত্যাদি নানা তারাপুঞ্জের নানা নাম। ইংরেজীতেও আছে ক্যাসিওপিয়া, পেগাসাস্,

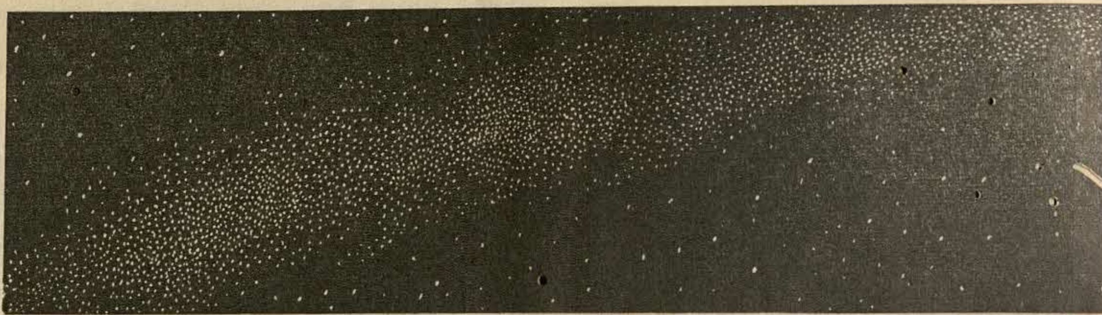


এই কাল্পনিক মূর্তিগুলি দেখে আকাশের গ্রহ-তারা চিনে নেওয়া খুব সহজ

লিটল্ বেয়ার ইত্যাদি নাম। এদের সাহায্যে, আকাশে কখন কোথায় এরা আছে দেখে, অন্যান্য অনেক দলের বা দল-ছাড়া নক্ষত্রকেও আলাদা আলাদা করে চেনা সম্ভব হয়েছে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে অনেক সময় দেখা যায় আকাশের এপার-ওপার যুড়ে দুধের মত সাদা রংএর আবছা একটা পথ চলে গেছে। এর নাম ছায়াপথ বা মিল্কীওয়ে। ছায়াপথ সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগের মানুষ বিভিন্ন রকম কল্পনা করলেও আসলে ওটিও তারাপুঞ্জ—একাধিক তারাপুঞ্জ বলা যেতে পারে। মহাকাশের ঐখানটায় যেন এপার-ওপার যুড়ে অসংখ্য তারা ছিটানো রয়েছে—একটি স্তরের পেছনে আর একটি স্তর, তার পেছনে আর একটি, তারও পেছনে আর একটি—এই ভাবে চলে গেছে—কত দূর কে জানে! সব মিলে দূর থেকে অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে দেখায়, কিন্তু ভাল দূরবীণ দিয়ে দেখলে সামনেরগুলোকে তারা বলে পরিষ্কার চেনা যায়। ছায়াপথ কিন্তু আকাশে একটাই নেই। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন তারার মত এরাও সংখ্যায় অনেক।

নীহারিকা বা নেবুলার কথা আগেই বলেছি। যতদূর জানা গেছে এই নীহারিকারাই হচ্ছে আকাশের দূরতম অধিবাসী। দূরবীণ দিয়ে দেখলে এদের এক-একটাকে উজ্জ্বল সাদা মেঘের টুকরো বলে মনে হয়; কিন্তু, বিজ্ঞানীর পরীক্ষায়, এদের আসল স্বরূপ ধরা পড়েছে। এগুলি যে জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড—আকাশের কোটি কোটি মাইল যুড়ে দাউ দাউ করে অবিরাম জ্বলছে সে বিষয়ে তাঁদের সন্দেহ নেই। নীহারিকাগুলোর আকারও নাকি নানারকম। কোনটা থালার



ছায়াপথ

মত গোল, কোনটা ডিমের মত চ্যাপ্টা, আবার কোনটা বা স্ক্রুর মত প্যাঁচানো। আর নীহারিকা সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা—আকাশযোড়া ঐ যে অগণিত নক্ষত্ররাজি, গ্রহ-উপগ্রহ-সূর্যে-গড়া আমাদের সৌরজগৎ—এ সবেরই নাকি সৃষ্টি ঐ নীহারিকা থেকে।

এ ছাড়া উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি আরও নানারকম ছোট-বড় বাসিন্দা আছে মহাকাশের। সে সবের কথা যথাস্থানে বলব।

আমাদের সূয্যি মামা

'মামা' না বলে আসলে সূর্যকে আমাদের 'দাদামশাই' বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়; কারণ আমাদের মা বসুন্ধরার জন্ম নাকি সূর্য থেকেই।

ইতিপূর্বে আমরা পৃথিবীকে আর অন্যান্য গ্রহকে সূর্যের প্রজা ব'লে বলেছি। প্রজাই বলা উচিত, কারণ ওরা সকলেই সূর্যের হুকুম তামিল করছে—সূর্য যেন ওদের নাকে দড়ি দিয়ে নিজের চারপাশে ঘোরাচ্ছে। সূর্যের টান এড়িয়ে কারুরই ছিটকে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। অবশ্য এখানে একটা কথা বলা দরকার। এই টানবার অভ্যাসটা শুধু যে একা সূর্যেরই আছে তা মনে করলে ভুল হবে। বিশ্বের সমস্ত জিনিসই পরস্পরকে টানাটানি করছে—নিজের নিজের শরীরের বহর আর ভর (যাকে ইংরেজীতে বলে 'মাস্') অনুযায়ী। পৃথিবীরও এই গুণটি আছে। সূর্যের টানে যেমন পৃথিবী ঘুরছে, তেমনি পৃথিবীর টানে আবার চাঁদ ঘুরছে। আমরা সবাই যে পৃথিবী থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছি না তারও কারণ পৃথিবীর এই টান। বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে এই টান বা আকর্ষণই হচ্ছে আমাদের ওজন।

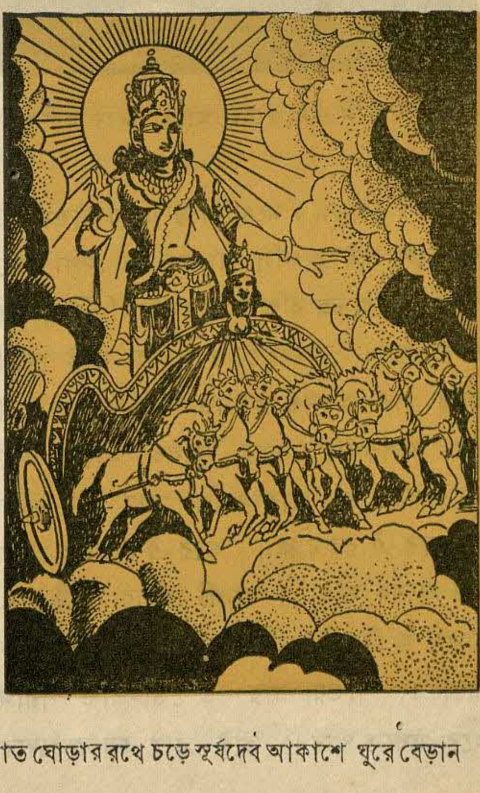
কিন্তু যতই হুকুম বা শাসন করুক, সূর্যের জন্যই আমরা বেঁচে আছি—টিকে আছি। আলো দিয়ে, তাপ দিয়ে সূর্য আমাদের জীবনী-শক্তি যোগাচ্ছে। গাছেরা সবুজ পাতায় তাদের খাদ্য তৈরী করে সূর্যেরই আলোর সাহায্যে, আমরা তার ওপর ভাগ বসাই। সূর্যের আলো না পেলে তা সম্ভব হ'ত না। কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ ও আলো পাওয়া যায়, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় শক্তি বা 'এনার্জি',—তাও আসে সূর্যেরই কৃপায়। সূর্যের শক্তিই কয়লার মধ্যে সঞ্চিত থেকে তাকে শক্তিমান্ করে। সূর্যের আলোয় যে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি আছে



প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্!

সূর্যের আলো

সাত ঘোড়ার রথে চড়ে সূর্যদেব আকাশে ঘুরে বেড়ান—আমাদের পুরাণে এই রকম বর্ণনা আছে। সূর্যের আলো বা রশ্মির রং সাদা। খালি চোখে আমাদের তাই-ই মনে হয়। কিন্তু আসলে ওই সাদা রংএর মধ্যে লুকিয়ে আছে সাতটি রং—বেগুনী (ভায়োলেট), গাঢ় নীল (ইণ্ডিগো), নীল (ব্লু), সবুজ (গ্রীন্), হলদে (ইয়োলো), কমলা (অরেঞ্জ) এবং লাল (রেড)। এই নামগুলো চট্ করে মনে আনবার জন্য ওদের ইংরেজী আদ্যক্ষর একত্র করে 'ভিবজিওর' ('VIBGYOR') কথাটি ব্যবহার করা হয়। V হচ্ছে ভায়োলেট, I ইণ্ডিগো—এই ভাবে। সূর্যের আলো যদি কোন ত্রিশিরা



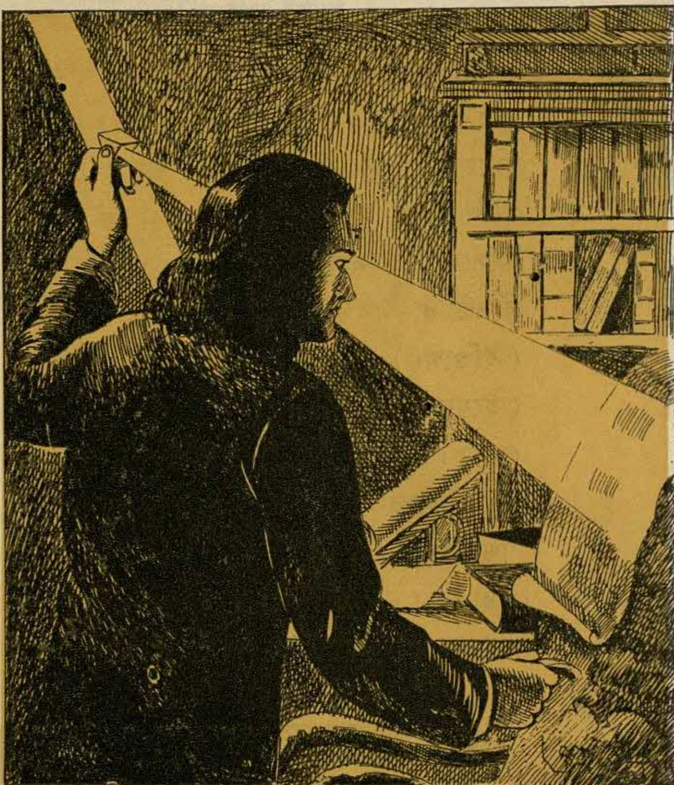
সাত ঘোড়ার রথে চড়ে সূর্যদেব আকাশে ঘুরে বেড়ান

তা আমাদের দেহের কাঠামোকে পুষ্ট করে। সূর্যের আলো যদি না থাকত, তাপ যদি না থাকত, তা হলে কোন জীবেরই পক্ষেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব হ'ত না। আমাদের প্রাচীন আর্যঋষিরাও এ কথা জানতেন, তাই তাঁরা শত মুখে সূর্যের জয়গান করে গেছেন। সূর্য-প্রণামের সেই সুন্দর মন্ত্রটি তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ?

"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্,
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।"

হে জবাকুসুমের মত লাল, কশ্যপপুত্র, মহা-দীপ্তিমান্, অন্ধকারের শত্রু, সর্বপাপহারী দিবাকর, তোমায় প্রণাম করি।

'মহাদ্যুতিম্'ই বটে! অত দূরে রয়েছে, তবু ভোরে আর সন্ধ্যায় ছাড়া তার দিকে চোখ মেলে তাকানো পর্যন্ত যায় না—এত তাঁর তেজ!



নিউটন সূর্যের আলো নিয়ে পরীক্ষা করছেন

কাচের (প্রিজ্‌ম্) মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা হলে এই রংগুলি পাশাপাশি দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন রশ্মির প্রতিসরণ বিভিন্ন, তাই এটা সম্ভব। রামধনুতেও আমরা তাই দেখি। বৃষ্টির পর কখনও কখনও আকাশে ভাসমান সূক্ষ্ম জলকণার ওপর সূর্যের আলো পড়ে প্রত্যেকটা রং পাশাপাশি দেখা দেয়—তাই রামধনুর ঐ রকম রং। আর ঐ থেকেই বোঝা যায় সূর্যের সাদা রং সাতটি রংএর সমষ্টি। ঐ সাতটি রং ঠিকমত মিশিয়ে নিতে পারলে ফের সাদা রং পাওয়া যায়—এ তোমরাও পরীক্ষা করে দেখতে পার। তাই বোধ হয় সূর্যদেবের ঐ সাত ঘোড়ায় টানা রথের কল্পনা করা হয়েছে। তবে সূর্যের আলোক বিশ্লেষণ করে তার সত্যিকার বৈজ্ঞানিক রহস্য যিনি প্রথম উদ্‌ঘাটন করেছিলেন তিনি একজন ইংরেজ—মহাবিজ্ঞানী নিউটন।

ঐ সাতটি রং ছাড়াও কিন্তু সূর্যের আলোয় আরও নানা রকম রংএর রশ্মি মেশান আছে, কিন্তু সেগুলি চোখে দেখে ধরবার ক্ষমতা আমাদের নেই। কারণ সেগুলি হচ্ছে অদৃশ্য আলোক-রশ্মি, খালি চোখে তাদের রং ধরা পড়ে না। অন্য ভাবে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে সেগুলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। যেমন ধর, বেগুনী আলোর ঠিক পাশেই আছে আর একটি অদৃশ্য আলো—যার নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন 'আল্‌ট্রাভায়োলেট' রশ্মি। এর কথা একটু আগেই বলেছি। বাংলায় এ আলোককে বলা যেতে পারে 'অতি-বেগুনী আলো' বা 'বেগুনীপারের আলো'। তেমনি লাল আলোর পাশেই রয়েছে অদৃশ্য 'ইন্‌ফ্রা-রেড্' রশ্মি। বাংলায় 'অতি-লাল আলো' বলা চলে। কেউ কেউ বলেন 'লাল-উজানি-আলো'।

সূর্যের স্বরূপ

ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখেছ কখনও, ভাল করে ? সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত ? লাল টুকটুকে একখানা

থালার মত দেখতে। ক্রমে, যতই বেলা বাড়ে, লাল রং বদলে দেখা দেয় তার চোখ-ঝলসানো রূপ। একটু পরে আর তার দিকে চাওয়াই যায় না। কবিরা সূর্যকে সোনার থালার সঙ্গে তুলনা করে অনেক কবিতা-টবিতা লিখেছেন, কিন্তু সূর্য মোটেই সে রকম নয়। আসলে সূর্যও হচ্ছে একটা জ্বলন্ত গ্যাসের তাল—সর্বক্ষণ দাউ দাউ করে জ্বলছে তো জ্বলছেই! কী দারুণ তার উত্তাপ! ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে জল ফুটে বাষ্প হয়, আর সূর্যের বাইরের দিকের উত্তাপই কম করে ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। হিসেব করে দেখা গেছে, ৭৫ ফুট পুরু একটা বরফের চাঁই দিয়ে সূর্যকে ঢেকে দিলে চোখের পলকে সূর্য তা গলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প করে দিতে পারে। বাইরের তাপ যদি ঐ রকম হয় তবে ভিতরের তাপ কত? বিজ্ঞানীরা মনে করেন—অন্ততঃ ৩ কোটি থেকে ৬ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হবার সম্ভাবনা। কোথা থেকে আসছে এই উত্তাপ? নিশ্চয়ই সূর্যের ভিতরকার গ্যাস পুড়িয়ে তবেই এ উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অতখানি তাপ যোগাতে হ'লে যে জ্বালানী গ্যাস লাগে তাও তো তা হলে কম নয়! প্রতি সেকেণ্ডে এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ মণ গ্যাস পোড়ালে তবেই ঐ উত্তাপ পাওয়া সম্ভব হতে পারে। তাই নিশ্চয় ঘটছে সূর্যের মধ্যে—প্রতি সেকেণ্ডে। এমনি ভাবে মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর কেটে যাচ্ছে, তবু কিন্তু সূর্যের নিববার নাম নেই। কারণ সূর্যে শুধু ক্ষয়ই হচ্ছে না, সূর্য তার ক্ষুধার ইন্ধন কিছু কিছু সংগ্রহ করে নিচ্ছে আকাশের উড়ন্ত জ্যোতিষ্ক পদার্থগুলি থেকে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন আপাততঃ দু' হাজার কোটি বছর এই ভাবে সে দিব্যি চালিয়ে যেতে পারবে। ঐ সময়ের মধ্যে তার নিববার কোন আশঙ্কাই নেই।

তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে সূর্যের ভিতর। সূর্যের শরীরে যে উত্তাপ আর চাপ তাতে কোন জিনিসই সেখানে নিরেট বা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না—এমন কি যৌগিক পদার্থের আকারেও থাকতে পারে না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্যে যে মৌলিক উপাদান রয়েছে প্রচণ্ড উত্তাপ আর চাপের ফলে তার পরমাণু বা অ্যাটমগুলো ক্রমাগতই ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই অ্যাটম্ বা পরমাণু ভাঙ্গলে কি হয় তা গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত অ্যাটম্ বোমার বিস্ফোরণের ভিতর দিয়েই আমরা জানতে পেরেছি। অ্যাটমের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরণের বিদ্যুৎ-কণা—যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি, আর আছে বিদ্যুৎশক্তিহীন নিউট্রন। অ্যাটম্ ভাঙ্গলে শুধু এগুলোই বেরিয়ে আসে না, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে তার ভিতরকার প্রচণ্ড শক্তি, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় পরমাণুশক্তি বা 'অ্যাটমিক এনার্জি'। কাজেই, সূর্যের ভিতর যদি ক্রমাগত এই অ্যাটম্ ভাঙ্গার কাজ চলতে থাকে তা হলে তা থেকে কী প্রচণ্ড শক্তি যে বেরোতে পারে তা কল্পনাতীত। সূর্যের প্রচণ্ড তেজ আর শক্তির উৎস খুব সম্ভবতঃ এইখানেই।

সূর্যের আকার কত বড়? সূর্যের চেহারা গোল—যাকে বলা হয় গোলক। এই গোলকের ব্যাস হচ্ছে ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪০০ মাইল। হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে সূর্যের এই

আয়তন পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ। পৃথিবীর হিসেব দিয়ে যদি সূর্যকে ওজন করা যেত তা হলে সূর্যের ওজন কত হ'ত তাও বের করেছেন পণ্ডিতেরা। মণ-সের উঠে গিয়ে কিলোগ্রাম চালু হলেও কোন জিনিসের সঠিক ওজন ধারণা করতে হলে এখনও আমরা মণের কথাই ভাবি। মণ দিয়েই সূর্যের ওজন বলি। ৬-এর পেছনে ২৮টা শূন্য বসালে যত হয় সূর্যের ওজন তত মণ।

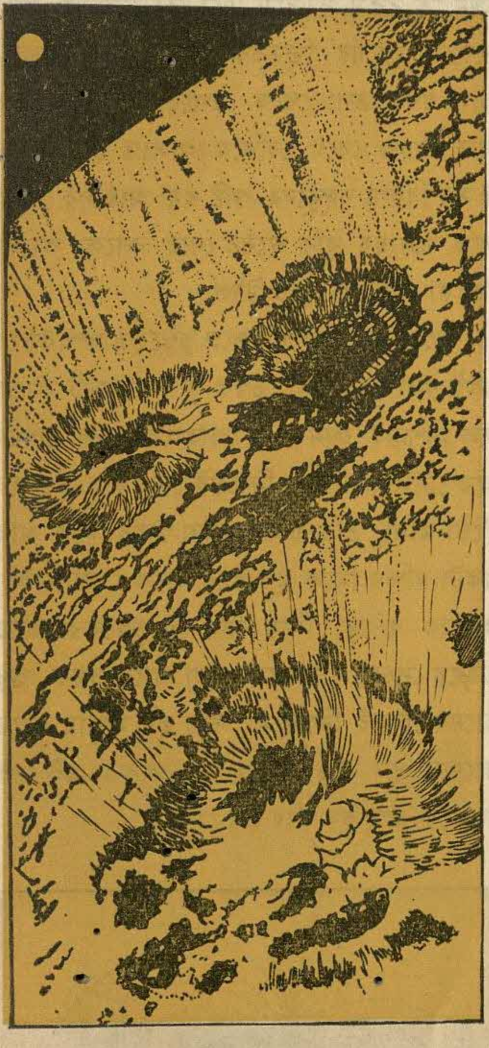
আমাদের পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খাওয়ার-সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকেও পাক খাচ্ছে লাট্টুর মত। সূর্য যদিও পৃথিবীর মত কারুর খাস প্রজা নয়, কিন্তু তবুও, বিজ্ঞানীদের ধারণা, তাকেও পাক খেতে হচ্ছে এক বিশাল জ্যোতিশ্চক্রের চারদিকে। ঐ চক্র তৈরী হয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র মিলিয়ে। আবার ঐ জ্যোতিশ্চক্রও নাকি স্থির হয়ে নেই, সেটাও পাক খাচ্ছে অবিরত। এ সব ভাবতে গেলে আমাদেরও মাথা ঘুরতে থাকে।

কিন্তু ও-ভাবে ঘুরপাক খেলেও সূর্যকে যে নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকেও লাট্টুর মত পাক খেতে হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পৃথিবীর এই রকম একটা পাক খেতে লাগে ২৪ ঘণ্টা, কিন্তু সূর্যের লাগে ২৬৷২৭ দিন। একটা নির্দিষ্ট সময় না বলে ঐ রকম একটা ভাসা-ভাসা হিসেব কেন দিচ্ছি? কারণটা আর কিছুই নয়, পৃথিবীর মত সূর্য তো নিরেট নয়—গ্যাস দিয়ে তার দেহ তৈরী। ঘুরবার সময় তার সমস্ত শরীর সমান বেগে নাও ঘুরতে পারে এবং সত্যিই তাই। শরীরের কোন কোন অংশ একটু তাড়াতাড়ি ঘোরে, আবার কোন কোন অংশ একটু আস্তে ঘোরে। কোন জায়গা ২৬ দিনে একবার পাক খায়, কোন জায়গার পাক খেতে ২৭ দিনও লেগে যায়।

সূর্যেও কলঙ্ক আছে

সূর্যের এই রকম পাক খাওয়ার খবর কি করে ধরা পড়ল জান? লাট্টু যখন বন্ বন্ করে ঘোরে তখন তার দিকে চাইলে কি বোঝা যায় সেটা সত্যি ঘুরছে কিনা? কিন্তু তার গায়ে যদি একটা কালো দাগ দিয়ে তার পর ঘোরানো যায় তা হলেই বোঝা যাবে লাট্টুটা ঠিক ঘুরছে—কারণ ঐ দাগটা একবার সামনে আসবে, আবার পেছনে যাবে, আবার সামনে ফিরে আসবে। সূর্যের গায়েও যদি ঐ রকম কোন দাগ থাকে এবং যদি সে দাগটা লাট্টুর দাগের মত ক্রমাগত আসা-যাওয়া করে তা হলেই বোঝা যাবে সূর্য লাট্টুর মত ঘুরপাক খাচ্ছে। সূর্যের গায়ে সত্যি এই রকম কালো কালো দাগ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এবং তাই দেখেই ওর ঘুরপাক খাওয়া ধরা পড়েছে। কিসের দাগ ওগুলো? ওগুলোকে বলা হয় সূর্যের কলঙ্ক বা 'সান্‌স্পট্‌'।

কলঙ্ক বলতে আমরা চাঁদের কলঙ্কের কথাই শুনে আসছি, তা হ'লে সূর্যেরও কলঙ্ক আছে? হ্যাঁ, আছে, তবে তা চোখে দেখা বড় কষ্টকর। সূর্যের ঐ তেজাল দেহের দিকে তাকাতে পারলে তবে তো দেখা যাবে! তা ছাড়া সব কলঙ্ক এত বড় হয় না যা দূরবীণ ছাড়া খালি চোখে ধরা পড়তে পারে। বিজ্ঞানীরা ফটোগ্রাফের সাহায্যে এগুলি খুঁজে বার করেছেন। চাঁদের কলঙ্ক আর সূর্যের কলঙ্কে আরও অনেক তফাৎ আছে। চাঁদের কলঙ্ক চিরদিনই তার গায়ে আঁকা, কিন্তু



সূর্যের কলঙ্ক—সানস্পট্

সূর্যের কলঙ্ক সব সময়ে থাকে না। এক-একবার দেখা দেয়, তারপর একটু একটু করে সরতে সরতে ১২।১৩ দিন পরে একেবারে একধারে চলে যায়। কোন গোল জিনিষকে পাশ থেকে দেখলে যেমন চ্যাপ্টা দেখায় এদেরও তখন অনেকটা তেমনি দেখায়। এর পরই কলঙ্কগুলো কয়েকদিনের জন্য বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু ১২।১৩ দিন পরে ফের ফুটে ওঠে যেদিকে অদৃশ্য হয়েছিল তার উল্টো দিকে। সেই লাট্টুর গায়ের দাগের কথা মনে কর। এও যেন ঠিক তাই, আর এই দেখেই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন সূর্যের পাক খাওয়ার খবর।

সূর্যের কলঙ্কগুলো চাঁদের কলঙ্কের মত চিরস্থায়ী নয় সে কথা তো আগেই বলেছি। একবার দেখা দিলে মাস কয়েক মাত্র থাকে, তারপর আপনি মিলিয়ে যায়। সব কলঙ্ক আবার সমান জোরে ঘোরে না। যেটা সূর্যের দেহের যত মাঝামাঝি—অর্থাৎ সূর্যের বিষুবরেখার যত কাছাকাছি—সেটা তত জোরে ঘোরে। সূর্যের দেহের সবটা যে সমান জোরে ঘোরে না এ থেকেই তা বোঝা যায়। অবশ্য এর কারণ তো আগেই বলেছি—সূর্য নিরেট নয়, জ্বলন্ত গ্যাসের তাল মাত্র।

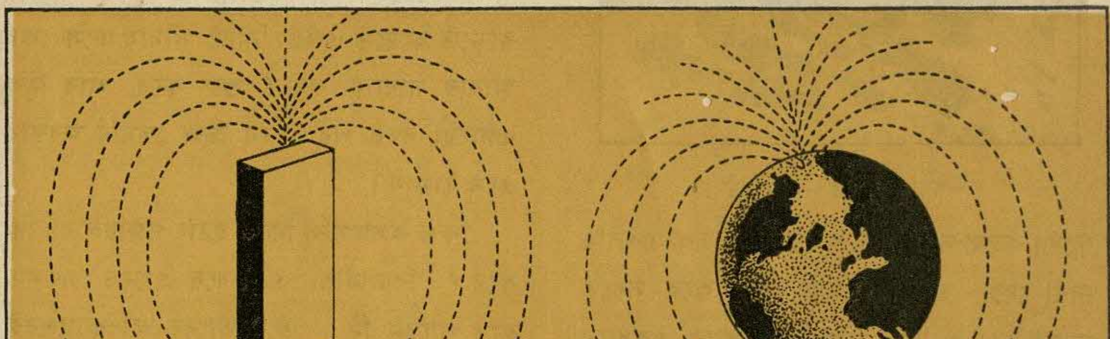
সূর্যের এই কলঙ্ক সম্বন্ধে আরও একটা মজার ব্যাপার আছে। পণ্ডিতেরা তার নাম দিয়েছেন 'এগারো বছরের ঘুরপাক'। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন—কলঙ্কগুলো ক্রমাগত সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে একটা নির্দিষ্ট সীমায় এসে ফের আবার সংখ্যায় কমতে শুরু করে, আর ঠিক এগারো বছর পর যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু কলঙ্কগুলি কি ? হঠাৎ গজায়ই বা কি করে ? বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে এখনও একমত হতে পারেন নি। তবে তাঁদের অধিকাংশেরই যা ধারণা তা হচ্ছে এই ঃ সূর্যের গায়ে লক্ষ লক্ষ মাইল যুড়ে নানা রকমের গ্যাস দাউ দাউ করে জ্বলছে আর অবিরাম ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাধাক্কি করছে। ফলে বড় বড় ঝড়ঝাপ্টা সেখানে লেগেই আছে। আমাদের পৃথিবীর

আকাশে যখন ঝড় ওঠে তখন কি হয়? মেঘ ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় আর সেই ছেঁড়া মেঘের তলা থেকে এখানে-ওখানে টুকরো আকাশ উঁকি মারে। সূর্যের ওপরেও নাকি ঠিক এই কাণ্ড হয়। সূর্যের গায়ে যখন এক-একটা বিরাট বিরাট ঝড় ওঠে তখন তার জ্বলন্ত আবরণ জায়গায় জায়গায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় আর তার তলা থেকে উঁকি মারে নীচেকার অনুজ্জ্বল অংশ। সূর্যের ওপরটার মত ভিতরটা অত উজ্জ্বল নয়, তাই পৃথিবী থেকে সেগুলোকে ছোট ছোট কালো কালো গর্ত বা দাগ বলে মনে হয়। "ছোট ছোট" বলতে অবশ্য সূর্যেরই তুলনায় ছোট বুঝতে হবে, কারণ ওরই এক-একটার ভিতর হয়তো আমাদের দশ-বিশটা বা সময় সময় হাজারটা পৃথিবীকে পূরে রাখা যায়।

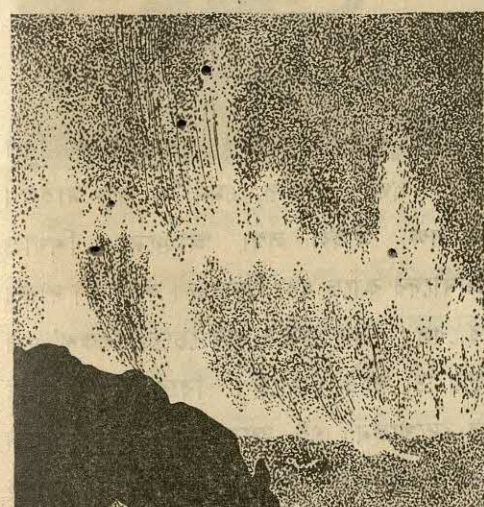
আর একদল বিজ্ঞানীর ধারণা—ওগুলো সূর্যদেহের বিরাট বুদ্‌বুদ্‌। জলের ভিতর দিয়ে যখন কোন গ্যাস ঠেলে বেরোবার চেষ্টা করে তখন কি রকম বুড়বুড়ি ওঠে তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। সূর্যের ভিতরকার নানারকম জ্বলন্ত গ্যাস যখন তলা থেকে ওপরের গ্যাসকে ভেদ করে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসতে চায় তখন ঐ সব বিরাট বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয় আর দূর থেকে দেখে মনে হয় বুঝি সূর্যের দেহে কালো কালো দাগ বা ক্ষতচিহ্ন ফুটে উঠল!

সূর্যের এই কলঙ্কের সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্কটাও একটু বলা দরকার। চুম্বক বা ম্যাগনেট কাকে বলে নিশ্চয়ই জান এবং লোহাকে চুম্বক কেমন করে টেনে ধরে তাও নিশ্চয়ই দেখেছ। চুম্বকের দু'টো মাথা, তার একটা সর্বদা উত্তর দিকে আর একটা দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে। খানিকটা লোহার গুঁড়ো নিয়ে যদি ঐ চুম্বকের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে চুম্বক শুধু তাদের টেনেই নিচ্ছে না, তার দুই মাথার কাছে তাদের এনে জড় করছে। চুম্বকের এই দুই মাথাকে বলা হয় তার দুই মেরু।



পৃথিবীটাও একটা বিরাট চুম্বক

কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, আমাদের এই পৃথিবীও নাকি একটা বিরাট চুম্বক আর তার দুই মাথা হচ্ছে পৃথিবীর দুই মেরু। সূর্যের গায়ে যখন এক-একটা বিরাট ঝড় ওঠে তখন তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে অজস্র বিদ্যুৎ-কণা—পরমাণু বা অ্যাটম্ ভেঙ্গে যার সৃষ্টি। এই বিদ্যুৎ-কণা যখন অতিবেগে মহাকাশে ছুটতে থাকে তখন তার কতক আমাদের পৃথিবীর ওপরও এসে পড়ে, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর ওপর তা ছড়িয়ে পড়ে না।—পড়ে না পৃথিবী নিজেই একটা বিরাট চুম্বক ব'লে। এই বিরাট চুম্বকের টানে সেগুলো লোহার গুঁড়োর মতই পৃথিবীর দুই মেরুপ্রান্তে গিয়ে জড় হয়। সেখানে আছে মেরুর হাল্কা বাতাস। সেই বাতাসের সঙ্গে বিদ্যুৎ-কণার সংঘর্ষ হলে সেই ধাক্কায়



মেরুজ্যোতিঃ বা অরোরা

বাতাসও জ্বলে ওঠে আর রং-বেরংএর আলো ছড়াতে থাকে। এরই নাম "মেরুজ্যোতিঃ" বা "অরোরা"। এই আশ্চর্য রঙ্গিন বৈদ্যুতিক আলোর কথা তোমরা ভূগোলেও হয়তো পড়েছ। হাল্কা বাতাসের ওপর বিদ্যুৎ-কণা ফেললে যে ঐ রকম আশ্চর্য রংএর খেলা দেখা যায় তা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন। যখনই সূর্যের গায়ে এক-একটা বড় রকম কলঙ্ক দেখা দেয় তখনই পৃথিবীর বুকে সমস্ত চুম্বকের গায়ে একটা বড় রকম সাড়া বা চাঞ্চল্য জাগে। পৃথিবীর দুই মেরুতেও। এগারো বছর পর পর, যে সময়টা সূর্যের কলঙ্ক আকারে ও সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী হয়,—মেরুদেশের এই আলোর খেলারও তখন খুব বাড়াবাড়ি দেখা যায়। কাজেই দু'টোর মধ্যে যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে তা অস্বীকার করা যায় কি?

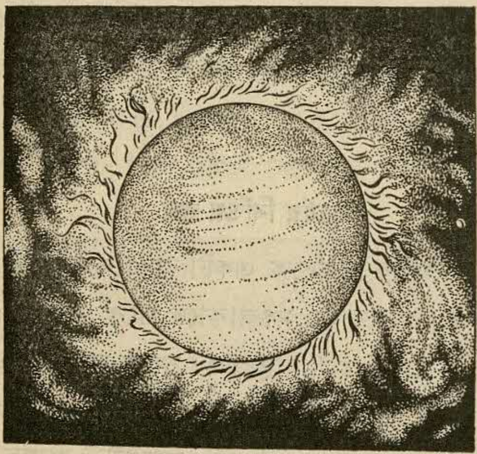
সূর্যের বিভিন্ন স্তর

পৃথিবীর চারদিকে একটা বাতাসের আবরণ তাকে কম্বলের মত মণ্ডলাকারে ঢেকে রেখেছে; তাকে আমরা বলি বায়ুমণ্ডল। সূর্যের চারদিকেও ঐ রকম একটা গ্যাসের আবরণ আছে। সূর্যের ভিতরের অংশটাও কিন্তু, আগেই বলেছি, পৃথিবীর মত নিরেট নয়;—তাও গ্যাস এবং অত্যন্ত ঘন গ্যাস। ঘন হবার কারণ চারদিক্-কার প্রচণ্ড চাপ। আমাদের পৃথিবীর ওপরকার লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু যে রকম ঘন, সূর্যের এই গ্যাস নিশ্চয়ই তার চেয়েও ঘন। কিন্তু তবু তা গ্যাস, কেন না অত উত্তাপে কোন পদার্থই নিরেট বা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না।

অত ঘন গ্যাস যে আসলে কি রকম তা আমরা ধারণা করতে পারি না।

সূর্যের এই সবচেয়ে ভিতরের অংশকে বাংলায় বলা হয় 'তাপমণ্ডল' (বিজ্ঞানের ভাষায় 'থার্মোস্ফিয়ার')। সূর্যের যত তাপ আর রশ্মি সবেরই উৎপত্তি-স্থল এটি। এখানে কি আছে? আছে যত মৌলিক পদার্থের পরমাণু আর সেই পরমাণু-ভাঙ্গা বিদ্যুৎ-কণা। কাজেই এটাই যে সূর্যের ভিতরকার সমস্ত শক্তির ভাণ্ডার তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

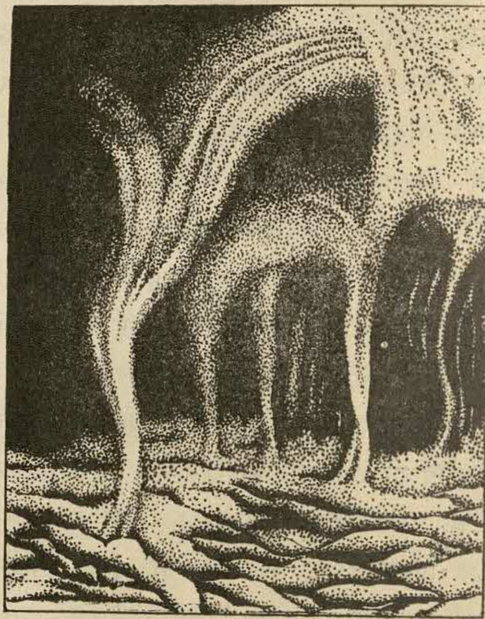
সূর্যের ঐ ঘন অংশকে আর একটা পাৎলা জ্বলন্ত গ্যাসের আবরণ ঘিরে আছে। এটি শুধু জ্বলছেই না, সঙ্গে সঙ্গে আলোও ছড়াচ্ছে প্রচুর।



সূর্যের আলোকমণ্ডল

আগুনের ঝড় তো আছেই! এই অংশটিকে বলা হয় 'আলোকমণ্ডল' (ফোটোস্ফিয়ার)।

আলোকমণ্ডলের ওপরেও কিন্তু আছে আরও একাধিক স্তর। প্রথম যেটি সেটিকে বলা হয় 'বর্ণমণ্ডল' (ক্রোমোস্ফিয়ার)। এই স্তরটির বিশেষত্ব হচ্ছে এর তীব্র রঙ্গিন অগ্নিশিখা। লাল টক্‌টকে সেই শিখা সাপের ফণার মত লক্ লক্ করে লাফিয়ে উঠছে। এই অগ্নিশিখাগুলির



সূর্যের বর্ণমণ্ডল—লাল টকটকে শিখা সাপের ফণার মত লক্ লক্ করে লাফিয়ে উঠছে

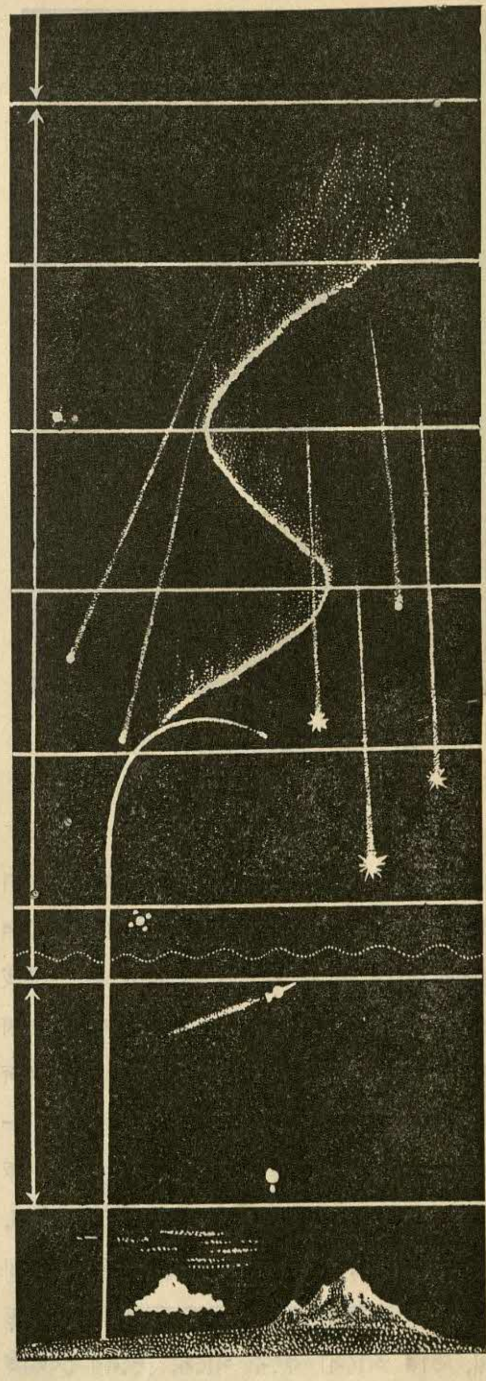
এক-একটি কত লম্বা জান? দশ হাজার—বিশ হাজার—পঞ্চাশ হাজার, এমন কি লক্ষ মাইল। তিন লক্ষ মাইল লম্বা আগুনের শিখাও বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়েছে। আর কী দারুণ তার বেগ! বন্দুকের গুলির চেয়েও একশ' গুণ জোরে তা ছুটে চলেছে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এই স্তরে প্রচুর হাইড্রোজেন আর ক্যালসিয়াম্ মেশান আছে, আর আছে হিলিয়াম্। এগুলি,—বিশেষ করে ক্যালসিয়াম্-গুলি প্রচণ্ড তাপে ভেঙ্গে এমন অবস্থায় রয়েছে যা নাকি সর্বদাই বিদ্যুৎ-শক্তি মাখানো। আর এরাই মাঝে মাঝে ফুলে, ফেঁপে, সূর্যের টান এড়িয়ে মহাশূন্যে ছিটকে বেরিয়ে পড়ছে, এবং



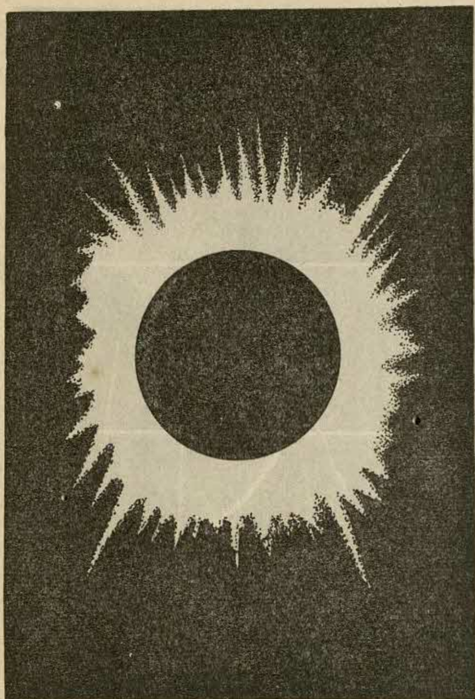
ফুলে, ফেঁপে মহাশূন্যে ছিটকে বেরিয়ে পড়ছে···

এদেরই ভিতরকার বিদ্যুৎ-কণা পৃথিবীতে এসে মেরুর টানে সৃষ্টি করছে মেরুজ্যোতিঃ (অরোরা)।

বর্ণমণ্ডলকে ঘিরে যে দ্বিতীয় স্তর তার নাম 'কিরণ-মুকুট' বা 'করোনা'। কেউ কেউ নাম দিয়েছেন 'ছটামণ্ডল'। দেব-দেবীর ছবি আঁকবার সময় তাঁদের মাথার চারদিকে অনেক সময় যে ছটা আঁকা থাকে, ইংরেজীতে যাকে বলে 'হেলো', এও অনেকটা সেই রকম। তফাৎ শুধু এর আয়তন। লক্ষ লক্ষ মাইল যুড়ে সূর্যকে ঘিরে ঝলমল করছে এই ছটা।



মেরুর টানে সৃষ্টি করছে মেরুজ্যোতিঃ



সূর্যের কিরণ-মুকুট বা ছটামণ্ডল—
পূর্ণগ্রাসের দিন যেমন দেখায়

সূর্যের এই বর্ণমণ্ডল আর কিরণ-মুকুট, বা ছটামণ্ডলকে দেখা কিন্তু খুব কঠিন। সূর্যের ভিতরটা এত গরম আর এত উজ্জ্বল যে তারই আলো এদেরকে সর্বক্ষণ ঢেকে রাখে। তবে এদের দেখা যায় কি করে? দেখা যায় যদি একটা কিছু দিয়ে তাপমণ্ডল আর আলোক-মণ্ডলকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। তাও কি সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। তবে সব সময়ে নয়, এক-একটা বিশেষ বিশেষ সময়ে—সূর্যগ্রহণের সময়ে। ঐ সময়ে সূর্যের কতক অংশ ঢাকা পড়ে যায়, তার আলো কমে আসে, দিনের বেলাই মনে হয় বুঝি বা সন্ধ্যা হয়ে এল। এক টুকরো কাচের গায়ে ভুষো কালি মাখিয়ে তার ভিতর দিয়ে এই সময়ে সূর্যের দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায় সূর্য কেমন ক্ষয়ে গেছে! তার মানেই ওর কতক অংশ ঢাকা পড়ে গেছে। কখনও কখনও সূর্য একেবারে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায়। তখন তাকে বলা হয় সূর্যের পূর্ণগ্রহণ বা পূর্ণগ্রাস। এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য অবশ্য কালে-ভদ্রে হয় এবং তাও পৃথিবীর সব জায়গা থেকে নয়—এক একবার এক-একটা বিশেষ বিশেষ জায়গা থেকে। এই রকম এক-একটা পূর্ণগ্রহণ যখন হয় তখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে যায়। যন্ত্রপাতি নিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কারের আশায় তাঁরা উঠি-পড়ি করে ছোটেন সেই বিশেষ জায়গাটিতে।

সূর্যের গ্রহণ

গ্রহণ কেন হয়? আকাশে নিশ্চয়ই এ একটা অলৌকিক ব্যাপার, তাই পৃথিবীর নানান্ দেশে এ নিয়ে নানান্ গল্প কল্পনা করা হয়েছে। আমাদের পুরাণেও আছে। গল্পটা এই রকম:

সমুদ্রমন্থনের সময় সাগর ছেঁচে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে পাওয়া গেল অমৃত। দেবতারা অসুরদের বঞ্চিত করে সেটা দখল করলেন, তার পর সবাই মিলে বসলেন সেই অমৃত পান করতে। অমৃত যে পান করবে সেই হবে অমর।

এদিকে কেতু নামে একজন অসুর ছিল ভারী চালাক। দেবতারা অমৃত বেঁটে নিচ্ছেন দেখে সেও দেবতার ছদ্মবেশ ধরে বসে গেল তাঁদের সঙ্গে অমৃতের ভোজে। খাওয়া সবে সুরু হয়েছে, কেতুও অমৃত নিয়ে চুমুক দিয়েছে, ঠিক এমনি সময় চন্দ্রদেব আর সূর্যদেব তাকে ধরে ফেললেন। "আরে, এ যে একটা অসুর,

কখন লুকিয়ে লুকিয়ে এসে বসেছে আমাদের মধ্যে!" যেই প্রকাশ পাওয়া অমনি বিষ্ণু, তাঁর হাতে ছিল সুদর্শন চক্র,—সেই চক্র দিয়ে কেতুর মাথাটা কেটে ফেললেন। কিন্তু ততক্ষণে অমৃত কেতুর গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এর ফলে তার শরীরটা আলাদা হয়ে গেলেও মাথাটা জ্যান্তই রয়ে গেল। আর ঐ মাথাটার নাম হ'ল রাহু। এর পর রাহুর যত রাগ গিয়ে পড়ল

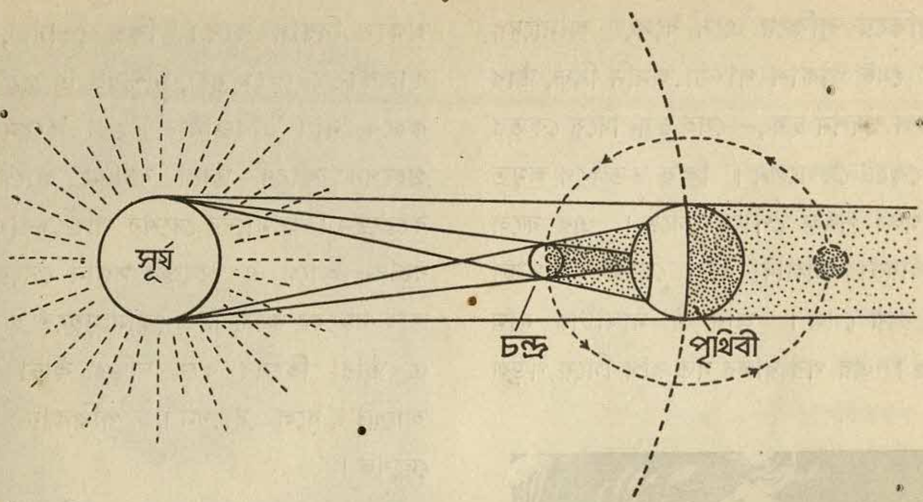


রাহু সূর্যকে গিলতে যাচ্ছে

সূর্যদেব আর চন্দ্রদেবের ওপর। তাঁরাই তো ওকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সে তখন চন্দ্র-সূর্যকে গিলে ফেলার জন্য সারা আকাশ ছুটে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে সে ওঁদেরকে গিলেও ফেলে, কিন্তু গলার দিক্‌টা কাটা থাকায় তাঁরা আবার ফের সুড়ুৎ করে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসেন। রাহু যখন সূর্যকে গিলে ফেলে তখনই হয় সূর্যগ্রহণ। চাঁদকে গিললে হয় চন্দ্রগ্রহণ।

গল্পটা শুনতে বেশ মজার এবং এখনও এদেশে বহু লোক আছে যারা এ গল্প অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে। কিন্তু তোমরা, আজ-কালকার ছেলেমেয়েরা, নিশ্চয়ই এ গল্প বিশ্বাস করবে না। বিজ্ঞানীরা তো করেনই না। গ্রহণের কারণ তাঁরা বহুদিন আগেই বার করেছেন। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরাও বহু—বহুদিন আগে এ রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই বছরের কবে, ঠিক কোন্ মুহূর্তে গ্রহণ হবে এ তাঁরা হিসেব করে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে আগেই বলে রাখেন। পঞ্জিকায় নিশ্চয়ই দেখেছ।

সূর্যগ্রহণের জন্য আসল দায়ী হচ্ছে চাঁদ। সমীহ করে চন্দ্রদেব বলতে পার যদি ইচ্ছে হয়। কিন্তু চাঁদ কোন কালেই দেবতা ন'ন—আমাদের পৃথিবীর একটি প্রজা মাত্র,—সর্বক্ষণ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিজ্ঞানের ভাষায় সে পৃথিবীর উপগ্রহ, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু চাঁদকে পৃথিবী থেকে দেখলে মাসের সব দিন সমান দেখা যায় না, আবার রোজ একই সময়েও দেখা যায় না। কেন তা পরে বলব। অমাবস্যার পর প্রতিপদে চাঁদকে দেখায় একটা কুমড়োর ফালির মত। তারপর রোজ সে বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমার দিন পুরোপুরি গোল হয়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ সেদিন আমরা চাঁদের সবটাই দেখতে পাই। আবার তারপরই চাঁদ ক্রমাগত ছোট হতে থাকে এবং ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষে অমাবস্যার দিন একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই বলে চাঁদ তো সেদিন সত্যি হারিয়ে যায় না, কোথায় যায় তা হলে? ঐ দিন চাঁদ সূর্যোদয়ের সঙ্গে ওঠে আর সূর্যাস্তের সঙ্গে অস্ত যায়, তাই আর তাকে আমরা দেখতে পাই না।



চাঁদের আড়ালে সূর্য একদম ঢাকা পড়ে—দেখা দেয় সূর্যগ্রহণ

এখন, বছরের কোন কোন অমাবস্যায় চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে এমন জায়গায় এসে পড়ে যে তখন চাঁদের আড়ালে সূর্য একদম ঢাকা পড়ে যায়। চাঁদ যদিও সূর্যের চেয়ে অনেক—অনেক ছোট, কিন্তু সূর্যের তুলনায় সে পৃথিবীর অনেক কাছাকাছি আছে বলেই ঐ রকমটা হয়। অবশ্য পৃথিবীর সব জায়গা থেকে একই সময়ে চাঁদকে পূরোপূরি সূর্য ঢাকতে দেখা যায় না, বেশীর ভাগ জায়গা থেকেই খানিকটা ঢাকা দেখা যায়। তারই নাম আংশিক সূর্যগ্রহণ। চাঁদ যখন সূর্যকে পূরোপূরি ঢেকে ফেলে তখনই হয় সূর্যের পূর্ণগ্রহণ বা পূর্ণগ্রাস।

সূর্য কি দিয়ে তৈরী

সূর্যের সমস্ত শরীর গ্যাস বা বাষ্পীয় পদার্থে তৈরী। কিন্তু ঐটুকু বললেই সব বলা হয় না। প্রশ্ন ওঠে, কিসের গ্যাস? কোন্ ধাতু—কোন্ মৌলিক পদার্থ দিয়ে তা তৈরী? কেমন করে তা জানা যাবে?

পৃথিবীর ওপরকার কোন জিনিসের উপাদান বার করতে হলে আমরা সাধারণতঃ তার রাসায়নিক পরীক্ষা করতে বসি। ল্যাবোরেটরীতে টেষ্ট টিউবে নানারকম রাসায়নিক মশলাপাতির সাহায্যে এই কাজ হাসিল করা হয়। কিন্তু অত দূরের সূর্য থেকে কোন জিনিস তুলে এনে তো আর তা টেষ্ট টিউবে ভরা যায় না! তবে?

এরও একটা সহজ উপায় আছে। বিজ্ঞানীরা কোন জিনিসের আলো পরীক্ষা করে বলে দিতে পারেন তার মধ্যে কি আছে। একে বলে বর্ণালী বিশ্লেষণ বা 'স্পেকট্রাম্ অ্যানালিসিস্'। সূর্যের সাদা আলোয় প্রধানতঃ সাত রকম রশ্মি আছে এ কথা আমরা জানি। এ ছাড়াও অন্য রংএর নানা রকম রশ্মি আছে যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। সূর্যের সাদা রং নিয়ে বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে ঐ সাত রং পর পর ফুটে ওঠে। কোন কঠিন বা তরল জিনিস খুব গরম করে তার আলো নিয়ে বর্ণালী পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাতেও ঐ সাত রং অবিচ্ছিন্ন ভাবে চোখে ধরা পড়ে। কিন্তু ঐ

ভাবে কোন উত্তপ্ত গ্যাসের আলো পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার বর্ণালীর মধ্যে ঐ রংগুলোর মাঝে মাঝে এক-একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা করে বা একাধিক কালো কালো রেখা। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন, ঐ কালো রেখাগুলির সৃষ্টি হয় এক-একটা বিশেষ বিশেষ ধরণের মৌলিক পদার্থের (যার ইংরেজী নাম এলিমেণ্ট) দরুণ। তা হলেই, বুঝতে পারছ, কোনও জিনিসকে বাষ্পীয় অবস্থায় এনে তার আলো নিয়ে বর্ণালী বিশ্লেষণ করলেই বলে দেওয়া যায় সে জিনিসটা কি দিয়ে তৈরী—অর্থাৎ কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থ বা এলিমেণ্টের উপাদানে সেটি গঠিত। ঠিক এইভাবেই সূর্যের উপাদান সম্বন্ধেও অনেক কথা জানা গেছে।

এইভাবে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন—যে সব মৌলিক পদার্থ দিয়ে আমাদের পৃথিবীর শরীর তৈরী তার বেশীর ভাগই সূর্যের মধ্যেও আছে। সোনা, রূপো, লোহা, তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতু আছে, কার্বন (অঙ্গার), গন্ধক, ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতি ধাতু-নয়-এমন মৌলিক পদার্থও আছে, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হিলিয়াম্ প্রভৃতি মৌলিক গ্যাসও আছে। মোট কথা, পৃথিবীর বুকে এ পর্যন্ত যতগুলি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে (বর্তমানে শতাধিক) তার অধিকাংশেরই সন্ধান পাওয়া গেছে সূর্যে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, যেগুলো পাওয়া যায় নি সেগুলোরও সন্ধান একদিন-না-একদিন পাওয়া যাবে—কারণ পৃথিবী তো সূর্য থেকেই তৈরী! আবার, এমন কতকগুলো মৌলিক পদার্থের আভাস পাওয়া গেছে সূর্যে যা নাকি আমাদের পৃথিবীতে নেই। কে জানে, পরে পৃথিবীতেও



ডক্টর মেঘনাদ সাহা

ওদের আবিষ্কার করা যাবে কিনা। এখানে একটা কথা উল্লেখ করলে তোমাদের ভাল লাগবে। সূর্যের ছটামণ্ডলের উপাদান নিয়ে যে সব বিজ্ঞানী নানা তথ্য আবিষ্কার করেছেন তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালী বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই এ সম্পর্কে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য খবর জানা গেছে।

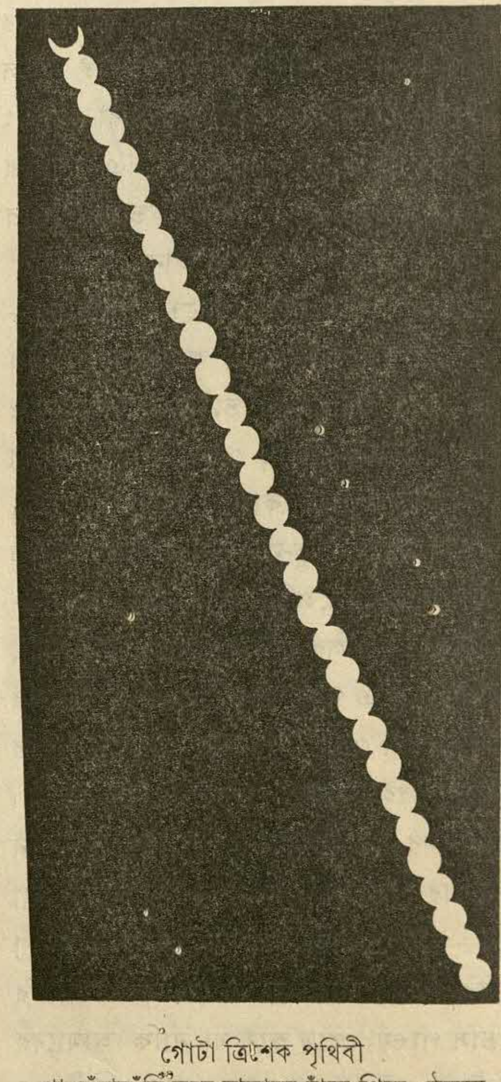
এই সব মৌলিক পদার্থ সূর্যের মধ্যে কি ভাবে আছে তার আভাস আগেই দিয়েছি। পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তুই তৈরী হয়েছে যৌগিক পদার্থ (যাকে বলা হয় কম্পাউণ্ড) দিয়ে। অর্থাৎ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের একটার সঙ্গে আর একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যুড়েই সেগুলো তৈরী। যেমন জল হচ্ছে মৌলিক হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে গঠিত একটি যৌগিক পদার্থ। সূর্যে কিন্তু কোন জিনিসই যৌগিক আকারে নেই। সূর্যের যে প্রচণ্ড তাপ

তাতে কোন জিনিসই যৌগিক আকারে থাকতে পারে না—ভেঙ্গে মৌলিক আকারে গিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া তাদের কোনটাই কঠিন বা তরল আকারেও থাকতে পারে না—সবই বাষ্পীয় আকারে অর্থাৎ গ্যাসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই জন্যই সূর্যের শরীরের সবটাই গ্যাস দিয়ে গড়া। তবে অত্যন্ত ঘন সে গ্যাস। এত ঘন যে আমাদের সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। এরই কতক কতক আবার আরও ভেঙ্গে পরমাণুর ভগ্নাংশ বিদ্যুৎ-কণায় রূপান্তরিত হয়, যা নাকি আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে সূর্যের প্রচণ্ড শক্তির অন্যতম উৎস।

চাঁদের গল্প শোন

সূর্যের মত চাঁদকেও আমরা বলি 'চাঁদা মামা', আর খোকার কপালে টিপ্ দিয়ে যাবার জন্য মা তাকে যখন তখন ডাকেনও। কিন্তু সূর্য যদি আমাদের দাদামশাই হন, পৃথিবী যদি আমাদের মা বসুন্ধরা হন, তবে চাঁদকেও কিছুতেই মামা বলা উচিত নয়—বলা উচিত দাদা। কারণ পণ্ডিতদের মতে চাঁদেরও জন্ম হয়েছে পৃথিবী থেকে। ইয়োরোপের লোকেরা আবার চাঁদকে 'দেবতা' না ভেবে কল্পনা করেছিলেন 'দেবী' রূপে,—চন্দ্র দেবী (ডায়না)। শিকারী-কুকুর নিয়ে তিনি বনে বনে শিকার করে বেড়ান। তাই যদি মেনে নিতে হয় তা হলে চাঁদকে দাদা না বলে বলতে হয় দিদি।

তা সম্পর্ক যাই পাতানো হোক না কেন, চাঁদ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল বহুদিনের, আর সে কৌতূহল সে মিটিয়েছেও অনেকটা। চাঁদ সম্বন্ধে আমরা, পৃথিবীর মানুষ, অনেক কথাই জানি এবং বেশ ভাল করেই জানি। এর কারণ আর কিছু নয়, মহাকাশের অন্যান্য বাসিন্দাদের তুলনায় চাঁদ আমাদের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭ শ' ৯৩ মাইল মাত্র। বিরাট মহাকাশের তুলনায় এ দূরত্ব নেহাৎই সামান্য। আমাদের পৃথিবীর মত আর গোটা ত্রিশেক



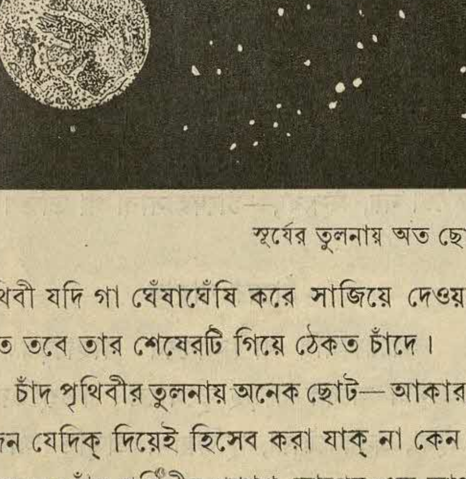
গোটা ত্রিশেক পৃথিবী
গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সাজালে চাঁদে গিয়ে ঠেকবে



সূর্যের তুলনায় অত ছোট চাঁদ—কিন্তু দেখায় কত বড় !

পৃথিবী যদি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সাজিয়ে দেওয়া যেত তবে তার শেষেরটি গিয়ে ঠেকত চাঁদে।

চাঁদ পৃথিবীর তুলনায় অনেক ছোট— আকার, ওজন যেদিক্ দিয়েই হিসেব করা যাক্ না কেন। আয়তনে চাঁদ পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ



দূরবীণ দিয়ে দেখলে চাঁদের গায়ের দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যায়

মাত্র, ওজনে আরও কম—একাশি ভাগের এক ভাগ। গোল চাঁদের এ পিঠ থেকে ও পিঠ পর্যন্ত একটা কাল্পনিক রেখা তার কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে টানলে সেটা হবে ২১৬০ মাইল।

অত ছোট চাঁদ, কিন্তু তার ঐ স্বল্প দূরত্বের জন্যই তাকে কত না বড় দেখায় অন্যান্য গ্রহ-তারার তুলনায়! প্রায় সূর্যেরই কাছাকাছি মনে হয়। এমন কি তার গায়ের দাগগুলো পর্যন্ত আমরা খালি চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই। দূরবীণ দিয়ে আরও ভাল দেখা যায়। আজকাল বিজ্ঞানীরা যে সব বাঘা বাঘা দূরবীণ তৈরী করছেন তা দিয়ে চাঁদকে দেখলে সময় সময় এত কাছে মনে হয় যে ভুল হয় বুঝি বা পৃথিবীরই কোন দূরাঞ্চলের দৃশ্য দেখছি!

দূর থেকে চাঁদকে দেখতে ভারী সুন্দর দেখায়—বিশেষ করে পূর্ণিমার রাতে। ওর স্নিগ্ধ আলোও আমাদের মুগ্ধ করে। কবিরা তাই যুগ যুগ ধরে চাঁদকে নিয়ে কত কবিতা লিখেছেন



আজকালকার বাঘা বাঘা দূরবীণ
দিয়ে চাঁদকে দেখলে…

—কত হা-হুতাশ করেছেন! এমন কি সুন্দর মুখের উপমা দিতে হলে এখনও আমরা বলি—"আহা, যেন চাঁদপানা মুখ রে!"

কিন্তু আসলে চাঁদ মোটেই অমন 'আহা মরি' গোছের কিছু নয়, বরঞ্চ ঠিক তার উল্টো। চাঁদকে ভাল করে দেখে, পরীক্ষা করে, চাঁদের যে সব 'ঘরের খবর' জানা গেছে তা শুনলে খুব যে লোভনীয় মনে হবে এমন মনে হয় না। চাঁদে জল নেই, বাতাস নেই, মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, গাছপালা নেই, জীবজন্তু—কীটপতঙ্গ কিছুই নেই। পৃথিবীর মত প্রাণের কোন রকম চাঞ্চল্য—কোন রকম সাড়া পাওয়া যায় না সেখানে। তবে কি আছে সেখানে? আছে শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর পাহাড়! সে পাহাড়ও আবার এখানকার মত বরফে-ঢাকা বা জঙ্গলে-ঘেরা পাহাড় নয়। কেবল রাশি রাশি রুক্ষ পাথর দিয়ে তা তৈরী। পাহাড় ছাড়া বাকি যে সব অংশ তাও ঐ রকম পাথুরে। বড় বড় সমুদ্রের খাত আছে, কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই সে সমুদ্রে—মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে সর্বক্ষণ। তা ছাড়া আছে বড় বড় ফাটল। একটা নয়, দু'টো নয়, অসংখ্য,—চাঁদের সারা গা ভর্তি।

চাঁদের পাহাড়

আগ্নেয়গিরি বা আগুনে পাহাড়ের গল্প তোমরা অনেক পড়েছ ভূগোলে। ভিসুভিয়াস্, এট্না, ক্রাকাটোয়া, ফুজিয়ামা প্রভৃতি আগুনে পাহাড়ের নামও হয়তো তোমাদের মুখস্থ আছে। এই সব আগুনে পাহাড়ের মাথা ফুঁড়ে থেকে থেকে নানা রকম বিষাক্ত গ্যাস, গরম ধূলো, আগুন আর তরল বা গলা পাথর বেরিয়ে আসে,—ভীষণ বেগে আর তেমনি অপর্যাপ্ত পরিমাণে। সাধু ভাষায় একে বলা হয় 'অগ্ন্যুৎপাত', আর ঐ সব গলা পাথরকে ইংরেজীতে বলা হয় 'লাভা'। তেমন তেমন এক-একটা অগ্ন্যুৎপাতে আশ-পাশের গ্রাম বা বড় বড় শহর একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। পম্পিয়াই, হারকিউলিয়াম্ প্রভৃতি সেকালকার অনেক বিখ্যাত শহর এই ভাবেই একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কাজেই আগুনে পাহাড় যে কি ভয়ঙ্কর জিনিস তা বুঝতেই পারছ।



চাঁদের আসল চেহারা—রাশি রাশি রুক্ষ পাহাড় আর পাথুরে ফাটলে সারা গা ভর্তি

শুধু এইটুকু খবর দিয়েই বিজ্ঞানীরা থামেন নি। পৃথিবীর মত চাঁদেরও, যতটা দেখা যায়, তার সমস্তটার দস্তুর মত ম্যাপ্‌ও তৈরী করে ফেলেছেন তাঁরা এবং তাতে কোথায় কোন্ পাহাড় আছে, কোথায় কোন্ শুকনো সমুদ্রের খাত আছে—সব এঁকে দেখিয়েছেন। পাহাড়গুলোর একটা করে নাম দিতেও ছাড়েন নি। এমন কি কোন্‌টা কতখানি উঁচু তাও বার করে ফেলেছেন। এ কাজটা অবশ্য শুনতে যতটা কঠিন মনে হয় আসলে তাঁদের কাছে তা নয়। আমরা পৃথিবীর ওপরকার কোন জিনিসের ছায়া দেখে সেটা মেপে বলে দিতে পারি জিনিসটা কতখানি উঁচু—যদি জানা যায় সূর্য সে সময়টা পৃথিবী থেকে কতখানি উঁচুতে আছে। চাঁদের বেলায়ও ঠিক এইভাবেই অঙ্ক কষে তার পাহাড়গুলির উচ্চতা মাপা হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, চাঁদের পাহাড়গুলির বেশীর ভাগই এই রকম আগুনে পাহাড়। তবে এখন আর সেগুলো সজীব নেই—সব মরা, অর্থাৎ তাদের ভিতরকার সমস্ত আগুন নিবে গেছে, লাভা-স্রোতও বন্ধ হয়ে গেছে চিরকালের মত। শুধু আগেকার লাভাগুলো জমে জমে ঐ সব পাহাড়ের চারপাশে বড় ধড় প্রাচীরের মত পড়ে আছে।

এই সব পাহাড় মেপে দেখা গেছে পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের পাহাড়গুলো ঢের বেশী উঁচু। অত উঁচু পাহাড় আমাদের পৃথিবীতে বড় বেশী নেই। অবশ্য হিমালয়ের মত উঁচু পাহাড় চাঁদে হয়তো নেই, কিন্তু ওর কাছাকাছি যায় এমন পাহাড় বিস্তর আছে। তা ছাড়া ঐ সব পাহাড়ের 'ক্রেটার' বা গহ্বরগুলিও তেমনি বিরাট। যেমন

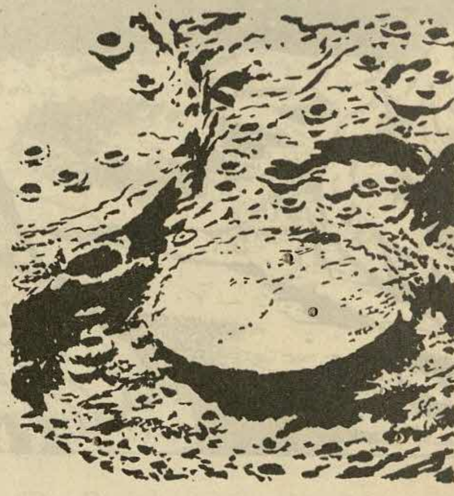


চাঁদের পাহাড়—পাহাড়ের চারপাশে লাভা জমে জমে প্রাচীরের মত পড়ে আছে

ধর, একটা আগুনে পাহাড় আছে, বিজ্ঞানীরা তার নাম রেখেছেন 'কোপারনিকাস',—এটির গহ্বর কত বড় জান?—চওড়ায় প্রায় ছাপ্পান্ন মাইল। অত বড় আগ্নেয়গিরির গহ্বর পৃথিবীতে কোনও পাহাড়ে আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই পাহাড়ের চারদিকে লাভা জমে জমে যে প্রাচীরের সৃষ্টি হয়েছে তাও কম করে দু'মাইল উঁচু। আর কোপারনিকাসের মত পাহাড় নাকি চাঁদে আরও অনেক আছে।

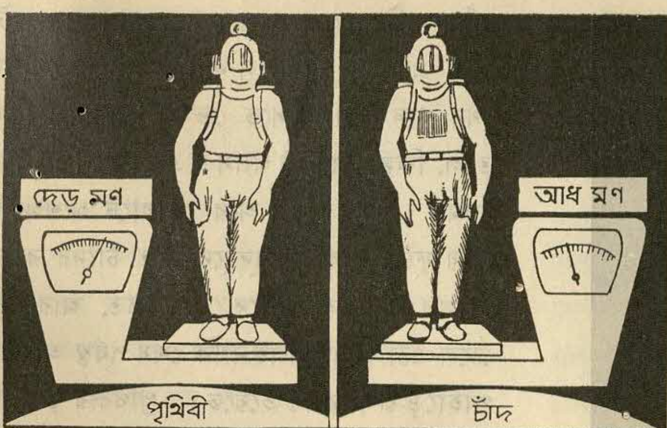
চাঁদের পাহাড়গুলো এত উঁচু হ'ল কেন, আর ঐ গহ্বরগুলিই বা অত চওড়া হ'ল কি করে? বিজ্ঞানীরা এ নিয়েও গবেষণা করেছেন এবং একটা লাগসই জবাবও বার করেছেন। তাঁরা বলেন, এর কারণ চাঁদের ঐ ছোট্ট দেহ আর পৃথিবীর তুলনায় তার হাল্কা ওজন।

ওজন কথাটা এর আগেও আমরা ব্যবহার করেছি। আবার বলি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের কথা তোমরা সবাই জান। পৃথিবী তার ওপর-কার সমস্ত জিনিসকে সর্বক্ষণ টানছে তার কেন্দ্রের দিকে। পৃথিবীর এই টান বা আকর্ষণী শক্তির জন্যই ওজন কথাটা এসেছে। পৃথিবীর অর্থাৎ মাটির ওপর থেকে কোন জিনিস টেনে তুলতে গেলে পৃথিবী ওই জিনিসটিকে যত জোরে টানছে তার চেয়েও বেশী জোরে টানতে না পারলে সেটাকে তোলা যায় না। যে জিনিস টেনে তুলতে এই জোর যত বেশী লাগে সে জিনিস তত ভারী। অর্থাৎ ভার বা ওজন জিনিসটা নির্ভর করে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির ওপর। পৃথিবীর মত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব জিনিসেরই একটা করে আকর্ষণী শক্তি আছে সে কথা আগেই বলেছি। গ্রহ-তারা-সূর্য থেকে সুরু করে ছোট্ট একটা



চাঁদের পাহাড়গুলির সবই প্রায় আগ্নেয়গিরি ; এখন নিবে গেছে—কিন্তু গহ্বরগুলি স্পষ্ট দেখা যায়

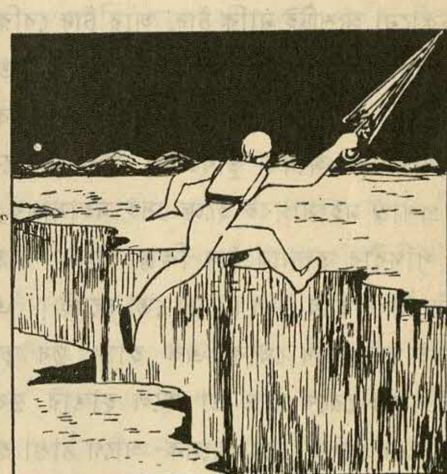
ধূলিকণাও প্রত্যেকে প্রত্যেককে টানছে। তফাৎ শুধু ঐ টানের জোরটা। কারও টানের জোর প্রচণ্ড, কারও অত্যন্ত ক্ষীণ। বড় জিনিসের টান সাধারণতঃ বেশীই হয়। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের টান বা আকর্ষণী শক্তি অনেক কম। সোজা কথায় বলা যায়, পৃথিবীতে দাঁড়ালে যে লোকটির ওজন দেড় মণ, সে-ই যদি চাঁদে গিয়ে দাঁড়ায় তবে



পৃথিবীতে তোমার ওজন যদি হয় দেড় মণ, তা হলে চাঁদে গেলে হয় তো হবে বড় জোর আধ মণ বা তারও কম!

তার ওজন হয়ে যাবে হয় তো আধ মণ বা তারও কম। আর একটা হিসাব দেই। একটা লাফ দিয়ে তুমি কতটা উঁচু পার হতে পার? চার ফুট? তা হলে চাঁদে গেলে দেখবে, তুমি এক-এক উঁচু লাফে অন্ততঃ চব্বিশ ফুট ডিঙ্গিয়ে যেতে পারছ। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের আকর্ষণী শক্তি তোমার ওপর অনেক কম হবে বলেই ও রকমটা সম্ভব হবে। চাঁদের পাহাড়গুলোর অত উঁচু হওয়ার কারণও নাকি এই। চাঁদের চেহারা তো বরাবরই এ রকম ছিল না, লক্ষ লক্ষ বছর আগে এমন এক দিন গেছে যখন ঐ সব পাহাড়ও সজীব ছিল। তখন তাদের ভিতর থেকে জ্বলন্ত এবং গলন্ত লাভা প্রচণ্ড জোরে ঠেলে উঠত এবং চাঁদের আকর্ষণী শক্তি কম বলে, অনেকটা ওপরে উঠে শেষে হয় তো ফোয়ারার মত বহুদূর যুড়ে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ত। তারই ফলে ওই পাহাড়গুলো অত উঁচু আর তার গহ্বরগুলোও অত ছড়ানো হতে পেরেছে।

শুধু তাই নয়, চাঁদে অত আগুনে পাহাড়ের ছড়াছড়ি কেন তারও একটা কারণ খুঁজে বার করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলেন, আজ থেকে লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি বছর আগেকার যে পৃথিবী, এখনকার পৃথিবীর তার সঙ্গে অল্পই মিল আছে। তখন পৃথিবীর সবটাই প্রায় ছিল একটা আগুনের গোলা, শুধু হয়তো ওপরের দিকে খানিকটা একটু তরল হয়ে এসেছিল। সে পৃথিবী অবশ্য তখনও সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খেত এবং এখনকার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী জোরে।



চাঁদে গেলে শুধু এই রকম বড় বড় ফাটলই নয়, চব্বিশ ফুট উঁচু এক-একটা ঢিবিও তুমি এক-এক লাফে ডিঙ্গিয়ে যেতে পার

সেই সময়ে নাকি কোন রকমে তার দেহ থেকে খানিকটা অংশ সূর্যের টানে ছিটকে বেরিয়ে আসে; তারপর তালগোল পাকিয়ে পৃথিবীর চারদিকেই ঘুরপাক খেতে থাকে,—



সূর্যের টানে পৃথিবীর একটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে আসে……

তারই টানে। অবশ্য পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করতে হয় তাকে। এই ছিটকানো অংশটিই নাকি চাঁদ, আর চাঁদ বেরিয়ে যাওয়ায় পৃথিবীর গায়ে যে বিরাট গর্ত তৈরী হয়ে যায় সেটি শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় একটি মহাসাগর। অনেক ভূবিজ্ঞানী অনুমান করেন যে প্রশান্ত মহাসাগরই হচ্ছে সেই মহাসাগর।

পৃথিবীর তুলনায় চাঁদ কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তা তো হবেই! এক কড়াই ফুটন্ত দুধ থেকে এক হাতা দুধ তুলে যদি পাশে রেখে দাও তা হলে হাতার দুধটা কড়াইএর দুধের চেয়ে অনেক আগে ঠাণ্ডা হবে না কি? চাঁদের বেলায়ও তো ঠিক এই কাণ্ডটিই ঘটেছে! পৃথিবী যদি হয় কড়াই-ভরা দুধ, তা হলে চাঁদের তুলনা দিতে হবে তার থেকে তোলা এক হাতা দুধের সঙ্গে।

তা হ'লে দেখ, চাঁদ আগে ছিল সূর্যেরই মত একটা আগুনের গোলা। তারপর ঠাণ্ডা হতে হতে প্রথমে হ'ল তরল; তারপর জমতে জমতে কঠিন মাটি-পাথরের রূপ পেতে লাগল। সবটা কিন্তু একসঙ্গে শক্ত হ'ল না। ওপরের খোলস যখন শক্ত হয়ে আসছে ভেতরটা তখনও কিছু তরল, কিছু ধোঁয়াটে গ্যাস—এবং তখনও ভীষণ গরম। ঐ সব তরল আর ধোঁয়াটে অংশগুলো প্রায় ফুটন্ত অবস্থায় বুদ্‌বুদের মত চাঁদের কঠিন খোলস ভেদ করে ওপরে ঠেলে উঠত, আর এই ঠেলে-ওঠা বুদ্‌বুদ্‌গুলিই নাকি শেষ পর্যন্ত আগুনে পাহাড়ে রূপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের আকার অনেক ছোট হওয়ায় এ সব পরিবর্তন পৃথিবীর তুলনায় চাঁদে খুব দ্রুত হয়েছে। চাঁদে এত বেশী আগুনে পাহাড় গজানোর কারণও নাকি এই।

চাঁদ কি সত্যি খুব সুন্দর?

শুধু আগুনে পাহাড় গজানো নয়, এই দ্রুত পরিবর্তনের ফলে চাঁদে পর পর আরও অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ঠাণ্ডা হতে হতে ক্রমে চাঁদের ভেতরকার তরল আর ধোঁয়াটে অংশগুলোও এক সময়ে শক্ত হয়ে গেল। আগুনে পাহাড়গুলোও নিবতে সুরু করল একে একে। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের ওপরে যে বাষ্প মেঘের আকারে ভেসে বেড়াত তা গলে জল হয়ে চাঁদের ওপর ঝরে পড়তে লাগল। এই সময়টা চাঁদ হয়তো অনেকটা আমাদের পৃথিবীর মতই ছিল। তখন চাঁদে জল ছিল, বাতাস ছিল; সম্ভবতঃ গাছপালাও ছিল। এমন কি জীবন্ত প্রাণী থাকাও কিছু বিচিত্র নয়।

কিন্তু এ অবস্থাও হয়তো বেশী দিন চলে নি। চাঁদ আরও ঠাণ্ডা হয়ে আরও জমাট বাঁধতে লাগল। চাঁদের সমস্ত জল জমে গেল। গাছ-

পালা, প্রাণী (যদি থেকে থাকে)—এরাও ধীরে ধীরে লোপ পেল। চাঁদ তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে ওপরকার বাতাসকেও বেশী দিন ধরে রাখতে পারল না—বাইরের টানে ধীরে ধীরে সে বাতাস মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু জল ছিল সেটুকুও টেনে নিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পড়ে রইল শুধু তার পাথুরে কঙ্কাল—রুক্ষ, মরুময়, কতকগুলি মৃত আগ্নেয়গিরি বুকে নিয়ে। আজও চাঁদ সেই ভূতের মত চেহারাটা টেনে নিয়ে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবনের কোন স্পন্দন নেই তার মধ্যে—কবির ভাষায় বলা চলে "তেজোহীন ব্রহ্মাণ্ডের নির্বিষ খোলস।"

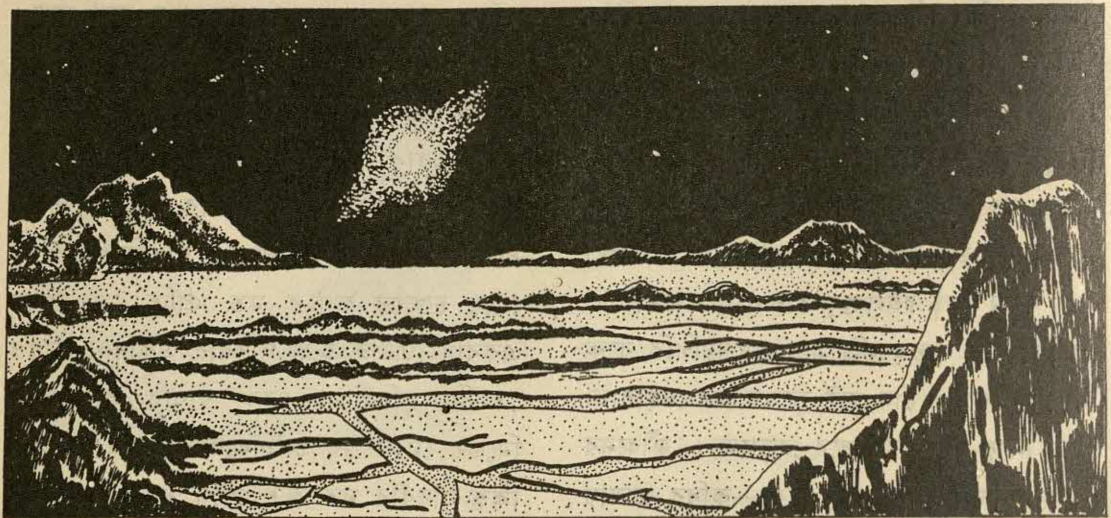
এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ কেন বলছিলাম চাঁদকে নিয়ে সত্যি কবিত্ব করার কিছু নেই। তার চেয়ে আমাদের এই শ্যামল পৃথিবী—এই প্রাণচঞ্চল পৃথিবী অনেক—অনেক সুন্দর।

চাঁদের গতি আর চাঁদের কলা

চাঁদ সম্বন্ধে কিন্তু আরও অনেক কিছু বলবার আছে। চাঁদ যে পৃথিবীর উপগ্রহ তা তো আগেই বলেছি, আর গ্রহ পৃথিবী যখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে তখন চাঁদেরও সেই সঙ্গে সূর্যকে প্রদক্ষিণ না করে উপায় নেই। পৃথিবীকে একবার পাক খেয়ে আসতে চাঁদের কত সময় লাগে ? মোটামুটি আমরা বলি ২৮ দিন, কিন্তু ঠিক ঠিক বলতে গেলে বলতে হয় ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট। এই-ই হচ্ছে আমাদের আসল মাস—যাকে বলা হয় চান্দ্র মাস। পৃথিবী সূর্যকে প্রায় ৩৬৫ দিনে একবার পাক খেয়ে আসে। (আসলে আরও ৬ ঘণ্টা বেশী লাগে)। এটাই হ'ল আমাদের এক বছর। কাজেই চাঁদ সূর্যকে বছরে ১৩ বার পাক খায় বলা চলে। কাজেই সেই হিসেবে আমাদের বছরে ১৩টা মাস বলা উচিত।

পৃথিবীর মতই চাঁদের আর একটা গতি আছে। পৃথিবী যেমন সূর্যকে পাক খাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকেও পাক খেয়ে চলেছে লাট্টুর মত, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার (এটাই হ'ল পৃথিবীর একদিন), চাঁদও তেমনি পৃথিবীকে পাক খাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকেও পাক খাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর মত অত বেগে নয়—ধীর মন্থর গতিতে। পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে তার যতটা সময় লাগছে, নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে একবার পাক খেতেও তার ঠিক ততখানি সময় লাগছে। অর্থাৎ চাঁদের এক-একটা দিন এক-একটা মাসের মত লম্বা। আর মজা এই, চাঁদের ঘুরপাকটা এই ধরণের হওয়ায় পৃথিবী থেকে আমরা চিরকাল চাঁদের একটা দিক্ই দেখতে পাচ্ছি, চাঁদের অপর পিঠ সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ ধারণা নেই।

চাঁদের আলো সূর্যের মত প্রখর নয়, বেশ মৃদু এবং ঠাণ্ডা ;—আমরা বলি চাঁদের কিরণ কী স্নিগ্ধ ! কিন্তু এখানেও একটা মস্ত ভুল। চাঁদের কোন আলোই নেই—তার আবার ঠাণ্ডা-গরম হবে কি ! চাঁদের যে আলো আমরা পাই তা আসলে সূর্যেরই আলো—চাঁদের গায়ে পড়ে ঠিকরে আসে, অনেকটা আয়নার মত। আমরা তাই দেখে মনে করি বুঝি চাঁদই আলো ছড়াচ্ছে। চাঁদের ঐ যে ঝক্ঝকে উজ্জ্বল চেহারা —সেও সূর্যেরই কল্যাণে। (যদিও সে উজ্জ্বলতা সূর্যের সাড়ে চার লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র !)



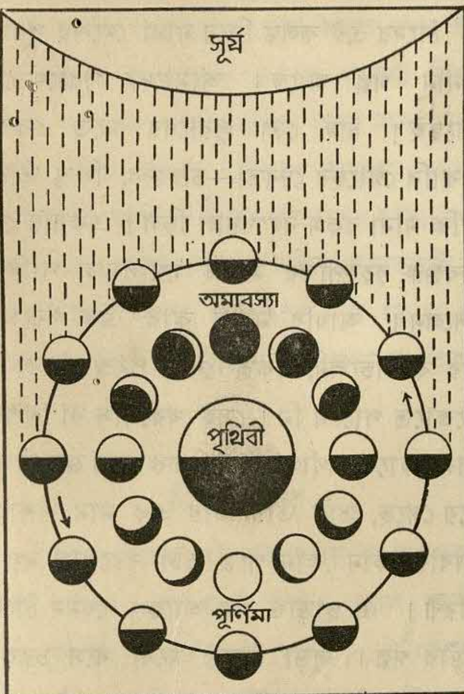
চাঁদে গেলে পৃথিবীকে কেমন দেখাবে? মনে হবে আকাশের অনেকখানি যুড়ে একটা বিরাট গোল চাকতি জল্‌জল্‌ করছে

নইলে এমনিতে চাঁদ একেবারেই গাঢ় অন্ধকারে ঘেরা। আবার, একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি? অনেক সময়,—ধর ৭মী কি ৮মী তিথিতে,—যখন চাঁদের আধখানা মাত্র দেখা যায়, তখন সময় সময় বাকি আধখানাও একেবারে অন্ধকার লাগে না—সেখানটাও আবছা—অস্পষ্ট আলোয় আলোকিত দেখা যায়। এও ঐ সূর্যেরই ধার-করা আলো, কিন্তু এটি চাঁদকে উপহার দেয় আমাদের পৃথিবী। চাঁদের মত পৃথিবীরও নিজের কোনও আলো নেই, কিন্তু সূর্যের আলো তার গায়ে পড়ে ঠিকরে এসে ফের চাঁদে পড়লে ঐ রকম দেখায়। এর থেকে একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ দূর মহাকাশ থেকে দেখলে আমাদের পৃথিবীকেও চাঁদের মত উজ্জ্বল দেখাবে। যদি কখনও কেউ চাঁদে যেতে পার তবে দেখবে আকাশের অনেকখানি যুড়ে একটা বিরাট গোল চাকতি জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে। বিরাট বলে বিরাট?—পঞ্চাশটা চাঁদের সমান বড় সেটা। ভারী অদ্ভুত সে দৃশ্য নিশ্চয়ই।

একটু আগে ৮মীর চাঁদের কথা বলছিলাম। বলছিলাম সেদিন চাঁদের আধখানা মাত্র দেখা যায়। বাস্তবিক সূর্য আর চাঁদে এইখানে যেন একটা বড় তফাৎ। সূর্য তো সব সময়েই গোল দেখায়, তবে চাঁদ অমন দেখায় কেন? পূর্ণিমার দিন একদম্‌ গোল, তারপর ক্রমেই ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছোট হতে হতে শেষে একটা কুমড়োর ফালির মত হয়ে গেল। তারপর অমাবস্যার দিন একেবারেই উধাও! আবার তার পর দিনই দেখা গেল আবার যেন একটা কুমড়োর ফালি! একটু একটু করে ফের সেটা বাড়তে লাগল এবং পূর্ণিমার দিন আবার দেখা দিল নয়ন-ভুলানো পূর্ণশশীর রূপ নিয়ে।

চাঁদের এই হ্রাসবৃদ্ধিকে আমরা বলি 'কলা', —চাঁদের ষোল কলা। এক-একটা দিনকে বলি তিথি, আর চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির এক-একটা ভাগকে

বলি পক্ষ। পূর্ণিমার পর চাঁদ যখন ক্ষয় হতে



চাঁদ কেন বাড়ে কমে

থাকে তখন বলি কৃষ্ণপক্ষ, আবার অমাবস্যার পর যখন চাঁদ বাড়তে থাকে তখন বলি শুক্লপক্ষ। কিন্তু কেন অমনটা হয়?

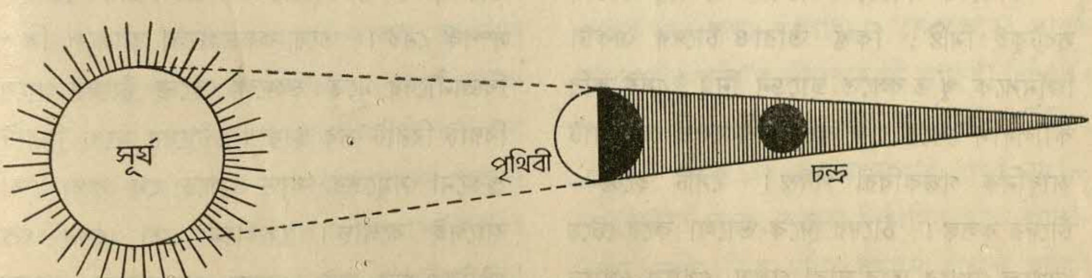
চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু সূর্য রয়েছে চাঁদের এই ভ্রমণপথের বাইরে। ফলে পৃথিবী থেকে দেখলে চাঁদের আলোকিত অংশ প্রত্যহ সবটা দেখা যায় না—এক পূর্ণিমার দিন ছাড়া। তার পর দিন থেকে চাঁদ যতই সরে সরে যেতে থাকে তার আলোকিত অংশেরও খানিকটা করে ততই পৃথিবীর দৃষ্টিপথ থেকে সরে সরে যায়। এই ভাবে কমতে কমতে এসে পড়ে অমাবস্যা। সেদিন চাঁদের যে দিক্‌টা পৃথিবী থেকে একদম দেখা যায় না শুধু সেই দিক্‌টায় পড়ে সূর্যের আলো। কাজেই আমরা চাঁদকে পুরোপুরি অন্ধকার দেখি। তারপর আবার উল্টো। চাঁদের আলোকিত অংশ রোজই একটু একটু বেশী করে আমাদের চোখে পড়ে। এই ভাবে ফের আসে পূর্ণিমা।

চাঁদের গ্রহণ

কিন্তু পূর্ণিমার দিনও চাঁদকে দেখা যায় না—এমন কখনও হতে পারে কি? মেঘলা দিনের কথা বলছি না, পরিষ্কার স্বচ্ছ রাত্রিতে?

পারে বই কি, তবে কালেভদ্রে; বছরে বড় জোর বার তিনেক। চন্দ্রগ্রহণের দিনে।

এর আগে তোমাদের সূর্যগ্রহণের কথা বলেছি। চন্দ্রগ্রহণও হয় অনেকটা ঐ ভাবেই। কখনও কখনও পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ আর সূর্যের মাঝখানে এমন জায়গায় এসে পড়ে যে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে তাকে



চন্দ্রগ্রহণ

সূর্যালোক থেকে একদম ঢেকে ফেলে। একেই বলে চন্দ্রগ্রহণ। যদি পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে পারে তবে হয় পূর্ণগ্রহণ বা চাঁদের পূর্ণগ্রাস ; আর খানিকটা ঢাকলে হ'ল গিয়ে আংশিক গ্রহণ। কিন্তু প্রত্যেক পূর্ণিমায় এ জিনিসটি হয় না। কারণ সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর যে ভ্রমণ-পথ আর পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের যে ভ্রমণ-পথ এ তু'টো ঠিক এক রেখায় নেই, শেষেরটি একটু কাৎ হয়ে আছে। এই জন্যই গ্রহণ কালেভদ্রেই হয়—এক-একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর। হিসেব করে দেখা গেছে চন্দ্রগ্রহণ বছরে তিন বারের বেশী হয় না। সূর্যগ্রহণও ঐ রকম বছরে ২ থেকে ৫ বার পর্যন্ত হতে পারে, তার বেশী নয়।

পূর্ণগ্রাসের সময়েও কিন্তু চাঁদকে কখনও কখনও একদম অন্ধকার দেখায় না—অস্পষ্ট তামাটে বলে মনে হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীর ওপরে যে বাতাস রয়েছে তারই ওপর দিয়ে সূর্য-কিরণ যাবার সময় ঈষৎ বেঁকে যাওয়ায় তার খানিকটা, গ্রহণের সময়েও, চাঁদের ওপর গিয়ে পড়া কিছু বিচিত্র নয়। এই জন্যই অমনটা হতে দেখা যায়।

চাঁদের কলঙ্ক

কবিদের কাছে, আগেই বলেছি, চাঁদের সবটুকুই মিষ্টি ; কিন্তু তাঁরাও চাঁদের একটা জিনিসকে খুঁত বলতে ছাড়েন নি। সেই কবি কালিদাস থেকে সুরু করে একালের ছোটখাট আধুনিক গদ্যকবিরা পর্যন্ত। সেটি হচ্ছে—চাঁদের কলঙ্ক। চাঁদের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে দেখবে তার সারা গায়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে কালো কালো বিশ্রী কতকগুলো দাগ। এরই নাম চাঁদের কলঙ্ক।

চাঁদের এই কলঙ্ক নিয়ে নানা দেশের পুরাণে নানান্ গল্প আছে। আমাদের পুরাণে তো আছেই! চাঁদ তো পুরাণের মতে একজন মাঝারি গোছের দেবতা—চন্দ্রদেব, কিন্তু তাঁরও নাকি নানা রকম বদ্‌খেয়াল ছিল। একবার তো দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গেই গোলমাল পাকিয়ে বসলেন। আবার নাকি কার এক খরগোস চুরি করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তা লুকোতে পারেন নি। সেই খরগোস বা 'শশক' তাঁর কোলে অর্থাৎ 'অঙ্কে' চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে গেছে, তাই তাঁর আর এক নাম শশাঙ্ক। আবার কোন কোন গল্পে ওটা খরগোস নয়—হরিণী। এ ছাড়াও গল্প আছে। যেমন চাঁদের বুড়ীর গল্প। বুড়ী চাঁদের মধ্যে বসে চরকায় সূতো কাটছে—তাই দূর থেকে ঐ রকম দেখাচ্ছে।—

"এক যে ছিল চাঁদের কোণে চরকা-কাটা বুড়ি,
পুরাণে তার বয়স লেখে সাতশ' হাজার কুড়ি।"

রবীন্দ্রনাথের এ কবিতা কে না পড়েছে?

কিন্তু রাহু-কেতুর গল্প যেমন তোমরা বিশ্বাস কর না,—এ সব গল্পও তেমনি নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেবে। গল্প শুনতে ভালো, কল্পনা করতে আরও ভালো, কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই। তবে কলঙ্কগুলো আসলে কি? বিজ্ঞানীদের মতে ওগুলো হচ্ছে চাঁদের গায়ে বিরাট বিরাট সব ছায়া। চাঁদের মধ্যে বিরাট শুকনো সমুদ্রের খাত আছে সে কথা তো আগেই বলেছি। সেখানে তো এখন এক ফোঁটাও জল নেই—আছে শুধু কালো পাথুরে

গর্ত। সূর্যের আলো ঐ সব গর্তে পড়লে চাঁদের অন্যান্য জায়গার মত ঝক্‌মক্ করে না—তাই দূর থেকে দেখলে ওগুলিকে কালো কালো দাগ বলে মনে হয়। এ ছাড়াও চাঁদের গায়ের বিরাট বিরাট আগুনে পাহাড়গুলির কথা মনে আছে তো?—সেই যাদের ভেতরে রয়েছে যোজন-যোড়া সব গহ্বর! ঐ সব পাহাড়ের ছায়া যখন চাঁদের গায়ে পড়ে তখন সেগুলিও স্বভাবতঃই ঐ রকম কালো কালো দাগ ব'লে মনে হয়। এই হচ্ছে নাকি গিয়ে চাঁদের কলঙ্কের ভেতরকার রহস্য।

চাঁদের স্বরূপ

চাঁদের গায়ের এই সব কলঙ্ক বা দাগগুলো বেশ কালো এবং খুবই স্পষ্ট। ভাল দূরবীণ দিয়ে দেখলে আরও স্পষ্ট দেখায়। এ থেকেই বোঝা যায় যে চাঁদে একটুও বাতাস নেই। যদি থাকত তবে বাতাসের স্বভাব অনুযায়ী তা আলোকে খানিকটা ছড়িয়ে দিতই; আর, যত কালো ছায়াই হোক না, বাতাসের আড়ালে থাকলে তাকে একটু ঝাপসা লাগতই। আরও একটা প্রমাণ দেওয়া যায় চাঁদে বাতাস না থাকার। নিজের পথে চলতে চলতে চাঁদ অনেক সময়ে কোন কোন নক্ষত্রকে দৃষ্টির আড়ালে ঢেকে ফেলে। এখন, চাঁদে যদি পৃথিবীর মত কোনও বায়ুমণ্ডল বা বাতাসের আবরণ থাকত, তা হ'লে ঐ নক্ষত্রগুলো চাঁদের আড়ালে যাবার আগে প্রথমে তার বায়ুমণ্ডলের আড়ালে যেত; ফলে পূরোপূরি ঢাকা পড়বার আগে তাদের আলো একটু ম্লান দেখাত—ওপরকার বাতাসের দরুণ। কিন্তু তা তো হয় না। চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়বার পূর্ব মুহূর্তেও তাদের উজ্জ্বলতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

চাঁদে বাতাস না থাকায় জলও থাকতে পারে না। আমাদের পৃথিবীর ওপর বাতাসের আবরণ থাকায় সেখানকার জল বাষ্প হয়ে সব উড়ে যেতে পারছে না। জল ফোটা ব্যাপারটা তার ওপরকার বাতাসের চাপের ওপর নির্ভর করে—পদার্থ-বিজ্ঞানের এটা একটা নিয়ম। একটা পাত্রের মধ্যে খানিকটা জল রেখে তার ওপরকার বাতাসটা পাম্প্ করে নিলে দেখবে, ভিতরের জল মুহূর্তের মধ্যে ফুটতে সুরু করবে, তারপর বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। চাঁদের বেলাও নিশ্চয়ই এই ব্যাপার ঘটেছে। চাঁদের সমস্ত জল বাতাসের অভাবে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে এবং সে বাষ্পও বাতাসের মত চাঁদের ওপরে ভাসছে না। কারণ তা হলে দূরবীণ দিয়ে দেখলে চাঁদের গায়ে মেঘের চিহ্ন দেখা যেত; কিন্তু তা যায় না।

জল আর বাতাস হচ্ছে জীবের প্রাণধারণের দু'টি অপরিহার্য জিনিস। জল আর বাতাস ছাড়া বাঁচতে পারে এমন কোনও জীবের কথা আমাদের জানা নেই। কাজেই চাঁদ যে এখন জীববাসের অযোগ্য তা তো সহজেই বুঝতে পারা যায়। তা ছাড়া চাঁদে এমন কিছু নেই যা খেয়ে বেঁচে থাকা যায়। অবশ্য যদি শুধু কাঁকর আর পাথর খেয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে তার কথা আলাদা। সে হয়তো পারত "ঠাকুমা'র ঝুলি"র নীলকমলের রাক্ষুসী দিদিমা। পাথর কেন—লোহার কলাইও নাকি সে চিবিয়ে খেত! কিন্তু চাঁদ তো রূপকথার রাজ্য নয়,—আমিষ না হোক, অন্ততঃ নিরামিষ শাক-পাতা-ঘাস একটা কিছু চাই সেখানে বাঁচতে হলে।

কিন্তু চাঁদে সে রকম গাছপালার কোনই চিহ্ন নেই।

তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি রকম? অদ্ভুত এক রাজ্য আমাদের ঐ 'আহা-মরি' চাঁদের দেশ। সেখানে খাল-বিলের বালাই নেই, মেঘ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝাপ্টা কখনও দেখা যায় না। পাখী ডাকে না, জন্তু হাঁটে না, পোকা নড়ে না, গাছ জন্মায় না—একেবারে পোড়া দেশ। বাতাস না থাকলে শব্দও হতে পারে না—কারণ শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে বাতাসের ঢেউ থেকে। চাঁদে কোন শব্দ নেই। চাঁদে গিয়ে যদি কেউ কথা বলার চেষ্টা করে, কেউ শুনতে পাবে না সে কথা। তেমনি গন্ধ ছড়াবার জন্যও দরকার বাতাসের। চাঁদে যেমন কোনও শব্দ শোনা যায় না কানে, তেমনি কখনও কোন গন্ধও শুঁকতে পাওয়া যায় না নাকে।

তার ওপর আছে আর এক ব্যাপার। পৃথিবীর ওপরকার বায়ুমণ্ডল আমাদের অজান্তে আমাদের অনেক উপকার করছে। ওরই দরুণ দিনের বেলা সূর্যের অনেকটা তাপ থেকে আমরা রক্ষা পাচ্ছি—বাতাস সে তাপের অনেকখানি মাঝপথে লুফে নিয়ে সূর্যকে ফেরৎ পাঠাচ্ছে। রাতের বেলা আবার সেই বাতাসই পৃথিবীর মাটিকে চট্ করে ঠাণ্ডা হতে দিচ্ছে না, কম্বলের মত জড়িয়ে রেখে শীতের হাত থেকে অনেকটা বাঁচাচ্ছে আমাদের। চাঁদে এ সুযোগ নেই। তার ওপর সেখানকার দিন আমাদের পৃথিবীর দিনের চাইতে অনেক লম্বা—পৃথিবীর ১৪টি দিনের সমান চাঁদের এক-একটা দিন। কাজেই দিনের বেলা চাঁদের পাথুরে গা কি রকম তেতে ওঠে তা আন্দাজেই বোঝা যায়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, সময় সময় চাঁদের গায়ের তাপ ৩৯২ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে। আমাদের এখানে ১০৫ কি ১০৬ ডিগ্রী ফারেন-হাইট তাপ উঠলেই আমরা কি রকম হাঁসফাঁস করি, ঐ অতখানি উত্তাপে আমাদের কি অবস্থা হ'ত ভাবতে পার?

আবার রাতের বেলা ঠিক উল্টো। ১৪ দিন ধরে চলছে সমানে রাত, আর সে সময়ে চাঁদকে ঢেকেঢুকে রাখবারও কেউ নেই। ফলে তখন চাঁদের শরীর—যাকে বলে হিমশীতল। না, তার চেয়েও ঠাণ্ডা—শূন্য ডিগ্রীর চাইতেও ২৪৩ ডিগ্রী নীচে। ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটে [বা ০ (শূন্য) ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে] জল জমে বরফ হয়, তা হলে সে যে কী রকম ঠাণ্ডা কল্পনা করাও কঠিন।

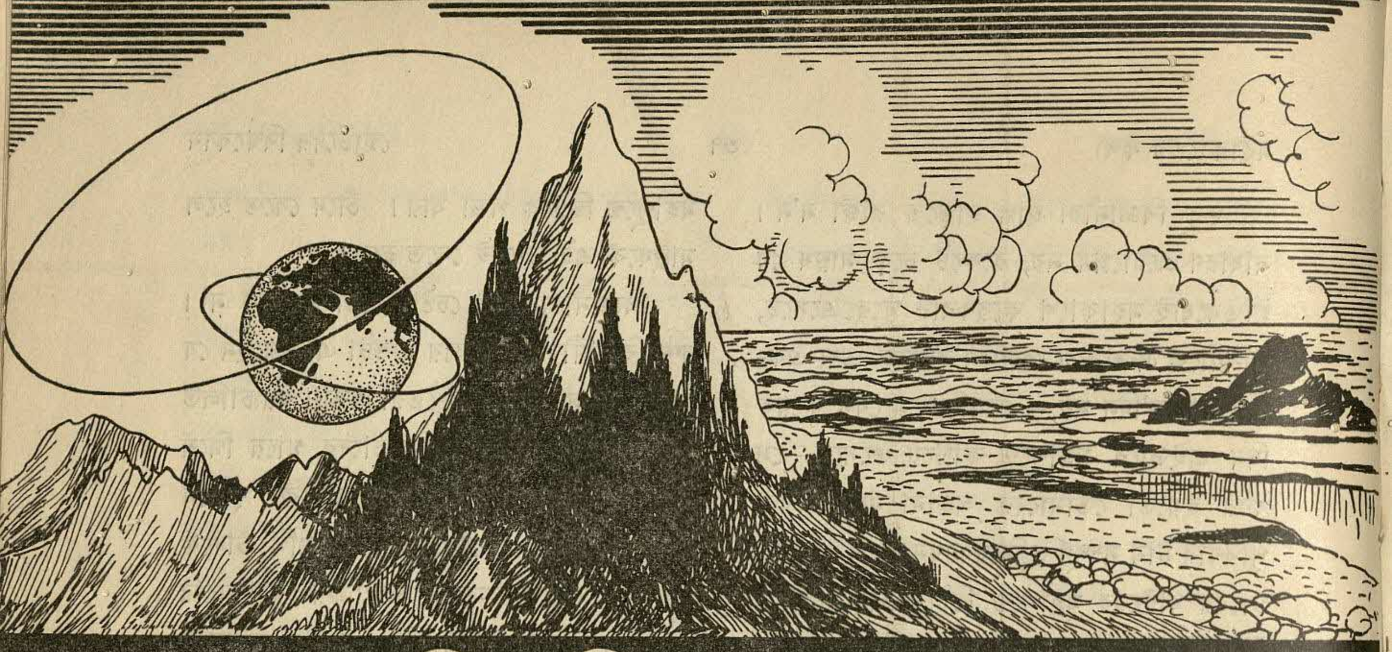
মানুষের চন্দ্রলোকযাত্রা—আর কত দেরী?

এমন চাঁদেও নাকি কেউ যেতে চায়? চায় বই কি! বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে চাঁদে যাবার জল্পনা-কল্পনা করছেন এবং কেউ কেউ তোড়-জোড়ও সুরু করেছেন অনেক দিন থেকে। কারণ মহাকাশের রাজ্যে চাঁদই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। যদি কখনও পৃথিবীর বাইরে কোথাও যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় তবে সব-প্রথম চাঁদে যাওয়াই সম্ভব হতে পারে। অবশ্য চাঁদে কোন রকমে পৌঁছতে পারলেও সেখানে গিয়ে বহাল তবিয়তে টিকে থাকার ব্যবস্থাও এখান থেকেই করে নিয়ে যেতে হবে, নইলে চাঁদের ওপর নিয়ে কাউকে ছেড়ে দিলে তার কি অবস্থা হবে না বলাই ভাল। শুধু যাওয়া আর টিকে থাকাই নয়, ফিরে আসবার ব্যবস্থাও এখান থেকেই করতে হবে।

তবু বিজ্ঞানীরা হাল ছাড়তে রাজী ন'ন। সাধারণ এরোপ্লেন নয়, রকেটে চড়ে মানুষ যে ইতিমধ্যেই মহাকাশে কয়েকবার ঘুরে এসেছে, পৃথিবীকে দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণ করেছে এবং এক-দিন নয়, দু'দিন নয়,—একাদিক্রমে বেশ কয়েক দিন এইভাবে মহাশূন্যে কাটিয়ে এসেছে—সে খবর হয়তো তোমাদের অজানা নয়। কিন্তু পৃথিবীর টান সম্পূর্ণ এড়িয়ে এখনও সে পৃথিবীর টানের বাইরের মহাশূন্যে ছিটকে পড়তে পারে নি। হিসেব করে দেখা গেছে রকেট প্লেন বা মহাকাশ-যানের গতিবেগ যদি ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইলের কম হয় তা হলে সে রকেট পৃথিবীর টানে আবার পৃথিবীর বুকেই এসে পড়ে। ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে ছুটতে পারলে পৃথিবীর টান অনেকখানি অগ্রাহ্য করা যায় বটে, কিন্তু পূরোপূরি নয়। সে অবস্থায় রকেটটি পৃথিবীর চারধারে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এ পর্যন্ত যে ক'জন মহাকাশযাত্রী মহাশূন্যে ঘুরে এসেছেন (আমি আজ ২৯শে এপ্রিল, ১৯৬৫ সালের কথা বলছি) তাঁরা এইভাবেই পৃথিবীকে দ্রুত চক্কর দিয়ে দিয়ে ঘুরেছেন, তার টানের গণ্ডীর বাইরে কেউ যান নি। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে হ'লে আরও গতিবেগ-সম্পন্ন রকেট দরকার। ঘণ্টায় অন্ততঃ ২৫ হাজার মাইল বেগে ছুটতে পারলে তবেই সত্যি সত্যি পৃথিবীর টান এড়িয়ে আরও দূরের মহাশূন্যে ছিটকে পড়া যায়। চাঁদে যেতে হলে মানুষকে এই ভাবেই যেতে হবে।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য চেষ্টার ত্রুটী করছেন না। রুশ বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে এতটা এগিয়েছেন যে কিছু দিন আগে তাঁদের তৈরী একটা স্বয়ংচালিত আরোহীহীন রকেট নাকি চাঁদের গায়ে গিয়ে আঘাত করেছে। চাঁদের চারদিকে কৃত্রিম উপগ্রহও ছাড়া হয়েছে এবং সেগুলি চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে করতে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার সাহায্যে চাঁদের উল্টো পিঠ—অর্থাৎ যেদিক্‌টা কখনোই পৃথিবী থেকে দেখা যায় না—তারও ফটো তুলে নিয়েছে। তারপর তা থেকে দস্তুরমত সে পিঠের ম্যাপও তৈরী করে ফেলেছেন সোভিয়েত পণ্ডিতেরা। আমেরিকান্ বিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে নেই, তাঁদেরও তোড়জোড় নাকি অনেকখানি এগিয়েছে। সুতরাং আর দশ-বিশ বছরের মধ্যেই মানুষ নিজেও যে চাঁদের ওপর গিয়ে হাজির হবে এটা আশা করা অন্যায় নয়। চাই কি, এই বই ছাপা হয়ে বেরোতে বেরোতেই হয়তো শুনব—মানুষ চন্দ্রলোকে গিয়ে হাজির হয়েছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে তখন চাঁদই টেনে নেবে তার নিজের কাছে।

চাঁদে-যাওয়া প্রথম মানুষের অভিজ্ঞতার কথা তখন হয়তো আমরা তার নিজের মুখ থেকেই শুনতে পাব।



পৃথিবীর কথা

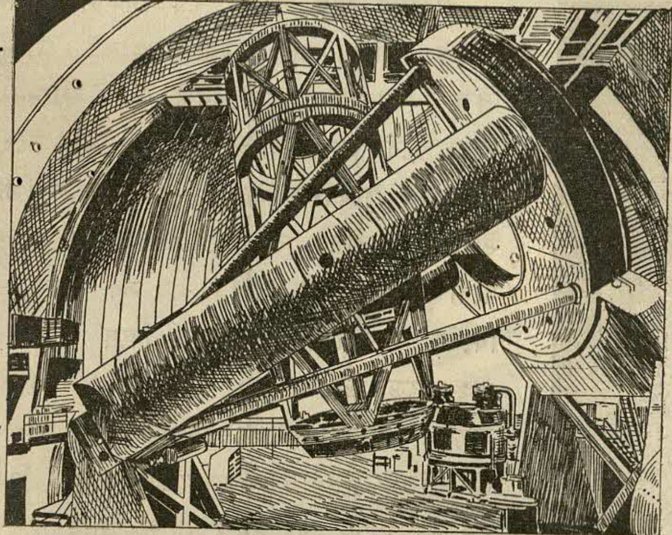
পৃথিবীর জন্মকথা

আকাশের মহারাজ্য থেকে এবার আমরা ধীরে ধীরে নেমে আসব আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে—আমাদের শ্যামা মৃন্ময়ী পৃথিবীর বুকে। কিন্তু তার আগে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগবে এই পৃথিবীই বা এল কোত্থেকে? শুধু পৃথিবী নয়, অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র, এমন কি আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রমণি সূর্যেরই বা জন্ম হ'ল কি করে?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন এবং তাঁদের যন্ত্রপাতি—বিশেষ করে দূরবীণ নিয়ে মহাকাশকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এর ফলে জানা গেছে, যে, যে-সব আলোকবিন্দুকে আমরা তারা বলে মনে করি তার সবগুলিই সত্যিকার তারা নয়—তাদের অনেকগুলিই আসলে এক-একটি নীহারিকা বা নেবুলা—অর্থাৎ জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড—আকাশের কোটি কোটি মাইল যুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে তো জ্বলছেই। দূরবীণ দিয়ে দেখলে এদের এক-এক টুকরো উজ্জ্বল মেঘের মত মনে হয়, তাই ওদেশের বিজ্ঞানীরা ওদের নাম রেখেছিলেন নেবুলা। 'নেবুলা' একটা ল্যাটিন শব্দ, ওর অর্থ মেঘ। শুধু দূরবীণ দিয়ে দেখেই নয়—বিশেষ ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে নেবুলার আলো পরীক্ষা করেও ওদের স্বরূপ জানা গেছে।

আকাশের কোনও কোণে যদি এক ঝাঁক তারা খুব ঘেঁষাঘেঁষি—জড়াজড়ি করে থাকে তা হলেও, দূর থেকে দেখলে, তাদেরকেও উজ্জ্বল মেঘের মত দেখাতে পারে; কিন্তু তেমন তেমন বাঘা দূরবীণের পাল্লায় পড়লে তাদের আসল চেহারা, অর্থাৎ তারার যে বিশেষ রূপ, তা ধরা পড়ে যায়। সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পক্ষে তারা আর নীহারিকা বা নেবুলার তফাৎ চিনে নেওয়া খুব কঠিন নয়।

কিন্তু কোনও কোনও নীহারিকা দেখলে



এ যুগের 'বাঘা' দূরবীণ

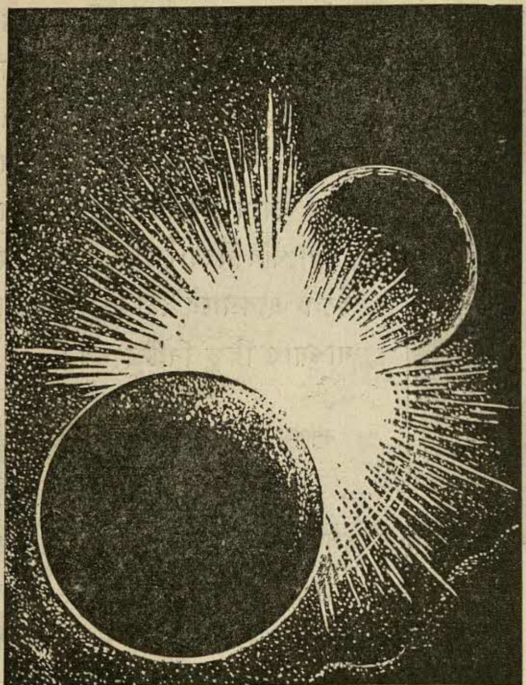
ছুটতে খুব কাছাকাছি এসে পড়ল। যত কাছাকাছি আসবে তাদের পরস্পরের প্রতি টান ততই বাড়বে। ফলে কোন এক সময়ে তাদের গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি কিংবা তেমন তেমন টান হলে একেবারে ঠোকাঠুকি হয়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

স্পষ্ট বোঝা যায় যে তার ভিতরকার কিছু কিছু অংশ অন্যান্য অংশের তুলনায় অত্যন্ত ঘন—এত ঘন যে তাদের তারা বলেই মনে হয়। সত্যিই সেগুলি তারা, এবং তারকার জন্ম নাকি ঐ ভাবেই হয়। আকাশের বিরাট ময়দানে কোটি কোটি মাইল জায়গা যুড়ে ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় ঐ জ্বলন্ত গ্যাসের কোন কোন অংশ জমে যায়, আর তাই শেষ পর্যন্ত নতুন তারার সৃষ্টি করে। আবার মজা এই, নীহারিকা থেকে তারার জন্ম হলেও উল্টে নীহারিকারাও নাকি জন্মায় ঐ তারা থেকেই।

একটু বুঝিয়ে বলা যাক্। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পদার্থ—তা সে ধূলোর কণার মত ছোটই হোক, আর তারা বা নীহারিকার মত বড়ই হোক, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। এখন, ধর, এই রকম দু'টি তারা মহাশূন্যে ছুটতে

প্রথম পর্ব ঃ মহাকাশে সংঘর্ষ

দু'টি জিনিসে ঘষাঘষি হলে সেগুলি গরম হয়ে ওঠে। পাথরে পাথরে জোরে ঠোকাঠুকি হলে এত গরম হয় যে দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কাজেই মহাকাশের বুকে দুই সৃষ্টিযোড়া নক্ষত্র যদি বিপুল বেগে ছুটতে ছুটতে ধাক্কা লাগিয়ে দেয় তখন কি ব্যাপার ঘটে অনুমান করা খুব কঠিন নয়। দু'টি চলন্ত মোটর-গাড়ীতে জোর 'কলিশন্' হলে যেমন দু'টিই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। সেই বিরাট ধাক্কায় দু'টি নক্ষত্রই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় আর সেই সংঘর্ষে যে নিদারুণ তাপ আর আগুনের সৃষ্টি হয় তাতে সেই ভাঙ্গা নক্ষত্রের দেহ,—তা সে নিরেট মাটি-পাথরেরই হোক বা অন্য কিছুরই হোক, জ্বলে পুড়ে পরিবর্তিত হয় এক সৃষ্টিযোড়া জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ডে। তার পর সেই গ্যাসের তাল আকাশের বিরাট রাজ্য যুড়ে অবিরাম জ্বলতে থাকে—শতাব্দীর পর শতাব্দী—যুগের পর যুগ। কত কোটি বছর পরে তা ঠাণ্ডা হবে কেউ বলতে পারে না। এই জ্বলন্ত গ্যাসের তালই হচ্ছে নীহারিকা।



দুই সৃষ্টিছাড়া নক্ষত্র যদি ছুটতে ছুটতে পরস্পর ধাক্কা লাগিয়ে দেয়···

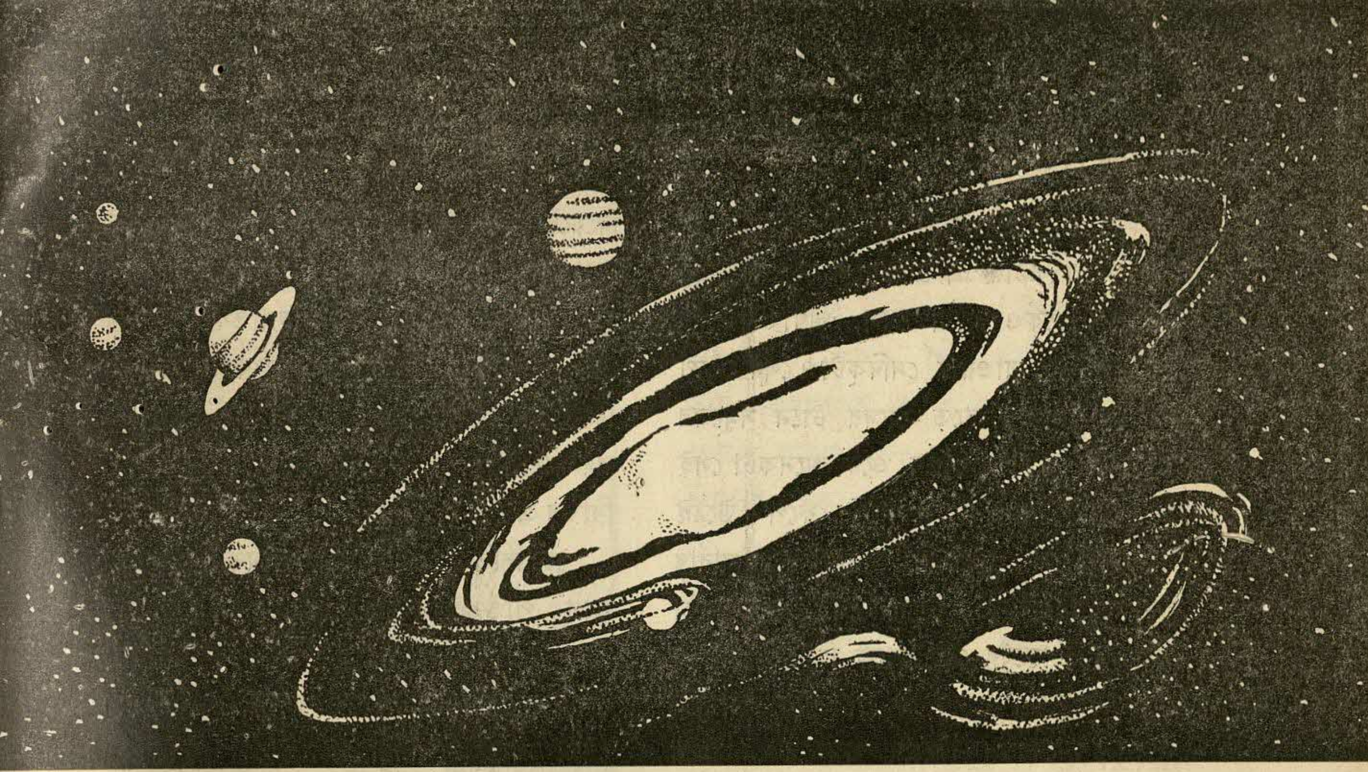
পৃথিবীর জন্মের কথা বলতে গিয়ে এত কথা বলতে হচ্ছে এর নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। নীহারিকার জন্মের কারণ একটু বললাম, আবার নীহারিকা থেকে কতক অংশ জমাট বেঁধে কি করে নতুন তারার সৃষ্টি করে তারও খানিকটা আভাস দিলাম। আমাদের সূর্যও তো এই রকম একটি ছোট-খাট তারা, সুতরাং তারও জন্ম একদিন এই ভাবেই হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। অর্থাৎ একদা, সৃষ্টির কোন্ আদিকালে আমাদের সূর্য ঠাকুরও কোন একটা নীহারিকার অংশরূপে আকাশে বোঁ বোঁ করে ঘুরছিলেন, তার পর ধীরে ধীরে ঘন হতে হতে জমাট বেঁধে নতুন চেহারা নিয়ে দেখা দিলেন।

গ্রহদের সঙ্গে সূর্যের যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু বিজ্ঞানীরা আরো বেশী করে জানেন। তাঁরা সূর্যের এবং বিভিন্ন গ্রহের,—তার মধ্যে আমাদের পৃথিবীও একটি,—শরীরের বিভিন্ন উপাদান পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এদের মধ্যে মিল অত্যন্ত বেশী। যে সব পদার্থ,—বিশেষ করে মৌলিক পদার্থ দিয়ে পৃথিবীর দেহ গড়ে উঠেছে তা সবই সূর্যের মধ্যে আছে। অন্যান্য গ্রহের বেলাও ঠিক তাই। তা ছাড়া গোটা সৌরজগতের মধ্যেও মিল বড় কম নয়! এর সমস্ত অংশই প্রায় একই সমতল যুড়ে ছড়িয়ে আছে, আর প্রত্যেকটি অংশ একই দিকে মুখ করে ঘুরছে। এই রকম গ্রহদের হাব-ভাব, চাল-চলন এবং আরও অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার লক্ষ্য করলে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে গ্রহেরা সকলেই জন্মেছে সূর্য থেকে। আর, সত্যি কথা বলতে কি, এ নিয়ে বড় কেউ তর্কও তোলেন নি। তর্ক উঠেছে কি ভাবে সেগুলো জন্মাল তাই নিয়ে।

নানা মুনির নানা মত, তেমনি নানা পণ্ডিতেরও নানা মত। এদের মধ্যে যে মতবাদগুলি যুক্তিতর্ক আর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পণ্ডিতেরা কিছুটা মেনে নিয়েছেন বা নিয়েছিলেন সেগুলির কথাই বলি।

লা প্লাস্ কি বলেন

ফরাসী পণ্ডিত লা প্লাসের মতে সূর্য যখন নীহারিকা থেকে জমাট বেঁধে ক্রমেই ঠাণ্ডা হতে লাগল তখন তার দেহও, ঠাণ্ডা



লা প্লাস বললেন—সূর্যদেহের বাইরের দিক্‌কার কতক অংশ আংটির মত ঝরে পড়তে লাগল আর তাই থেকে জন্ম হতে লাগল পৃথিবীর মত এক-একটি গ্রহের।

হলে যা হয়,—কুঁচকে ছোট হতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার বাইরের দিক্‌কার কতক অংশ ছিটকে গিয়ে আংটির মত চেহারা নিয়ে ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু ঝরে পড়লেও তো সূর্যের টান থেকে রেহাই নেই! তাই সেই জ্বলন্ত আংটিগুলিও তখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সুরু করল এবং পরবর্তী কালে সেগুলিই ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে, তাল পাকিয়ে, রূপান্তরিত হ'ল এক-একটি গ্রহে। এই মত অনুযায়ী পৃথিবীও এক সময় ঐ রকম আংটির আকার নিয়েই সূর্যদেহ থেকে ঝরে পড়ে এবং ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে, জমাট বেঁধে, বর্তমান আকারে এসে ঠেকে।

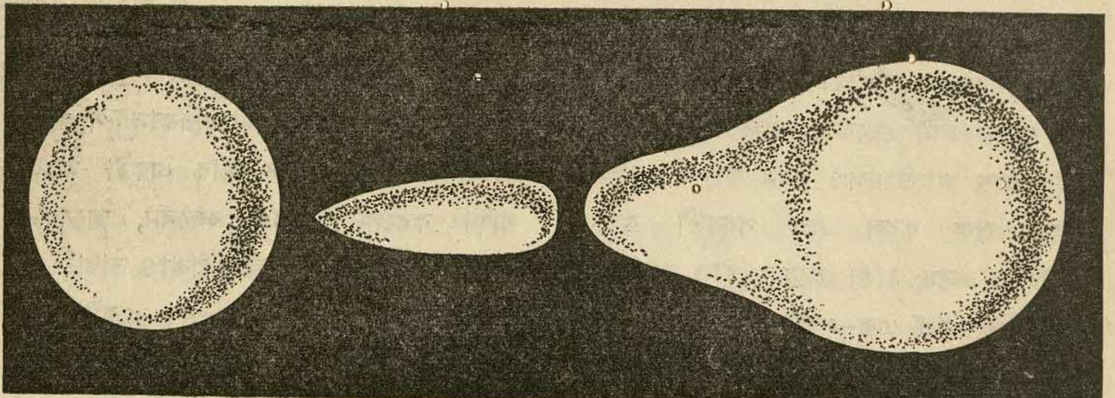
লা প্লাসের মত এক সময়ে পণ্ডিতমহলে খুব খাতির পায়, কিন্তু শেষে এরও নানা সমালোচনা সুরু হ'ল—গ্রহ-উপগ্রহের অনেক চালচলনের সঙ্গে নাকি এটা খাপ খায় না, আর কোন কোন রহস্যেরও ঠিকমত সন্ধান মেলে না।

অন্য পণ্ডিতদের মতে—

এর পর দু'জন আমেরিকান্ পণ্ডিত—চেম্বারলিন ও মোল্‌টন আর একটা মতবাদ খাড়া করলেন। তাঁরা বললেন, অনেক—অনেক দিন আগে একটা প্রকাণ্ড তারা,—হয় তো সূর্যের চেয়ে ঢের বড় একটা তারা আকাশপথে চলতে চলতে একেবারে প্রায় সূর্যের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছিল। ঐ সময়ে সূর্য আর ঐ তারাটা স্বভাবতঃই পরস্পরকে খুব টানাটানি করেছিল। কিন্তু যেটা আকারে বড় সেটারই টানের জোর হবে বেশী। ফলে হ'ল কি, তারার টানে যে দিক্ দিয়ে তারাটা যাচ্ছিল সূর্যের গায়ের সে

দিক্‌কার খানিকটা অংশ ফেঁপে উঠল, আর সেই ফেঁপে ওঠার প্রতিক্রিয়া সূর্যের শরীরের বিপরীত দিকেও দেখা গেল, অর্থাৎ উল্টো দিক্‌টা এগিয়ে যাওয়ায় সেদিক্‌টাও যেন ফেঁপে উঠল। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের টানে সমুদ্রের জল যেমন দু'দিকে ফেঁপে ওঠে অনেকটা সেই রকম আর কি! কিন্তু শুধু ফেঁপে উঠেই ব্যাপারটা শেষ হ'ল না, তারাটা চলে যাবার সময় তার হেঁচকা টানে সেই ফেঁপে-ওঠা অংশ দু'টি সূর্যের দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল মহাশূন্যে। তবে ঐ পর্যন্তই। তারাটা অবশ্য তাদেরকে নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে পালাতে পারল না, ঐ অংশ দু'টি শেষ পর্যন্ত সূর্যেরই টানে তার চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল। তারপর ঐ দুই গ্যাসের তাল ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে কেমন করে প্রথমে বিন্দু বিন্দু তরল পদার্থের এবং ক্রমে আরও ঠাণ্ডা হয়ে নিরেট চেহারা নিতে সুরু করল, তার পর সেই জমাট কণা (যেগুলির তাঁরা নাম দিয়েছেন 'গ্রহাণু') প্রচণ্ড বেগে ছুটোছুটি করার সময় পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, যুড়ে যুড়ে ক্রমে বড় বড় জ্যোতিষ্ক পদার্থের সৃষ্টি করল তারও ভারী চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এঁরা। বলা বাহুল্য ঐ জ্যোতিষ্ক পদার্থগুলোই হ'ল আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ।

চেম্বারলিন ও মোল্‌টনের মতবাদ বেশীর ভাগ পণ্ডিতই মেনে নিয়েছিলেন, তারপর বিখ্যাত বিজ্ঞানী জীন্‌স্‌ ঐ মতটা সামান্য একটু বদলে তাকে আরও সম্পূর্ণ রূপ দিলেন। তিনি বললেন, তারার টানে সূর্যদেহের খানিকটা অংশ ফেঁপে উঠে বেরিয়ে এসেছিল এটা ঠিকই, তবে দু'দিক্‌ দিয়ে নয়—একদিক্‌ থেকেই, আর জিনিসটার চেহারা তখন নিশ্চয়ই ছিল অনেকটা 'টর্পেডো' বা বর্মা চুরুটের মত। পরবর্তীকালে সেই 'টর্পেডো' বা 'বর্মা চুরুটটিই' ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে, জমাট বেঁধে এবং আরও নানা



জীন্‌স্‌ বললেন—তারার টানে সূর্যদেহের খানিকটা অংশ ফেঁপে উঠে বেরিয়ে এল অনেকটা টর্পেডো বা বর্মা চুরুটের মত চেহারা নিয়ে, আর তাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত হ'ল এক-একটি গ্রহে। পৃথিবীরও জন্ম এইভাবে।

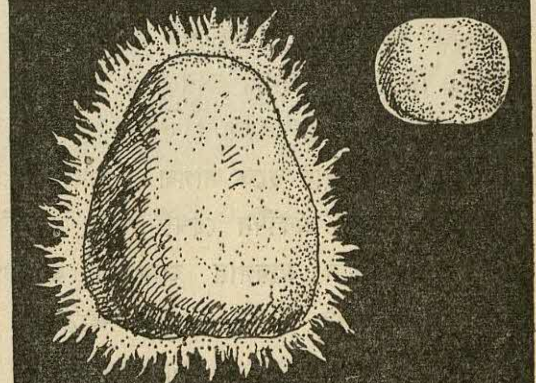


স্যার্ জেম্স্ জীন্স্

পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন গ্রহে রূপান্তরিত হয়েছে। জীন্স্ তাঁর এই মতবাদ অঙ্ক কষেও প্রমাণ করবার ত্রুটী করেন নি। তারপর জেফ্রিস নামে আর এক পণ্ডিতও নানাভাবে এই মতবাদটিকেই অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। বর্তমান যুগের বেশীর ভাগ পণ্ডিতের মতও তাই—অর্থাৎ মা বসুন্ধরা তাঁর অন্যান্য সহোদর বা সহোদরাদের সঙ্গে এইভাবেই একদিন সূর্যদেহ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পৃথিবীর শৈশব

সূর্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল পৃথিবী। তখনও সে একটা জ্বলন্ত গ্যাসের তাল ছাড়া কিছু নয়। কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা, এখন যেমন পৃথিবীর চেহারা গোল বলের মত—ঠিক বল নয়, ওপরে নীচে কমলালেবুর মত একটু চাপা,—সেই আদিম পৃথিবীর চেহারা কিন্তু ঠিক সে রকম ছিল না। খুব সম্ভবতঃ তার চেহারাটা ছিল অনেকটা নাসপাতির মত। তা কমলালেবুই হোক আর নাসপাতিই হোক, সে পৃথিবীর চেহারা দেখলে কারো জিভ দিয়ে জল পড়ত না নিশ্চয়ই। কারণ, আগেই বলেছি, তখনও সে একটা আগুনের তাল—একরাশ জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড— বন্ বন্ করে ঘুরছে আর দিগ্বিদিকে আলো আর উত্তাপ ছড়াচ্ছে। সে তখন সূর্যেরই একটা ছোটখাট সংস্করণ মাত্র। ঘুরপাক খেতে খেতে তারও চেহারা সূর্যেরই মত গোল হয়ে আসছে।



এখন পৃথিবীর চেহারা নাকি কমলালেবুর মত, কিন্তু আদ্যিকালে সেটা ছিল অনেকটা নাসপাতির মত।

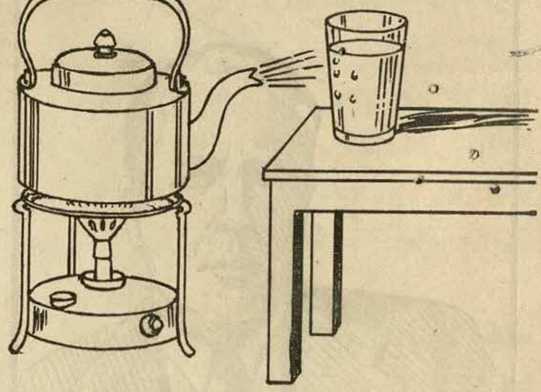
কিন্তু সূর্যের মত চেহারা হলেও আকারে পৃথিবী সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট। আর ছোট জিনিস বড় জিনিসের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় এটাও সত্যি। পৃথিবীও তাই দ্রুত ঠাণ্ডা হতে লাগল।

'দ্রুত' কথাটা উল্লেখ করলাম, কিন্তু

মহাকাশের রাজ্যে, কালও যেখানে মহাকাল,— দ্রুত বলতে আমাদের সময়ের সঙ্গে তুলনা করতে যেও না। ও-রাজ্যে কয়েক লক্ষ বছরকেও খুব 'দ্রুত' বলেই ধরা হয়।

পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে লাগল

যাই হোক, এইভাবে কয়েক লক্ষ বছর ধরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে লাগল—অর্থাৎ তার বয়স বাড়তে লাগল। আমাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকারেও বড় হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে হ'ল ঠিক উল্টো—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ক্রমেই ছোট হতে লাগল। কেন বল তো? গরম অবস্থায় সব জিনিসই আকারে বেড়ে যায়, আর ঠাণ্ডা হলে ছোট হয়ে আসে—বিজ্ঞানের এই সাধারণ নিয়মটা কি আর তোমরা জান না? কাজেই, বয়স বাড়লেও, ঠাণ্ডা হওয়ার দরুণই পৃথিবী আকারে ক্রমশঃ ছোট হতে লাগল। অবশেষে ঠাণ্ডা হতে হতে একদিন দেখা গেল, তার গায়ের ঘন গ্যাস জায়গায় জায়গায় জমে গিয়ে তরল বিন্দুর আকার ধারণ করেছে। জিনিসটা কি রকম জান? মনে কর একটা কেটলিতে চায়ের জল ফোটানো হচ্ছে, কেটলির নল দিয়ে ভস্ ভস্ করে বাষ্প বেরিয়ে আসছে। বাষ্প অবস্থায় তাকে চেনা যাবে না, কিন্তু যদি একটা কাচের গ্লাস ঠাণ্ডা জলে ভর্তি করে তার কাছে ধর তা হলে দেখবে গ্লাসের গায়ে বাইরের দিকে বিন্দু বিন্দু জলকণা জমা হচ্ছে। গরম বাষ্প ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে লেগে ঠাণ্ডা হয়ে জমে তরল হচ্ছে, আর তাই-ই ছোট ছোট জলবিন্দুর আকারে জমে



কেটলির গরম বাষ্প ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে লেগে বিন্দু বিন্দু জলকণা জমা হচ্ছে।

যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রথম গ্যাসও এই ভাবেই তরল হয়েছিল। তবে সে গ্যাস কিন্তু জলীয় বাষ্প নয়। জলীয় বাষ্প যে অবস্থায় তরল হয় পৃথিবীর গায়ের উত্তাপ তখনও তার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু জলীয় বাষ্প ছাড়াও তো আরও নানান্ রকমের গ্যাস আছে এবং যে উত্তাপে তারা তরল হয় তার মধ্যেও আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে। তেমন তেমন উত্তাপে অনেক ধাতু,—যেমন ধর লোহা, নিকেল ইত্যাদি—এরাও গ্যাস হয়ে যায়, কিন্তু ঠাণ্ডা করার সময় জলের তুলনায় অনেক গরম অবস্থাতেই তরল হয়ে আসে। গরম লোহা যে অবস্থায় তরল হয় জল কি আর সে উত্তাপে তরল থাকতে পারে? আবার এমন অনেক গ্যাস আছে যাদের তরল করতে গেলে অনেক ঠাণ্ডা করা দরকার। যেমন ধর অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের চাইতেও প্রায় ১৯০ ডিগ্রী কম তাপে (তাও প্রবল চাপের সাহায্যে) বাতাস তরল হতে পারে। হাইড্রোজেন গ্যাসও



মহাশূন্য থেকে তোলা ভারতবর্ষের আলোক চিত্র।

—ইউ. এস্. এ তথ্য বিভাগের সৌজন্যে

ঐ ভাবে তরল হয় শূন্য ডিগ্রী থেকে প্রায় ২৫৩ ডিগ্রী নীচে। কাজেই পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হতে লাগল তখন তার কিছু কিছু গ্যাস মাত্র তরল হ'ল, বাকিগুলো তখনও বাষ্পাকারে রয়ে গেল।

এখন, পৃথিবীর আকর্ষণের কথা এর আগেও আমরা অনেক বার বলেছি। ভারী জিনিসকে সে বেশী জোরে টানে। অর্থাৎ একটা ভারী জিনিস আর একটা হাল্কা জিনিস একসঙ্গে মিশে থাকলে পৃথিবী ভারী জিনিসটাকেই আগে তার দিকে অর্থাৎ তার কেন্দ্রের দিকে টেনে নেবে। আর গ্যাসের চাইতে তরল জিনিস যে স্বভাবতঃই বেশী ভারী এ কথা কে না জানে? তাই, পৃথিবীর ওপরকার গ্যাস যেমন যেমন তরল হতে লাগল, ততই তারা নীচের দিকে নেমে যেতে লাগল। এইভাবে চলল আরও বহু লক্ষ বছর। তখন দেখা গেল, অতি অল্প কয়েকটি বাদে পৃথিবীর ওপরকার সমস্ত গ্যাসই তরল হয়ে গেছে।

তরল পৃথিবী

এই সময়কার পৃথিবীটাকে একবার মনে মনে কল্পনা করতে পার? একটা বিরাট গোলাকার পদার্থ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু তার সারা দেহখানি তরল টলটলে—ঠিক যেন একরাশ জল দিয়ে একটা গোলক বানানো হয়েছে। অবশ্য সত্যি তা জল নয়, আর তখনও তা এত গরম যে জল না বলে বরঞ্চ তরল ধাতুর সঙ্গেই তার তুলনা দেওয়া চলে।

যে ক'টা গ্যাস তখনও তরল হয় নি তারা কিন্তু তখনও সেই তরল গোলকের ওপর ভাসছে—ঠিক যেন একটা ঘন গ্যাসের চাদর দিয়ে গোটা পৃথিবীটাকে কেউ মুড়ে রেখেছে। এই সব গ্যাসের মধ্যে আমাদের জলীয় বাষ্পও একটা। অবশ্য তার কিছুটা হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনে ভেঙ্গে থাকাও বিচিত্র নয়। আর আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি।

কিন্তু তরল জিনিসও চিরকাল তরল থাকে না, ক্রমাগত ঠাণ্ডা হতে হতে শেষে একদিন জমাট বেঁধে নিরেট চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। পৃথিবীর বুকেও এই কাণ্ড ঘটল। পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের তরল উপাদান জায়গায় জায়গায় জমাট বেঁধে একটি দু'টি করে নিরেট দানায় রূপান্তরিত হতে লাগল—ঠিক যেমন চিনির রস ঠাণ্ডা করতে করতে ধীরে ধীরে তার মধ্যে মিছরির দানা বাঁধতে থাকে। গ্যাস থেকে তরল অবস্থায় যাওয়ার সময় যেমন সব গ্যাস একসঙ্গে বদলায় নি, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই,—কোন কোন জায়গা আগে জমাট বাঁধল, কোনটা পরে। আবার তরল জিনিসের চেয়ে নিরেট জিনিস স্বভাবতঃই ভারী, তাই পৃথিবীর টানে ভারী নিরেট অংশগুলি ক্রমে ক্রমে আরও নীচে গিয়ে জমতে লাগল—ওপরে রইল তরল অংশ।

নিরেট অংশ বললাম, কিন্তু এর সবটাই এক জিনিস নয়। এর মধ্যে আছে নানান্ রকমের ধাতু, আর আছে ভারী, মাঝারি, হাল্কা নানান্ জাতের পদার্থ—যাকে বলা হয় পাথর। ধাতুগুলিই সবচেয়ে ভারী, তাই সেগুলিই গিয়ে জড় হ'ল সকলকার নীচে—অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে। কারণ পৃথিবীর সব

দিক্ই তো গোল, নীচে বলতে কেন্দ্রকেই বোঝাবে। তার ওপর রইল অপেক্ষাকৃত ভারী পাথর, তার ওপর আর একটু কম ভারী পাথর। এইভাবে সবচেয়ে হাল্কা পাথর রইল সকলের মাথার ওপরে।

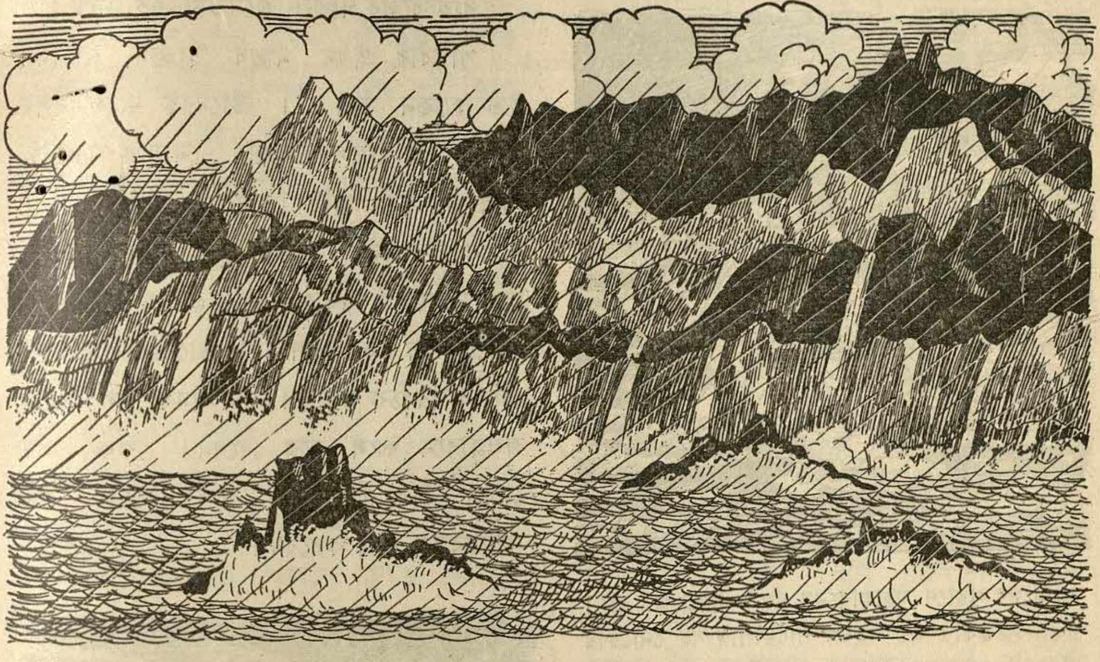
এদিকে পৃথিবীর তরল অংশ যেমন যেমন ঠাণ্ডা হচ্ছে, ওপরকার গ্যাসের চাদরটাও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ঠাণ্ডা হচ্ছে এবং ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তরলও হচ্ছে। সেই গ্যাসের মধ্যে আছে জলীয় বাষ্প, তাও ঠাণ্ডা হচ্ছে। বাষ্প ঠাণ্ডা হলে হয় জল। এইবার সেই জল তার তরল চেহারা নিয়ে নেমে এল পৃথিবীর গায়ে—বৃষ্টির মত। পৃথিবী যদিও তখন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে কিন্তু এতটা ঠাণ্ডা হয় নি যাতে তার গায়ে জল ঢাললে সে জল তরল অবস্থায়ই সেখানে জমে থাকতে পারে। প্রথম দিকে তো কাছাকাছি এসেই সে জল ফের বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে লাগল। কিছুদিন পরে, পৃথিবী আর একটু ঠাণ্ডা হলে, সে জল পৃথিবীর গায়ে গিয়ে পৌঁছল বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার পৃথিবীর তাপে বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে গেল। কারণ পৃথিবীর গায়ের উত্তাপ তখনও একশ' ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ওপরে—যে তাপে জল বাষ্প হয়ে যায়।

পৃথিবীর এই অবস্থা কতদিন চলল বলা কঠিন। যাই হোক, সে সময়কার পৃথিবীর চেহারাও আমরা মনে মনে কল্পনা করতে পারি। পৃথিবীর কতক অংশ তখন শক্ত হয়ে গেছে, কতক তখনও তরল। শক্ত অংশ তরল অংশের নীচে চাপা রয়েছে, আর ওপরে ঘন মেঘের বাষ্প সর্বক্ষণ পৃথিবীকে কুয়াশার মত ঢেকে রেখেছে। সে কুয়াশা এত ঘন যে তার ভিতর দিয়ে সূর্যের আলোও ভালো করে পৃথিবীর ওপর পড়তে পারছে না। সেই আদ্যিকালের কুয়াশা-ঘেরা পৃথিবীর সঙ্গেও এখনকার পৃথিবীর চেহারার কোনই মিল নেই।

মহাপ্লাবন

তার পর। পৃথিবীর ওপরকার তাপ তখন আরও একটু কমেছে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, ওপরকার জলীয় বাষ্প বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর ওপর এসে নামল কিন্তু আর বাষ্প হয়ে উঠে গেল না। অর্থাৎ পৃথিবী তখন এতটা ঠাণ্ডা হয়েছে যে তার ওপরকার বৃষ্টিধারাকে সে আর ও-ভাবে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যেতে দিচ্ছে না, নিজের গায়েই আটকে রাখতে পারছে। সে জল জমা হচ্ছে পৃথিবীরই বুকে। তখন? পৃথিবীর সে আর এক অবস্থা। শুধু বৃষ্টি—বৃষ্টি—আর বৃষ্টি! যতক্ষণ না ওপরকার পুঞ্জীভূত জলীয় বাষ্প সমস্তটা মেঘ হয়ে তার সবটাই আবার পৃথিবীর বুকে ঝরে না পড়ছে ততক্ষণ আর যেন সে বৃষ্টির শেষ নেই! আমাদের পুরাণে এবং বাইবেলেও যে অঝোর ধারায় বৃষ্টি এবং মহাপ্লাবনের গল্প আছে এও যেন ঠিক তাই। গল্প দু'টো জান তো? আচ্ছা, সংক্ষেপে বলছি:

সূর্যের পুত্র মনু একবার দারুণ তপস্যা করছিলেন, এমন সময় একটি ছোট্ট মাছ এসে বলল, "আমাকে বড় মাছেরা খেতে আসছে, তাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচান।"



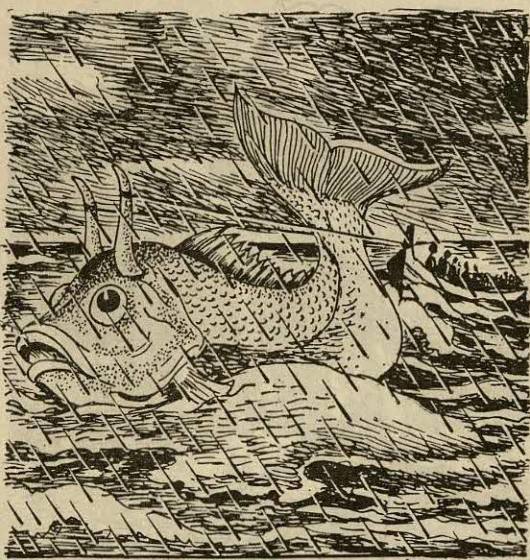
শুধু বৃষ্টি—বৃষ্টি আর বৃষ্টি !

মনু মাছটিকে একটা হাঁড়ির মধ্যে যত্ন করে রেখে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে মাছটা এত বড় হয়ে উঠল যে ছোট্ট হাঁড়ির মধ্যে আর সে ধরে না। মনু তখন তাকে একটা পুকুরে নিয়ে রাখলেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও সে এমন ভাবে বাড়তে লাগল যে মনু শেষটা তাকে নদীতে এবং পরে সমুদ্রে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। মাছটা তখন পাহাড়ের মত বড় হয়ে উঠেছে।

মাছ সমুদ্রে নেমে মনুকে বলল, "শীগ্‌গীরই মহাপ্রলয় আসছে। সমস্ত পৃথিবী জলে ভেসে যাবে, সৃষ্টির কেউ রক্ষা পাবে না; কিন্তু আপনাকে আমি বাঁচাব। আপনি একটা প্রকাণ্ড নৌকো তৈরী করে তার মধ্যে সাত ঋষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ—এই সপ্তর্ষি, আর যত রকম গাছপালা আছে তাদের বীজ সংগ্রহ করে নিয়ে ঢুকে পড়ুন। সময় হলে আমি আসব। আমার মাথায় দু'টো শিং আছে। তারই সঙ্গে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আপনি নৌকো ছেড়ে দেবেন। তা হলে আর ভয় থাকবে না।"

মাছ চলে গেলে মনু তার কথামত সব কিছু করলেন। তারপরই সুরু হ'ল প্রলয়। আকাশ থেকে ক্রমাগত ঝরতে লাগল অঝোর ধারায় বৃষ্টি; তার আর শেষ নেই। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল প্রবল তুফান। মাছটি ঐ সময় জলে ভেসে উঠল আর মনু তার শিংএ নৌকো বেঁধে দিলেন। মাছ সেই নৌকো নিয়ে প্লাবনের জলে ভেসে বেড়াতে লাগল।

পৃথিবীর সমস্ত ডাঙ্গা তখন লোপ পেয়েছে।



আমাদের পুরাণে মহাপ্লাবনের গল্প : মুষলধারে বৃষ্টি। ব্রহ্মা সৃষ্টিরক্ষার জন্য মনুকে সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ নৌকোয় বসিয়ে নিজে মাছের রূপ ধরে সেটা টানতে টানতে প্লাবনে ভেসে বেড়াতে লাগলেন।

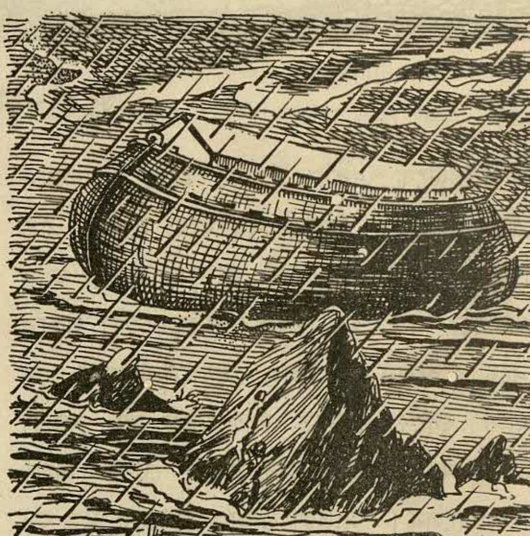
বৃষ্টি সমানে ঝরছে। চারদিকে শুধু জল থই-থই সমুদ্র। এই ভাবে কতদিন চলল! শেষে বৃষ্টি থামলে মাছ নৌকো নিয়ে হিমালয়ের চূড়ায় গিয়ে বলল, "এইখানে নৌকো বাঁধুন।"

তাই করলেন মনু। মাছ তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আমি হচ্ছি প্রজাপতি ব্রহ্মা। সমস্ত সৃষ্টি প্লাবনে ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে যত পাপ। তুমিই মনু, তুমিই আবার নতুন করে সমস্ত সৃষ্টি করবে। মনুর সন্তান, তাই তাদের বলা হবে মানব। তুমি যে গাছপালার বীজ জমিয়ে রেখেছ তাই দিয়ে নতুন গাছপালাও সৃষ্টি হবে। সপ্তর্ষি অমর হয়ে আকাশে বিরাজ করবেন।"

এইভাবেই নাকি মহাপ্লাবনের পর নতুন পৃথিবীর জন্ম হ'ল।

বাইবেলের গল্পটিও অনেকটা এই রকম :

পৃথিবীর প্রথম মানুষ হচ্ছেন আদাম; ইভ হচ্ছেন তাঁর স্ত্রী। তাঁদেরই বংশে দশম পুরুষে জন্ম নিলেন নোয়া। নোয়ার স্বভাবটা ছিল চমৎকার আর তিনি খুব পবিত্র জীবন যাপন করতেন। অথচ সেই সময় পৃথিবীর অন্য মানুষেরা, অর্থাৎ আদামের অন্য বংশধরেরা মোটেই সে রকম ছিল না। তাদের রকম-সকম দেখে ঈশ্বর ঠিক করলেন তিনি সমস্ত পৃথিবীটাকে জলপ্লাবনে ধ্বংস করে দেবেন। কেবল মাত্র নোয়া তাঁর প্রিয়পাত্র বলে তাঁকে তিনি সপরিবারে রক্ষা করবেন।



বাইবেলে মহাপ্লাবনের গল্প : ঈশ্বরের নির্দেশে নোয়া এক জাহাজের খোলের মত 'আর্ক' বানিয়ে তার মধ্যে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ঢুকে রইলেন। বাইরে মহাপ্লাবনে সমস্ত সৃষ্টি ভেসে গেল।

ঈশ্বরের নির্দেশ মতই নোয়া একটি বিরাট জাহাজের খোলের মত "আর্ক" তৈরী করলেন

কাঠ দিয়ে, তার পর নিজের সন্তানসন্ততি এবং পৃথিবীতে যত রকম জীবজন্তু আছে তাদের প্রত্যেকের ভিতর থেকে দু'টি করে বেছে নিয়ে সেই আর্কে গিয়ে ঢুকলেন। তারপরই সুরু হ'ল মুষলধারে বৃষ্টি। অবিরাম—অবিশ্রান্ত ভাবে চলল দিনের পর দিন। সমস্ত পৃথিবী বন্যায় ভেসে গেল—সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল। কেবল নোয়া তাঁর দলবল নিয়ে ঐ আর্কের মধ্যে বসে সেই জলপ্লাবনের মধ্যে ভাসতে লাগলেন।

প্লাবনের শেষে যখন পৃথিবী আবার স্বাভাবিক হ'ল তখন অন্য সমস্ত প্রাণী আর মানুষ লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু নোয়ার বংশধররাই আবার নতুন করে সৃষ্টি করল মানব-সমাজ। আর সেই সব জীবজন্তু, যাদের নোয়া সঙ্গে করে নিয়ে আর্কে পূরেছিলেন—তাদেরই কাচ্চাবাচ্চারা সৃষ্টি করল নতুন জীবজগৎ।

এই দুই দেশের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানীর দেওয়া পৃথিবীতে সত্যিকার প্লাবনের ছবির আশ্চর্য একটা মিল দেখা যায়।

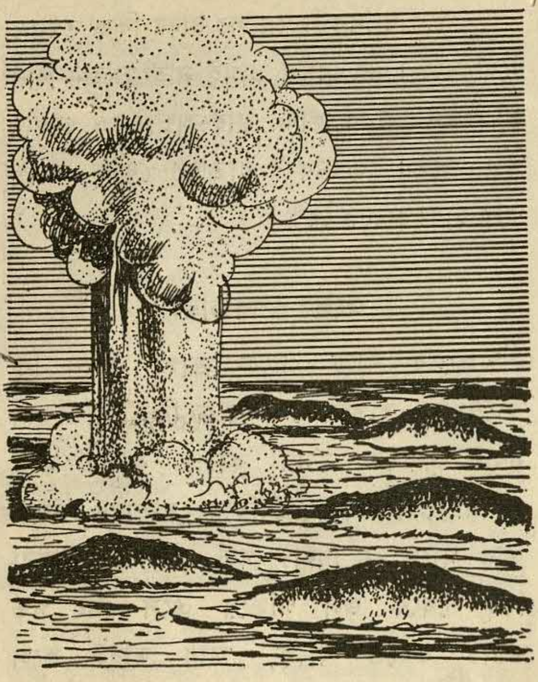
তার পর, যা বলছিলাম বলি। বৃষ্টির জল ক্রমাগত জমতে জমতে পৃথিবীর সারা গা ভাসিয়ে দিল আর যেখানেই ফাঁক পেল সেখানেই গিয়ে জড় হতে লাগল। সেই জল-থই-থই পৃথিবীতে তখনও ডাঙ্গা বা মাটি বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। সত্যিই যাকে বলে মহাপ্লাবন। তবে হ্যাঁ, জলীয় বাষ্প গলে ঝরে পড়বার ফলে পৃথিবীর ওপরকার কুয়াশা নিশ্চয়ই তখন অনেক পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, ফলে সূর্যকিরণও পৃথিবীর বুকে লুটিয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল অনেক বেশী।

ওপরে খানিকটা গ্যাসের চাদর কিন্তু তখনও রয়ে গেছে। এর বেশীর ভাগই নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন; তবে কার্বন ডাই-অক্সাইডও নেহাৎ কম নেই। এখনকার বাতাসে যেটুকু আছে তার চাইতে ঢের বেশী।

জলের ওপর ডাঙ্গা

জলের নীচে থেকে ডাঙ্গা কখন কি ভাবে মুখ বাড়াল সে সম্বন্ধে কিন্তু পণ্ডিতেরা সবাই একমত ন'ন। কারও কারও মতে পৃথিবী থেকে চাঁদ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে তার গায়ে যে বিরাট গর্ত তৈরী হয়—নানা দিক্ থেকে জল গড়িয়ে এসে সেই গর্ত ভরাট করতে থাকে, আর তারই ফলে অন্যান্য উঁচু জায়গায় তলাকার শক্ত নিরেট খোলা মাথা তুলে দাঁড়ায়। আবার কারো কারো মতে পৃথিবীর যে সব পাথরে তেজস্ক্রিয় ধাতু মেশান ছিল সেগুলো তেজ অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের রশ্মি বিকীরণ করতে করতে জায়গায় জায়গায় নতুন করে এত উত্তাপের সৃষ্টি করে যে তাতেই হয়তো নীচেকার শক্ত পাথর কতক কতক ফের গলে গিয়ে জলের ওপর ঠেলে ওঠে, তার পর ঠাণ্ডা হয়ে আবার শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু তখন সেগুলি জলের ওপরে। সেগুলিই হচ্ছে ডাঙ্গা। অবশ্য এ ছাড়াও নানা পণ্ডিতের নানা মত আছে।

ইতিমধ্যে নানা কাণ্ড চলছে পৃথিবীর ভিতরে। পৃথিবীর ভিতরটা তো তখনও স্থির হয় নি—সর্বদাই সেখানে নড়াচড়া চলেছে। ঠেলে উঠছে নানা রকম গ্যাস—যাকে আমরা বলি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।



নীচেকার পাথর উত্তাপে গলে গিয়ে জলের ওপর ঠেলে ওঠে।

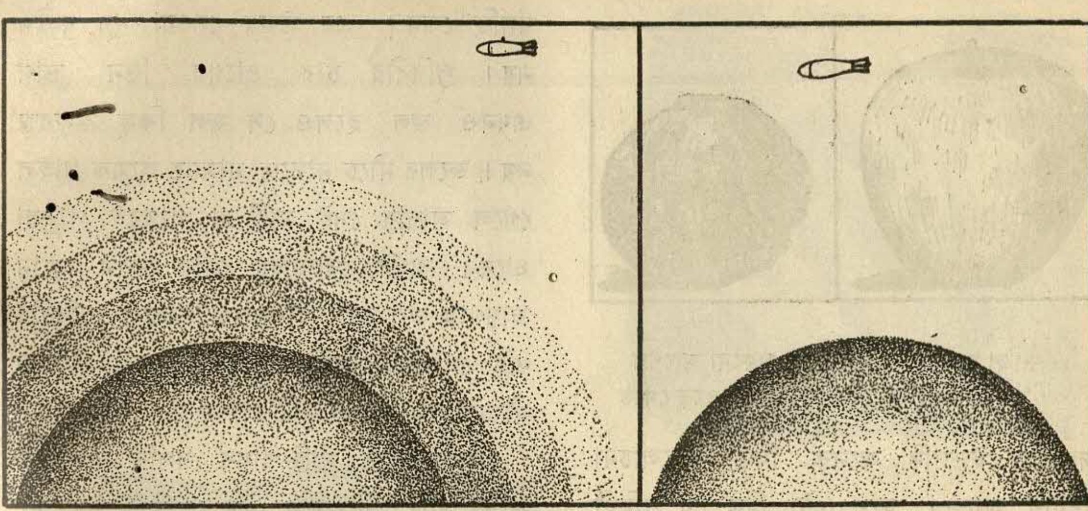
ওদিকে সূর্যের আলো, বৃষ্টির জল, বাতাসের গ্যাস এরাও সকলে মিলে সমবেতভাবে পৃথিবীর খোলসটার চেহারা বদলে দিচ্ছে। কোথাও ডাঙ্গা ক্ষয়ে ক্ষয়ে জলে গুলে জড় হচ্ছে গিয়ে সমুদ্রে। সমুদ্রের জলে সেই সব বিভিন্ন লবণ জাতীয় পদার্থ জমে জমে সে জল ক্রমেই হয়ে যাচ্ছে লোনা। এই রকম আরও কত কি!

বাতাসও বদলে যায়

পৃথিবীর ওপরকার বাতাসের যে চাদর তারও কিছু কিছু অদল-বদল হচ্ছে বৈ কি! সে বাতাস আরও হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। পৃথিবীর ওপরকার এই যে বাতাস—যাকে আমরা সাধু ভাষায় বলি 'বায়ুমণ্ডল'—এ কিন্তু পৃথিবীরই একটা অংশ,—পৃথিবীর বাইরে নয়। অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরবার সময় এই বায়ুমণ্ডলকে নিয়েই ঘুরছে, সেটাকে আলাদা ফেলে রেখে নয়। এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর খোলসের ওপরে আরও প্রায় ২০০ মাইল জায়গা যুড়ে রয়েছে। যদি আমরা কখনও পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে উঠতে পারি—যেমন ইতিমধ্যেই কয়েকজন মহাকাশ-চারী উঠেছেন,—তা হলে দেখা যাবে বায়ুমণ্ডলের নীচে পৃথিবীর মূল ভূভাগ কিছুটা আবছা দেখাচ্ছে। পৃথিবীর চারধারে ঐ রকম কোন আবরণ না থাকলে তাকে আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল দেখাত।

আগেই বলেছি, সে যুগের বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভাগ নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু এখন খুবই কম,—শতকরা ·০৪ ভাগ মাত্র। তা হলে কোথায় গেল সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড? পৃথিবী এখনও এতটা ঠাণ্ডা হয় নি যে সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড গলে গিয়ে পেঁজা তূলোর মত পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়বে, কার্বন ডাই-অক্সাইড ঠাণ্ডায় জমে গেলে যেমনটা হয়। তবে?

এরও একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের স্পন্দন সুরু হয় গাছপালা দিয়ে। অবশ্য সে যুগের গাছপালাও ছিল খুব আদিম, অর্থাৎ আমরা যাকে বলি নিম্নস্তরের। বেশীর ভাগই শ্যাওলা জাতের উদ্ভিদ্। থাকত সমুদ্রের জলে, কিন্তু তারাই ছিল তখন পৃথিবীর একমাত্র জীবন্ত বাসিন্দা।

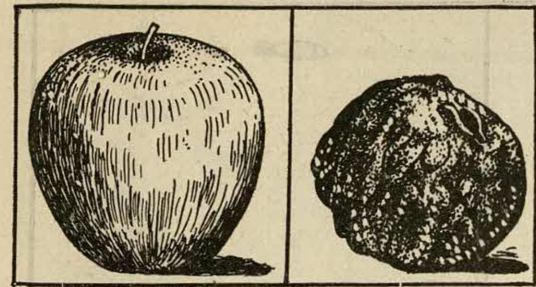


বাঁয়ে: পৃথিবীর বাইরেকার মহাকাশ থেকে নীচে তাকালে পৃথিবীকে কিছুটা আবছা দেখায়। পৃথিবীর ওপরে বায়ুমণ্ডলের স্তর না থাকলে তাকে আরও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দেখাত (ডাইনে)।

জলে বা ডাঙ্গায় কোন জীবন্ত প্রাণী তো দূরের কথা, কোন কীট-পতঙ্গ, এমন কি আমাদের পরিচিত অন্য কোন গাছপালাও তখন পর্যন্ত দেখা দেয় নি। পরে অবশ্য অন্য রকম গাছপালাও জন্মাতে লাগল, কিন্তু প্রাণীরা এল তারও পরে। এখন, তোমরা জান, গাছেরা বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস টেনে নিয়ে আলোর সাহায্যে তা থেকে নিজেদের অনেকখানি খাবার তৈরী করে নেয়, আর তার বদলে বাতাসে ছেড়ে দেয় অক্সিজেন গ্যাস। প্রাণীরা আবার অক্সিজেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে শরীরের ভিতরকার দহনকার্য চালায়, তারপর ফের আবার কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপে তা বের করে দেয়। সে যুগে শুধু গাছপালাই ছিল, প্রাণীরা কেউ ছিল না, আর সেই আদিম গাছপালারাও বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নিতে কসুর করত না নিশ্চয়ই। অবশ্য তার বদলে তারা বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে দিত। এই ভাবে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড ধীরে ধীরে কমতে লাগল, কারণ তাকে ফের বাতাসে ফিরিয়ে দেবার কেউ ছিল না তো! তেমনি বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল, তাকে তো আর কেউ টেনে নেবার নেই। কাজেই সেই আদ্যিকালের পৃথিবীর ওপরকার বাতাস আর এখনকার পৃথিবীর ওপরকার বাতাস কি করে এক রকম হবে?

চল যাই পৃথিবীর ভিতরে

এ পর্যন্ত আমরা পৃথিবীর যে চেহারার কথা বলেছি তা প্রধানতঃ পৃথিবীর খোলসটার কথা। এই খোলসের কথা আমরা পরে আরও আলোচনা করব—যুগে যুগে এর চেহারা কেমন বদলাচ্ছে, কেন বদলাচ্ছে, কি করে



তাজা আপেল মসৃণ রয়েছে শুকনো আপেল কুঁকড়ে-মুকড়ে গেছে

বদলাচ্ছে ইত্যাদি অনেক কিছু আলোচনা করবার আছে। তবে এটা ঠিক যে পৃথিবী ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই ছোট হয়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে যেতে লাগল। তার গায়ে দেখা দিল উঁচুনীচু ভাঁজ—এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেল তার চেহারা। ব্যাপারটা কেমন জান? মনে কর একটা তাজা আপেল সবে গাছ থেকে পাড়া হয়েছে। আপেলের গা-টা তখন কেমন মসৃণ—প্রায় বলের মতই গোল। আপেলটাকে কিছুদিন রেখে দাও, দেখবে তার সেই তাজা মসৃণ চেহারা আর থাকবে না—শুকিয়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে কেমন এবড়ো-খেবড়ো হয়ে যাবে তার গা! পৃথিবীর বেলাও ঠিক তাই হয়েছে।

কিন্তু এই পরিবর্তন শুধু আপেলের খোসাটার ওপরেই প্রথম দেখা যাবে, ভিতরের পরিবর্তন হবে আরও পরে। পৃথিবীর বেলাও তাই হয়েছে। পৃথিবীর খোলসটাই কেবল জমে, শুকিয়ে এবড়ো-খেবড়ো নিরেট চেহারায় রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু পৃথিবীর তো এখনও বেশীর ভাগ অংশই জল। তবে শক্ত, নিরেট খোলস বলছি কেন? এর উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নয়। পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ এখনও জল হলেও সে জল কিছু অফুরন্ত নয়। জলের নীচে নামতে নামতে কয়েক মাইল গেলে আবার সেই মাটি বা পাথরই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ খোলসের ওপর কোন কোন জায়গায় জল জমে থাকলেও আসলে পৃথিবীর এই খোলসটা মাটি-পাথরেরই তৈরী, জলের নীচেই রয়েছে সেই মাটি-পাথর।

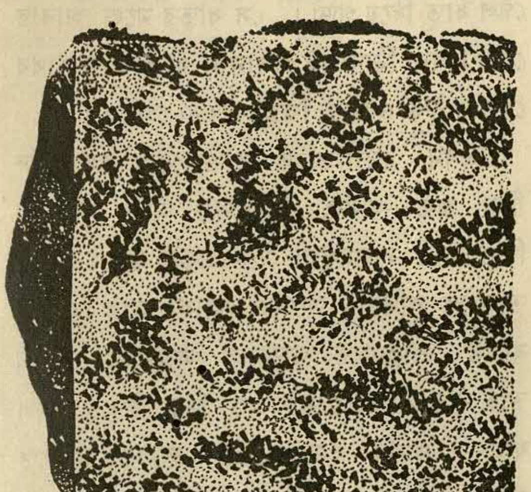
বারে বারে মাটি-পাথর বলছি। পাথর আর মাটি কি তবে এক? ঠিক এক না হলেও ওদের সম্পর্ক খুবই নিকট, পাথরই ক্ষয়ে গিয়ে গুঁড়ো হয়ে হয়ে নানা রাসায়নিক পরিবর্তনের পর শেষে মাটি হয়ে দাঁড়ায়।

পৃথিবীর পাথুরে খোলস

যাই হোক, পৃথিবীর খোলস দেখে তার ভিতরের চেহারা সম্বন্ধে অনুমান করা ঠিক হবে না এটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু পৃথিবীর ভিতরটা দেখা যাবে কি করে? কতটুকুই বা তার ভিতরে ঢোকা যেতে পারে? বড় জোর এক মাইল বা দু'মাইল, তাও ক্ষেত্রবিশেষে, মাত্র ২।১টা খনির মধ্যে দিয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তাই বলে হাল ছাড়বার পাত্র ন'ন। পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে—পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তাঁরা ঐ সব মাটি-পাথর পরীক্ষা করে দেখেছেন। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে পৃথিবীর ওপরে এই মাটির আস্তর খুব সামান্যই পুরু। আসলে তার ওপরের দিক্‌টা মোটামুটি সবটাই গ্র্যানাইট পাথর দিয়ে তৈরী। অবশ্য গ্র্যানাইট বদলে

গিয়ে যে সব পাথরে রূপান্তরিত হয় তাও কিছু কিছু আছে। কিন্তু তারও পরিমাণ খুব সামান্য। এই গ্র্যানাইট পাথর কিন্তু খুব ভারী পাথর নয়—জলের চেয়ে বড় জোর আড়াই গুণ ভারী হবে। চিনতেও ওকে বেশী কষ্ট হয় না। সাদাটে বা ঈষৎ লালচে, তার ভিতর মাঝে মাঝে কালো কালো ফুটকি দেওয়া।

তা হলে কি বলতে হবে পৃথিবীর ওপরটুকু বাদ দিলে সবটাই এই গ্র্যানাইট পাথর দিয়ে



গ্র্যানাইট পাথর

গড়া ? উঁহু, মোটেই তা নয়। গ্র্যানাইটের নীচে আবার আছে আর এক জাতের পাথর, যা নাকি গ্র্যানাইটের চেয়ে আরও শক্ত—আরও নিরেট—আরও ভারী। এই পাথরের নাম দেওয়া হয়েছে বেসল্ট। গ্র্যানাইটের মত বেসল্টকেও চিনতে খুব কষ্ট হয় না। জমাট কালো রং, আর দানাগুলোও বেশ মিহি। যদি সমুদ্রের তলায় নেমে যাওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে সেখানেও গ্র্যানাইটের তলায় এই বেসল্টের স্তর গোটা পৃথিবী যুড়ে ছড়িয়ে আছে।

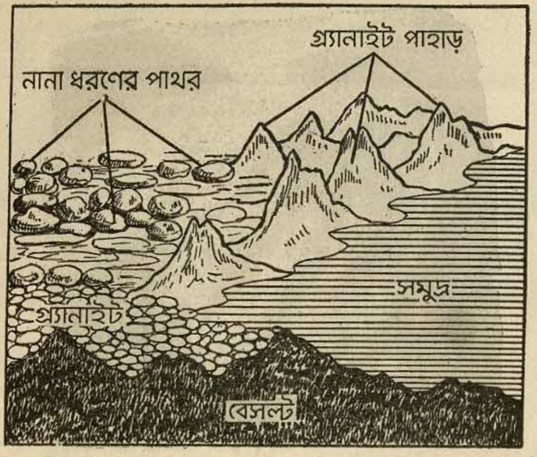


বেসল্ট পাথর

এই বেসল্ট কি করে গড়ে ওঠে তাও বিজ্ঞানীরা বার করেছেন। আগ্নেয়গিরি থেকে শুধু আগুনই নয়, পাথরও গলে গিয়ে বেরিয়ে আসে, আর সেই তরল পাথর যখন ঠাণ্ডা হয়ে আবার জমাট বাঁধে তখনই তাকে বলা হয় বেসল্ট। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বুকে যত আগুনে পাহাড় তরল পাথর উগরে দিয়েছে সমস্তই এই ভাবে আবার জমে গিয়ে বেসল্ট পাথরে পরিণত হয়েছে, আর সেগুলোই গিয়ে ডাঙ্গা আর সমুদ্রের তলায় এক বিরাট স্তরের সৃষ্টি করেছে।

জলের চেয়ে পৃথিবী সাড়ে পাঁচ গুণ ভারী

তা হ'লে পৃথিবীর ভিতরটা বুঝি আগাগোড়া বেসল্ট দিয়েই তৈরী ? উঁহুঃ! তাই যদি হ'ত তা হলে পৃথিবী অত ভারী হ'ত না। পণ্ডিতেরা অনেক মাপজোখ—অনেক হিসেব-পত্র করে দেখেছেন গোটা পৃথিবীটা জলের চেয়ে অন্ততঃ সাড়ে পাঁচ গুণ ভারী। যদি তাই-ই হয় তা হলে পৃথিবীর মাঝখানে নিশ্চয়



পৃথিবীর খোলস—বেসল্টের ওপরে গ্র্যানাইটের স্তর

এমন আরও কোন জিনিস আছে যা নাকি জলের চাইতে অন্ততঃ সাত-আট গুণ ভারী। তা হলেই হরে-দরে ওজনটা ঐ রকম হতে পারে। নইলে শুধু বেসল্ট আর গ্র্যানাইটের আস্তর দিয়ে গড়া পৃথিবী অত ভারী হতে পারত না।

ঐ ভারী জিনিসটা কি হতে পারে এই বার তাই নিয়ে জোর খোঁজাখুঁজি চল্‌ল। এবারে সাহায্যের জন্য এলেন কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী—আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন। তাঁরা বললেন, পৃথিবীর এই অদৃশ্য উপাদান বার করতে হলে ওরই জাতভাইদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিতে হবে। কিন্তু মহাকাশে পৃথিবীর যে সব জাতভাই ঘুরছে তাদের নাগাল পাব কি করে? তাঁরা বললেন, পাওয়া যাবে,—যদি আমরা বড় বড় গ্রহের পেছনে না ঘুরে ছোট ছোট উল্কাগুলো পরীক্ষা করে দেখি। কারণ ঐ উল্কাই বোধ হয় একমাত্র জিনিস যা মহাকাশ থেকে ছিটকে এসে আমাদের পৃথিবীতে হাজির হয়। অবশ্য বেশীর ভাগ উল্কাই মাঝপথে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কিন্তু পৃথিবীর বুকে এসে জমা হয় এ রকম ছোট-বড় উল্কাপিণ্ডেরও অভাব নেই। পৃথিবী আর উল্কাপিণ্ডের জন্ম প্রায় একই মূল থেকে। কাজেই উল্কার উপাদানের সঙ্গে পৃথিবীর উপাদানের সাদৃশ্য থাকা খুবই স্বাভাবিক।

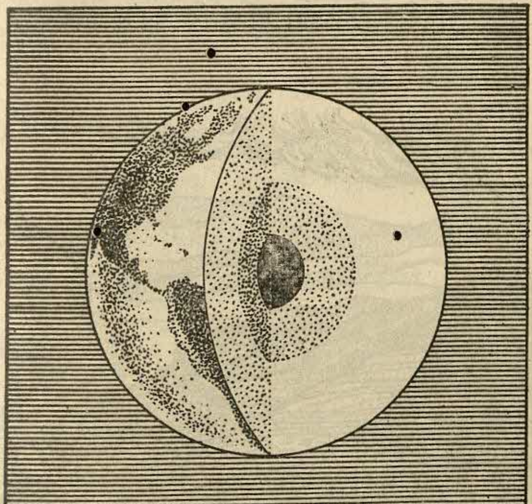
পরীক্ষা করে তিন জাতের উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেল। কতকগুলি প্রায় গোটাটাই পাথর দিয়ে তৈরী, কিন্তু বেশীর ভাগই দেখা গেল ধাতু দিয়ে গড়া। সে ধাতুর মধ্যে আবার লোহা আর নিকেলই প্রধান। ধাতু আর পাথর মেশান উল্কাও কিছু কিছু পাওয়া গেল।

এখন, জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতদের কথা যদি ঠিক হয়,—অর্থাৎ উল্কাপিণ্ড আর পৃথিবীর ভিতরকার মালমশলা যদি একই জাতের হয়, তা হলে পৃথিবীর মধ্যেও লোহা আর নিকেল যথেষ্ট পরিমাণে থাকবার সম্ভাবনা। আর তাই যদি হয় তা হলেই অঙ্ক ঠিক ঠিক মিলে যায়—পৃথিবীর ওজন কেন জলের চাইতে সাড়ে পাঁচ গুণ বেশী সে রহস্যেরও মীমাংসা হয়ে যায়। কারণ যে রকম ভারী জিনিসের খোঁজ করা হচ্ছিল লোহা আর নিকেল হচ্ছে ঠিক সেই রকম ভারী। সুতরাং পৃথিবীর ঠিক মাঝখানটায়, বেসল্ট স্তরেরও নীচে, লোহা আর নিকেলেরই যে একটা বিরাট স্তর রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

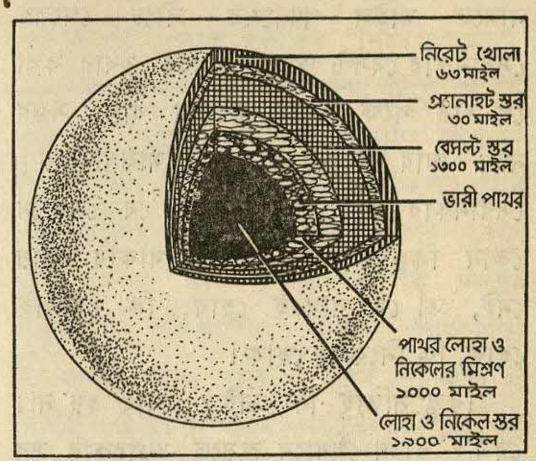
বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারেও এই রকমই হওয়ার কথা। কারণ ভারী জিনিস কখনও হাল্কা জিনিসের ওপর ভেসে থাকতে পারে না, তাকে নীচে নেমে আসতেই হবে। খনি থেকে লোহা-পাথর তুলে এনে যখন

সে পাথর রাসায়নিক মশলা মিশিয়ে গালিয়ে ফেলা হয় তখনও আমরা ঠিক এই ব্যাপারটাই দেখতে পাই। তরল লোহা নীচে নেমে আসে আর পাথুরে অংশটা তার ওপর ভেসে থাকে দুধের ওপর সরের মত। পৃথিবীর বেলায়ও নিশ্চয়ই তাই হয়েছে। ভারী ধাতু লোহা আর নিকেল, ভারী বলেই, সব চেয়ে তলায়—অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছে গিয়ে জমেছে। তার ওপর রয়েছে পাথর, লোহা আর নিকেলের একটা মিশ্রণ। তার ওপর রয়েছে লোহা-নিকেলের চেয়ে হাল্কা কিন্তু বেসল্টের চেয়ে ভারী পাথরগুলো এবং তারও ওপর রয়েছে ঐ বেসল্টের স্তর। সকলের ওপরে রয়েছে গ্র্যানাইট আর মাটির আস্তর।

একটা আস্ত আপেলকে ছুরি দিয়ে কেটে



পৃথিবীর ভিতরকার বিভিন্ন স্তর ঃ
একেবারে কেন্দ্রে লোহা আর নিকেল, তার ওপর ভারী পাথর, তার ওপর বেসল্ট। বেসল্টের ওপর রয়েছে গ্র্যানাইট আর মাটির আস্তর।



গোল পৃথিবীর খানিকটা অংশ যদি খুঁচিয়ে বার করে নেওয়া যেত তা হলে ভিতরটা যেমন দেখাত।

আমরা যে ভাবে তার একটা অংশ খুঁচিয়ে বার করে নেই ঠিক সেইভাবে যদি গোল পৃথিবীরও খানিকটা অংশ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করে নেওয়া যেত তা হলে জিনিসটা কেমন হ'ত তার একটা ছবি দেখ। কোন্ স্তর কতখানি পুরু তার একটা মোটামুটি হিসেবও দেখতে পাবে ছবিতে। যেমন ধর, ভিতরের লোহা-নিকেলের স্তরটি কম করে ১৯০০ মাইল পুরু হবে, তার পরের স্তরটি ১০০০ মাইল। এই রকম করে গ্র্যানাইট স্তরটি দেখবে মাত্র ৩০ মাইল পুরু। গোটা ডাঙ্গাটা ৬৩ মাইলের বেশী পুরু হবে না।

পৃথিবীর ভিতরটা এখনও ভীষণ গরম

পৃথিবীর ওপরকার এই শক্ত ডাঙ্গার ওপর দিক্‌টা এখন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে কিন্তু নীচেকার অংশ এখনও বেশ গরম। 'বেশ' বললে ঠিক বলা হবে না, যতই ভিতরে নামা যাবে ততই গরম বাড়তে থাকবে। হিসেব করে দেখা গেছে, এইভাবে নামতে

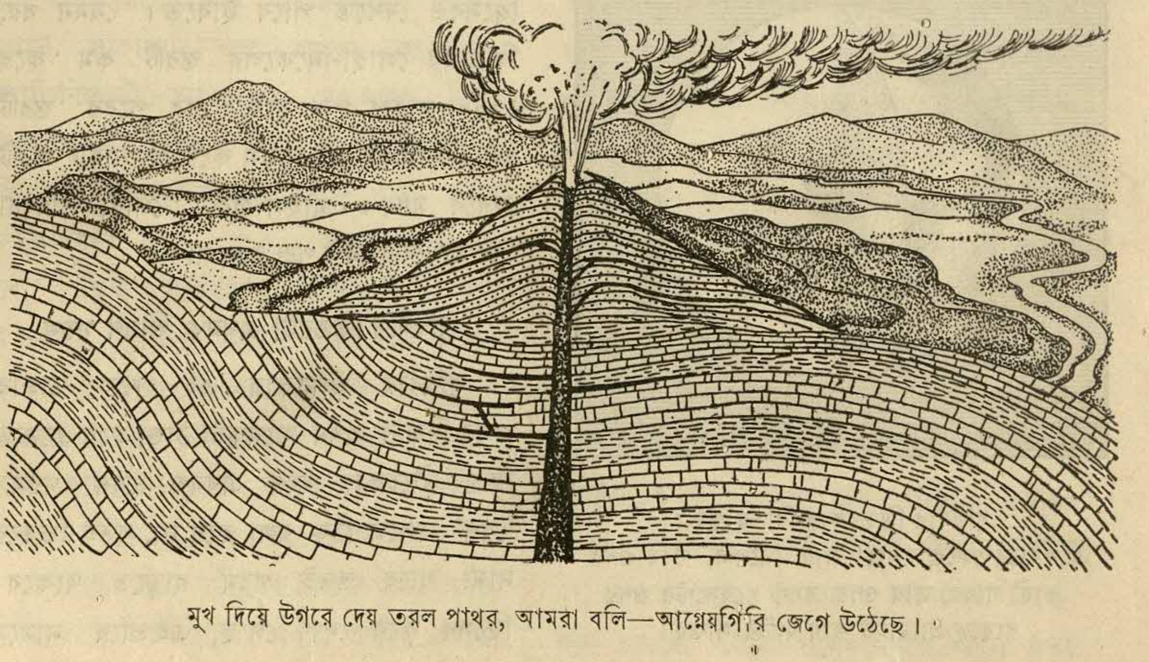
নামতে মাইল পঞ্চাশেক নীচে গেলেই সেখানকার বেসল্ট স্তর এত গরম হবার কথা যে তার পক্ষে নিরেট অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। আর পৃথিবীর একেবারে মাঝখানটায়? সেখানকার উত্তাপ এত বেশী যে সেখানে কোন কিছুরই তরল না হয়ে থাকার উপায় নেই, তা সে পাথরই হোক, কি লোহাই হোক, কি নিকেলই হোক।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? বোধ হয় না। কেন? কারণ সেখানে রয়েছে ওপরকার সব কিছুর প্রচণ্ড চাপ। ওপরকার কোটি কোটি মণ ওজনের বোঝা পৃথিবীর পেটের ভিতরকার তরল উপাদানকে এমন ভাবে চেপে, ঠেসে, পিষে রেখেছে যে তাদের পক্ষে পূরোপূরি তরল হওয়া সম্ভব হয় নি। পণ্ডিতদের ধারণা— একটা না-তরল না-জমাট থস্‌থসে কিম্ভুত-কিমাকার অবস্থায় রয়েছে সেগুলো, আর ওপরের গ্র্যানাইটের শক্ত খোলাটা যেন তার ওপরে ভাসছে। যদি কোন রকমে সেখানটা একটু খুঁচিয়ে ফুটো করে দেওয়া যেত তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ তরল পাথর-লোহা-নিকেল এক সঙ্গে ভুড় ভুড় করে ঠেলে উঠত শক্ত খোলা ভেদ করে। সে রকম যে মাঝে মাঝে হয় না তা নয়। এখনও পৃথিবীর ভিতরকার ঐ অংশ কখনও কখনও দৌরাত্ম্য করতে ছাড়ে না। সুরু হয় ভূমিকম্প। ঠেলে ওঠে পাহাড়। কখনও কখনও সে পাহাড় মুখ দিয়ে উগরে দেয় ভিতরকার তরল পাথর; আমরা বলি আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে।

পৃথিবীর শৈশবে এ ছিল একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এখন অবশ্য সে কিছুটা শান্ত হয়েছে বলা চলে।

যন্ত্র কি বলে?

পৃথিবীর ভিতরটা সত্যি কি রকম আজকাল



মুখ দিয়ে উগরে দেয় তরল পাথর, আমরা বলি—আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে।

যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করেও তার কিছু কিছু বলে দেওয়া যাচ্ছে। ব্যাপারটা অনেকটা ডাক্তারের রোগী দেখার মত। ধর, তোমার বুকে সর্দি বসেছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন, হ্যাঁ, সত্যি তাই। কিন্তু এজন্য ডাক্তারকে কখনও ছুরি দিয়ে বুক কেটে দেখতে হয় না, বুকের ওপর স্টেথোস্কোপ্ যন্ত্রটি বসিয়ে তিনি সেখানকার আওয়াজ কান দিয়ে শুনেই বলে দিতে পারেন কি হয়েছে। তেমনি কারো হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ হার্টের অসুখ করলে যন্ত্রের সাহায্যে "কার্ডিওগ্রাফ্" তুলে সেই রেখা দেখে বলে দেওয়া যায় হার্টের অবস্থা কি রকম।

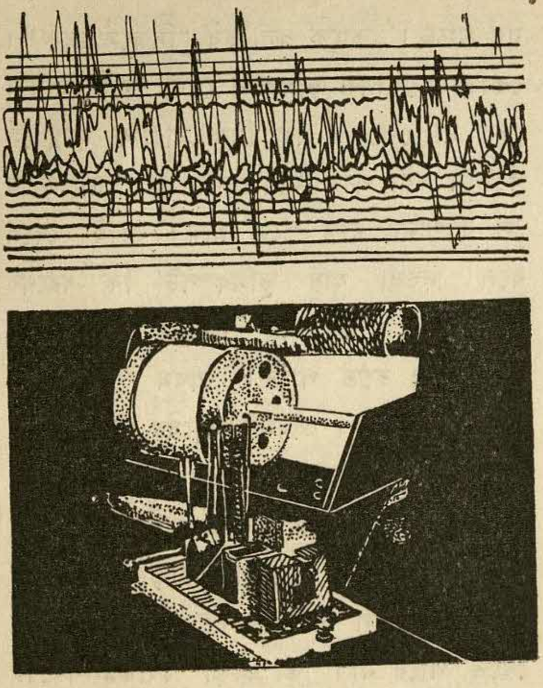
বিজ্ঞানীদের মতে এই রকম ভাবেই পৃথিবীর ভিতরকার অনেক খবর ওপরে বসেই যন্ত্র দিয়ে জানা যেতে পারে, তার জন্য ভিতরে নামবার কোন দরকার নেই।

পৃথিবীর ভিতরটার যে বিবরণ আমরা এর আগে দিয়েছি তা থেকেই বোঝা যায় ও জায়গাটা প্রায় সর্বদাই টলমল করছে, একটুও স্থির নেই। পৃথিবীর ভিতরকার এই টলমল অবস্থা থেকেই হয় ভূমিকম্প। এই টলমল যখন খুব বেশী হয়—সোজা কথায় যখন কাঁপুনির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় তখনই আমরা টের পাই যে মাটি কাঁপছে, অর্থাৎ ভূমিকম্প হচ্ছে। কাঁপুনি যদি খুব মৃদু হয় তা হলে তা সহজে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সেটাও যে আসলে ভূমিকম্প তাতে সন্দেহ নেই। এ ধরণের ভূমিকম্প প্রায় প্রতিনিয়তই ঘটছে পৃথিবীর ভিতরে।

এই ভূমিকম্প মাপবার জন্য এক রকম যন্ত্র আছে। তাকে বলা হয় "সিজ্‌মোগ্রাফ্"। কোথাও কোনও ভূমিকম্প দেখা দিলে আমরা টের না পেলেও এই সিজ্‌মোগ্রাফ্ যন্ত্রে সে কাঁপুনি ধরা পড়ে আর একটা কাগজের গায়ে সে কাঁপুনির দাগ পড়ে যায়। তাই দেখে বলে দেওয়া যায় ভূমিকম্পটা কি ধরণের হয়েছে। ভূমিকম্পের কাঁপুনি সাধারণতঃ দু' ধরণের হতে পারে। প্রথম পর্যায়ের ও দ্বিতীয় পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ের কাঁপুনি খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে এবং তরল পদার্থের ভিতর দিয়েও বয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাঁপুনি কিন্তু অত তাড়াতাড়ি ছড়ায় না, আর তরল পদার্থের ভিতর দিয়েও বয়ে যেতে পারে না। তা ছাড়া বিভিন্ন ধরণের পাথরের ভিতর দিয়ে যাবার সময়ও তাদের তফাৎটা বোঝা যায়। তাই সিজ্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে এই দুই পর্যায়ের কাঁপুনি পরীক্ষা করেই বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারেন ঐ কাঁপুনি কিসের ভিতর দিয়ে আসছে, কতটা দূর থেকে আসছে, আসবার পথে কি কি বাধা পেরিয়ে আসতে হয়েছে—ইত্যাদি অনেক কিছু। আর তাই থেকেই পৃথিবীর ভিতরকার রহস্যও অনেকটা জানাজানি হয়ে গেছে।

পৃথিবীটা একটা মস্ত বড় চুম্বক

পৃথিবী সম্বন্ধে আর একটা দরকারী কথা এবং মজার কথা এই প্রসঙ্গে আবার বলে নেই। চুম্বক লোহা, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় "ম্যাগ্‌নেট্", তোমরা সকলেই দেখেছ। চুম্বকের সামনে যদি খানিকটা লোহার গুঁড়ো (বড় চুম্বক হলে বড় লোহার টুকরোও)

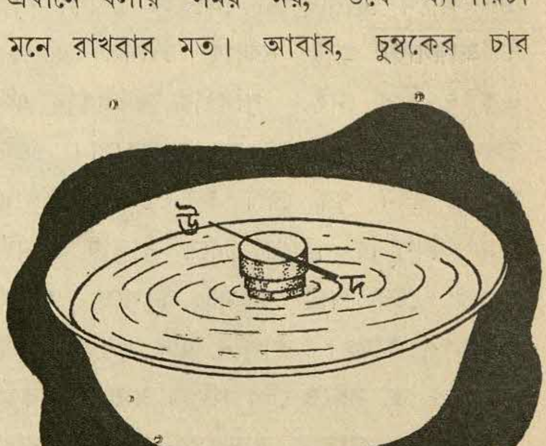


নীচে সিজ্মোগ্রাফ্ যন্ত্র; ওপরে কাগজের গায়ে ভূমিকম্পের কাঁপুনি ধরা পড়েছে।

এনে ধরা যায় তা হলে চুম্বক সে লোহার গুঁড়ো বা টুকরোকে টেনে ধরে আর সেগুলো সার বেঁধে চুম্বকের দুই মাথার দিকে চলে যায়। অর্থাৎ চুম্বকের একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে—যাকে বলা যায় চৌম্বক শক্তি বা "ম্যাগ্‌নেটিক পাওয়ার",—আর সেটা রয়েছে চুম্বকের চারদিকের বিশেষ খানিকটা জায়গা ঘিরে। সবচেয়ে বেশী দুই মাথায়।

শুধু এই-ই নয়। একটা সরু চুম্বকের সূচ যোগাড় করে (সাধারণ সূচকেও চুম্বকের গায়ে কয়েকবার ঘষে নিয়ে তাকে চুম্বকের সূচে পরিবর্তিত করা যায়, ঘষতে হবে কিন্তু বার বার একই দিকে) যদি আলতো ভাবে সেটা একটা কর্কের ছিপির ওপর বসিয়ে দাও আর সে ছিপিটা এক গামলা জলে ভাসিয়ে রাখ, তা হলে দেখবে, সূচ-সমেত ছিপিটা যে ভাবেই, যে দিকে মুখ করেই ঘুরিয়ে দেওয়া যাক না কেন, —শেষ পর্যন্ত সূচটার এক মাথা উত্তর দিকে, অপর মাথা দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকবে। অর্থাৎ কোন চুম্বককে যদি তার ইচ্ছেমত নড়াচড়ায় বাধা না দেওয়া যায় তা হলে তার একটা মাথা সর্বদাই উত্তরমুখী হয়ে থাকে, অন্য মাথা থাকে দক্ষিণমুখী হয়ে। চুম্বকের ঐ দুই মাথাকে তাই বলা হয় চুম্বকের দুই মেরু—উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু।

এবারে যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম। আমাদের এই পৃথিবীটাও আসলে একটা বিরাট চুম্বক। এরও দুই মাথা—অর্থাৎ দুই মেরু সর্বদা উত্তর আর দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে—যদিও আসল চৌম্বক মেরু আর পৃথিবীর অর্থাৎ ভৌগোলিক মেরু ঠিক এক জায়গায় নয়—বেশ খানিকটা তফাতে। তবে ঐ দূরত্বটা সর্বদাই সমান। এর কারণ এখানে বলার সময় নয়, তবে ব্যাপারটা মনে রাখবার মত। আবার, চুম্বকের চার

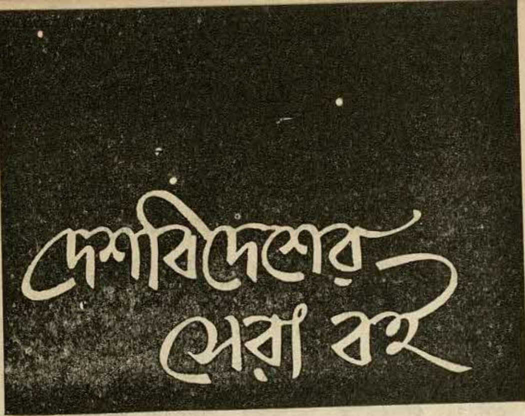


চুম্বকের সূচের দু'মাথা সর্বদাই উত্তর আর দক্ষিণমুখী হয়ে থাকবে।

দিক্ ঘিরে যেমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে —যাকে বলা হয়েছে চৌম্বক শক্তি, আর বিশেষ করে চুম্বকের দুই মেরুর দিকে এই শক্তি যেমন খুব বেশী, তেমনি পৃথিবীর চার দিকেও রয়েছে একটা আকর্ষণী শক্তি বা চৌম্বক শক্তি আর সেটা রয়েছে পৃথিবীর চারদিকে বিশেষ খানিকটা জায়গা ঘিরে। আবার পৃথিবীর এই চৌম্বক শক্তি সবচেয়ে বেশী রয়েছে পৃথিবী-চুম্বকের দুই মাথায়—উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে। পৃথিবীর (এবং চুম্বকেরও) চার দিক্‌কার ঐ জায়গাটুকুকে বলা হয় তার 'চৌম্বক এলাকা' বা ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ড।

এর আগে তোমাদের অরোরার কথা বলতে গিয়ে (পৃঃ ১৭) বলেছি পৃথিবীর দুই মাথায় কেমন করে সূর্য-থেকে-ছিটকে-আসা বিদ্যুৎ-কণা বা ইলেক্‌ট্রন এসে পড়ে আর মেরুর হাল্কা বাতাসে এক অদ্ভুত রঙ্গিন আলোর সৃষ্টি করে। এখন বুঝতে পারছ বোধ হয়, বিদ্যুৎ-কণাগুলোর বিশেষ করে বেছে বেছে ঐ দুই মেরুর ওপরই এসে পড়ার কারণ আর কিছুই নয়—কারণ পৃথিবীর এই চৌম্বক শক্তি। হাল্কা বিদ্যুৎ-কণা পৃথিবীর কাছে এলেই পৃথিবী-চুম্বকের টানে সেগুলো তার দুই মাথায় গিয়ে জড় হয়—যেখানে এই চৌম্বক শক্তি সবচেয়ে বেশী।

কিন্তু পৃথিবীর এই রকম চৌম্বক শক্তি পাওয়ার কারণ কি? কারণ নিশ্চয়ই একটা আছে। বিজ্ঞানীরা কয়েকটি কারণের কথা বলছেন, তার মধ্যে যে কারণটা সবচেয়ে সমীচীন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই ঃ পৃথিবীর ভিতরে রয়েছে নানা রকম ধাতু আর পাথর—কতক তরল, কতক না-তরল না-জমাট ইত্যাদি। তাদের উত্তাপও সর্বত্র এক রকম নয়—কোথাও অত্যন্ত বেশী, কোথাও তার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। আবার পৃথিবী নিরন্তর ঘুরপাক খাচ্ছে, তার ভিতরকার ঐ সব তরল এবং না-তরল উপাদান-গুলোও সেই সঙ্গে নড়াচড়া খাচ্ছে। এই সমস্ত মিলিয়ে পৃথিবী হয়ে দাঁড়িয়েছে এক বিরাট বিদ্যুৎশক্তির ভাণ্ডার। প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর অভ্যন্তরে এই বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে আর সেই বিদ্যুৎ পৃথিবীর ভিতরকার ঐ সব নানা অংশের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত বয়ে চলেছে। বিদ্যুতের সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দেখা গেছে যেখানেই চৌম্বক শক্তি সেখানেই বিদ্যুতের স্রোত থাকে, আবার যেখানেই বিদ্যুতের স্রোত দেখা যায় সেখানেই চার পাশে দেখা দেয় একটা চৌম্বক এলাকা। সুতরাং পৃথিবীর ভিতরকার বিদ্যুৎ-প্রবাহই যে পৃথিবীকে চুম্বকে পরিণত করার জন্য প্রধানতঃ দায়ী—এই সিদ্ধান্তটাই সবচেয়ে সঙ্গত বলে মনে হয়।



কথাসরিৎ-সাগর

প্রাচীন সংস্কৃত কথাসাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে "কথাসরিৎ-সাগর"। সোমদেব ভট্ট নামে এক পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় এটি রচনা করেন—অনুমান একাদশ শতাব্দীতে। এর গল্পগুলি কিন্তু তাঁর নিজের নয়। তাঁরও অনেক আগে "বৃহৎকথা" নামে একখানি বিরাট বই লিখে গিয়েছিলেন গুণাঢ্য। কিন্তু সে বইখানার ভাষা ছিল পিশাচ-ভাষা অর্থাৎ কোন অনার্য ভাষা। সোমদেব তারই থেকে গল্পগুলো নিয়ে সেগুলো সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করে তাঁর কথাসরিৎ-সাগর রচনা করেন।

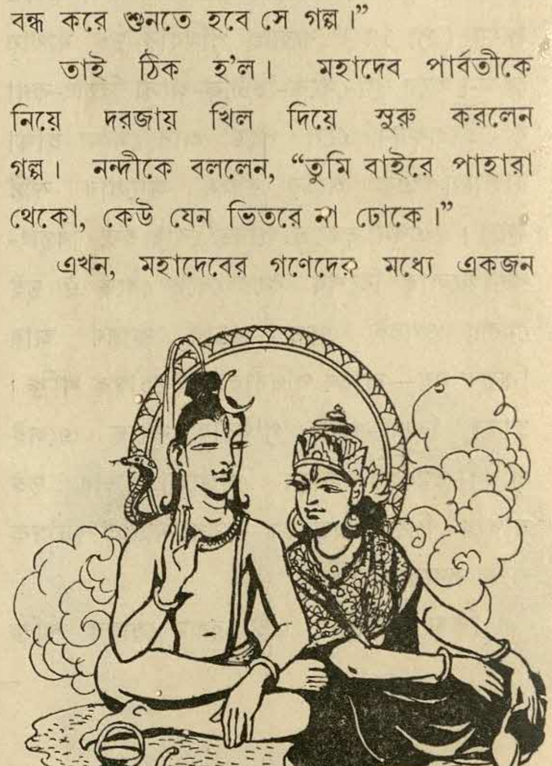
কথাসরিৎ-সাগর নাম কেন হ'ল? নানা জায়গা থেকে সরিৎ অর্থাৎ জলধারা এসে যেমন সাগরে গিয়ে মেশে, তেমনি এই গল্পসাগরেও অসংখ্য 'কথা'—কিনা গল্পের সরিৎ নানা জায়গা থেকে এসে মিশেছে এবং সমস্তটা মিলে একটা সাগরের মত রূপ পেয়েছে। সাগরের মতই বিরাট গ্রন্থ কথাসরিৎ-সাগর। বইটি মোট ১৮টি ভাগে ভাগ করা—সেগুলোকে বলা হয় লম্বক। প্রত্যেকটি লম্বক অজস্র গল্প বা আখ্যায়িকায় ঠাসা। অথচ এই কথাসরিৎ-সাগর নাকি মূল গ্রন্থের মাত্র সাত ভাগের এক ভাগ। গুণাঢ্য প্রথম যে বইটি লেখেন তাতে নাকি ছিল সাত লক্ষ শ্লোক। তার ছয় লক্ষই নষ্ট হয়ে যায়, বাকি এক লক্ষ শ্লোকই 'বৃহৎকথা' নামে পরিচিত আর সেই এক লক্ষ শ্লোকই সোমদেব ভট্টের কথা-সরিৎ-সাগরের উপাদান। এই বিরাট গ্রন্থ রচনার যে কাহিনী ওতে দেওয়া আছে সেটি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি সরস। ভূমিকার সেই গল্পটি এখানে তুলে দিচ্ছি:

একদিন পার্বতী মহাদেবকে বললেন, "আমাকে একটি গল্প শোনাও। এমন গল্প বলতে হবে যা এর আগে কেউ কখনও শোনে নি।"

মহাদেব বললেন, "বেশ। কিন্তু তুমি ছাড়া সে গল্প আর কাউকে শোনাতে চাই না। দরজা বন্ধ করে শুনতে হবে সে গল্প।"

তাই ঠিক হ'ল। মহাদেব পার্বতীকে নিয়ে দরজায় খিল দিয়ে সুরু করলেন গল্প। নন্দীকে বললেন, "তুমি বাইরে পাহারা থেকো, কেউ যেন ভিতরে না ঢোকে।"

এখন, মহাদেবের গণেদের মধ্যে একজন



মহাদেব গল্প সুরু করলেন।

ছিলেন পুষ্পদন্ত। তিনি কি কাজে ভিতরে যাচ্ছিলেন, নন্দী তাঁকে সব কথা বলে ভিতরে যেতে বারণ করলেন। মহাদেব পার্বতীকে গোপনে গল্প বলছেন আর সে গল্প কেউ শুনতে পাবে না—এ কথা শুনে কিন্তু পুষ্পদন্তের ভারী লোভ হ'ল গল্পটা শুনবার। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে তিনি যোগবলে অদৃশ্য থেকে গল্পটা শুনে নিলেন। বিদ্যাধরের গল্প—একটি নয়, পর পর সাতটি।

তা শুনলেন শুনলেন, তা নিয়ে কে আর তখন মাথা ঘামাচ্ছে? কিন্তু সে গল্প তিনি তাঁর স্ত্রী জয়াকে বলে ফেললেন আর সেই থেকেই হ'ল যত গণ্ডগোল। কথায় বলে মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। পুষ্পদন্তের স্ত্রী জয়ার মুখ দিয়েই একদিন কথাটা ফাঁস হয় গেল। জয়া পার্বতীকে গল্পটা শোনাতে গেলেন। পার্বতী তো শুনে অবাক্, কেন না শিব বলেছেন এ গল্প পার্বতী ছাড়া আর কেউ কখনও শোনে নি। শিবকে সে কথা বলতেই শিব সব বুঝতে পারলেন আর সঙ্গে সঙ্গে রাগে জ্বলে উঠলেন। কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা পুষ্পদন্তের! তাঁর নিষেধ অমান্য করে গোপনে গল্প শুনে নিয়েছে সে! তক্ষুণি তিনি শাপ দিলেন, "তুমি পৃথিবীতে গিয়ে মানুষের ঘরে জন্ম নাও।"

পুষ্পদন্তের বন্ধু ছিলেন মাল্যবান্। তিনি বন্ধুর হয়ে বলতে গেলে উল্টে তাঁকেও শিব শাপ দিলেন, "তোমাকেও মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে।"

দুই বন্ধুই শিবের শাপে পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করলেন। পুষ্পদন্ত হলেন কৌশাম্বী নগরের বররুচি (বা কাত্যায়ন), আর মাল্যবান্



রাণীর দিকে নাড়ু ছুঁড়তে সুরু করে দিলেন।

হলেন প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা সাতবাহনের সভাসদ্ গুণাঢ্য।

এখন, এই সাতবাহন রাজা লেখাপড়ার,—বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্যের, বিশেষ ধার ধারতেন না। রাজার অনেক রাণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারী বিদুষী। একদিন রাজা রাণীদের নিয়ে জলে নেমে স্নান করছেন, মজা করবার জন্য রাণীদের গায়ে বারে বারে জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। এতে সেই বিদুষী রাণী হঠাৎ সংস্কৃতে বলে উঠলেন, "মোদকৈঃ পরিতাড়য়।" মা উদকৈঃ সন্ধি করলে হয় মোদকৈঃ। অর্থাৎ জল ছিটিয়ে মেরো না। কিন্তু মূর্খ রাজা মোদক বলতে মিঠাই-ই চেনেন, তিনি তাড়াতাড়ি কতকগুলি নাড়ু আনিয়ে রাণীর দিকে তাই ছুঁড়তে সুরু করে দিলেন। রাণী তো প্রথমটা অবাক্, তারপরই ব্যাপারটা

বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বললেন, "মহারাজ, তুমি দেখছি একেবারেই মূর্খ! সামান্য একটা সংস্কৃতের সন্ধিও বোঝ না! আমি তোমাকে জল ছিটোতে বারণ করলাম, আর তুমি কিনা কতকগুলি নাড়ু এনে ছুঁড়তে লাগলে!"

রাণীর কথা শুনে রাজা সাতবাহনের ভারী অপমান বোধ হ'ল। মনে মনে ভাবলেন, ছিঃ, আমি একটা কি! আমার রাণী পর্যন্ত আমাকে মূর্খ বলে ঠাট্টা করে! তিনি সভা ছেড়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় নিলেন। সভায় যান না, রাজকার্য করেন না, এমন কি কারো সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন না। দেখতে দেখতে রাজা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগলেন।



বেশ, তা যদি তুমি সত্যি পার⋯

এদিকে রাজা রাজসভায় না আসায় রাজ্যে নানা রকম গোলমাল দেখা দিল। ব্যাপার জানবার জন্য তখন গুণাঢ্য তাঁর এক সহকর্মী শর্ববর্মাকে নিয়ে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর মনঃপীড়ার কারণ জানতে চাইলেন। সাত-বাহন প্রথমটা কিছুই বলতে চান না। তখন শর্ববর্মা বুদ্ধি করে বললেন, "কিন্তু আমি যে স্বপ্ন দেখেছি আপনার মুখে সরস্বতী প্রবেশ করেছেন!"

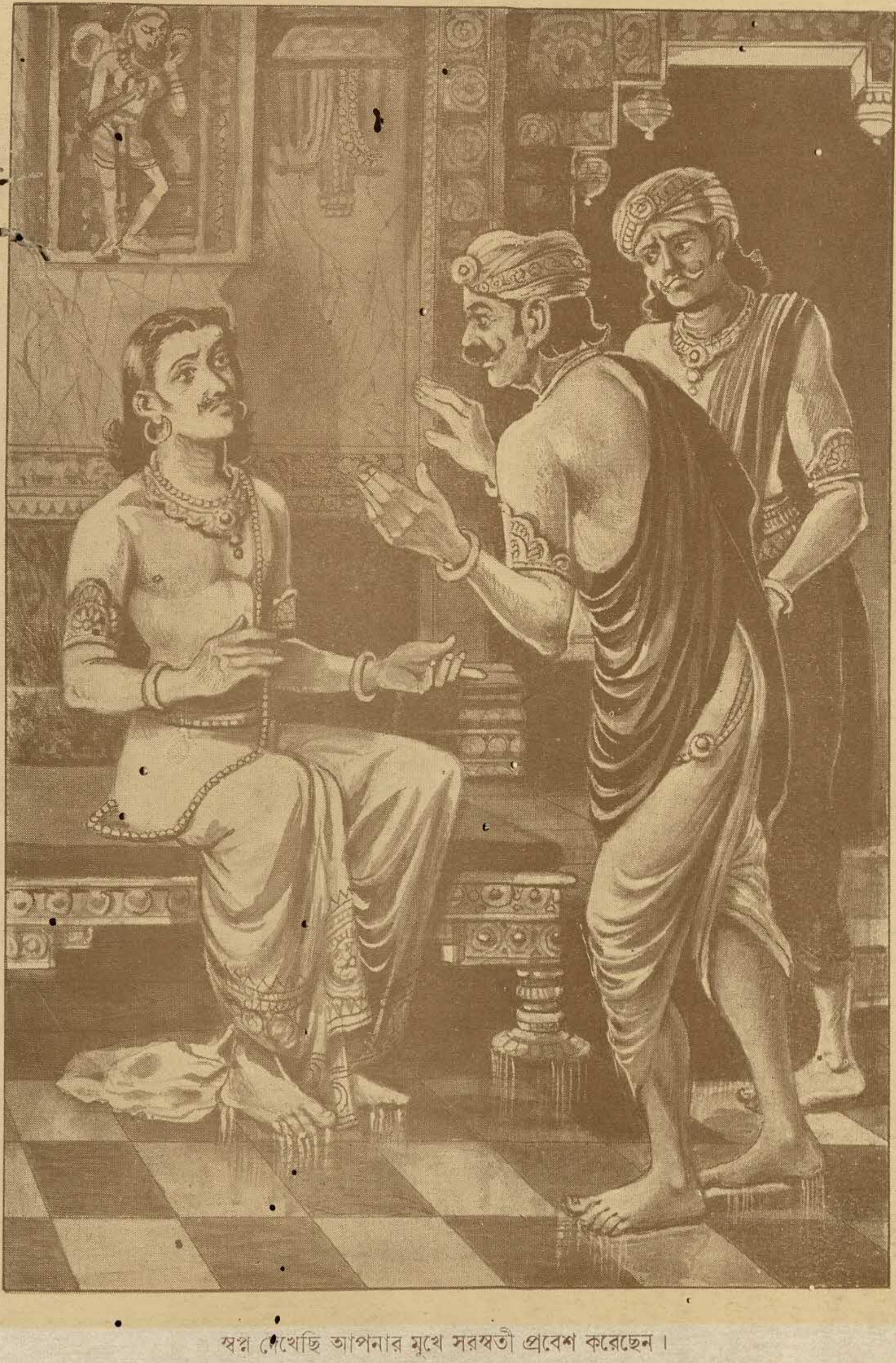
এবার সাতবাহন যেন আশার আলো দেখতে পেলেন একটা। সমস্ত খুলে বললেন তিনি; তার পর বললেন, "হ্যাঁ, সরস্বতীকেই আমার মুখে আনতে হবে। যে ভাবেই হোক আমাকে সংস্কৃত শিখতে হবে। আপনারা বলুন, কতদিনে আমি সংস্কৃত শিখতে পারি?"

গুণাঢ্য বললেন, "সকল শাস্ত্রের মূল হচ্ছে ব্যাকরণ, তা শিখতে বারো বছর লাগে। কিন্তু আমি আপনাকে তা ছ' বছরে শিখিয়ে দেব।"

তখন শর্ববর্মা বললেন, "কিন্তু রাজা সুখী লোক, তিনি তো আর ছ' বছর পরিশ্রম করতে পারবেন না। আমি ওঁকে ছ' মাসেই ব্যাকরণ শিখিয়ে দিতে পারি।"

শর্ববর্মার এই অত্যুক্তি শুনে গুণাঢ্য চটে উঠে বললেন, "বেশ, তা যদি তুমি সত্যি পার তা হলে আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং চলতি দেশভাষা—তিনটে ভাষাই ত্যাগ করব এই প্রতিজ্ঞা করছি।"

শর্ববর্মাও বললেন, "আর আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, যদি না পারি তা হলে বারো বছর ধরে তোমার ঐ জুতো জোড়া মাথায় করে রাখব।"



স্বপ্ন দেখেছি আপনার মুখে সরস্বতী প্রবেশ করেছেন।

—কথাসরিৎ-সাগর—পৃঃ ৬২

প্রতিজ্ঞা করেই শর্ববর্মা বনে গিয়ে কার্তিকের তপস্যা আরম্ভ করলেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে কার্তিক তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন,—"সিদ্ধো বর্ণ সমাম্নায়ঃ।" তারপর বললেন, "বৎস, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। আমি তোমাকে যে নতুন সূত্রটি বললাম এর নাম কলাপ বা কা-তন্ত্র। এরই সাহায্যে তুমি সাতবাহনকে ছ' মাসের মধ্যে সংস্কৃত শিখিয়ে দিতে পারবে।"

আর, সত্যি তাই হ'ল। কলাপ ব্যাকরণের সাহায্যে শর্ববর্মা ছ' মাসের মধ্যে সাতবাহনকে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত করে তুললেন। তখন গুণাঢ্য আর কি করেন, তাঁকেও তো প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে! কিন্তু তিনটি ভাষার একটিও ব্যবহার না করতে পারলে আর কি করে লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়? তিনি মৌন-ব্রত নিয়ে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এদিকে পুষ্পদন্ত যে কৌশাম্বীতে বররুচি-কাত্যায়ন হয়ে জন্মেছেন সে কথা আগেই বলেছি। ক্রমে তিনি মগধের রাজা নন্দের মন্ত্রিত্ব লাভ করলেন। মন্ত্রী হবার পর একদিন তিনি বিন্ধ্যারণ্যে গেছেন বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পূজো দিতে, দেবী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, "এই বনে কাণভূতি নামে এক পিশাচ থাকে, তার সঙ্গে দেখা কর।"

স্বপ্নাদেশ পেয়ে বররুচি বহু কষ্টে কাণভূতিকে খুঁজে বার করলেন্। কাণভূতি তাঁকে তার পিশাচ হবার কাহিনী বল্‌ল। বল্‌ল, আসলে সে ছিল কুবেরের অনুচর সুপ্রতীক। স্থূলশিরা নামে এক রাক্ষসের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু কুবেরের সেটা পছন্দ হয় নি, তাই তিনি তাকে শাপ দেন যে যক্ষ হয়ে রাক্ষসের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর জন্য তাকে এই বনে পিশাচ হয়ে বাস করতে হবে। "এই ভীষণ শাপ আমি সহ্য করতে পারব না বুঝে তাঁর পায়ে ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করায় শেষে তিনি বলেন, শিবের গণ পুষ্পদন্ত শাপগ্রস্ত হয়ে যদি কখনও তোমার কাছে আসে তা হলে তার পূর্বকথা মনে পড়বে। তোমাকে সে যদি মহাদেবের সেই গল্প—সেই বৃহৎকথা শোনায় তা হলে তার মুক্তি হবে, আর তুমি সেই গল্প শুনে যদি কখনও পুষ্পদন্তের বন্ধু মাল্যবান্‌কে তা শোনাতে পার তা হলে তোমারও মুক্তি। মাল্যবানের মুক্তি হবে যখন সে ঐ গল্প জগতে প্রচার করবে তখন।"

কাণভূতির কথা শোনা মাত্র, আশ্চর্য, বররুচির সমস্ত পূর্বকথা মনে পড়ল। তিনি বললেন, "আমিই সেই শাপগ্রস্ত পুষ্পদন্ত। তোমাকে সেই গল্প শোনাচ্ছি।" এই বলে বররুচি সেই পিশাচকে সাত লক্ষ শ্লোকের সেই বৃহৎকথা শোনালেন, এবং গল্প শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আবার পুষ্পদন্ত হলেন।

এবার আবার গুণাঢ্যের কথায় আসা যাক্। মৌনব্রত নিয়ে দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে গুণাঢ্যও শেষে একদিন বিন্ধ্যারণ্যে এসে হাজির হলেন। সেখানে তিনিও দেবীর পূজো দিলেন। দেবী তাঁকেও স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, "এই বনে কাণভূতি নামে এক পিশাচ বাস করে, তুমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর। সে যদি তোমাকে বৃহৎকথার

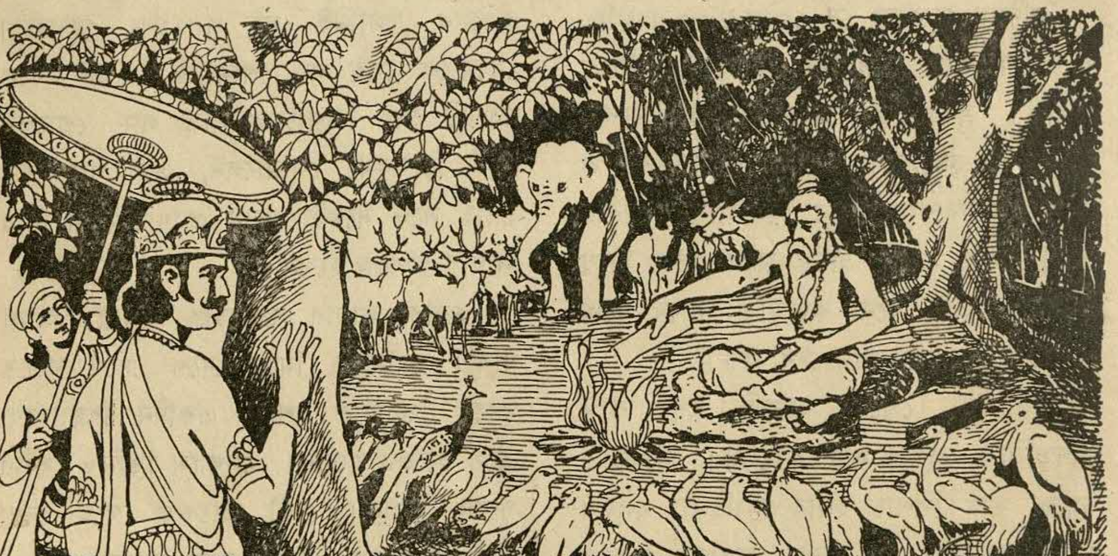
গল্প শোনায় তা হলে তার মুক্তি হবে, আর পরে সে গল্প প্রচার করলে তুমিও মুক্তি পাবে। তুমি আসলে শিবের গণ মাল্যবান্।"

কাণভূতিকে খুঁজতে খুঁজতে গুণাঢ্য এক জায়গায় গিয়ে দেখেন অনেকগুলো পিশাচ একত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে। গুণাঢ্য আড়ালে বসে তাদের কথা শুনতে লাগলেন এবং শুনে শুনে খানিকটা শিখেও ফেললেন। তার পর যখন কাণভূতির দেখা পেলেন তখন আর তার সঙ্গে কথা বলতে তাঁর কোন কষ্ট হ'ল না। কারণ তিনি তো শুধু সংস্কৃত, প্রাকৃত আর দেশ-ভাষাই ত্যাগ করেছেন, পিশাচ ভাষায় কথা বলতে তো আর কোন বাধা নেই!

কাণভূতি গুণাঢ্যকে পিশাচ ভাষায় সেই সাত লক্ষ শ্লোকের সাতটি গল্প শোনাল। গুণাঢ্য তা সঙ্গে সঙ্গে লিখে চললেন,—সেই পিশাচ ভাষাতেই। লিখতেই লেগে গেল সাত বছর। লিখবার জন্য ব্যবহার করা হ'ল গাছের ছাল। কিন্তু কালি? গুণাঢ্য নিজের গায়ের রক্ত দিয়ে সে অভাব পূর্ণ করলেন।

গল্প বলা শেষ হতেই কাণভূতি মুক্তি পেয়ে আবার সুপ্রতীক যক্ষ হয়ে কুবেরের কাছে চলে গেল। এবার গুণাঢ্যের পালা। গল্পটি জগতে প্রচার করলে তবেই তাঁর মুক্তি হবে,—তবেই তিনি আবার মাল্যবানে রূপান্তরিত হবেন।

কিন্তু কি ভাবে প্রচার করা যায়? অনেক ভেবে-চিন্তে গুণাঢ্য পুঁথিখানি—অর্থাৎ সেই বৃহৎকথা রাজা সাতবাহনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।—অনুরোধ, রাজা যেন ওটি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। গুণাঢ্য নগরের বাইরে এক দেবীমন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।



একটা করে পাতা পড়েন আর সেটা ছিঁড়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দেন।

কিন্তু রাজা সাতবাহন সে পুঁথির মর্ম বুঝলেন না। রেগে গিয়ে বললেন, "কি, সাত লক্ষ রসকষহীন শ্লোক, লেখা হয়েছে পিশাচ ভাষায়, তাও আবার রক্ত দিয়ে! ছ্যাঃ, এ বই আমি ছোঁবও না।"

দুঃখে, অভিমানে গুণাঢ্য ভেঙ্গে পড়লেন। শেষে ভাবলেন, কি হবে তা হলে এই পণ্ডশ্রমে? এ পুথি আমি পুড়িয়ে ফেলব।

বনের মধ্যে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে বসলেন গুণাঢ্য। একটা করে পাতা পড়েন আর সেটা ছিঁড়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দেন। শ্রোতা হচ্ছে বনের যত পশুপাখী। তারা আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিবারাত্র সেই অপরূপ গল্পকথা শোনে আর শোনে আর শোনে।

এদিকে রাজা সাতবাহন হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কি ব্যাপার? রাজবৈদ্য দেখে-টেখে বললেন, "শুকনো মাংস খাওয়ার দরুণই রাজার এই অসুখ হয়েছে।" শুকনো মাংস কেন? রাজবাড়ীর রাঁধুনেদের ডেকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। তারা বলল, "কি জানি মহারাজ, ব্যাধেরা রাজবাড়ীতে বন্য পশুর মাংস সরবরাহ করে। তারা আজকাল শুধু এই রকম মাংসই দিচ্ছে, আগের মত তাজা মাংস আর দিচ্ছে না।"

রাজা তখন ব্যাধদের ডেকে পাঠালেন। তারা হাতযোড় করে জানাল, "মহারাজ, আমাদেরও কোন দোষ নেই। বিন্ধ্যবনে কোত্থেকে এক ব্রাহ্মণ তপস্বী এসেছেন, তিনি বনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে রোজ পুঁথি পড়েন আর একখানি করে পাতা আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। সেই পুঁথিতে নাকি আশ্চর্য সব গল্প লেখা আছে! বনের পশুপাখীরা তা শুনবার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে সেখানে ভিড় করে। ঐ ভাবেই তারা গল্পের নেশায়, খাওয়াদাওয়া ত্যাগ করে, অস্থিচর্মসার হয়ে গেছে। গায়ের মাংস শুকিয়ে গেছে তাদের। সেই মাংসই দিতে হচ্ছে মহারাজকে। অন্য মাংস কোথায় পাব?"

ব্যাধদের মুখে এই আশ্চর্য কাহিনী শুনে রাজা সাতবাহন অসুস্থ দেহ নিয়েই বনে এসে হাজির হলেন। এসে দেখেন তপস্বী ব্রাহ্মণ আর কেউ ন'ন—তাঁরই ভূতপূর্ব সভাসদ্—তাঁরই মন্ত্রী গুণাঢ্য। গুণাঢ্যের কাণ্ড দেখে ভারী অনুশোচনা হ'ল তাঁর।

রাজা বললেন, "আমরই ভুল হয়েছিল গুণাঢ্য! আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। যাই হোক্, তুমি আমার অনুরোধ রাখ, পুঁথিটা আর পুড়িও না। আমাকে দাও।"

গুণাঢ্য তখন নিজের আসল পরিচয় দিয়ে বললেন, "মহারাজ, এই সাত লক্ষ শ্লোকের বৃহৎকথার ছ' লক্ষ শ্লোকই যে আমি পুড়িয়ে ফেলেছি, মাত্র এক লক্ষ অবশিষ্ট আছে! যাই হোক, আপনার অনুরোধ মত এই এক লক্ষ শ্লোকই আমি আপনাকে দিচ্ছি। আমার শিষ্যেরা আপনাকে এর ভাষা—অর্থাৎ পিশাচ ভাষা শিখিয়ে দেবে।"

এর পর রাজা সেই এক লক্ষ শ্লোকের পুথিই গুণাঢ্যের দুই শিষ্যের সাহায্যে জগতে প্রচার করলেন। গুণাঢ্যও শাপমুক্ত হলেন।

গুণাঢ্যের সেই বৃহৎকথার গল্প অবলম্বন করেই সোমদেব ভট্ট সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বিখ্যাত কথাসরিৎ-সাগর গ্রন্থ রচনা করেন—সে কথা তো আগেই বলেছি।



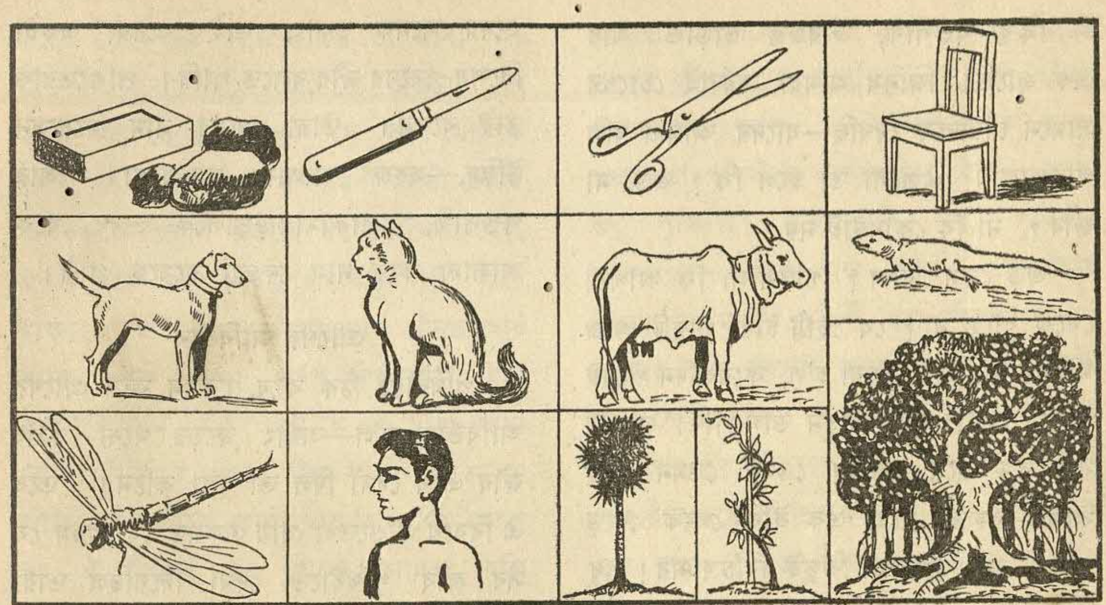
গাছপালার কথা

জড় আর জীব

সীমাহীন অনন্ত মহাকাশ, তারই মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের মত ঘুরপাক খাচ্ছিলেন আমাদের সূর্যদেব। হঠাৎ তাঁর দেহ থেকে একটা টুকরো ছিটকে বেরিয়ে এসে কি ভাবে আমাদের মাতা বসুন্ধরা অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি হ'ল সে গল্প তোমরা মহাকাশের কথা এবং পৃথিবীর কথায় পড়েছ। জন্মের পর পৃথিবী ক্রমাগত ঠাণ্ডা হতে হতে তার গায়ে জেগে উঠল সমুদ্র আর ডাঙ্গা। কত লক্ষ কোটি বছর আগে সে ঘটনা ঘটেছিল তার হিসেব করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা হিমসিম খেয়ে গেছেন।

সে যাই হোক, আদ্যিকালের সেই পৃথিবীতে কিন্তু জীবনের কোন লক্ষণ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তার সমস্তটাই ছিল তখন জড়—অর্থাৎ পাথর, মাটি, ধূলো ইত্যাদি দিয়ে গড়া। জল আর বাতাস তো ছিলই।

'জড়' কথাটির সঙ্গে আমরা এখন পর্যন্ত ভাল করে পরিচিত হই নি। তাই জড় আর জীব বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে একটু বলে নেওয়া ভাল। আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে আছে নানা রকমারি জিনিস। ইট, পাথর, বাড়ীঘর, টেবিল, চেয়ার, বই, ছুরি, কাঁচি, জামা, কাপড় ইত্যাদি। আশেপাশে রয়েছে নানান্ ধরণের গাছপালা, কুকুর, বেড়াল, গরু, ছাগল, কাক, চিল প্রভৃতি পশুপাখী, আরশোলা, মাকড়সা, পিপড়ে প্রভৃতি পোকামাকড়, আরও কত কি! এদের মধ্যে কতকগুলি আছে যারা খাওয়াদাওয়া করে না, কুকুর-বেড়ালের মত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে না, আবার তাদের বাচ্চাও হয় না। এক টুকরো ইটকে তাজা রাখতে কখনও খাবার দিতে হয় কি? একটা ইট তৈরী করার পর কখনও বয়সের সঙ্গে বেড়ে বেড়ে ছোট থেকে বড় হয় কি? ইটের বাচ্চা হচ্ছে বা একটা ইট থেকে আরও নতুন নতুন ইট গজাচ্ছে' এ কথা বললে তোমরা আমাকে পাগলা-গারদে পাঠাতে চাইবে। তেমনি কোন



জড় ও জীব

ইট আপনা থেকে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে এমনটাও কখনও হয় না। ইটের মত টেবিল, চেয়ার, ছুরি, কাঁচি, বইপত্তর প্রভৃতি অসংখ্য জিনিসের সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। এই ধরনের জিনিস-গুলিকেই বলা হয় 'জড়' বা অচেতন পদার্থ, অর্থাৎ যাদের চেতনা নেই।

অথচ কুকুর-বেড়াল, কাক-চিল, এমন কি ছোট্ট একটা পিঁপড়েকেও দেখ, জন্মের পর ওরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেমন বেড়ে উঠছে! অবশ্য সে বাড়ারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। ছোট্ট বেড়ালছানা যখন জন্মাল, ভাল করে নড়তে-চড়তে পারে না, চোখ ফোটে নি, শুধু কুঁই কুঁই করে। মাস খানেক যেতে না যেতেই দেখবে সে দিব্যি তোমাদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে খেলা করছে। আর বছর খানেক পরেই সে একটা পূরোপূরি বেড়াল—এই তাগড়াই চেহারা! তখন আর সে কুঁই কুঁই করে না, গোঁফ ফুলিয়ে ডাকে মিয়াঁও। তুমি খেতে বসলে সেখানে গিয়ে ঠিক হাজির হবে। একটা মাছের কাঁটা ফেলে দাও, কত খুসী হয়ে খাবে! এক ফোঁটা দুধ পেলে চক্ চক্ করে চাটবে। না দিলে চুরি করে খেতেও ছাড়বে না, কারণ তাকে টিকে থাকতে হলে খেতে হবেই। তার পরে দু'দিন পরে তার বাচ্চা হবে। একটা বেড়াল থেকে দেখা দেবে আরও নতুন নতুন বেড়াল। একটা পিঁপড়েও দেখ, খাবারের জন্য কী রকম দিশেহারা হয়ে ঘোরাফেরা করছে! তাকেও, বেঁচে থাকতে হলে, খাবার যোগাড় করতেই হবে। পিঁপড়েদেরও ডিম থেকে বাচ্চা হয়। কাজেই এদেরকে আমরা জড় বলতে পারি না, অচেতনও বলতে পারি না। এরা সবাই জ্যান্ত। এদেরই আমরা নাম দিয়েছি 'জীব'।

কিন্তু পশুপাখী, জীবজন্তু ছাড়াও আর এক জাতের জিনিস আমরা সর্বদাই চোখের সামনে চারদিকে দেখছি—যাদের আমরা বলি গাছপালা। এগুলো তা হলে কি? জড়, না জীব? না কি কোনটাই নয়?

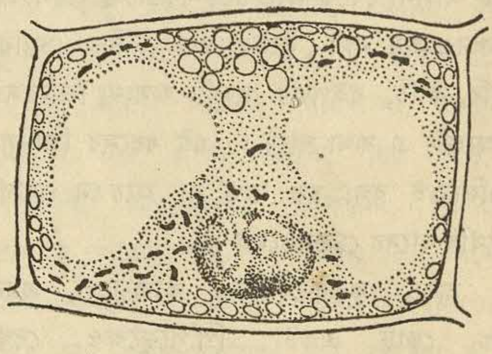
জড় কেন বলব? গাছপালা কি আপনা থেকে বাড়ে না? যে ছোট্ট চারা গাছটি আজ মাটিতে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল, কয়েকদিন পরেই দেখবে সেটা বেড়ে, নতুন ডাল-পাতা গজিয়ে কত বড় হয়ে গেছে! তেমন তেমন গাছ কয়েক বছরের মধ্যে এক ইঞ্চি থেকে বেড়ে ৪০।৫০ ফুট হওয়াও কিছুই বিচিত্র নয়! শুধু বয়সের সঙ্গে বাড়েই না, গাছপালারাও খায়। অবশ্য তোমার-আমার মত বাটি-ভর্তি দুধ নিয়ে তারা চুমুক দিয়ে খায় না বা ডাল-ভাত-চর্চড়ী নিয়ে চিবোয় না—কারণ তাদের মুখই নেই, কিন্তু তবু তারা খায়। আমরা সে খাওয়া চোখে দেখতে পাই না কিন্তু পরীক্ষা করলে সহজেই বুঝতে পারি। শিকড় দিয়ে মাটি থেকে রস টেনে গাছ তা থেকে খাবার যোগাড় করে, তেমনি পাতা দিয়ে বাতাস থেকেও খাদ্য সংগ্রহ করে। তবে জীবজন্তুর মত গাছেরা নড়েচড়ে বেড়াতে পারে না, যেখানে একবার গজাল, সারা জীবন সেখানেই থেকে যাবে।

অন্যান্য জীবের মত গাছেদেরও বাচ্চা হয়—বংশবৃদ্ধি হয়। একটা গাছের বীচি থেকে কত গাছ গজায়! ওরাই তো তা হলে গাছের বাচ্চা!

কাজেই আমরা গাছকে জড়ের দলে না ফেলে অবশ্যই জীবের দলে ফেলব। অর্থাৎ পশুপাখীর মত গাছেরাও জ্যান্ত। তবে হ্যাঁ, পশুপাখীদের সঙ্গে চেহারায় বা চালচলনে ওদের অনেক তফাৎ, তাই ওদের একটা বিশেষ ধরণের জীব বলতে পারি। পণ্ডিতেরাও তাই বলেন। তাঁরা ওদের নাম দিয়েছেন উদ্ভিদ,—সহজ বাংলায় গাছপালা। আর পশুপাখী, পোকামাকড়গুলিকে ওদের থেকে আলাদা করে নাম দেওয়া হয়েছে প্রাণী।

প্রাণের আবির্ভাব

পৃথিবীতে ঠিক কবে, কেমন করে প্রাণের আবির্ভাব হ'ল—অর্থাৎ জড়ের মধ্যে হঠাৎ জীব এসে দেখা দিল তা বলা কঠিন। তবে এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা প্রায় একমত যে প্রথম যে সব জীব পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল তারা কিন্তু প্রাণী নয়, গাছপালা। অবশ্য এখন আমরা সাধারণতঃ যে সব গাছপালার সঙ্গে



জীবন্ত কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্

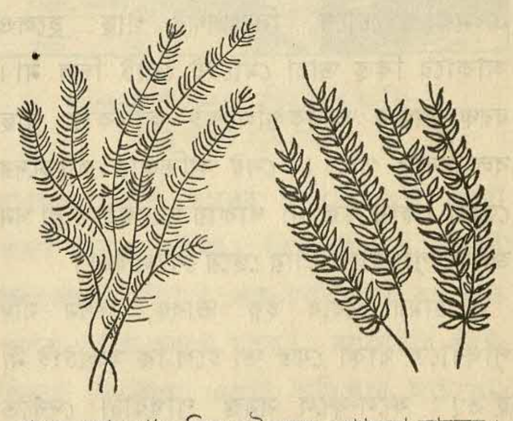
পরিচিত আদ্যিকালের সেই গাছপালার সঙ্গে এদের কোনই মিল নেই। খুব নিম্নশ্রেণীর গাছ পালা,—শ্যাওলা বা ঐ জাতীয় যে সব গাছ,—তারাই এসেছিল প্রথম। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন প্রত্যেক জীব অর্থাৎ জ্যান্ত প্রাণী বা গাছপালার মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের জিনিস আছে যাকে বলা হয় জীবন্ত পদার্থ বা 'প্রোটোপ্লাজ্‌ম্'। এই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ প্রথম কি

ভাবে তৈরী হয় আজ পর্যন্ত তা জানা যায় নি। অনেকের মতে এটাকে একটা দৈব ঘটনা বলা যেতে পারে। যে সব মৌলিক পদার্থ বা এলিমেন্ট দিয়ে পৃথিবী তৈরী তারই কতকগুলো কোন রকমে, হয়তো দৈবক্রমেই, একত্র হয়ে এই জীবন্ত পদার্থটি সৃষ্টি করে থাকবে। এই প্রোটোপ্লাজ্‌মের ভিতরকার সমস্ত রহস্য এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বার করতে পারেন নি। এমন কি ওর মধ্যে কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থ ঠিক কতটা পরিমাণে আছে তাও সঠিক জানা যায় নি। কি থেকে ওর ঐ বিশেষ গুণ, যাকে আমরা বলি জীবনীশক্তি, এল—তাও এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। এ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা কথা বলেছেন। একজন বলেছিলেন—চুম্বকের গুণ যেমন লোহাকে টানা, তেমনি প্রোটোপ্লাজ্‌মের গুণ হচ্ছে এই অদ্ভুত জীবনীশক্তি। মানুষ চুম্বকের রহস্য আবিষ্কার ক'রে কৃত্রিম উপায়ে চুম্বক তৈরী করতে শিখেছে কিন্তু প্রোটোপ্লাজ্‌মের রহস্য আবিষ্কার করতে না পারায় কৃত্রিম ভাবে ও জিনিসটি তৈরী করতে পারে নি। যদি কোন দিন পারে তবে হয়তো বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটরীতেই একদিন কৃত্রিম জীবের সৃষ্টি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

কিন্তু যা এখনও হয় নি তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আবার আমাদের পুরোনো কথায় ফিরে আসা যাক।

আদিম যুগের গাছপালা

প্রথম যুগের গাছপালারা সবই প্রায় ছিল শ্যাওলা জাতের বা তারই জাতভাইদের দলের। একেবারে প্রথমে হয়তো একটা কোষ নিয়েই তাদের জীবন সুরু হয়েছিল এবং সে জীবন সুরু হয়েছিল জলে। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ তখন তো পৃথিবীতে জলই ছিল বেশী। আর, শুধু পৃথিবীর চেহারাটাই নয়, পৃথিবীর আবহাওয়াও ছিল অন্য রকম। এখনকার তুলনায় তখনকার পৃথিবী ছিল অনেক গরম। সমুদ্রের জল সর্বদাই বাষ্প হয়ে এত বেশী আকাশে উড়ে যেত যে আকাশ সর্বদাই থাকত মেঘ আর কুয়াশায় ঢাকা। সে মেঘ—সে কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলোককে পৃথিবীতে পৌঁছতে বেশ বাধা পেতে হ'ত। আকাশে-বাতাসে সর্বত্রই তাই কেমন একটা ভ্যাপসা গুমোট—কেমন একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব লেগে থাকত। তখনকার বাতাসও এখনকার বাতাসের মত ছিল না। সে বাতাসে জলীয় বাষ্প ছিল যেমন প্রচুর, তেমনি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসও ছিল প্রচুর



প্রথম যুগের গাছ ছিল এই রকম—শ্যাওলা জাতের।

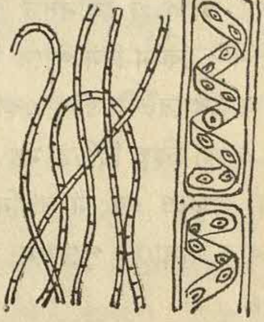
শ্যাওলা জাতীয় গাছ থেকে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য জলজ গাছ দেখা দিল, কিন্তু সেগুলোও আমাদের পরিচিত গাছগুলির মত নয়। তার পর ডাঙ্গা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ডাঙ্গাতেও



আদিম যুগের বনজঙ্গল—জলে আর ডাঙ্গায়

দেখা দিল তারা। ডাঙ্গায় তখন তো অন্য কোন জীবজন্তু দেখা দেয় নি—কাজেই এই সব গাছেরাই ছিল তখন ডাঙ্গার রাজা। আর এখনকার চোখে নিম্নশ্রেণীর গাছ হলেও আকারে কিন্তু তারা মোটেই ছোট ছিল না। বরঞ্চ তাদের অনেকগুলিকেই অতিকায় গাছ বলা যেতে পারে। সেই অতিকায় গাছেদের তেমন কোন শত্রু না থাকায় সহজেই তারা ঘন জঙ্গলে পৃথিবীকে প্রায় ছেয়ে ফেলেছিল।

তোমরা বোধ হয় ভাবছ, তখন যদি পৃথিবীতে থাকা যেত তা হলে কি মজাটাই না হ'ত! ফলে-ফুলে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে নিশ্চয়ই তপোবনের মত সুন্দর ছিল, আর না জানি কি মিষ্টিই ছিল সে সব গাছের ফল আর কি রঙ্‌চঙেই না ছিল তখনকার ফুলগুলি! কিন্তু মোটেই তা নয়। ফল আর ফুলের চিহ্নও ছিল না সে সব গাছে। আম, জাম, লিচু, নারকেল, কলা প্রভৃতি ফলের গাছ কিংবা গোলাপ, চামেলী, টগর, যুঁই—এ সব ফুলের গাছ সে যুগের পৃথিবীতে দেখাই দেয় নি। তখন যে সব গাছ ছিল তার অধিকাংশই এখন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। ২।৪টির বংশধর, যা এখনও



আদিকালের গাছের বংশধর—যা এখনও কিছু কিছু টিকে আছে।

টিকে আছে, তাদেরকে আমরা আজকাল নেহাৎ অপাংক্তেয় বলে তুচ্ছ করি—যেমন ধর ইকুই-

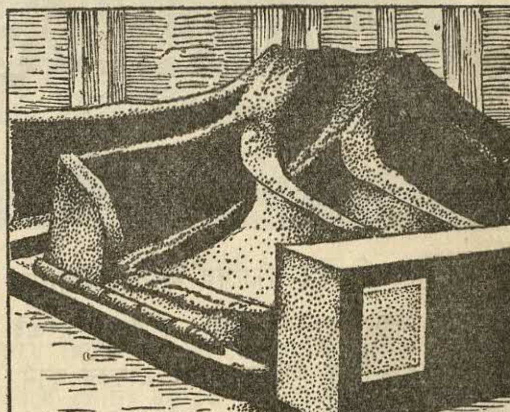

ফার্ন

জেটাম, সেলাজিনেলা, লাইকোপোডিয়াম্—এই সব জাতের গাছ। আর ছিল ফার্ন জাতীয় গাছ —প্রচুর। পাইন গাছেরও ২।৪টি পূর্বপুরুষকে তখন দেখা যেত।



১। লাইকোপোডিয়াম, ২। সেলাজিনেলা, ৩। ইকুইজেটাম

ইকুইজেটাম, সেলাজিনেলা বা লাইকোপোডিয়াম—এ সব গাছকে তোমরা হয়তো চেনই না! না চিনলে যাঁরা চেনেন তাঁদের কাছ থেকে চিনে নিও। প্রথম দু'টিকে তোমরা হয়তো বাড়ীর কাছেই—যদি কোথাও জলাজমি থাকে তার পাশে বা বাগানেও দেখতে পাবে। লাইকোপোডিয়াম্ পাবে উঁচু পাহাড়ী দেশে—যেমন ধর দার্জিলিং বা শিলং পাহাড়ে। ঐ, যা বলেছি, তুচ্ছ—অপাংক্তেয় এই সব গাছ,


অতিকায় লাইকোপোডিয়ামের গুঁড়ি—
এখন ফসিল হয়ে গেছে।

সাধারণ একটা ঘাসের চাইতে বেশী মর্যাদা ওদের আমরা দেই না। কিন্তু সে যুগে ওদেরই পূর্বপুরুষরা আকারে এক-একটা কত বড় হ'ত শুনলে তাক্ লেগে যাবে। ম্যাঞ্চেষ্টার মিউজিয়মে ঐ রকম একটা অতিকায় লাইকোপোডিয়ামের পাথুরে গুঁড়ি (ফসিল) যোগাড় করে রাখা হয়েছে। দেখলে মনে হবে বুঝি একটা বিরাট বট কিংবা অশ্বত্থ গাছের গুঁড়ি।

ফার্ন গাছ তোমরা অনেকেই দেখেছ এবং হয়তো চেন। ঢেঁকি-শাক নামে এক রকম

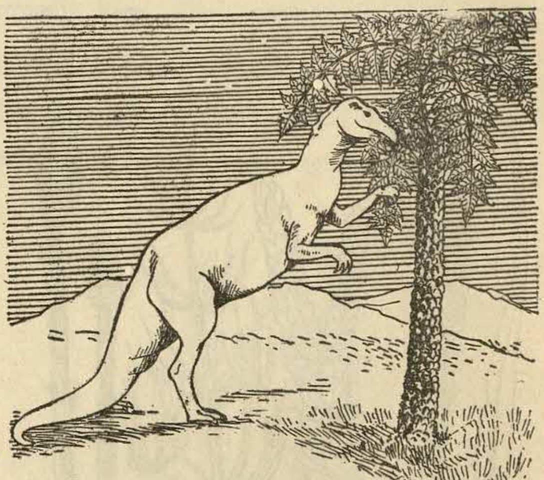


তালগাছের মত উঁচু অতিকায় ফার্ন গাছ—
এখন এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সুস্বাদু শাক দিয়ে তোমাদের মায়েরা উপাদেয় শাকের ঘণ্ট এখনও রান্না করেন। এই ঢেঁকি-শাকও কিন্তু আসলে এক জাতের ফার্ন। ফুলের তোড়া বাঁধবার সময়েও এই ফার্নের পাতা ব্যবহার করার রেওয়াজ আছে—ভারী সুন্দর কিনা পাতাগুলি দেখতে! কিন্তু এখনকার ফার্ন গাছ আর কত বড় হয়? বড় জোর ২।৩ হাত উঁচু। অবশ্য কোন কোন জায়গায় আরও উঁচু ফার্ন গাছ যে হয় না তা নয়, কিন্তু তাও তেমন কিছু নয়। কিন্তু সেই আদিম যুগের ফার্ন গাছগুলি হামেশাই তালগাছের মত বড় হ'ত আর সংখ্যায়ও হ'ত অজস্র। এখনকার বংশধরদের দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে সত্যি ওরা কত বড় বনেদী ঘরের সন্তান! এই সব জাতের গাছ—আজও যাদের ফুল-ফল হয় না—তারা কি ভাবে থাকে, কি ভাবে বংশ বিস্তার করে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

কোথায় গেল ঐ সব আদিম যুগের গাছ?

ঐ সব আদিম যুগের গাছ বেশীর ভাগই কি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এ প্রশ্ন তোমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। পণ্ডিতেরা এর কতকগুলি কারণ অনুমান করেন। প্রথমতঃ কালক্রমে অন্য জাতের গাছেরাও এসে ভিড় জমাতে লাগল চারদিকে। তাদের সঙ্গে ঠেলাঠেলিতে যাদের গায়ে জোর বেশী তারাই বেঁচে রইল, অনেকে কম-জোরী হওয়ায় ঐ ঘন জঙ্গলে ভিড়ের চাপে টিকতে পারল না—কেউ কেউ তো চাপের চোটেই মরতে লাগল। তারও পরে দেখা দিল প্রাণী। তারা এসে নির্বিবাদে এদেরই

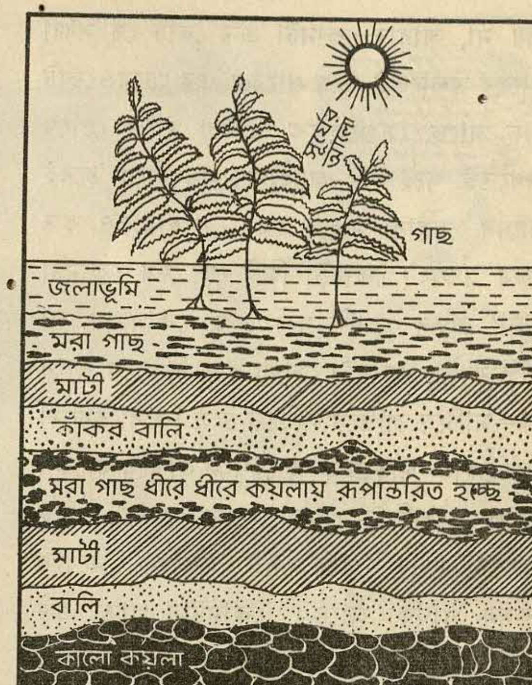


আদিম যুগের সরীসৃপের কবলে আদিম যুগের গাছ

ধরে খিদে মেটাতে লাগল। বহুদিন শত্রুহীন রাজ্যে বাস করে করে এই সব শত্রুদের কি করে ঠেকাতে হয় সে সব কলাকৌশল এদের জানা

ছিল না—ফলে তাতেও অনেকে বেঘোরে প্রাণ দিতে লাগল। তার ওপর বাদ সাধল পৃথিবীর খামখেয়ালী আবহাওয়া। যুগে যুগে তার এই খামখেয়ালীপনা কত যে সৃষ্টি নষ্ট করেছে তার ঠিক নেই! কি রকম জান? ধর, আজ এখানে রয়েছে বিরাট জঙ্গল। হঠাৎ নেমে এল তুষার যুগ। ঐ জঙ্গলের রাজ্য দিয়েই হয়তো বয়ে চলল একটা বরফের নদী। জঙ্গলের গাছ-পালারা অত ঠাণ্ডা আবহাওয়া সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিল না, তারা পট্‌ পট্‌ করে মরে গেল। আবার তার পরেই হয়তো, ঐ জায়গায়ই, দেখা দিল এক শুকনো খট্‌খটে মরু-আবহাওয়া। বাতাসে জলের চিহ্ন নেই, মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই; শুধু কাঠ-ফাটা রোদ্দুর আর গরম ধূলো-বালি। প্রথম উৎপাত থেকে যদি বা কোন গাছ বেঁচে থাকে তো দ্বিতীয় উৎপাতে আবার তাকে দাঁড়াতে হ'ল গিয়ে মহামারীর সম্মুখে। এই ভাবে যুগে যুগে প্রকৃতির খামখেয়ালীতে কত গাছপালার বংশ যে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে তার ঠিক নেই। যারা এই জীবন-যুদ্ধে টিকে থাকতে পেরেছে তাদেরই বংশধররা আজও পৃথিবীতে রয়ে গেছে—তাও নতুন রূপ নিয়ে।

পুরোনো যুগের মৃত গাছপালাগুলো কোথায় গেল? তাদের মৃতদেহ মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছে। তারপর যুগ যুগ ধরে ওপরকার মাটিপাথর তাদের ওপর ক্রমাগত আরও আস্তরণ বিছিয়েছে—আরও চাপ দিয়েছে। এইভাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মাটির তলাকার গরম পরিবেশে আর ওপরকার প্রচণ্ড চাপের ফলে তাদের শরীরের অন্যান্য অংশ নষ্ট



গাছ থেকেই হয় কয়লা

হয়ে গিয়ে পড়ে আছে শুধু অঙ্গারটুকু। এমনি ভাবে গোটা বন-কে বনই চেহারা বদলে মাটির তলায় পড়ে আছে, আর তারাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়লা। খনির তলা থেকে তাদেরই উদ্ধার করে মানুষ আজ তাদের নানান্‌ কাজে লাগাচ্ছে।

নানা জাতের গাছ

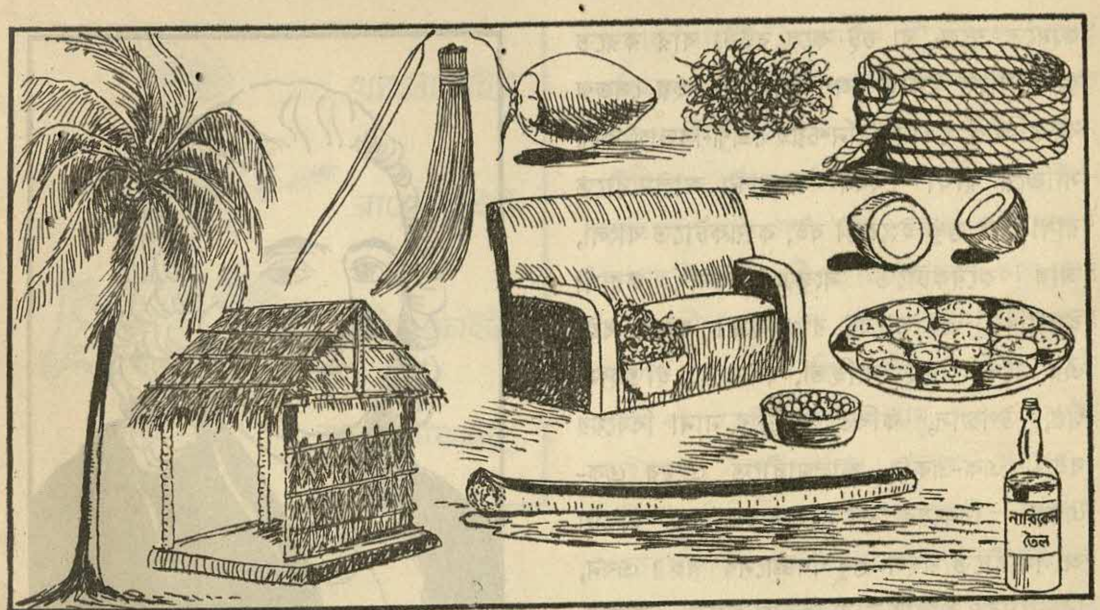
আদিম যুগের গাছপালা ছেড়ে এবারে আমাদের আশেপাশে যে সব গাছ-গাছড়া সর্বদা দেখছি তাদেরই কথা বলা যাক।

পৃথিবীতে যেমন লক্ষ লক্ষ রকমের প্রাণী আছে তেমনি গাছও আছে লক্ষ লক্ষ রকমের। কোনটা ইয়া মোটা,—এত উঁচু যে তলায় দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়েও তাদের চূড়া দেখা

যায় না, আবার কোনটা এত ছোট যে সর্বদা পায়ের তলাতেই পড়ে থাকে। এর চেয়েও ছোট গাছ আছে, সেগুলোকে আমরা খালি চোখে দেখতেই পাই না—অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তবেই তাদের চেহারা মালুম হয়। চেহারায়ও কত রকম তফাৎ! কোনটা মিষ্টি ফল দেয়, কোনটা নানা রঙের সুগন্ধি ফুল দেয়, কোনটার গা ভর্তি কাঁটা, কোনটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না—মাটিতে লতিয়ে লতিয়ে চলে কিংবা হয়তো অন্য কোন গাছকেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। অবশ্য সবগুলিই সবুজ পাতায় ছাওয়া, তাই দেখতে সবুজ,—তবে সেই সবুজের মধ্যেও কেমন পার্থক্য আছে! কোনটার পাতা এত বেশী যে ভিতরের কাঠামোকে প্রায় দেখাই যায় না, আবার কোনটার পাতা খুব কম—সময় সময় একেবারেই নেড়া দেখায়। অবশ্য সবুজ রঙের একটুও ছোপ নেই এ রকম গাছও যে নেই তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। কারণ গাছের ঐ সবুজ রং গাছের বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য। কেন তা পরে বলব।

এই এত রকম গাছ—তাদের সবগুলোকে চিনে রাখা সহজ নয়—সম্ভবও নয়। অথচ না চিনলেই বা চলে কি করে? গাছপালা আমাদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে আছে যে ওদের ছাড়া আমাদের একটি মুহূর্তও চলে না। আমাদের বেশীর ভাগ খাদ্যই আসছে গাছ থেকে। গাছের ফসল—অর্থাৎ বীজ, ফল, মূল, পাতা, ডাঁটা অর্থাৎ ডাল কোনটাই আমরা খেতে বাকি রাখি না—তবে সব গাছের সব কিছু খাই না এই যা! গাছ না থাকলে আমরা না খেয়েই মরে যেতাম। তোমরা বোধ হয় ভাবছ, কেন, আমিষ খেয়েও তো বাঁচা যায়—যেমন বাঘ-সিংহরা বেঁচে রয়েছে! মাছ খাব, মাংস খাব, ডিম খাব, দুধ খাব—তা হলেই তো গাছের ওপর আর নির্ভর করতে হবে না কিন্তু যে সব প্রাণীর মাংস বা ডিম বা দুধ খাচ্ছি তারাও তাদের দেহের পুষ্টির জন্য গাছের ওপরই নির্ভর করছে যে! পাঁঠার মাংস হয়তো বেশ উপাদেয়, কিন্তু সেই পাঁঠা তো ঘাস খেয়েই টিকে রয়েছে! গরুর দুধ খুব ভাল, কিন্তু গরু কি খায়? কাজেই, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, ঐ গাছের ওপরেই আমাদের খাওয়াদাওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। এক কথায় গাছ তার দেহ দিয়ে গোটা সৃষ্টিটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

শুধু খাওয়া নয়, আরও অনেক ব্যাপারে আমরা গাছের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের বাড়ীর অর্ধেক প্রয়োজনীয় জিনিসই আসছে গাছ থেকে। বাড়ীর দরজা, জানালা, টেবিল-চেয়ার-খাট প্রভৃতি আসবাবপত্র—সবই গাছের কাঠ থেকে তৈরী। এমন কি যে কাগজে এ বই লিখছি তাও গাছের আঁশ থেকেই পাওয়া গেছে। পাড়াগাঁয়ে, যেখানে পাকাবাড়ীর চল খুব কম, সেখানকার লোকেরা তো আরও বেশী গাছের ওপর নির্ভর করে থাকে। তাদের কুঁড়েঘরের দেয়াল বাঁশগাছের বেড়া দিয়ে তৈরী, ঘরের ছাদ কাঠের গুঁড়ির ওপর ক্ষেত-থেকে-আনা খড় দিয়ে ছাওয়া। এই রকম কত কি! এক নারকেল গাছের কথা ধরলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। এই গাছের গুঁড়ি দিয়ে আমরা খুঁটি বানাই, ঘাটের সিঁড়ি বানাই, দরকার হলে ডিঙ্গি নৌকোও বানাই। পাতা দিয়ে ঘর ছাওয়া হয়, বেড়া বাঁধা হয়, পাতার কাঠি দিয়ে হয় ঝাঁটা।



নারকেল গাছ আমাদের কত রকম কাজে লাগে !

ফল, অর্থাৎ ডাব আমরা কাঁচা খাই তার জলের জন্য ; ফল পুষ্ট হলে তার শাঁস বার করে তাও খাই, তা দিয়ে রকমারি মিঠাই তৈরী করি ; তা ছাড়া তা থেকে তেলও বার করে নেই। নারকেলের ছোবড়া (যার ইংরেজী নাম কয়্যার) দিয়ে তৈরী হয় দড়ি, তৈরী হয় গদী, মাদুর। আগুন জ্বালাতেও সে ছোবড়া ব্যবহার করা হয়। নারকেলের মালা দিয়েও ঐ রকম কত কাজ হয়। গাঁয়ের লোকেরা ঐ দিয়েই ডাবা হুঁকো বানিয়ে তামাক খায়। বিজ্ঞানীরাও ঐ মালা পুড়িয়ে তৈরী করেন বিশেষ এক ধরণের কাঠকয়লা, যার নাকি গুণের তুলনা নেই। এক কথায় ঐ গাছের এমন একটি অংশও নেই যা আমাদের কোন-না-কোন কাজে লাগে।

শুধু নারকেল গাছের কথা বললাম, এ রকম প্রায় সব গাছ সম্বন্ধেই কথাটা খাটে। কাজেই গাছেদের সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হওয়া, তাদের প্রত্যেকটিকে চিনে রাখা কত প্রয়োজনীয় তা বোধ হয় বলার দরকার করে না।

গাছ চিনব কি করে ?

কিন্তু চিনব বললেই কি চেনা যায় ? পণ্ডিতেরা এ পর্যন্ত কম করে আড়াই লক্ষ গাছের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু চেনেন না বা খোঁজ রাখেন না এমন গাছ এখনও যে অনেক রয়েছে সে বিষয়েও তাঁরা নিঃসন্দেহ। এই আড়াই লক্ষ গাছের সমস্ত খবরাখবর মনে রাখা সহজ কথা নয়।

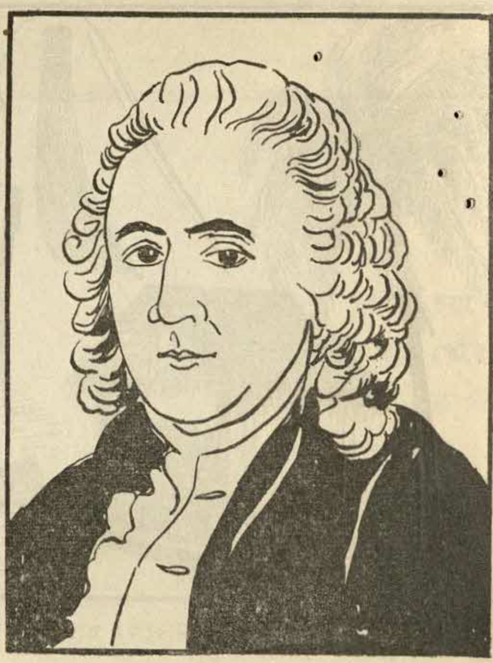
পণ্ডিতেরা এজন্য কতকগুলি সুন্দর নিয়ম বার করেছেন। তাকে বলা যায় গাছের শ্রেণী-বিভাগ। এই শ্রেণী-বিভাগ যে কোন বিজ্ঞানের পক্ষেই অপরিহার্য বলা চলে। একটা উদাহরণ দেই।

ধর, তোমাদের বাড়ীতে বা পাড়ায় একটা বেশ বড়সড় লাইব্রেরী আছে—হাজার পাঁচেক বই আছে সেখানে। কোন একটা বই সম্বন্ধে

জানতে হলে বা চট্ করে বইটা বার করতে হলে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য বইগুলিকে তোমরা নিশ্চয়ই শ্রেণী-বিভাগ করে সাজিয়ে রাখ। যেমন কয়েকটা আলমারীতে রাখা হ'ল শুধু ইংরেজী বই, কয়েকটাতে বাংলা, আর কয়েকটাতে সংস্কৃত, হিন্দী, ফরাসী ইত্যাদি। এই ভাবেই রাখা হয়। বাংলা বই-এর মধ্যে আছে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি নানা বিষয়ের বই। এক-একটা আলমারীতে এদের এক-একটা বিষয়ের বই রাখা হ'ল। একটা আলমারীতে রইল শুধু বিজ্ঞানের বই। এখন, বিজ্ঞানেরও আবার নানা বিভাগ আছে—রসায়ন, পদার্থ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি। এগুলোর সব খিচুড়ী না পাকিয়ে এক-একটা তাকে এক-এক রকমের বিজ্ঞানের বই রাখলে। আবার, ঐ বিশেষ বিজ্ঞানে হয়তো এক-এক জন লেখকের কয়েক-খানা করে বই আছে। এক-এক লেখকের বই তাকের এক-একদিকে সাজান হ'ল। এবারে হঠাৎ একখানা বইএর দরকার হ'ল। বইটা বার করতে তোমাকে নিশ্চয়ই গোটা লাইব্রেরীর সমস্ত আলমারী ঘাঁটতে হবে না—শ্রেণী-বিভাগ করা আছে বলে বিশেষ একটা আলমারীর বিশেষ একটা তাকের বিশেষ একটা কোণে হাত দিয়ে এক মুহূর্তেই হয়তো তুমি বইটা বার করে দিতে পারবে।

গাছের শ্রেণী-বিভাগ

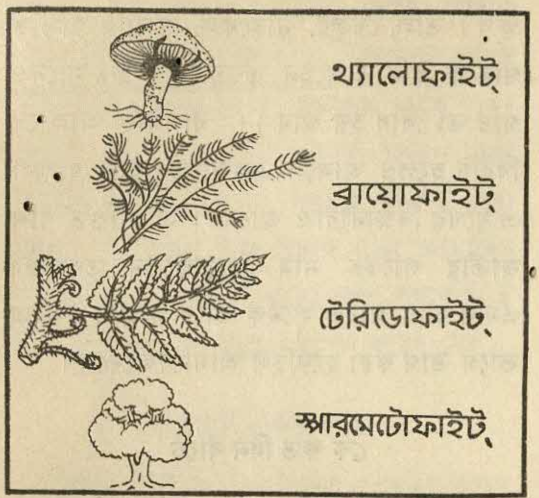
পণ্ডিতেরা গাছপালাকেও এইভাবে শ্রেণী-বিভাগ করে ফেলেছেন। তাদের আকৃতি, চাল-



লিনীয়াস্

চলন, বংশপরিচয় ইত্যাদি নানান্ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই কাজটা সম্ভব হয়েছে। লিনীয়াস্ নামে একজন বিজ্ঞানীকে এ বিষয়ে অনেকটা পথ প্রদর্শক বলা যেতে পারে। অবশ্য আরও অনেক পণ্ডিত এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন এবং অনেকের সম্মিলিত চেষ্টায়ই কাজটা সম্ভব হয়েছে। তবে লিনীয়াসের দান এ-বিষয়ে অসামান্য।

এইভাবে গাছপালাকে মোটামুটি চারটে বড় ভাগে গোড়ায় ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এদের বলা হয় থ্যালোফাইট্, ব্রায়োফাইট, টেরিডোফাইট আর স্পারমেটোফাইট। ছাতা বা ছত্রক জাতের গাছদের বলা হয় থ্যালোফাইট। শ্যাওলা জাতের গাছকে বলা হয় ব্রায়োফাইট, ফার্ন জাতীয় গাছকে বলা হয় টেরিডোফাইট্, আর যে সব গাছে বীজ ফলে তাদের বলা হয় স্পারমেটোফাইট্। এই

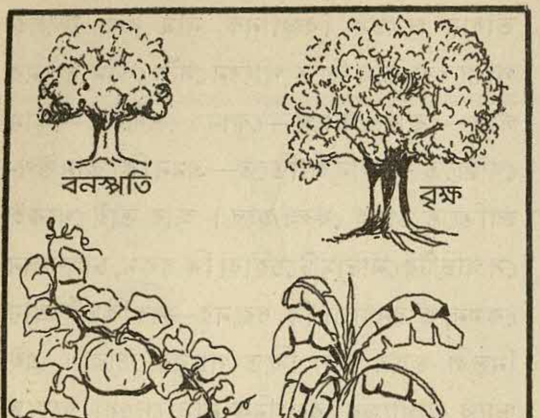


চার রকমের গাছ

শেষেরটি—যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় বীজজ (সীড্‌বেয়ারিং) গাছ,—এদেরই আমরা আমাদের আশপাশে সব চেয়ে বেশী দেখতে পাই। নামগুলো শুনতে আমাদের কানে কেমন কেমন লাগে? লাগবেই তো! কারণ এগুলো সবই যে বিদেশী লাটিন ভাষা থেকে নেওয়া। যে সব বিজ্ঞানীরা এ সব শ্রেণী-বিভাগ ও তাদের নামকরণ করেছেন তাঁরা বেশীর ভাগই ইয়োরোপের লোক, আর আমাদের যেমন সংস্কৃত, ওদেশে তেমনি লাটিন। তাই নামগুলো লাটিন শব্দ দিয়েই করা হয়েছে। ওপরে যে চারটে নাম বললাম সেগুলো হচ্ছে গাছের চারটে প্রধান ভাগ বা ডিভিশন। এই ডিভিশন-গুলোকে আবার ভাগ করা হয়েছে ক্লাস বা শ্রেণীতে, শ্রেণীগুলিকে ভাগ করা হয়েছে অর্ডারে (বাংলায় বলে বর্গ), অর্ডারগুলোকে ফ্যামিলি অর্থাৎ পরিবার বা গোষ্ঠীতে, ফ্যামিলিগুলিকে জেনাস্ বা জাতিতে এবং জেনাস্‌গুলোকে ভাগ করা হয়েছে স্পেসিস্ বা উপজাতিতে। লাটিন ভাষায় গাছের বৈজ্ঞানিক নাম বলে দিলেই পণ্ডিতেরা বলে দিতে পারেন সেটা কোন্ ধরনের গাছ—কোন্ ভাগে—কোন্ শ্রেণীতে—কোন্ গোষ্ঠীতে—কোন্ জাতিতে—এমন কি কোন্ উপ-জাতিতে তাকে ফেলা হবে। আর তাই থেকেই সে গাছটির মোটামুটি চেহারা কি রকম, চাল-চলন কেমন, জীবনযাত্রা কি ধরনের—সব কিছুই প্রায় নির্ভুল ভাবে বলে দিতে পারেন তাঁরা। এই ভাবে বটগাছের বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে ফাইকাস্ বেঙ্গালিন্‌সিস্, অশ্বত্থ গাছের—ফাইকাস্ রিলিজিয়াসা, রবার গাছের—বম্‌ব্যাক্স মালাবারিকান্ এবং আমাদের ধান গাছের নাম দেওয়া হয়েছে ওরাইজা স্যাটিভা। এ সব নাম শুনলেই বিজ্ঞানীরা মুহূর্তে ওদের পরিচয় পেয়ে যান,—তা যতই বদ্‌খদ্ হোক্ না কেন সে নাম।

আমাদের দেশে কি বলা হ'ত

গাছের বর্তমান শ্রেণী-বিভাগে ইয়োরোপীয় বা পাশ্চাত্য পদ্ধতিই বিশেষ করে মেনে নেওয়া হয় বলে মনে ক'র না যে আমাদের দেশে ও-রকম কোন শ্রেণী-বিভাগের কথা কেউ জানত না। অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের ঋষিরা গাছ-পালা সম্বন্ধে প্রচুর চর্চা করতেন। এমন কি অথর্ব বেদেও এদের নানা বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। চক্রপাণি নামে এক ঋষি গাছেদের দস্তুর মত শ্রেণী-বিভাগও করে গেছেন। এঁর বিবরণীতে গাছপালাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—বনস্পতি, বানস্পত্য, ওষধি আর বিরুধ। যে সব গাছে ফল হয় কিন্তু ফুল সহজে নজরে পড়ে না তারাই হ'ল বনস্পতি। যে সব গাছের ফুল এবং ফল দুই-ই হয় তারাই হ'ল বানস্পত্য। ওষধি হচ্ছে



প্রাচীন ভারতের ঋষিরা যে ভাবে বিভিন্ন জাতের গাছকে ভাগ করেছিলেন।

সেই সব গাছ যারা ফল দিয়েই মরে যায়। আর বিরুধ হচ্ছে লতা, ঝোপজঙ্গল জাতীয় গাছ—যাদের ডালপালা আর গুঁড়ি চারদিকে ছড়ানো থাকে।

এ ছাড়া এদেশের আরও অনেক পণ্ডিত আরও নানাভাবে গাছেদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে গেছেন। একজনের মতে গাছ ছয় রকম—বনস্পতি, বৃক্ষ, লতা, ওষধি, তৃণ এবং অবতান। এই পদ্ধতিতে আমগাছ অবতানের মধ্যে পড়ে। আর একজনের মতে যে সব গাছে ফল হয় এবং কাঠ পাওয়া যায় তারা হ'ল বৃক্ষ। যে সব গাছ ঝোপের মত, কিন্তু ফুল-ফল দুইই দেয়, তারা হ'ল ক্ষুপ। তাল, খেজুর, নারকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছকে ইনি বলেছেন তৃণদ্রুম। (দ্রুম মানেও গাছ তা বোধ হয় জান)। বাঁশগাছ আকারে বিরাট হলেও আসলে একজাতের ঘাস এ কথা এ যুগের বিজ্ঞানীরাও জানেন। ঐ পণ্ডিত বাঁশি জাতীয় গাছের নাম দিয়েছিলেন তৃণধ্বজ। এমনি ধারা আরও অনেক ভাবে গাছকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল আমাদের দেশে।

কে কত দিন বাঁচে

আমরা কারো দীর্ঘায়ু কামনা করলে বলি—"লোকটি শতায়ু হোক"—অর্থাৎ একশ' বছর বেঁচে থাকুক। একশ' বছর বাঁচাটা মানুষের পক্ষে খুবই বেশী বাঁচা– যদিও তার চেয়ে বেশী বয়সের লোকও আমরা অনেক দেখেছি। তুরস্কের জোরো আগা দেড়শ' বছরেও বেশ শক্ত-সমর্থ ছিলেন। কাশীর, সাধুপুরুষ তৈলঙ্গ স্বামীর বয়স সম্বন্ধে নানা রকম কথা শোনা যেত—কেউ বলত তাঁর বয়স দু'শ' বছরের ওপর, কেউ বলত তিনশ' বছরেরও বেশী। যাই হোক, তিনি যে খুব বেশী দিন বেঁচে ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ রকম আয়ু হচ্ছে স্বাভাবিকের ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ অকালমৃত্যু না ঘটলে সব মানুষই সত্তর থেকে আশি—এমন কি নব্বই বছরও বাঁচতে পারে।

আমাদের চারপাশে যে সব জীবজন্তু দেখি তাদেরও অনেকেরই একটা মোটামুটি নির্দিষ্ট রকম আয়ু আছে। একটা কুকুর সাধারণতঃ ৮।১০ বছরের বেশী বাঁচে না। গরু বা ঘোড়া আরও কিছু বেশী দিন বাঁচে, তবে তারাও ২০।২২ বছরের বেশী বড় একটা বাঁচে না। হাতী, কুমীর,

কচ্ছপ, তিমি এরা খুব দীর্ঘায়ু প্রাণী। হাতীর আয়ু গড়পড়তা ৮০ থেকে ১০০ বছর বা তারও বেশী বলে শোনা যায়। কুমীরও নাকি ১০০ থেকে ১৫০ বছর বাঁচে। আর কচ্ছপ এবং তিমিকে নাকি ২।৩ শ' বছরও বাঁচতে দেখা গেছে! জীবজন্তুর আয়ু সম্বন্ধে যখন আমাদের এত কৌতূহল তখন গাছেদের আয়ু সম্বন্ধেও ঐ রকম কৌতূহল না হওয়ার কোন কারণ নেই।

কয়েকটি দীর্ঘায়ু গাছ

বিভিন্ন প্রাণীদের মত বিভিন্ন গাছেরও আয়ুর রকম-ফের আছে। আমাদের দেশের বট, অশ্বত্থ গাছ অনেক দিন বাঁচে বলে শোনা যায়। তোমরা, যারা শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বটগাছটি দেখেছ, তারাই এ কথা স্বীকার করবে। ঐ গাছটি বাড়তে বাড়তে ঝুরি নামিয়ে এতটা জায়গা দখল করে ফেলেছে যে দেখলে বিশ্বাসই হতে চায় না যে সমস্তটা মিলে একটাই গাছ। এ গাছটির বয়স প্রায় দু'শ' বছর হতে চলল। কিন্তু এর চাইতেও দীর্ঘায়ু বট বা অশ্বত্থ গাছ এদেশে অনেক দেখা গেছে। ৩০০ বা ৪০০ বছরের পুরোনো বটগাছের কথাও শোনা গেছে। কলকাতার কাছে পানিহাটীতে একটি বিখ্যাত অশ্বত্থ গাছ এই সেদিন ভেঙ্গে পড়ল। ঐ গাছটির নীচে শ্রীচৈতন্য বসে বিশ্রাম করে-ছিলেন। বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত বোধিদ্রুম বহুদিনের



শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বটগাছের একটি অংশ



পানিহাটীর প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ—যার নীচে শ্রীচৈতন্য বসে বিশ্রাম করেছিলেন।

গাছ। তবে এখনকার ওটি বুদ্ধদেবের আমলের সেই গাছ নয়—তার বীজ থেকে তৈরী। সিংহলে একটি পুরোনো অশ্বত্থ গাছ আছে—তার বয়স নাকি প্রায় দু' হাজার বছর। এটিও বোধিদ্রুমের ডাল থেকে হয়েছে বলে শোনা যায়। সিংহলের অনুরাধপুরে এই বোধিদ্রুমের আর একটি ডাল অশোকের পুত্র মহেন্দ্র নিয়ে গিয়ে পুঁতে দিয়েছিলেন। সেটি নাকি এখনও বেঁচে আছে।

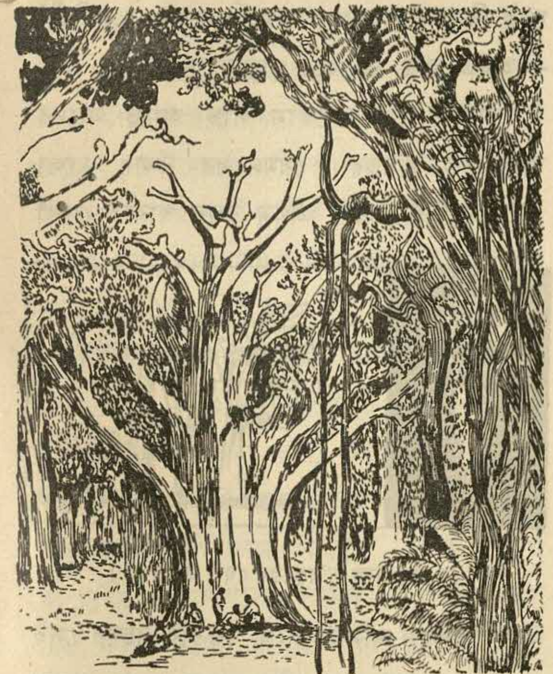
বট-অশ্বত্থ ছাড়া অন্য অনেক গাছকেও বহুদিন বাঁচতে দেখা গেছে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে একটি গজারি গাছ আছে তার বয়স প্রায় সাড়ে সাতশ' বছর। আম, জাম, তেঁতুল প্রভৃতি গাছও অনেক দিন বাঁচতে পারে—সত্তর, আশি, একশ' বছর হামেশাই বাঁচে। বর্তমান নবদ্বীপের অপর পারে মায়াপুরে চাঁদ কাজীর সমাধির ওপর একটি গোলাপচাঁপার গাছ আছে —যেটি চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক।

আমেরিকার রেড্উড গাছই বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘায়ু গাছ। হাজার—দেড় হাজার—দু' হাজার, এমন কি তার চেয়েও বেশী পুরোনো রেড্উড গাছ অনেক দেখা গেছে। বিজ্ঞানীরা গাছের বয়স মাপবার একটি সহজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বার করেছেন—কাজেই কোনও গাছের সঠিক বয়স বলে দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। এই রেড্উড গাছের যে বিশাল অরণ্যানী আমেরিকায় রয়েছে সে একটা দেখবার জিনিস। গাছগুলো শুধু দীর্ঘায়ুই নয়—আকারেও বয়সের মতই দীর্ঘ।

এই ধরণের দীর্ঘায়ু গাছ আফ্রিকার জঙ্গলেও প্রচুর দেখা যায়। মানুষ এখনও আফ্রিকার সমস্ত জঙ্গল ভাল করে পরীক্ষা করে উঠতে পারে নি। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, ওখানকার তেমন তেমন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢুকতে পারলে এই রকম



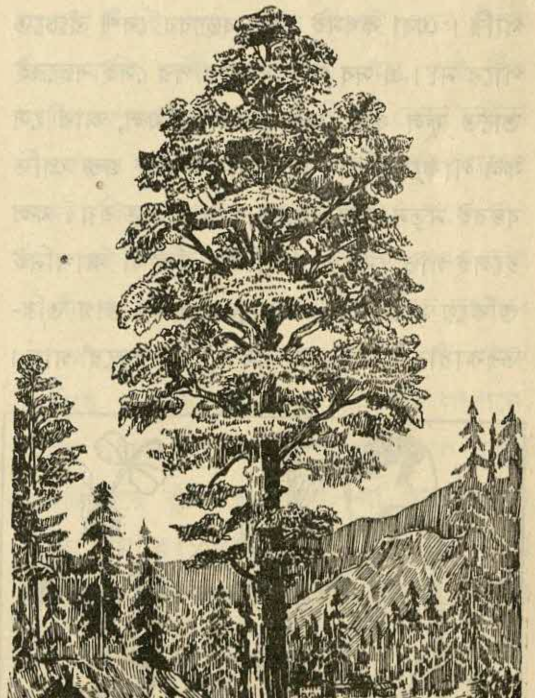
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গাছ রেড্উডের জঙ্গল



আফ্রিকার জঙ্গল—বহু প্রাচীন গাছের যেখানে ছড়াছড়ি

প্রাচীন ও অতিকায় গাছের আরও অনেক নমুনা তাঁরা সংগ্রহ করতে পারবেন।

বিলাতের ওক গাছ আমাদের দেশের বট-অশ্বত্থের মতই বিশাল আকারের গাছ। এই ওক গাছও খুব দীর্ঘজীবী হয়। তিনশ'-চারশ' বছরের পুরোনো ওক গাছ ওদেশে অনেক আছে। এমন কি আরও বেশী দিনের পুরোনো ওকও আছে। ওয়েলবেক্ এবং ডর্সেটশায়ারে দু'টি ওক গাছ আছে—তাদের একটার বয়স দেড় হাজার আর একটার বয়স দু'হাজার বছর ব'লে দাবী করা হয়। তুঁত গাছও নেহাৎ কম দিন বাঁচে না। মহাকবি মিল্টন তাঁর নিজের হাতে একটি তুঁতগাছ পুঁতেছিলেন, তিনশ' বছর পরেও সে গাছটিকে দিব্যি সতেজ থাকতে দেখা গেছে। অষ্ট্রেলিয়া দেশের বিচিত্র ইউক্যালিপ্টাস্ গাছ তোমরা এদেশেও অনেকে দেখে থাকবে। মধুপুর, গিরিডি, দেওঘর প্রভৃতি জায়গায় অনেক বাগানে অনেকে এই গাছ সখ করে লাগিয়ে গেছেন। এখন গাছগুলো বিরাট আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা ধবধবে তাদের গায়ের রং, পাতার মধ্যে ঝাঁঝাল ইউ-ক্যালিপ্টাস্ তেলের গন্ধ। এই গাছের বিশাল আকৃতি দেখলেই এদের বয়সের প্রাচীনত্ব আন্দাজ করা যায়। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনেও এই ইউক্যালিপ্টাস্ গাছ দেখতে পাবে।

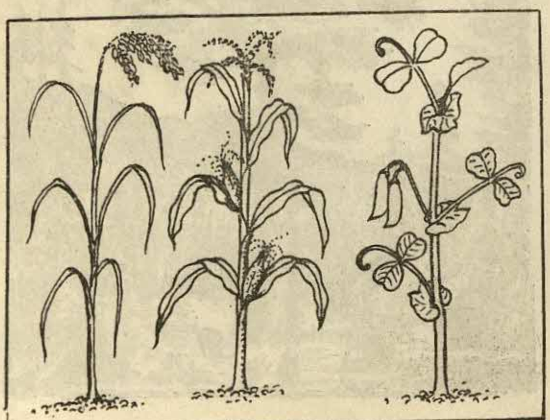


প্রাচীন ওক গাছ

যে গাছ দীর্ঘায়ু নয়

কিন্তু দীর্ঘায়ু গাছের কথা বললেই তো হবে না, সব গাছই আর ও-রকম দীর্ঘায়ু নয়। তবে সাধারণ গাছ—যাদের আমরা চলতি কথায় বৃক্ষ বলি—তাদের পরমায়ু প্রায় মানুষেরই মত। অর্থাৎ ৩০।৪০ থেকে সুরু করে ৭০।৮০ বছর অনেক গাছই টিকে থাকে—যদি না কোন কারণে তাদের অকালমৃত্যু ঘটে।

কিন্তু বড় বড় গাছের বেলা যে কথা খাটে ছোট ছোট গাছের বেলা সে কথা মোটেই বলা চলে না। ধান, গম, মটর, সীম, লাউ, কুমড়ো, দোপাটি, বেলী প্রভৃতি গাছের বয়স কত হবে তা আমরা গাছ না দেখেই বলে দিতে পারি। এরা কখনই এক বছরের বেশী বাঁচতে পারে না। এ সব গাছ বুনবার পর সেই বছরেই তাতে ফুল ধরে, ফুল থেকে হয় ফল, আর সে ফল পাকলেই গাছ মরে যায়। এই জন্য প্রতি বছরই নতুন করে এদের চাষ করতে হয়। ফল হলেই গাছ কেটে ফেলা হয়, কিংবা আপনিই শুকিয়ে মরে যায়। আমাদের বেশীর ভাগ তরি-তরকারীর গাছই এই রকম 'এক-বছুরে' গাছ।



যে সব গাছ মাত্র এক বছর বাঁচে

তাই বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন 'বর্ষজীবী' —অর্থাৎ মাত্র এক বছর যাদের পরমায়ু।

আবার কোন কোন গাছ আছে যাদের আয়ু ঠিক দু'বছর। যেমন ধর কলা, মূলো ইত্যাদি গাছ। এরা প্রথম বছর খাবার তৈরী



যে সব গাছ দু'বছরের বেশী বাঁচে না।

করে শিকড়ে জমিয়ে রাখে, দ্বিতীয় বছরে সেই জমানো খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। সে খাবার যেই ফুরিয়ে গেল অমনি ওদের মৃত্যু। এজন্য এ সব গাছকে বলা হয় 'দু'-বছুরে' গাছ। ভাল বাংলায় 'দ্বিবর্ষজীবী'।

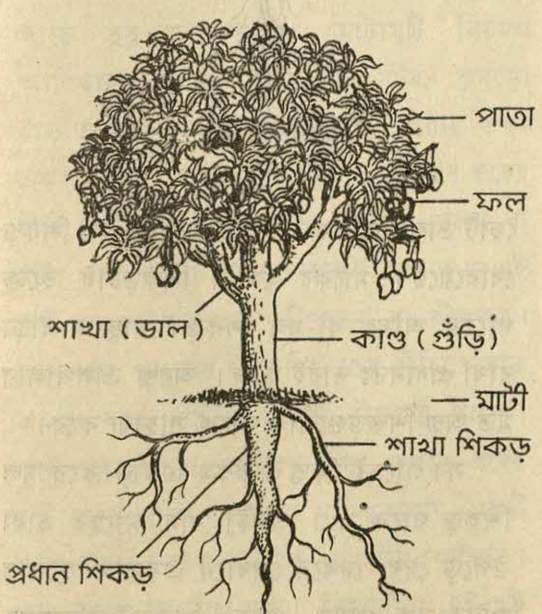
এ ছাড়া ছোটখাট অনেক গাছ আছে যারা খুব বেশী দিন না বাঁচলেও পাঁচ-সাত-দশ বছর দিব্যি টিকে থাকে। অনেকটা আমাদের কুকুর-বেড়ালের মতই।

গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

গাছেদের সঙ্গে জীবজন্তুর চেহারায় রয়েছে বিরাট পার্থক্য। বলতে গেলে কোন দিক্ দিয়েই মিল নেই। আমাদের,—শুধু আমাদের কেন, হাড়গোড়ওয়ালা সব জন্তুরই চেহারার মধ্যে কিছুটা মিল দেখা যায়। প্রত্যেকেরই আছে একটি করে মাথা। সেই মাথায় আবার দু'টি করে কান, দু'টি করে চোখ, একটি নাক, একটি মুখ ইত্যাদি। তারপর শরীর—যাকে আমরা

বলি ধড়। তার সঙ্গে যোড়া আছে হাত-পা। চারপেয়ে জন্তুদের অবশ্য হাত নেই, চারটেই পা; উপরন্তু প্রায় সকলেরই আছে একটা করে লেজ। পাখীদেরও হাতের বদলে আছে ডানা, মাছেদেরও অনেকটা তাই। তবু ঐ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে এরা সকলেই প্রায় একই ধরনের কাজ করে।

কিন্তু জীবজন্তুর সঙ্গে মিল না থাকলেও গাছেদেরও একটা মোটামুটি নিয়ম-মাফিক শরীরের গড়ন দেখা যায়, আর সেই শরীরে কতকগুলি নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও রয়েছে। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি হচ্ছে গাছের শিকড়, কাণ্ড বা গুঁড়ি (ডালপালা সমেত), পাতা, ফুল এবং ফল। ফলের মধ্যেই রয়েছে গাছের ভাবী সন্তানকে বুকে নিয়ে গাছের বীচি বা বীজ। জীবজন্তুর মতই সব গাছেরই এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলি প্রায় একই ধরনের কাজ করে।



গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

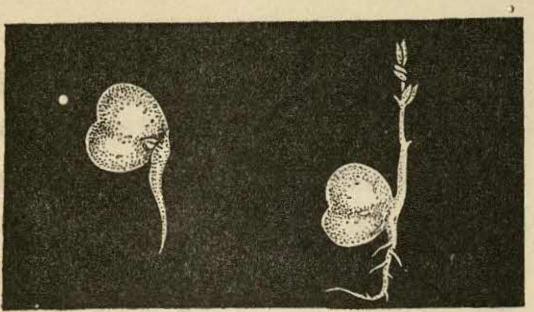
আমাদের শরীরের কাঠামো হচ্ছে হাড়,—আমরা বলি কঙ্কাল। এই কঙ্কালের সাহায্যেই সমস্ত শরীরটা আমরা খাড়া করে রেখেছি। যে সব প্রাণীর শরীরে হাড়গোড় নেই তারা শরীরকে আমাদের মত খাড়া করে রাখতে পারে না—মাটির ওপর এলিয়ে পড়ে থাকে, সেইভাবেই চলাফেরা করে। গাছেদের শরীরের এই কাঠামো হচ্ছে তার শিকড় আর গুঁড়ি। মাটির অনেক নীচে শিকড় ঢুকিয়ে দিয়ে গাছ খুঁটি পোঁতার মত করে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়, আর মাটির ওপরে গুঁড়ি বা কাণ্ড তাকে ডালপালা সমেত সোজা করে রাখে।

গাছের শিকড় ক্রমাগত নীচের দিকে বেড়ে চলেছে। এই বেড়ে চলার দরুণই ওপর দিকে ভার যতই বেশী হোক না কেন, গাছ ঠিক মাটির ওপর আটকে থাকে, বিরাট কোন দুর্ঘটনা —যেমন ধর প্রচণ্ড ঝড় বা সাইক্লোন গোছের একটা কিছু না ঘটলে সহজে উপড়ে পড়ে না। আর এই শিকড়ের সাহায্য পেয়েই কাণ্ডও তার করণীয় কাজগুলো সহজ ভাবেই হাসিল করছে।

গাছের ডালপালাগুলো কাণ্ডের গা থেকে বেরিয়ে আসছে। সেই ডালের সঙ্গে লাগানো আছে পাতা। প্রত্যেকটি পাতার কোলে আছে একটি করে কুঁড়ি বা মুকুল—যা থেকে নতুন পাতা গজাবে। আবার ফুল ফোটাবার সময়ে এই রকম কুঁড়ি থেকেই পাতার বদলে বেরোবে ফুল, আর সেই ফুল থেকে ফল।

শিকড় কোথায় যায় ?

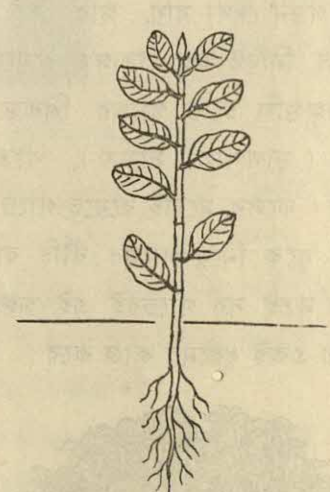
একটা ছোট্ট ছোলা বা মটর দানা কিংবা কুমড়োর বীচি নিয়ে মাটিতে পুঁতে দাও। মাটিটা



ছোলার বীজ থেকে চারা বেরুচ্ছে। শিকড় যাচ্ছে নীচের দিকে, কাণ্ড ঠেলে উঠছে ওপর দিকে।

যেন জল পেয়ে বেশ সরস থাকে। ২।৩ দিন পরেই দেখবে মাটির ওপর ছোট্ট দু'টি পুরু পুরু পাতা উঁকি মারছে। অর্থাৎ বীচি থেকে চারা বেরিয়েছে। এবারে ঐ পাতা-সমেত চারা গাছটা যদি সাবধানে, যাতে কোন অংশ ছিঁড়ে না যায় এমন ভাবে, মাটি থেকে টেনে তোল তা হলে দেখবে বীচি থেকে শুধু দু'টো পুরু পুরু পাতাই গজায় নি, সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা শিকড়ও বেরিয়ে এসেছে, আর শিকড়টা বেঁকে নীচের দিকে নেমে গেছে। পাতা দু'টি ঠেলে উঠেছে ওপর দিকে। আসলে শিকড়টাই কিন্তু আগে বেরোয়। একটা সহজ পরীক্ষা করে এটাও দেখা যেতে পারে। এক মুঠো ছোলা বা মটর বা ঐ জাতীয় কোন দানা নিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখ। পর দিনই দেখবে প্রত্যেকটি দানার ভিতর থেকে একটা ফুটো দিয়ে সাদা সুতোর মত কি একটা বেরিয়ে এসেছে। আমরা ওকে বলি অঙ্কুর বেরোনো। আসলে এটাই হচ্ছে সদ্যোজাত শিকড় বা শিকড়-শিশু। একদিন অপেক্ষা করলে দেখবে ভিজে ছোলার এই শিকড়-শিশু মুখ বার করেই নীচের দিকে বেঁকে যাবার চেষ্টা করছে। যত চেষ্টাই কর না কেন, এই শিকড় মাটির ওপর কিছুতেই থাকবে না, সর্বদাই চেষ্টা করবে মাটির নীচে গিয়ে ঢুকতে। শিকড়ের স্বভাবই ওই।

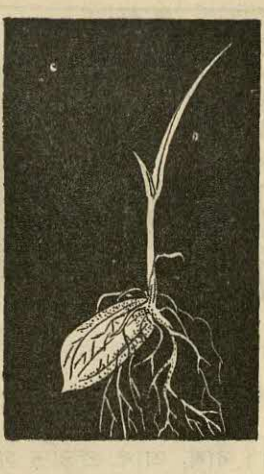
এবারে একটু অপেক্ষাকৃত বড় চারাগাছ নিয়ে দেখা যাক। ধর, হাত খানেক উঁচু হয়ে উঠেছে এমন কোন বটের চারা। আগের মত সাবধানে, গাছটাকে না ছিঁড়ে, শিকড় সমেত উপড়ে ফেল। তার পর শিকড়টা নিয়ে ভাল করে দেখ। দেখবে মাঝখানে একটা মোটা শিকড় নেমে এসেছে, আর তার গা থেকে ছোট



বটগাছের চারা

ছোট ডালপালার মত আরও অনেকগুলো শিকড় বেরিয়েছে। মাঝের মোটা শিকড়টাই হচ্ছে গাছের আসল বা মূল শিকড়। গাছকে খাড়া রাখা প্রধানতঃ তারই কাজ। অবশ্য ডালপালার মত অন্য শিকড়গুলোও তাকে সাহায্য করে।

সব গাছেই কিন্তু এ রকম একটা করে মূল শিকড় থাকে না। একটা ধান গাছের চারা উপড়ে দেখ, দেখবে সেখানে একসঙ্গে সুতোর জটার মত গোছা গোছা শিকড় বেরিয়েছে, কোনটাই কোনটার চেয়ে মোটা নয়। এখানে



ধানগাছের চারা। একসঙ্গে সুতোর জটার মত গোছা গোছা শিকড় বেরিয়েছে।

সবগুলো মিলে গাছকে সমান ভাবে খাড়া করে ধরেছে। শুধু ধান গাছ নয়—ভুট্টা, গম, যব, আখ, বাঁশ, এমন কি তাল-নারকেল গাছেও এই ধরনের শিকড় দেখতে পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানীরা এই রকম শিকড় কোন্ কোন্ গাছে হয় তার একটা মোটামুটি নিয়মও আবিষ্কার করেছেন। ছোলা, মটর, কুমড়ো প্রভৃতি গাছে যখন প্রথম পাতা বেরোয় তখন একসঙ্গে হু'টি করে পাতা বেরোয়—কারণ ওদের বীচি হু'টি ভাগে ভাগ করা—একটা ছোলা বা মটর দানা নিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখবে। এই হু'টি ভাগকে বলা হয় 'কটিলেডন' বা বীজপত্র। কিন্তু ধান, গম, যব ইত্যাদিগাছের বীচিতে মাত্র একটা করে কটিলেডন বা বীজপত্র থাকে। তাই প্রথম পাতা বেরোবার সময় দেখবে এদের হু'টি করে পাতা বোরোয় না—বেরোয় একটি করে পাতা—সলতের মত জড়ানো অবস্থায়। পরে অবশ্য তা খুলে যায়। বিজ্ঞানীরা এই হুই জাতের গাছকে হু'টি ভাগে ভাগ করেছেন আর নাম দিয়েছেন "ডাইকটিলেডনাস্"—অর্থাৎ হুই-বীজপত্রওয়ালা গাছ আর "মোনোকটি-লেডনাস্" অর্থাৎ এক-বীজপত্রওয়ালা গাছ। শেষোক্ত দলের গাছ—অর্থাৎ যাদের প্রথমে একটা করে পাতা বেরোয় তাদেরই শিকড় হয় ঐ রকম গোছা গোছা। আর প্রথম দলের সব গাছেই কিন্তু একটা করে মূল শিকড় থাকে।

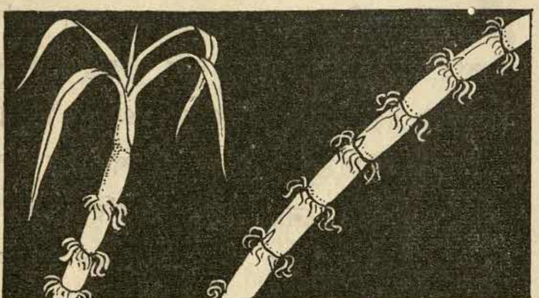
নানান্ রকমের—নানান্ ধরনের শিকড়

শিকড় সম্বন্ধে বলতে গেলে আরও মজার মজার শিকড়ের কথা মনে আসে। অবশ্য সাধারণ শিকড়ের সঙ্গে ওগুলোর চেহারার তফাৎ দেখেই 'মজার' কথাটা বলছি, নইলে ওদের সকলেরই বিশেষ বিশেষ কাজ আছে আর ঐ বিশেষ বিশেষ কাজ করতে হয় বলেই ওদের চেহারা ঐ রকম হয়েছে। যেমন ধর, বটগাছের ঝুরি। বটগাছ বুড়ো হয়ে গেলে তার ডালপালা থেকে অসংখ্য দড়ির মত নেমে আসে এবং ক্রমে গিয়ে তা মাটির মধ্যে ঢোকে। আমরা চলতি কথায় ওদের বটের ঝুরি বলি, কিন্তু আসলে ওগুলো হচ্ছে বটের শিকড়—একটা বিশেষ ধরনের অতিরিক্ত শিকড়। মূল শিকড়ের সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই। এই অতিরিক্ত শিকড় গাছকে মাটির সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে—যাতে গাছের ডালপালা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেও গাছের খাড়া হয়ে থাকতে কোন কষ্ট না হয়। অনেক সময় এই ঝুরি এমন ভাবে নেমে আসে যে মনে হয় একটি গাছই বুঝি অনেকগুলি আলাদা আলাদা গাছে ভাগ হয়ে গেছে। তেমন তেমন পুরোনো বটের ঝুরি এত মোটা আর এত শক্ত হয় যে কোন্টা আসল



মূল শিকড় মূল শিকড়ের গায়ে শাখা শিকড় বটের ঝুরি পরগাছা বাতাসী শিকড়

গাছের গুঁড়ি আর কোন্‌টা তার শিকড় (অর্থাৎ ঝুরি) তা বোঝাই যায় না। তোমরা যারা শিবপুরের বাগানের অতিকায় বটগাছটা দেখেছ তারা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছ। ঐ গাছের আসল গুঁড়িটা পোকায় খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছিল, তাই সেটাকে কেটে ফেলা হয়েছে ; কিন্তু তাতে গাছের কোনই ক্ষতি হয় নি। ঐ অসংখ্য ঝুরিই গাছটাকে আগের মত বহাল তবিয়তে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।



আখের গাঁটে অস্থানিক শিকড়

এই ধরনের অতিরিক্ত শিকড়কে বিজ্ঞানীরা বলেন অস্থানিক শিকড়—অর্থাৎ যা নির্দিষ্ট জায়গায় না গজিয়ে অন্যত্র গজায়। ইংরেজীতে বলে 'অ্যাড্‌ভেন্‌টিশাস্‌ রুট্‌'। এই রকম অস্থানিক অর্থাৎ অতিরিক্ত শিকড় আরও নানা ধরনের হতে পারে। বাঁশ, আখ প্রভৃতি গাছের গাঁটে গাঁটে এক রকম ছোট ছোট সুতোর মত শিকড় ঝুলতে দেখা যায়। এরাও ঐ রকম বিশেষ ধরনের অস্থানিক শিকড়—বিজ্ঞানীরা বলেন বায়ব বা বাতাসী শিকড়। এরা মাটিতে না ঢুকে বাতাসেই দিব্যি বাড়তে পারে, তারপর সুযোগ পেলে মাটিতে গিয়ে ঢোকে।

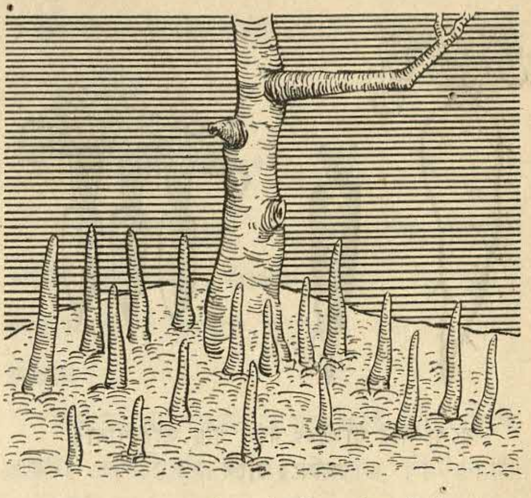
পরগাছা বলে একটা কথা তোমরা হরদম শুনে থাক। যে গাছ পরের ওপর নির্ভর করে থাকে তাকেই বলা হয় পরগাছা। মানুষের



পরগাছা অন্য গাছ থেকে রস শুষে নিচ্ছে।

মধ্যেও যারা নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে অপরের ঘাড়ে খেয়ে-পরে থাকে তাদের আমরা ঠাট্টা করে বলি পরগাছা। আসল পরগাছাও তাই। এরা নিজেরা মাটি থেকে কোন খাবার যোগাড় করবার চেষ্টা করে না, অপর গাছের ঘাড়ে চেপে সেই গাছের রস চুষে খেয়ে বেঁচে থাকে। আলোকলতা বা স্বর্ণলতা, রাস্না প্রভৃতি গাছগুলি হচ্ছে এই রকম পরগাছা। এই সব পরগাছাদের গায়ে এক রকম অদ্ভুত ধরনের শিকড় আছে। সেই শিকড় দিয়ে এরা অক্টোপাসের মত আঁকড়ে-ধরা গাছের রস চুষে নিতে পারে। কাজেই এই ধরনের শিকড়কেও আমরা বিশেষ ধরনের শিকড়ই বলব। এই শিকড়ের নাম 'শোষক' বা চুষে-খাবার শিকড়।

তোমাদের মধ্যে যারা ডায়মণ্ড হারবার বা কলকাতার আরও দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে গেছ তারা ঐ সব জায়গায় লোনা জলের ওপর বা কাদার মধ্যে এক রকম বড় বড় গাছ লক্ষ্য করে থাকবে। এই গাছগুলোকে ঘিরে চারপাশে ছোট ছোট খুঁটির মত কতকগুলো জিনিস বসানো আছে—কোনটা কাদার মধ্যে, কোনটা জলের মধ্যে। দেখলে মনে হবে কেউ যেন কতকগুলো ছুঁচাল লাঠি এনে উল্টো করে জল আর কাদার ভিতর গেড়ে রেখেছে। আসলে কিন্তু ওর কোনটাই খুঁটি নয়, ওগুলো সব ঐ গাছেরই শিকড়—বিশেষ এক ধরনের শিকড়। এই শিকড়গুলো দিয়েই ঐ গাছ বাতাস থেকে নিঃশ্বাস টেনে নেয়। তাই এই শিকড়গুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্রীদিং রুট্' বা নিঃশ্বাস-নেওয়া শিকড়। ভাল বাংলায় 'শ্বাসগ্রহণকারী শিকড়' বলা যেতে পারে। এই গাছগুলোকে বলা হয়

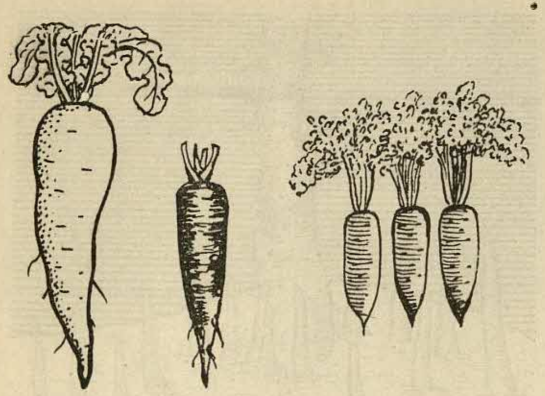


ম্যাংগ্রোভকে ঘিরে চারদিকে ঠেলে উঠেছে নিঃশ্বাস-নেওয়া শিকড়।

'ম্যাংগ্রোভ'। লোনা জলে এদের বাস, তাই নিঃশ্বাস নেবার জন্য ওরা ঐ রকম ফন্দী বার করেছে।

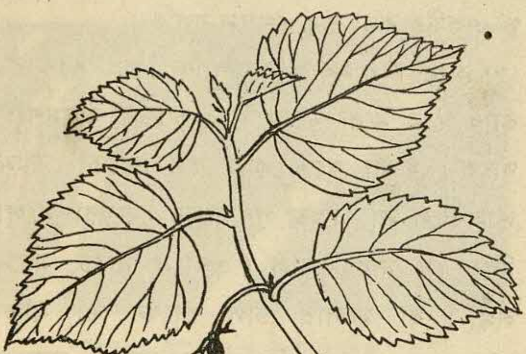
এই রকম বিশেষ বিশেষ ধরনের শিকড় আরও হরেক রকম গাছের আছে। আর দু'-একটির কথা শুধু এখানে বলছি।

আমরা যে সব আনাজপাতি দিয়ে তরকারী রাঁধি তার মধ্যে মূলো আর গাজর হামেশাই থাকে। মূলো খেতে কেউ কেউ হয়তো তেমন ভালবাসে না—কিন্তু পূর্ব বঙ্গের মেয়েরা মূলো দিয়ে যে মরিচ-ঝোল (এখানে মরিচ মানে লঙ্কা) বা মূলোর ডাল রাঁধেন তা সত্যি খুব সুস্বাদু। তেমনি পশ্চিম বঙ্গের মেয়েরা ভেটকী মাছের সঙ্গে মূলো বেটে মিশিয়ে যে মূলো-ভেটকী রাঁধেন তাও কম সুস্বাদু নয়। গাজর দিয়েও ঐ রকম সুস্বাদু স্টু তৈরী করা যায়। পাঞ্জাবীরা গাজরের হালুয়াও খুব ভালবাসেন। এই মূলো আর গাজর দু'টোই কিন্তু



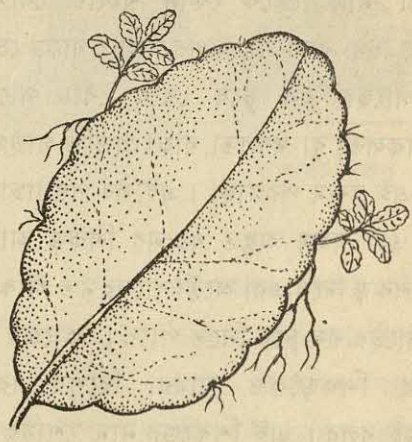
মূলো আর গাজরের মধ্যে গাছ তার খাবার জমিয়ে রাখে।

আসলে গাছের শিকড়। তবে শিকড়ের যা প্রধান কাজ তা এরা করে না—এদের কাজ হচ্ছে খাবার জমিয়ে রাখা। এর আগেই বলেছি যে কোন কোন গাছ প্রথম বছর যে সব খাবার যোগাড় করে তার সবটা খরচ না করে কিছুটা জমিয়ে রাখে, পরের বছর তাই খেয়ে টিকে থাকবে এই মতলবে। মূলো, গাজর—এরা



জবা গাছের ডাল—এই ডাল কেটে পুঁতে দিলেই বেরোবে নতুন গাছ।

হচ্ছে ঐ জাতের গাছ, আর সঞ্চিত খাবার ওরা রেখে দেয় ওদের শিকড়ের মধ্যে। সেইজন্যই ঐ শিকড়গুলো অমন "পুরুষ্টু" চেহারার হয়।



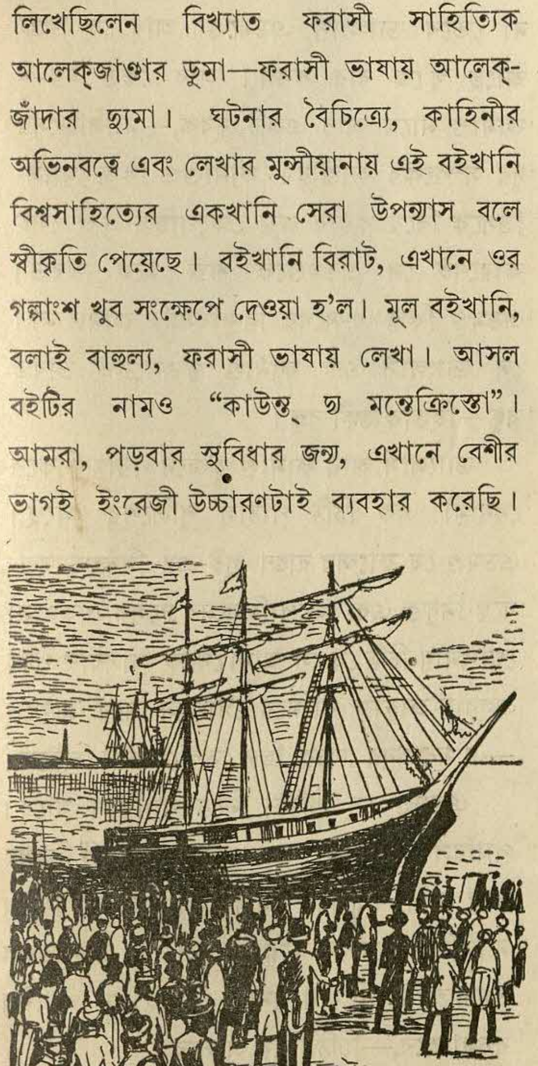
পাথরকুচির পাতার কিনারা থেকে নতুন গাছ গজিয়েছে।

আবার কতকগুলো গাছ আছে,—যেমন জবা, গোলাপ, স্থলপদ্ম, বেলী, টগর ইত্যাদি গাছ—যাদের ডাল কেটে এনে মাটিতে পুঁতে দিলে ঐ ডাল থেকেই অর্থাৎ ডালের গাঁট থেকেই নতুন শিকড় বেরিয়ে এসে এক-একটা নতুন গাছ সৃষ্টি করে। পাথরকুচি গাছ আবার আরও মজার। পাথরকুচির একটা পাতা যদি মাটিতে ফেলে রাখ তা হলে দেখবে কয়েকদিন বাদেই পাতার কিনারায় ধারে ধারে কতকগুলি শিকড় বেরিয়ে নীচের দিকে রওনা হয়েছে, আর ওপর দিকে গজিয়ে উঠছে ছোট্ট ছোট্ট পাতা বুকে নিয়ে এক-একটা আস্ত আস্ত নতুন গাছ। একটা পাথরকুচি পাতার গায়েই হয়তো দেখা যাবে ৮।১০টা নতুন গাছ বেরিয়েছে! প্রত্যেকটি গাছের পৃথক্ পৃথক্ শিকড়। ভারী মজার ব্যাপার, নয় কি?

দেশবিদেশের সেরা বই

কাউন্ট অব্ মণ্টেক্রিস্টো

"কাউন্ট অব্ মণ্টেক্রিস্টো" বইখানি লিখেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আলেক্জাণ্ডার ডুমা—ফরাসী ভাষায় আলেক্-জাঁদার দ্যুমা। ঘটনার বৈচিত্র্যে, কাহিনীর অভিনবত্বে এবং লেখার মুন্সীয়ানায় এই বইখানি বিশ্বসাহিত্যের একখানি সেরা উপন্যাস বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। বইখানি বিরাট, এখানে ওর গল্পাংশ খুব সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল। মূল বইখানি, বলাই বাহুল্য, ফরাসী ভাষায় লেখা। আসল বইটির নামও "কাউন্ত্ দ্য মন্তেক্রিস্তো"। আমরা, পড়বার সুবিধার জন্য, এখানে বেশীর ভাগই ইংরেজী উচ্চারণটাই ব্যবহার করেছি।



মার্সাই বন্দরে জাহাজ এসে ভিড়েছে।

কাউন্ট অব্ মণ্টেক্রিস্টো প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে।

*

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮১৫। ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে একখানা জাহাজ এসে ভিড়েছে। জাহাজখানি এসেছে স্মার্না থেকে,—নাম ফারাওঁ।

বন্দরে লোকের ভিড়। সকলেরই চোখে-মুখে একটা অস্বস্তিকর ভাব। জাহাজ কি কোন দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে?

হ্যাঁ, তাই। জাহাজের ক্যাপ্টেন আর বেঁচে নেই। জাহাজের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি এবং সমুদ্রের ওপরেই তাঁকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। জাহাজ চালিয়ে এনেছে জাহাজের মেট এডমণ্ড ডান্টে।

এডমণ্ডের বয়স বেশী নয়,—মাত্র উনিশ বছর। খুব কাজের ছেলে সে, আর স্বভাবটিও তার ভারী মিষ্টি। সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। ক্যাপ্টেন, যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন, তিনিও তাকে খুব ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। এমন কি মরবার আগে, যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি আর বাঁচবেন না, তখন এডমণ্ডকে ডেকে তারই ওপর তিনি জাহাজের ভার দিয়ে যান আর সেই সঙ্গে দিয়ে যান এক-খানা গোপনীয় চিঠি। চিঠিখানা প্যারিসের এক ভদ্রলোকের কাছে গোপনে পৌঁছে দিতে হবে। চিঠিখানায় কি লেখা আছে তা তিনি বললেন না, এডমণ্ডও জানতে চাইল না। ক্যাপ্টেনের নির্দেশই তার কাছে যথেষ্ট। তা সে যে করেই হোক পালন করবে।

আগেই বলেছি, এডমণ্ডকে সকলেই পছন্দ করত। জাহাজের মালিক মোরেলও তাকে ভালবাসতেন এবং তার গুণপনার তারিফ করতেন। ক্যাপ্‌টেনের খালি পদটা তিনি তাকেই দিয়ে দিলেন।

এডমণ্ডের আনন্দ আর ধরে না। তার মনে হ'ল তার মত ভাগ্যবান্ আর কেউ নেই। এর আরও একটা কারণ ছিল। মার্সিডিস্ নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার ছেলেবেলা থেকেই খুব ভাব ছিল এবং ত্ব'জনের বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এইবার সেই বিয়ের আয়োজন হতে লাগল।

কিন্তু ত্বনিয়ায় ভাল মান্থষেরও শত্রু থাকতে পারে। এডমণ্ডের অসাধারণ গুণ—যা তাকে অপর সকলের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল—তাই-ই আর একজনকে করেছিল তার শত্রু। এই লোকটির নাম ড্যাংলার্স। এডমণ্ডের মত সেও কাজ করত ফারাওঁ জাহাজে এবং একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে। এডমণ্ডকে সবাই পছন্দ করে দেখে তার হিংসে হ'ত। তা ছাড়া ক্যাপ্‌টেনের পদের ওপর তারও লোভ বড় কম ছিল না। তার ধারণা ছিল ঐ পদে বোধ হয় তাকেই বসানো হবে। এডমণ্ড ক্যাপ্‌টেন হওয়ায় তাই সে তার ওপর আরও চটে গেল।

শুধু চটে যাওয়াই নয়, কি করে এডমণ্ডের সর্বনাশ করবে এই হ'ল তার সর্বক্ষণের চিন্তা।

পুরোনো ক্যাপ্‌টেন এডমণ্ডকে যে গোপনীয় চিঠিখানা দিয়েছিলেন তার রহস্য সে না জানলেও ড্যাংলার্সের কিন্তু অজানা ছিল না। সেই সময় ফ্রান্সের সম্রাট্ মহাবীর নেপোলিয়ন ছিলেন এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত। ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেছেন অষ্টাদশ লুই। কিন্তু নেপোলিয়নের ভক্তের সংখ্যাও কম ছিল না। তারা নেপোলিয়নকে আবার ফ্রান্সের সিংহাসনে বসাবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করছিল। ঐ ক্যাপ্‌টেনও ছিলেন সেই দলে। ঐ চিঠিখানায় ছিল সেই সম্পর্কেই কতকগুলি গোপন তথ্য।

এখন, এডমণ্ডকে বিপদে ফেলতে গেলেও একটা ষড়যন্ত্র করা দরকার। একা স্থবিধে হবে না ভেবে ড্যাংলার্স এডমণ্ডের আর কে শত্রু আছে খুঁজে বার করল। আর কেউ নয়—ফার্নাণ্ড নামে আর একটি যুবক,—মার্সিডিসের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ফার্নাণ্ডও কিন্তু মার্সিডিসকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপেছিল এবং সেই কারণেই সে এডমণ্ডকে শত্রু মনে করত। এডমণ্ড কিন্তু এ-সবের বিন্দুবিসর্গও জানত না। সে ড্যাংলার্স এবং ফার্নাণ্ড ত্ব'জনকেই ভাবত বন্ধু—হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।

ড্যাংলার্স আর ফার্নাণ্ড ত্ব'জনে পরামর্শ করে বেনামী এক চিঠি পাঠাল পুলিশের কাছে। এডমণ্ড যে ফ্রান্সের রাজা লুই-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত এবং নেপোলিয়নের দলের একখানা গোপনীয় চিঠি যে সে স্মার্না থেকে আসবার পথে এল্‌বায় জাহাজ থামিয়ে গোপনে নিয়ে এসেছে—এ সব খবর দেওয়া ছিল সেই বেনামী চিঠিতে।

এডমণ্ড সে চিঠিটা নিয়ে প্যারিসে যাবে। প্যারিস অনেকটা পথ। এদিকে মার্সিডিসের সঙ্গে তার বিয়ের সমস্ত যোগাড়যন্ত্র ঠিক। মার্সিডিস অপেক্ষা করে আছে। সে ঠিক করল তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে নিয়েই সে প্যারিস রওনা হবে,—চিঠি দিয়ে আসবে।

কিন্তু বেচারা জানত না তার ভাগ্যে কি আছে। বিয়ের ভোজসভা থেকে এডমণ্ড

মার্সিডিসকে নিয়ে গীর্জায় রওনা হচ্ছে—সেখানে মন্ত্র পড়ে বিয়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানটুকু শেষ করবে, ঠিক এমনি সময়ে পুলিশ এসে তাকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। বিয়ে আর হ'ল না।



রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

এডমণ্ডের আনা সেই চিঠিখানা যে রাজকর্মচারীটির হাতে পড়ল সে হচ্ছে ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটর ভিলফোর্ট। আর চিঠিখানা ছিল তারই বাবা নর্টিয়ার ভিলফোর্টের নামে। অর্থাৎ ছেলে নতুন রাজার অনুগামী হলেও তার বাবা ছিলেন নেপোলিয়নের পরম ভক্ত। নেপোলিয়নকে স্বপদে বসাবার ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন।

ভিলফোর্ট পড়ল মহাদ্বিধায়। এডমণ্ড যে নির্দোষ সে বিষয়ে তার সন্দেহ রইল না ; কিন্তু তা সত্ত্বেও, নিজের বাপকে বাঁচাবার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের চাকরী ও প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্য, সে একটা হীন মিথ্যার আশ্রয় নিল। এডমণ্ডের সামনে সেই চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে বলল, কার নামে এ চিঠি লেখা হয়েছিল তা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে। আর এডমণ্ড নির্দোষ, কাজেই তার মুক্তির ব্যবস্থা সে করে দিচ্ছে। কিন্তু আসলে সে তার মুক্তির আয়োজন তো করলই না, উল্টে তাকে বিনা বিচারে যাবজ্জীবন কারাগারে বন্দী করে রাখবার ব্যবস্থা করল। নিরপরাধ এডমণ্ড আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনই সুযোগ পেল না।

সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা পাহাড়। তারই ওপর বিরাট পার্বত্য দুর্গ শ্যাতু দ্য ঈফ্। আসলে এটি হচ্ছে একটি ভয়াবহ কারাগার। ফরাসী সরকার সবচেয়ে গুরুতর অপরাধীদের এই দুর্গের নির্জন কক্ষে বন্দী করে রাখেন। এখানে যাদের কয়েদ করা হয় তারা আর কোন দিন বাইরের পৃথিবীর মুখ দেখতে পায় না। এডমণ্ডকেও এই ভীষণ কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

কারাগারের একটি নির্জন পাষাণ কক্ষে এডমণ্ডকে আটকে রাখা হ'ল। অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘর। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই তার। খাবার যা দেওয়া হ'ত তাও অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের। এইখানে তিলে তিলে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন রকমে দিন কাটতে লাগল তার। এইভাবে দেখতে দেখতে ছয়টি বছর কেটে গেল।

এদিকে ভিলফোর্টের চক্রান্তে বাইরে রটে গেল যে এডমণ্ড মারা গেছে। মার্সিডিস এতদিন আকুল আগ্রহে তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। সে এই খবরে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ওদিকে

সুযোগ বুঝে ফার্নাণ্ডও তাকে বিয়ে করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। এডমণ্ড তো আর ফিরে আসবে না কোন দিন! অবশেষে, উপায়ান্তর না দেখে, রাজী হ'ল মার্সিডিস। ফার্নাণ্ডের সঙ্গে একদিন তার বিয়েও হয়ে গেল।

দীর্ঘ ছ' বছর নির্জন কারাকক্ষে এডমণ্ডের দিন কাটছে। মুক্তির আর কোন আশাই নেই বুঝতে পেরে সে ঠিক করল আত্মহত্যা করে এ জীবন শেষ করবে। সে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিল একদম। দেখতে দেখতে অনাহারে তার শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে সে আর ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণেও ভাল করে হেঁটে যেতে পারে না।

মৃত্যুর কামনা করে একটি একটি করে দিন গুণছে এডমণ্ড, হঠাৎ একদিন তার মনে হ'ল পাথরের দেয়াল থেকে কেমন একটা ঠক্ ঠক্ আওয়াজ আসছে। কান পেতে শুনতে লাগল সে। সত্যিই শব্দ আসছে একটা। ঠিক যেন কেউ শাবল জাতীয় কিছু একটা দিয়ে দেয়ালের গায়ে ঘা মারছে।

হঠাৎ নতুন একটা আশায় নেচে উঠল এডমণ্ডের হৃদয়। তবে—তবে কি মুক্তির সম্ভাবনাও আছে নাকি?

কারারক্ষক যখন খাবার নিয়ে এল তখন আর সে অন্য দিনের মত সে খাবার এক কোণে ফেলে রাখল না, বরঞ্চ পাছে ঐ দেয়াল খোঁড়ার শব্দ কারারক্ষক শুনতে পায় সেজন্য এত চীৎকার করে আজেবাজে কথা বলতে লাগল যে কারারক্ষক ভাবল তার বুঝি মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে, তাই এ সব প্রলাপ বকছে। সে তাই তাড়াতাড়ি খানিকটা সুরুয়া আর সাদা রুটি এনে দিল তাকে। এডমণ্ড এক নিঃশ্বাসে সুরুয়াটা খেয়ে নিল; তর পর কৌশলে, যেন আচমকা ভেঙ্গে গেছে এইভাবে, সুরুয়ার পাত্রটা এমন ভাবে ভেঙ্গে ফেলল যে ওর হাতলটা দরকার হলে শাবলের মত সেও ব্যবহার করতে পারে। কারারক্ষক চলে গেলে সে জলের পাত্রটাও ভেঙ্গে ফেলে তার টুকরোটা দিয়ে পাথরের দেয়ালের চুণ-সুরকী খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলতে আরম্ভ করল। একটু চেষ্টা করতেই একখানা ছোট পাথর আলগা হয়ে এল। এডমণ্ড এবার দ্বিগুণ উৎসাহে সেই সুরুয়ার পাত্রের হাতলটাকে দেয়াল খোঁড়ার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল।

ওদিক্ থেকেও ক্রমাগত দেয়াল খোঁড়া হচ্ছে। ক্রমে মনে হ'ল গর্তটা এত কাছে এসেছে যে চেষ্টা করলে ওদিক্কার কথা এদিক্ থেকে শোনা যায়। দীর্ঘ দিন—বছরের পর বছর নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে আবার নতুন করে মানুষের কণ্ঠস্বর এডমণ্ডকে যেন নতুন আশার বাণী শুনিয়ে দিল।

তারপর, হঠাৎ একদিন তার পায়ের কাছের দেয়াল থেকে একটা মস্ত বড় পাথর সম্পূর্ণ খসে পড়ল। দেখা দিল একটা সুড়ঙ্গ-পথ, আর সেই সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা আস্ত মানুষের মাথা, তারপর তার সমস্ত শরীর। উস্কোখুস্কো জটাভর্তি তার চুল, আর লম্বা পাকা গোঁফ-দাড়িতে সমস্ত মুখ আচ্ছন্ন। দু'জনেই দু'জনকে দেখে হতবাক্।

বৃদ্ধটি আর কেউ ন'ন, ইটালির পাদরী অ্যাবে ফ্যারিয়া। এডমণ্ডকে এই শ্যাতুতে বন্দী করে আনারও চার বছর আগে থেকে তাঁকে



দু'জনেই দু'জনকে দেখে হতবাক্।

এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে,—বিপ্লবী সন্দেহ করে। তাঁর অপরাধ, খণ্ড খণ্ড ইটালিকে একত্র করে এক শক্তিশালী যুক্ত ইটালি গড়ে তুলবার জন্য ষড়যন্ত্র করছিলেন তিনি। প্রথমে তাঁকে ইটালির একটা কারাগারে তিন বছর আটকে রাখা হয়। তারপর ১৮১১ সালে ফরাসী সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে তাঁকে এনে রাখা হয় এই শ্যাতু দ্য ঈফ্এ। সেই থেকে বছরের পর বছর তিনি ঐ নির্জন স্যাৎসেঁতে ঘরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। কিন্তু এডমণ্ডের মত তিনি হতাশ হন নি। যে লোহার খাটে তাঁকে শুতে দেওয়া হয়েছিল তারই একটা টুকরো কৌশলে ভেঙ্গে নিয়ে তিনি একটা শাবলের মত তৈরী করে নিয়েছিলেন, এবং তারই সাহায্যে অমানুষিক শক্তি আর অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে পাথরের দেয়াল ভেঙ্গে একটা সুড়ঙ্গ তৈরী করছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, দেয়াল ফুটো করতে পারলেই তিনি দুর্গের বাইরে সমুদ্রের ধারে পৌঁছে যাবার পথ পেয়ে যাবেন। আজ এতদিন পরে তাঁর সুড়ঙ্গ খোঁড়া শেষ হয়েছে, কিন্তু এখন তিনি দেখছেন সুড়ঙ্গটা খোঁড়া হয়েছে উল্টো দিকে। অর্থাৎ বাইরের দিকে না গিয়ে সেটা এসে পড়েছে পাশের আর একটা কামরায়—যেখানে এডমণ্ড বন্দী হয়ে আছে। এত বছরের পরিশ্রম একেবারেই বিফল হয়েছে তাঁর। অবশ্য এ ভুল তিনি আগেই টের পেয়েছিলেন। কিন্তু তবু থামেন নি। ভেবেছিলেন মুক্তি যখন হ'লই না তখন অন্ততঃ একজন সঙ্গী পেলেও নির্জন কারাবাসের কষ্ট হয় তো কিছুটা লাঘব হবে।

পরস্পরের আলাপ হ'ল। দু'জনেই শুনলেন দু'জনের কথা। অ্যাবে ফ্যারিয়া ছিলেন মহাপণ্ডিত। নানা শাস্ত্রে অদ্ভুত ছিল তাঁর জ্ঞান। এডমণ্ডের সমস্ত কাহিনী শুনে তিনি বললেন, এডমণ্ডের এ দুর্দশার কারণ আর কেউ নয়—নিশ্চয়ই ড্যাংলার্স আর ফার্নাণ্ড—যাদের নাকি সে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে এতদিন মনে করে এসেছে। আর, এখানে তাকে নির্বাসন দিয়েছে আর কেউ নয়,—বিশ্বাসঘাতক ভিলফোর্ট।

এডমণ্ড জিজ্ঞাসা করল, "যদি আমরা নতুন করে আবার একটা গর্ত খুঁড়তে সুরু করি তা হলে কি বাইরে যাবার পথ বার করতে পারব না?"

অ্যাবে ম্লান হেসে বললেন, "মনে হয় তা আর হবে না। কত বছরের অমানুষিক পরিশ্রমে আমি পঞ্চাশ ফুট সুড়ঙ্গ কেটেও যখন কিছু করতে পারলাম না তখন আর কোন আশা দেখি না। আর সুড়ঙ্গ তো শুধু কাটলেই হ'ল না, দেয়াল কাটবার পর বিরাট বিরাট

পাথরের চাঁইগুলি গোপনে সরিয়ে ফেলাও তো একটা কম বড় সমস্যা নয়! আমি একটা সিঁড়ি ভেঙ্গে তার ফাঁকা জায়গায় ওগুলো এতদিন গুঁজে গুঁজে রেখেছি, কিন্তু আর তো একচুলও জায়গা নেই ওখানে!"

নতুন করে সুড়ঙ্গ খোঁড়া সম্ভব না হলেও প্রত্যহ কারারক্ষকের অনুপস্থিতির সময়ে দুই বন্দীর লুকিয়ে-লুকিয়ে একত্র হওয়ার কোন বাধা রইল না আর। আগেই বলেছি অ্যাবে ফ্যারিয়া ছিলেন নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সময় কাটাবার জন্য এডমণ্ডকে তিনি সেই সব শাস্ত্র শেখাতে আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে এডমণ্ডও নানা দেশের ইতিহাস, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠল। কারাবাসের অসহনীয় দুঃখ এইভাবে কিছুটা লাঘব হ'ল ওঁদের।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন অ্যাবে ফ্যারিয়া অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর একটা হাত পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে; এখান থেকে জীবিত অবস্থায় আর তাঁর মুক্তিলাভ হ'ল না।

এডমণ্ডকে ডেকে তিনি বললেন, "আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। যাবার আগে তোমাকে আমি একটা মহামূল্যবান্ গোপন খবর দিয়ে যাব—যা নাকি কেউ জানে না।"

তারপর তিনি জানালেন যে এক সময়ে তিনি ইটালির কার্ডিনাল স্পাডার সেক্রেটারী ছিলেন। কার্ডিন্যালের আর কেউ ছিল না, তাই তাঁর সম্পত্তি তিনি ওঁকেই দিয়ে যান আর বলে যান যে তিনি শুনেছেন তাঁদের পূর্বপুরুষেরা এক বিরাট ধনভাণ্ডারের মালিক ছিলেন কিন্তু সে ধনভাণ্ডার যে কোথায় লুকানো আছে অনেক পুরুষ থেকে কেউ সে খবর জানে না। ফ্যারিয়া যদি তার সন্ধান পান তবে স্পাডা-বংশের সে সম্পত্তি তাঁরই হবে।

"কার্ডিনাল স্পাডার সম্পত্তি বলতে ছিল একটা বিরাট লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার। তাঁর দানপত্র অনুযায়ী আমিই হলাম ঐ লাইব্রেরীর মালিক। লাইব্রেরী হাতে পেয়েই আমি তন্ন তন্ন করে তা খুঁজতে লাগলাম—যদি কোনও কাগজ-পত্রে ঐ ধনভাণ্ডারের কোন হদিস মেলে। কিন্তু নাঃ, কিচ্ছু মিলল না।

"তারপর একদিন। লাইব্রেরীতে একখানা দুষ্প্রাপ্য বহুদিনের পুরোনো বই পেয়ে আমি সেখানা পড়তে সুরু করেছি, হঠাৎ টেবিলের মোমবাতিটা গেল নিবে। তখন শীতকাল। ঘরের এক কোণে আগুন জ্বলছিল, আমি একটা কাগজ পাকিয়ে সেটা জ্বালিয়ে মোমবাতি ধরিয়ে নেব ঠিক করলাম। বাজে কাগজ খুঁজতে গিয়ে দেখি ঐ বইএর মধ্যেই একটা পুরোনো হলদে কাগজ ভাঁজ করে গুঁজে রাখা হয়েছে—বোধ হয় কেউ পেজ্-মার্ক্ হিসেবে ওটা ওখানে গুঁজে রেখেছিল। আমি সেই কাগজটা নিয়েই আগুনের ওপর ধরলাম আর, আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে আগুনের আঁচ পেয়ে ফাঁকা কাগজের মধ্যে যেন যাদুমন্ত্রে কতকগুলি লেখা ফুটে উঠল। তার মানে—কাগজটায় অদৃশ্য কালিতে কিছু লেখা আছে, যা আগুনে গরম করলে তবেই ফুটে ওঠে। নিশ্চয়ই কোন গোপন সাঙ্কেতিক কথা। সত্যি তাই! আর, অবাক্ কাণ্ড, এতদিন

ধরে যা খুঁজছি স্পাডা-বংশের সেই গুপ্তধনের সঙ্কেতই লেখা রয়েছে ওতে! আগুনে খানিকটা পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও অনেক ভেবে ভেবে আমি সমস্ত লেখাটাই উদ্ধার করে ফেললাম। তাতেই জানতে পারলাম ঐ গুপ্তধন পোঁতা আছে মন্টেক্রিস্টো দ্বীপের একটি গোপন গুহার ভিতরে। সেখানে কি করে যেতে হবে সে সঙ্কেতও দেওয়া ছিল ঐ লেখার মধ্যে।

"আমার অবস্থা তো বুঝতেই পার। ঐ বিরাট ঐশ্বর্য তা হ'লে আমারই হাতের মুঠোয়! আর ঐ দ্বীপের কথাও আমার অজানা নয়। আমি অবিলম্বে সেখানে যাবার জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু······

"কিন্তু যাওয়া আর আমার হ'ল না। ঠিক ঐ সময়ে এসে পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করলে।"

এই কথা বলে অ্যাবে ফ্যারিয়া একটু যেন দম নিলেন। তারপর বললেন, "যে ধন আমি পেলাম না আমার জীবনে তার আর কোন প্রয়োজনও নেই। সে সম্পত্তি আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম। যদি কোন দিন এখান থেকে মুক্তি পাও, মন্টেক্রিস্টো দ্বীপে গিয়ে সেই গুপ্তধন উদ্ধার ক'র।" এই বলে ফ্যারিয়া এডমণ্ডকে সেই অগাধ ধনরাশির সমস্ত সন্ধান বলে দিলেন।

এবং, এর পরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

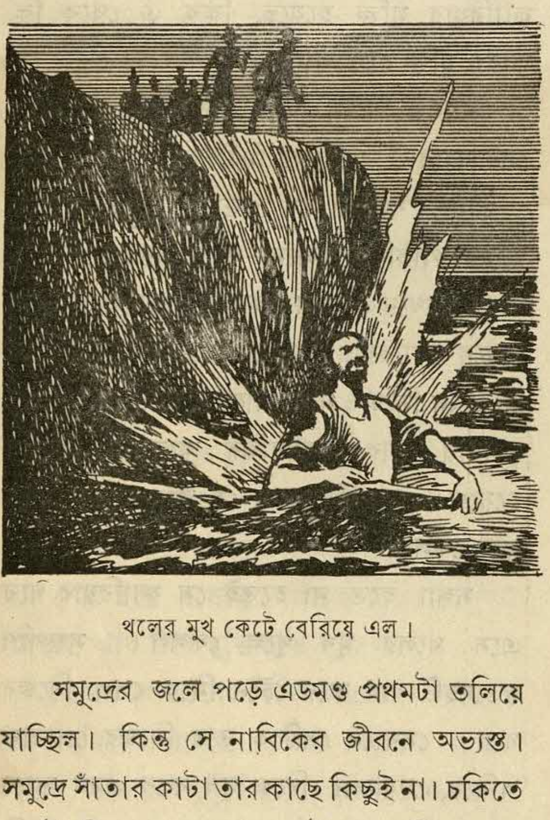
শ্যাতুর কারারক্ষীরা যথা সময়ে এসে ফ্যারিয়ার মৃতদেহ আবিষ্কার করল। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন, তারপর একটা বড় চটের থলের মধ্যে মৃতদেহটা ভরে, মুখ সেলাই করে রেখে সবাই চলে গেল। সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে থেকে এডমণ্ড তাদের কথাবার্তা শুনল এবং জানতে পারল যে রাত্রি দশটায় ওরা ফ্যারিয়াকে কবর দেবে।

চৌদ্দ বছর নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে এখন একমাত্র সঙ্গীকে এ ভাবে হারিয়ে এডমণ্ডের মনের অবস্থা কি রকম হ'ল সহজেই বোঝা যায়। প্রথমটা সে শোকে মুহ্যমান্ হয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই সে সামলে উঠল। মৃত্যুতেই ফ্যারিয়ার মুক্তি হয়েছে, কিন্তু এ থেকে কি তারও মুক্তি হতে পারে না?

এডমণ্ড এখন আর সে এডমণ্ড নেই। সেই ফ্যারাওঁ জাহাজের মিষ্টিস্বভাব, লাজুক মেট —উনিশ বছরের যে এডমণ্ড ডান্টের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম—এ সে নয়। দুঃখকষ্টের ঘা খেয়ে খেয়ে এ এখন এক অন্য মানুষ। তা ছাড়া অ্যাবে ফ্যারিয়ার সাহচর্যে কয়েক বছর কাটিয়ে সে এখন নিজেও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আগের তুলনায় তার বিদ্যাবুদ্ধির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সে ফ্যারিয়ার ঘরে এসে থলের মুখ খুলে ফেলল। সন্তর্পণে মৃতদেহটি বার করে টেনে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। সেখানে সেটিকে তার নিজের পোষাক পরিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে এমন ভাবে শুইয়ে দিল যেন হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি এডমণ্ডই দেয়ালের দিকে মুখ করে ঘুমুচ্ছে। তারপর ফিরে এল ফ্যারিয়ার কামরায়। নিজে ঢুকল সেই থলের মধ্যে; এবং, ঢুকে, নিজের হাতে ফের সেলাই করল থলির মুখ আর ডান হাতের মধ্যে লুকিয়ে রাখল সেই দেয়াল খোঁড়ার ধারাল অস্ত্রটা।

রাত দশটায় বাহকেরা এল। থলের মধ্যে যে ফ্যারিয়া নেই, জীবিত এডমণ্ডই ঢুকে রয়েছে, তা তারা বুঝতে পারল না। তারা কিন্তু কোন কবর খুঁড়ল না। থলেটা নিয়ে চলে এল দুর্গের প্রাচীরের ওপর, তারপর সেটা দোলাতে দোলাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রের জলে। শ্যাতু দ্য ঈফে এইভাবেই মৃতদেহ কবর দেওয়া হ'ত।



থলের মুখ কেটে বেরিয়ে এল।

সমুদ্রের জলে পড়ে এডমণ্ড প্রথমটা তলিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে নাবিকের জীবনে অভ্যস্ত। সমুদ্রে সাঁতার কাটা তার কাছে কিছুই না। চকিতে অস্ত্রটা দিয়ে থলের মুখ কেটে সে বেরিয়ে এল, তারপর ডুব-সাঁতার কেটে কেটে অনেক দূরে গিয়ে ভেসে উঠল—পাছে কেউ তাকে দেখে ফেলে।

সাঁতরে চলল এডমণ্ড। সৌভাগ্যক্রমে একটু যেতেই সে দেখতে পেল—জলের মধ্যে ছোট্ট একটা দ্বীপ ডুবো-পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করে রয়েছে। সেখানে বসে সে একটু বিশ্রাম করছে, এমন সময় এল প্রবল ঝড়। দেখতে দেখতে কোথা থেকে একটা জেলে-ডিঙ্গি এসে আছড়ে পড়ল সেই ডুবো-পাথরে আর তেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আরোহীরা কোথায় ভেসে গেল তার ঠিক নেই।

এডমণ্ড দেখল জলে একটা লাল টুপি ভাসছে; সে সেটা সন্তর্পণে তুলে নিল।

সেই প্রচণ্ড ঝড়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে সেইখানেই বসে রইল এডমণ্ড। ভোরের দিকে মনে হ'ল দূরে একটা জাহাজ যাচ্ছে। এ ধরনের জাহাজ চোরা-কারবারের উদ্দেশ্যে তখন হামেশাই এদিক্ ওদিক্ যাতায়াত করত। জাহাজ দেখে এডমণ্ড লাল টুপিটা মাথায় দিয়ে সাঁতরে চলল তার দিকে। জাহাজের লোকেরাও তাকে দেখতে পেয়েছিল। তারা তাড়াতাড়ি এসে তাকে জল থেকে তুলে নিল। এডমণ্ড জানাল—সে জেলে-ডিঙ্গি করে যাচ্ছিল, ঝড়ে সব ভেঙ্গেচুরে তলিয়ে গেছে, তার সঙ্গীরাও সব ভেসে গেছে।

ডিঙ্গির ভাঙ্গাচোরা টুকরো তখনও এদিক্ ওদিক্ ছড়িয়ে ছিল, কাজেই তার কথায় কেউ অবিশ্বাস করল না।

পরদিন জাহাজ একটা ছোট দ্বীপে নোঙর করল। কি দ্বীপ এটা? নাবিকেরা বলল, "এটা মণ্টেক্রিস্টো দ্বীপ।"

এডমণ্ড যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। পরক্ষণেই কিন্তু সে মতলব ঠিক করে নিল। একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে পিছলে পড়ার ভান করে সে একেবারে গড়িয়ে পড়ল নীচে।

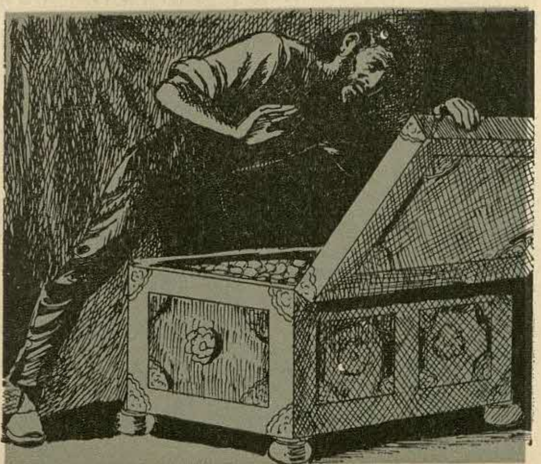
সবাই তাকে তুলতে ছুটে এল। এডমণ্ড বলল, তার পা একদম ভেঙ্গে গেছে, এখন

তাকে নাড়াচাড়া করলে সে আর বাঁচবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ তাকে কিছু খাবার-দাবার দিয়ে ওখানেই ফেলে রেখে যাক ওরা। ফিরবার পথে, যদি সে বেঁচে থাকে, তবে যেন তুলে নিয়ে যায়।

তাই করা হ'ল। কিছু খাবার-দাবার, বুনো জানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা বন্দুক আর কিছু গোলাবারুদ রেখে জাহাজ নিয়ে চলে গেল ওরা। এডমণ্ড একটা কোদালও চেয়ে নিল—যদি পা সারে তা হলে দ্বীপে ঘুরে ফলমূল কিছু পেলে যাতে তুলে খেতে পারে।

জাহাজ অদৃশ্য হতেই এডমণ্ড লাফিয়ে উঠল। গুপ্তধনের সন্ধান তার মুখস্থই আছে, খুঁজে বার করতে সময় লাগল না তেমন। পাহাড়ের ওপর এক জায়গায় একটা বিরাট আলগা পাথর বসানো। সেইখানে বারুদ রেখে তাতে আগুন জ্বালাতেই পাথর ফেটে বেরিয়ে এল একটা গুপ্ত গুহার মুখ। তলায় সিঁড়ি নেমে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই যা চোখে পড়ল তাতে মাথা ঘুরে গেল এডমণ্ডের। লোহা দিয়ে



রাজার ঐশ্বর্য তার কাছে কিছুই না।

বাঁধানো ওক্ কাঠে তৈরী এক বিরাট সিন্দুক! তাতে কত যে সোনাদানা, মণিমুক্তো, হীরে-জহরৎ ঠাসা তার আর লেখাজোখা নেই। রাজার ঐশ্বর্য তার কাছে কিছুই না।

একবার তো সে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এসে দ্বীপময় খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াল, কি করবে বুঝতে না পেরে। তারপর একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ফের ফিরে এল গুহায়। কিছু সোনার চাকতি আর মণিমুক্তো পকেটে ভর্তি করে নিয়ে সে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। আসবার সময় গুহার মুখ আবার পাথর দিয়ে ঢেকে, তার ওপর মাটি ছড়িয়ে, ঘাসের চাপড়া আর শিকড়শুদ্ধ বুনো গাছ লাগিয়ে দিয়ে এল—যাতে ওই গুহার অস্তিত্ব কেউ টের না পায়।

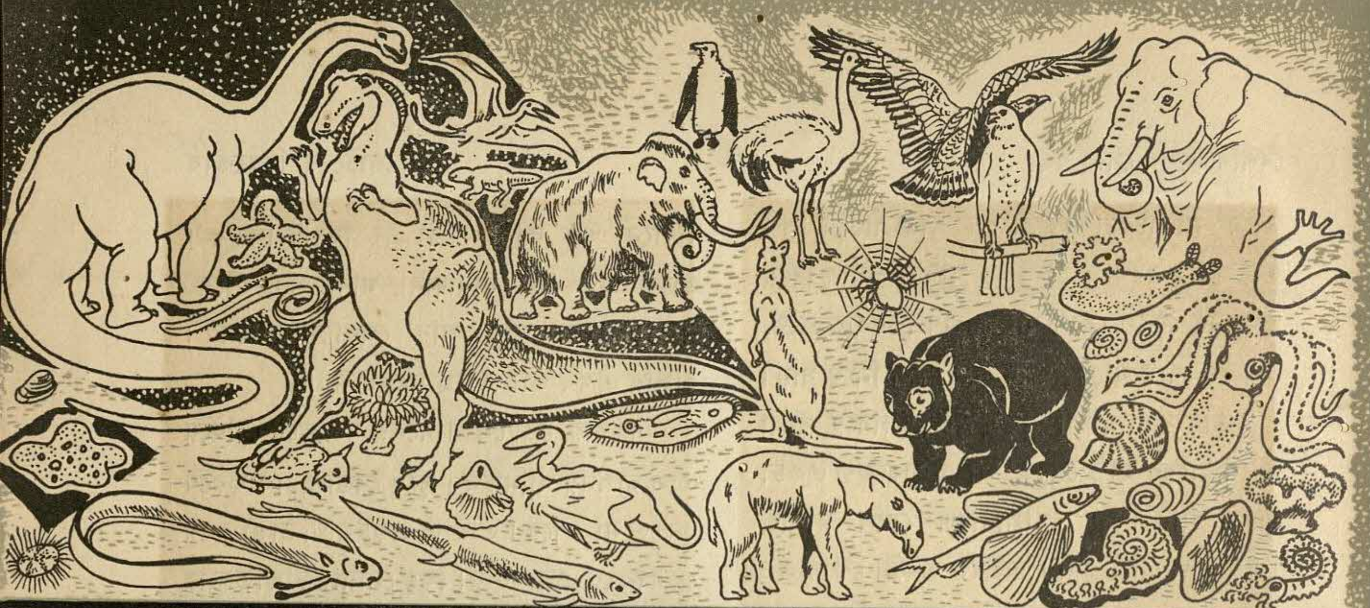
দু'-একদিন পরেই সেই জাহাজটা ফিরবার পথে পূর্বব্যবস্থা মত তাকে তুলে নিয়ে এল।

দেশে এসে এডমণ্ড পকেটে-করে-আনা ঐ সামান্য কয়েকটা মণিমুক্তো বেচেই যে টাকা পেল তাতে নিজেই একটা ছোট জাহাজ কিনে আবার ফিরে এল মন্টেক্রিস্টো দ্বীপে। তারপর গুহা থেকে বাকি ধনরত্নগুলো তুলে নিজের জাহাজে নিয়ে আসতে কোনই অসুবিধা হ'ল না তার।

দেশে ফিরে এল এডমণ্ড। সে এখন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী। কিন্তু সে এখন আর সেই জেল-পালানো ছোকরা এডমণ্ড নয়। সে তো কবে মারা গেছে! অন্ততঃ লোকে তাই জানে এবং তাই জানুক। ফ্রান্সের এই নতুন ধনকুবের হচ্ছেন মন্টেক্রিস্টোর কাউন্ট—কাউন্ত দ্য মন্তেক্রিস্তো বা কাউন্ট অব্ মন্টেক্রিস্টো। এখন থেকে সেই নামেই সে পরিচিত হবে।

তারপর সুরু হ'ল তার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

(পরবর্তী অংশ শেষের দিকে)



জীবজন্তুর কথা

"লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা"

আমার টেবিলের সামনে দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ নির্জীবের মত পড়ে ছিল। হঠাৎ কি মনে করে সেটা আমার টেবিলের ওপর নেমে এল। ঠিক সেই সময়ে আমার ছোট মেয়ে ঘরে এসে ঢুকল আর সামনেই টিকটিকিটাকে দেখে লাফিয়ে উঠল। ভয়ের চেয়ে ঘেন্নাটাই যেন তার বেশী!

"এঃ রাম, টিকটিকিটাকে তাড়িয়ে দাও না বাবা, দেখছ কেমন করে তাকিয়ে আছে!"

আমি বললাম, "কেন, কি দোষ করল ওটা? টেবিলে এসেছে, নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে!"

বলতে বলতেই দেখি একটা আরশোলা উড়ে এসে টেবিলের আর এক কোণায় বসেছে। হঠাৎ টিকটিকিটা বিদ্যুৎবেগে আরশোলাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর চোখের পলকে তাকে মুখে তুলে নিয়ে ছুটে ফিরে গেল তার দেয়ালে। এর পর কয়েকটা আছাড় দিতেই আরশোলার দফা শেষ, স্নুরু হ'ল টিকটিকির 'ডিনার'।

মেয়েকে বললাম, "দেখলি? কালই না বলছিলি আরশোলা আমাদের কত অপকার করে—উৎপাত করে। কত রকম ছোঁয়াচে রোগ ছড়াতে ওস্তাদ্ ওরা। টিকটিকিটা সেই আরশোলাকে খেয়ে আমাদের উপকারই করল তো! শুধু আরশোলা? ঘরে কত রকম পোকা-মাকড়ের অত্যাচারে আমরা উত্যক্ত হয়ে মরি। টিকটিকিটা স্নুযোগ পেলে তাদেরও খেতে কস্নুর করে না। তা হলে? দুনিয়ায় কাউকেই তাচ্ছিল্য করতে নেই।"

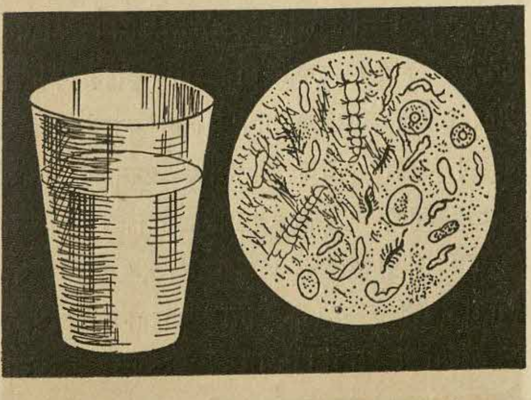
মেয়ে আমার চুপ করে গেল। জবাব দেবার ছিল না যে তার কিছু।

জীবজন্তুর কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই একটা টিকটিকির গল্প বলতে শুনে তোমরাও হয়তো অবাক্ হচ্ছ, কিংবা হয়তো ভাবছ, তা হলে টিকটিকিটা কি জীবজন্তুর রাজ্যে একটা কেউকেটা গোছের কেউ?

সত্যি কিন্তু তা নয়। লিখতে বসে নেহাৎ চোখের সামনে টিকটিকিটা দেখলাম বলেই তার

কথা উঠল। টিকটিকি ছাড়া আমাদের আশে-পাশে সর্বদাই আরো হাজারো রকমের প্রাণী ছড়িয়ে আছে, তাদের যে কোনোটাকে নিয়েই গল্প সুরু করা যেতে পারত।

"সর্বদাই হাজারো রকম প্রাণী ছড়িয়ে আছে?" তোমরা ভাবছ আমি বড় বাড়িয়ে বলছি। মোটেই তা নয়। আমাদের আশে-পাশে সর্বদাই কিলবিল করছে নানা রকম জীবন্ত প্রাণী। খালি চোখে তাদের বেশীর ভাগকেই দেখা যায় না, কিন্তু যদি আমাদের চোখের লেন্স দু'টো সাধারণ লেন্স না হয়ে অণুবীক্ষণের মত হ'ত তা হলে স্পষ্ট দেখা যেত তাদের। বাতাসে ধূলোর মত ছড়িয়ে আছে তারা, মাটিতে ধূলোর মধ্যে, বাগানের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। হাজার নয়—লক্ষ লক্ষ প্রাণী। এমন কি এক গ্লাস জল নিয়ে দেখ। এমনিতে কিছুই চোখে পড়বে না—মনে হবে নির্মল টলটলে জল! কিন্তু যদি ওরই এক ফোঁটা নিয়ে অণুবীক্ষণের তলায় রাখ, একেবারে আঁৎকে উঠতে হবে। কত রকম বিচিত্র চেহারার ক্ষুদে



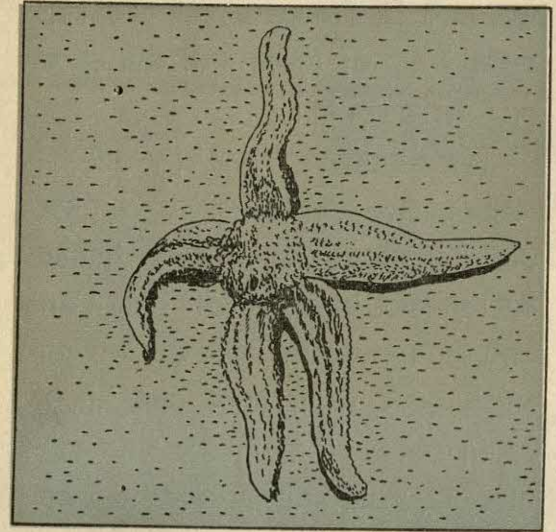
এক গ্লাস জল; তারই এক ফোঁটা নিয়ে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে কেমন দেখায়।

ক্ষুদে প্রাণী কিলবিল করছে সেই এক ফোঁটা জলের মধ্যে, তা দেখলে তখন আর সে জল খেতে প্রবৃত্তি হবে না।

কিন্তু শুধু ছোট ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীই নয়, কবি বলেছেন, "লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা!" সত্যিই তাই, জগৎ প্রাণময়— প্রাণিময়ও বটে। পৃথিবীতে এমন জায়গা নেই যেখানে জ্যান্ত প্রাণী নেই। তাদের মধ্যে যেমন ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী আছে—যাদের সহজে চোখে দেখা যায় না, তেমনি এমন বড় বড় জানোয়ারও আছে যাদের নাকি এক কথায় বলা যায় অতিকায়। এদের কোন কোনটা লম্বায় একশ' ফুট, ওজনেও বেশ কয়েক হাজার মণ। জলের তিমির কথাই ধর না কেন! তেমনি ডাঙ্গার হাতী! সে-ই বা কম কিসের?

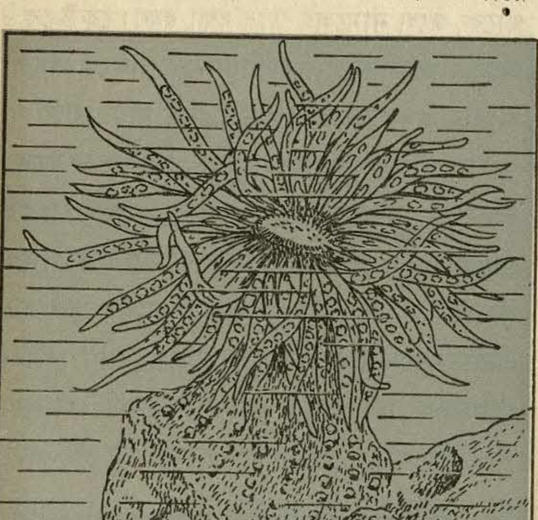
এই সব জন্তুদের চেহারায়, চাল-চলনে কত তফাৎ! কেউ জলের নীচে সাঁতরে বেড়ায়, ডাঙ্গায় তুললেই শেষ। কেউ আবার ডাঙ্গাতেই থাকে, জলে নামলেই তার দফা রফা। কেউ কেউ আবার জলে, ডাঙ্গায় দু'জায়গায়ই থাকতে পারে। আবার এমন জন্তুরও অভাব নেই যারা ডাঙ্গা বা জলের চাইতে আকাশটাকেই বেশী পছন্দ করে। চলাফেরা করতে হলে ঐ আকাশটাকেই বেছে নেয়। কেউ বিদ্যুতের বেগে ছুটতে পারে, কারো নড়তে-চড়তে বারো মাস। আবার এমন জানোয়ারও আছে যারা সারা জীবন গাছেদের মত একই জায়গায় মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে। কেউ মাংস ছাড়া খেতেই পারে না, কেউ বা ঘোরতর সাত্ত্বিক। বৈষ্ণবদের মত নিরামিষ ছাড়া কিছু মুখে তোলে না।

চেহারারই বা কত রকম-ফের! কারো

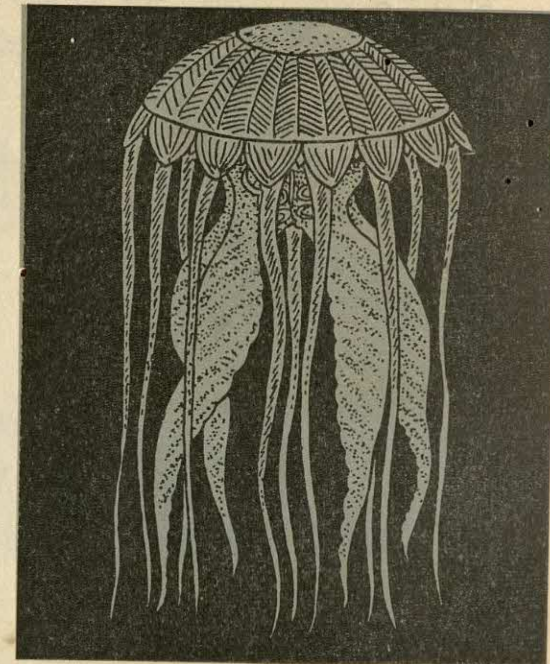


তারা মাছ আসলে মাছ নয়, কিন্তু দেখতে ঠিক তারার মত।

চেহারা তারার মত—হাত-পা, নাক-কানের বালাই নেই। কারও বা থাকার মধ্যে আছে কতকগুলো শুঁড়। কাউকে দেখলে মনে হবে ঠিক যেন একগোছা ফুল। আবার কেউ বা দেখতে ঠিক একটা খোলা ছাতার মত। কারও গায়ে



ফুল নয়—আসলে এটিও একটি সামুদ্রিক প্রাণী।



খোলা ছাতার মত দেখতে হলে কি হবে,
এও এক জাতের সামুদ্রিক প্রাণী !

শক্ত খোলা, কারো গায়ে আঁশ, কারও বা ইয়া বড় বড় লোম, আবার কারো কারো শরীরে শক্ত জিনিষই নেই—থল্‌থলে জেলির মত চেহারা, রোদে ফেলে রাখলে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যাবে ! কারো নাকের বাহার দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়, কারো নাক নেই বললেই চলে। কানের বেলাও তাই। কেউ চার পায়ে হাঁটে, কারো মাত্র দু'টিই ঠ্যাং, আবার কারো কারো পা-ই নেই ! আবার অজস্র পা আছে এমন প্রাণীরও অভাব নেই,—যেমন কেন্নো। কারো পেছনে রয়েছে দিব্যি পুরুষ্টু একটি লেজ, কারো বা মাথায় রয়েছে ঝুঁটি, আবার কারো বা রয়েছে এক যোড়া পাখা। গায়ের রং-এও কত না বৈচিত্র্য! জন্মাবার ধরনও সেই রকম কত বিচিত্র! কেউ জন্মায় ডিম ফুটে, কেউ সোজাসুজি বাচ্চা



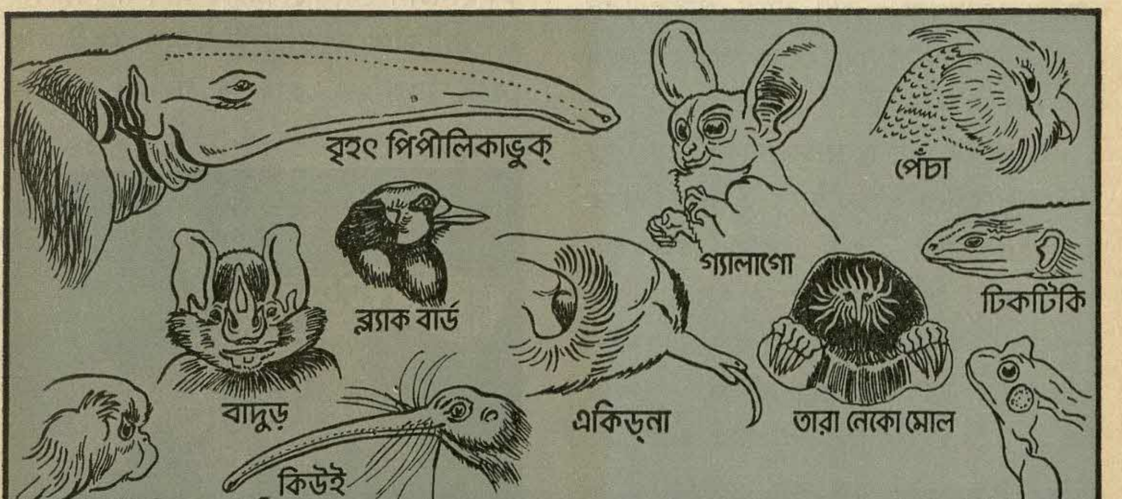
অক্টোপাস বা 'আট-শুঁড়ো' প্রাণী

হয়েই মা-র পেট থেকে বেরিয়ে আসে, আবার কোন কোন প্রাণী আছে যাদের একটা দু' টুকরো হয়ে গিয়ে দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা প্রাণী হয়ে যায়।

এই হচ্ছে প্রাণিজগৎ! ভাবলেও কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

এর ক'টিকেই বা আমরা চিনি? পণ্ডিতেরা এ পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ রকমের প্রাণী খুঁজে বার করছেন—তাদের চেহারা, গড়ন-পেটন, হালচাল—এক কথায় জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিবরণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এখনও কত কি জানতে বাকি! এখনও নিত্য-নূতন জাতের প্রাণীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। আবার যে সব প্রাণী এককালে পৃথিবীতে ছিল, এখন লোপ পেয়ে গেছে তাদেরও খবর—তাদের সম্বন্ধেও নানা তথ্য খুঁজে বার করতে ছাড়েন নি তাঁরা। তাদের সংখ্যাও তো বড় কম নয়!

গোড়াতে যে টিকটিকিটার কথা দিয়ে গল্প সুরু করেছিলাম তার কথা ভাবলেই বোঝা যায় পৃথিবীতে কোন কিছুই অকারণে সৃষ্টি হয় নি।



নাকের বাহার

যে পোকাটাকে টিকটিকিটা ধরে খাচ্ছে তারও হয়তো কিছু করবার ছিল। অর্থাৎ, সোজা কথায়, প্রত্যেক জীবজন্তু, কীটপতঙ্গেরই কিছু না কিছু দান আছে এই পৃথিবীতে। কেউ প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের উপকার করছে, কেউ বা প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের অপকার করলেও কোন-না-কোন ভাবে পৃথিবীর কোন-না-কোন উপকারে লাগছে। এ সব কথা আমরা পরে আবার আলোচনা করব।

প্রথম প্রাণী অ্যামিবা

এর আগে আমরা বলেছিলাম পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসকে মোটামুটি তু'টি ভাগে ভাগ করা যায় ;—এক জড়—অর্থাৎ অচেতন পদার্থ। যেমন ইট-পাটকেল, লোহা-তামা, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি ; আর তুই,—জীব বা জীবন্ত পদার্থ, অর্থাৎ কিনা যাদের প্রাণ আছে। জীব আবার মোটামুটি তু' জাতের—গাছপালা আর প্রাণী। গাছপালার কথা আগে আমরা কিছু কিছু আলোচনা করেছি, এবারে প্রাণীর প্রসঙ্গে আসা যাক।

জীবজন্তুর আগে গাছপালারাই যে এসে প্রথমে পৃথিবীতে আড্ডা গাড়ে এ কথা তোমরা আগেই শুনেছ। এমন একদিন ছিল যখন পৃথিবীতে জ্যান্ত জিনিস বলতে গাছপালাকেই বোঝাত। অবশ্য সে গাছপালা ঠিক এখনকার গাছপালার মত নয়। তারপর হঠাৎ একদিন কি করে প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব হ'ল সেও আজ পর্যন্ত এক রহস্য রয়ে গেছে।

প্রথম গাছপালার মত প্রথম প্রাণীও কিন্তু দেখা দেয় জলে। নামেই সেগুলো প্রাণী, চাল-চলনে উদ্ভিদের চাইতে খুব যে তাদের পার্থক্য ছিল এমন মনে হয় না। এ যুগের যে সব বড় বড় জীবজন্তুর সঙ্গে আমরা পরিচিত তাদের সঙ্গে কোনই মিল ছিল না সেই আদিম প্রাণীর। বিজ্ঞানীদের মতে প্রথম প্রাণীর শরীরে মাত্র একটি কোষ ছিল—যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি 'সেল্'। কিন্তু, আশ্চর্য, অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মিল না থাকলেও এই এককোষী আদিম প্রাণীর বংশধর কিন্তু আজও পৃথিবীতে টিকে রয়েছে !

তোমরা অ্যামিবার নাম শুনেছ হয় তো। এই অ্যামিবাই হচ্ছে সেই প্রথম প্রাণীর বর্তমান বংশধর। এ এমন এক প্রাণী যা উদ্ভিদ্ না প্রাণী বলা কঠিন। কোন কোন বিজ্ঞানী একে উদ্ভিদের দলে টানতে কম চেষ্টা করেন নি, তবে সব দিক্ দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখলে একে প্রাণীই বলতে হবে। সবচেয়ে আদিম স্তরের প্রাণী হয়তো প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ তুই-ই। ওর হালচাল শুনলে তোমরাও ঐ কথা বলবে।

অ্যামিবার সমস্ত শরীর বলতে একটি মাত্র কোষ, কিন্তু সে কোষ সে ইচ্ছামত বাড়াতে-



অ্যামিবা : একটি মাত্র কোষ দিয়ে এদের শরীর তৈরী।

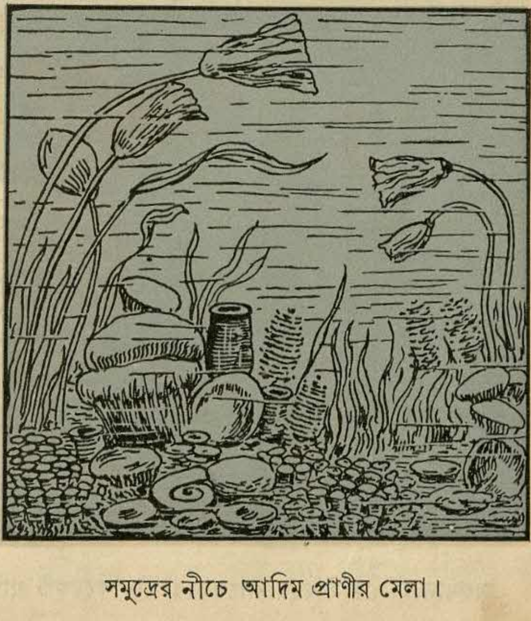
কমাতে পারে। কখনও লম্বা, কখনও চ্যাপ্টা, কখনও গোল। আবার কখনও বা বাঁকাচোরা, আঁকাবাঁকা—যাকে আমরা ঠাট্টা করে বলি "লগবগ সিং"। অ্যামিবার এই ক্ষণে ক্ষণে দেহ পরিবর্তন, যাকে নড়াচড়াও বলতে পার, তার প্রাণিত্বের একটি প্রমাণ। তা ছাড়া তার খাওয়াটাও ঐ কথা বলে। বেঁচে থাকতে গেলে —জ্যান্ত থাকতে হলে না খেলে চলে না। গাছেরা কি ভাবে খায় তা আমরা আগেই বলেছি। অ্যামিবার খাওয়ার ধরনটা কিন্তু ঠিক সে রকম নয়, বরঞ্চ বলব ভারী অদ্ভুত। খাবার সময় অ্যামিবা তার শরীরের খানিকটা অংশ বড় করে আঙ্গুলের মত বাড়িয়ে দেয়। তারপর যদি কোন ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র জীবাণু জাতের খাবার তার সামনে আসে তবে ঐ আঙ্গুলের ফাঁকে তাকে টেনে নিয়ে হজম করে ফেলে। অবশ্য কখনও কখনও এরা গাছেদের মত প্রকৃতি থেকেও নিজেদের খাবার তৈরী করে নেয়। সেইখানেই উদ্ভিদের সঙ্গে ওদের মিল।

এখন জল-স্থল-বাতাস সর্বত্রই অ্যামিবার নিবাস। তবে জলটাই বোধ হয় ওরা পছন্দ করে বেশী। জীবমাত্রই বংশ বিস্তার করবে, অ্যামিবাও করে; কিন্তু এদের বংশ-বিস্তার অর্থাৎ বাচ্চা হওয়াও ভারী মজার। বাচ্চা হবার সময়ে শরীরের একটা অংশ ফেঁপে ওঠে, তারপর আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে খসে পড়ে। এইভাবে একটা অ্যামিবা হয়ে যায় দু'টো। তখন কোন্‌টা মা-অ্যামিবা আর কোনটা বাচ্চা বুঝবার উপায় নেই।

একটা মাত্র কোষ নিয়ে শরীর তৈরী, কাজেই অ্যামিবা যে খুবই ছোট্ট প্রাণী তা আর বলে দিতে হবে না। এত ছোট যে অণুবীক্ষণ ছাড়া খালি চোখে এদের বড়-একটা মালুমই হয় না। তবে আদ্যিকালের অ্যামিবারা নাকি আকারে অনেক বড় হ'ত—এক একটা ৮।৯ ইঞ্চি পর্যন্ত হ'ত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

নানা জাতের প্রাণী

গাছপালার কথা বলতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম, সংখ্যায় যারা অনেক এবং বৈচিত্র্যে যারা ভরপূর তাদের ভাল করে জানতে হলে— তাদের সম্বন্ধে ঠিকমত বৈজ্ঞানিক তথ্য বার করতে হলে তাদের ঠিকমত শ্রেণী-বিভাগ করা দরকার। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাতেই এটা একটা গোড়ার কথা এবং বড় কথা। জীবজন্তু সম্বন্ধে জানতে গেলেও গোড়ায় এই শ্রেণী-বিভাগ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সুখের বিষয় প্রাণিবিজ্ঞানীরা আজ এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। পৃথিবীর এই লক্ষ কোটি প্রাণীকে তাঁরা বেশ সুশৃঙ্খল



সমুদ্রের নীচে আদিম প্রাণীর মেলা।



আদ্যিকালের সমুদ্রে এরাই ছিল প্রথম যুগের বাসিন্দা।

ভাবেই নানা শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়েছেন আর তারই ফলে ওদের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু সহজে জানবার সুযোগ পেয়েছি।

জীবজন্তুর শ্রেণী-বিভাগ করতে গিয়ে প্রথমেই তাদের মোটামুটি দু'টি বড় বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক হচ্ছে—যে সব প্রাণীর মেরুদণ্ড অর্থাৎ শিরদাঁড়া আছে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে—যাদের ও-জিনিসটা নেই। হাড়কে ভাল বাংলায় বলে অস্থি। কাজেই এই দুই জাতের প্রাণীকে আমরা অস্থিক আর নিরস্থিক প্রাণী বলতে পারি। যাদের হাড় আছে তারাই হ'ল অস্থিক ; কারণ শিরদাঁড়া থাকা মানেই হাড় থাকা, ইংরেজীতে এদের বলে 'ভার্টিব্রেট'। আর, যাদের হাড় নেই, তারাই হল নিরস্থিক বা 'ইন্‌ভার্টিব্রেট'।

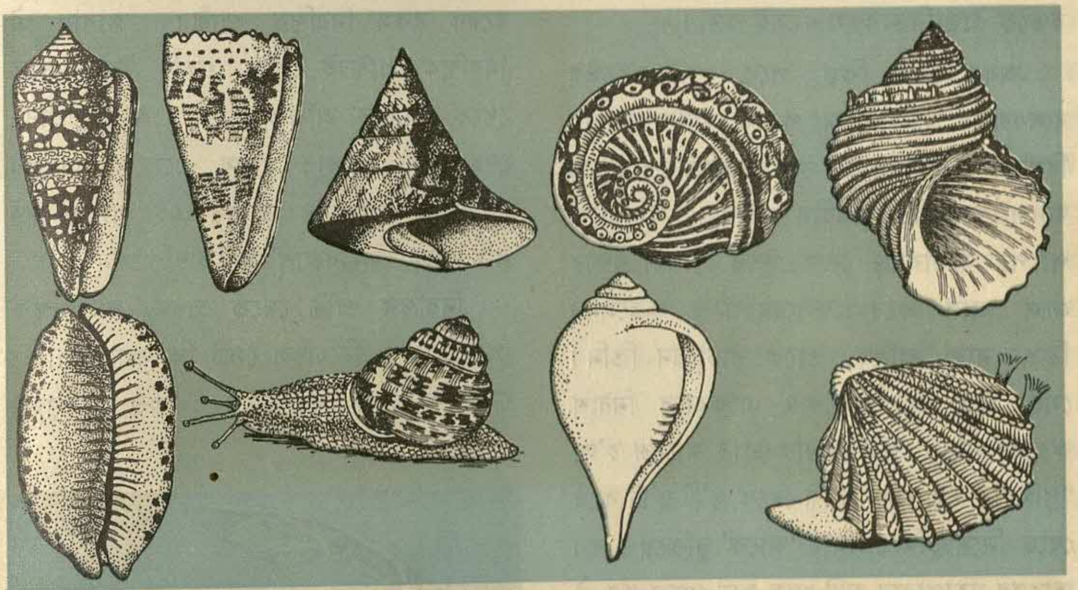
প্রথম যুগে পৃথিবীতে যে সব প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল তারা সকলেই নিরস্থিক জীব। অ্যামিবার তো কোন হাড়গোড় নেই,



অনুমান ৫০ কোটি বছর আগেকার আর কয়েকটি প্রাণী—এদেরই কারো কারো বংশধরেরা এখনও টিকে আছে।

তার জাতভাইরাও ছিল ঐ রকম। যে সব প্রাণীকে আমরা আজকাল সামুদ্রিক পোকা-মাকড়ের দলে ফেলি প্রথম যুগের প্রাণীরা ছিল সব ঐ দলের। তবে হাড় না থাকলেও ক্রমে এদের অনেকের গায়ে একটা শক্ত খোলস, যাকে আমরা বলি 'খোলা', দেখা দেয়—আত্মরক্ষার জন্য। শামুক, ঝিনুক, গেঁড়ি, গুগলি, কড়ি, শাঁখ এদেরই জাতভাই ছিল তারা। আমাদের চিংড়ির পূর্বপুরুষরাও ছিল ঐ দলে। চিংড়ি যে আসলে মাছ নয় তা নিশ্চয়ই জান, চেহারা দেখেও হয়তো অনুমান করতে পার।

তবে শামুক-ঝিনুক-গেঁড়ি-গুগলির জাতভাই বলে এদের নেহাৎ তুচ্ছ ক'র না। কারণ আকারে এদের কোন কোনটা অতিকায় দানবের মত হ'ত বলেই মনে হয়। এদের কথা এবং এদের জাতভাই অর্থাৎ অন্যান্য নিরস্থিক প্রাণীদের কথা আমরা পরে ক্রমে ক্রমে তোমাদের শোনাব। তবে একটা মজার কথা এখানে বলে নেই, যদিও সেটা বিশ্বাস করা একটু শক্ত বৈকি! এই শামুক-গুগলির জাতভাইরাই কিন্তু আমাদের সবাইকার পূর্ব-পুরুষ। তোমার, আমার, সমস্ত মানুষের পূর্বপুরুষ। সুতরাং নিশ্চয়ই আমাদের "গুরুজন"।



শামুক, ঝিনুক, কড়ি, শাঁখ—এদেরই পূর্বপুরুষরা এক সময়ে পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করে গেছে। তারা আমাদেরও পূর্বপুরুষ

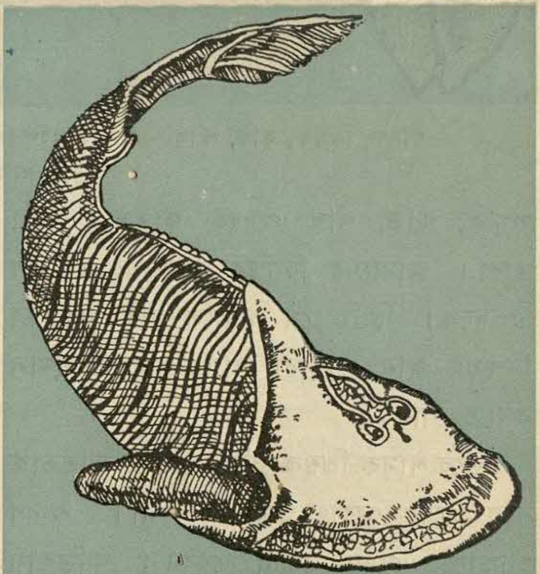
কথাটা শুনতে আজব বলে মনে হচ্ছে, না? আমাদের বা অন্যান্য দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু এমন কথা তো নেই! প্রজাপতি ব্রহ্মা মানুষকে সৃষ্টি করলেন মর্ত্যের শ্রেষ্ঠ জীবরূপে—এই রকমই তো লিখে গেছেন আমাদের দেশের পুরাণকাররা। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, যা নাকি পৃথিবীর কোটি কোটি লোক পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ে, তাতেও তো পৃথিবীর সৃষ্টিকথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—ঈশ্বর সব

প্রথম সৃষ্টি করলেন একটি পুরুষকে যাঁর নাম আদম। এবং তাঁরই হাড় থেকে তৈরী করলেন তাঁর সঙ্গিনী ইভকে। এই আদম আর ইভই হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম মানব দম্পতি। কিন্তু ঐ সঙ্গে অন্য প্রাণী সৃষ্টির কথা তেমন করে কিছুই বলা হয় নি ঐ বই-এ। তবে সাপের কথা আছে,—শয়তান সাপ হয়ে কি করে ইভকে প্রতারিত করল—সেই কথা।

অবশ্য এর কিছু পরে, আদম-ইভের বংশধরদের মধ্যে দশম পুরুষে আমরা নোয়ার বিখ্যাত কাহিনী দেখতে পাই। সে গল্প তোমাদের আগেই বলেছি, 'পৃথিবীর কথায়'। পৃথিবীতে পাপের বাড়াবাড়ি দেখে ঈশ্বর পৃথিবী বন্যার জলে ধ্বংস করে ফেলবেন ঠিক করলেন। কিন্তু নোয়া ধার্মিক, তাকে বাঁচাবেন তিনি। সেই সঙ্গে জীবজগৎকেও একেবারে নির্বংশ করবেন না। তাই নোয়ার ওপর আদেশ হ'ল, "পৃথিবীর সব রকম প্রাণী থেকে ছু'টি ছু'টি করে বেছে নিয়ে তুমি তোমার 'আর্কে' ঢুকিয়ে রাখ। তারপর মহাপ্লাবনে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেলে পর ঐ আর্ক থেকে তাদের বের করে নিও। ওরাই আবার তখন সৃষ্টি করবে নতুন জীবজগৎ।" অর্থাৎ, তা হলে দেখা যাচ্ছে, বাইবেলের কথায় নোয়ার সময়েই পৃথিবীতে তাবৎ জীব-জন্তু এসে গিয়েছিল। তার মানেই মানুষ সমেত পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু প্রায় একই সময়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু এ কথা একেবারেই মানতে রাজী ন'ন। নানা রকম পরীক্ষা-প্রমাণের পর তাঁরা দেখিয়েছেন যে সৃষ্টি মোটেই ওভাবে হয় নি। অ্যামিবার মত অতিক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী থেকেই ক্রমাগত বেড়ে বেড়ে এবং চেহারা বদলাতে বদলাতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন প্রাণীর। এই পরিবর্তন একদিনে হয় নি। একটু একটু করে দিনের পর দিন বদলাতে বদলাতে লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি বছর পরে তা বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অ্যামিবা থেকে, একটু একটু বদলাতে বদলাতে, এসেছে হরেক রকম নিরস্থিক প্রাণী। আবার ঐ নিরস্থিক প্রাণীরই কোন একটি উন্নত জাত থেকে এসেছে অস্থিক প্রাণী। অস্থিক প্রাণী-দের মধ্যে আবার মানুষ এসেছে সকলের শেষে। বিজ্ঞানীর ভাষায় এই পরিবর্তনের নাম হচ্ছে "ক্রমবিকাশ" বা "ইভলিউশন্"।

নিরস্থিক প্রাণী থেকে প্রথম যে অস্থিক প্রাণীটি দেখা দিয়েছিল সেটি কি বলতে পার? সেও আমাদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু পূর্বপুরুষ



আদিম যুগের মাছ ; এদের শরীরের অনেকটাই থাকত খোলার ভিতর

হলেও তাদের বর্তমান বংশধররা আমাদের, আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের, আজ একটি অতিপ্রিয় খাদ্য। বুঝতে পারছ কি ? মাছ !

কেমন করে জানলাম—ফসিলের কথা

তোমাদের মনে এই সময়ে একটা প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক। এ সব তথ্য—এ সব খবর বিজ্ঞানীরা যোগাড় করলেন কি করে ? খুবই সঙ্গত প্রশ্ন, সংক্ষেপে এর জবাব দিচ্ছি।

দু'শ', পাঁচশ' বা হাজার বছর আগে পৃথিবীতে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে তার পরিচয় আমরা কিছু কিছু জানতে পারি বই পড়ে। সে সময়ে যে সব লোক পৃথিবীতে ছিলেন তাঁরা কেউ কেউ ঐ সব ঘটনার বিবরণ বইয়ে লিখে রেখে গেছেন, কেউ বা এমন সব স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন যা দেখে আমাদের চোখের সামনে সে সময়কার একটা ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু 'লক্ষ কোটি বছর' আগে তো পৃথিবীতে কোন মানুষ ছিল না ! আর, থাকলেও, সে মানুষ নিশ্চয়ই তাদের যুগের কথা ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য কোন বইতে লিখে রেখে যায় নি। তবে ?

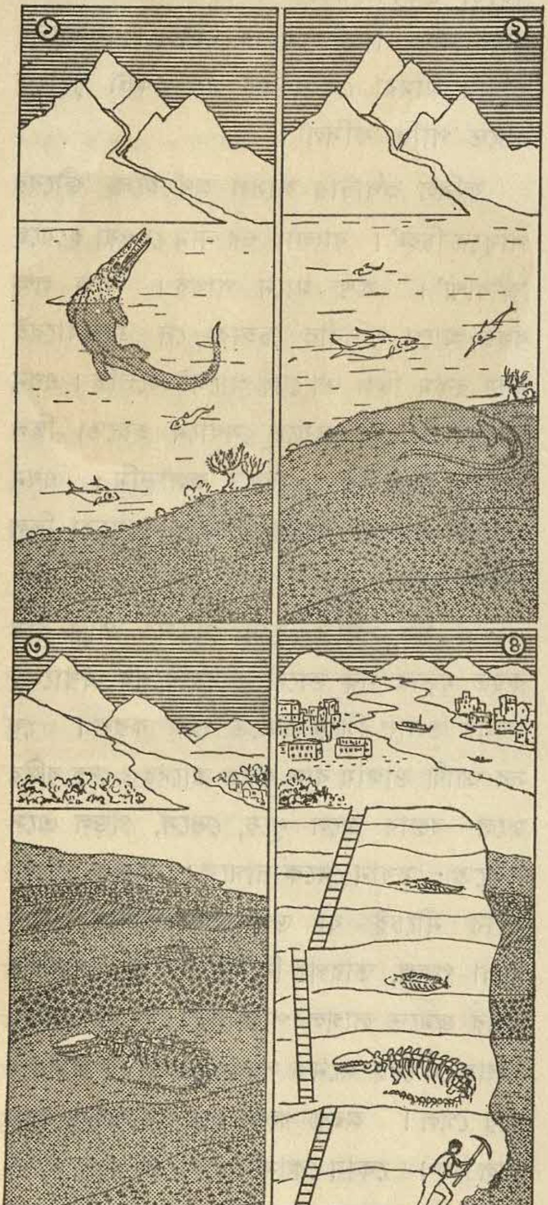
মানুষের লেখা বই না থাকলেও প্রকৃতি তাদের কথা লিখে রেখেছেন তাঁর নিজস্ব বইএ। এ বই অবশ্য কাগজের ওপর ছাপার হরফে লেখা নয়, হাতে লেখা পুঁথিও নয়, আর এ বই পড়ার বিদ্যেও সব লোকের নেই। কিন্তু পণ্ডিতেরা অসাধ্য সাধন করেছেন। দিনের পর দিন অজস্র বুদ্ধি খাটিয়ে, অজস্র পরিশ্রম করে তাঁরা সে বইএর কিছু কিছু পাঠোদ্ধার করেছেন আর তাই থেকেই আমরা জানতে পেরেছি সে যুগের কথা।

কোথায় রয়েছে সে বই ? রয়েছে পাহাড়ে-পর্বতে, শুকনো নদী বা সমুদ্রের তলায়, মরুভূমির নীচে, নিভৃত গুহার গহ্বরে। বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা সে বইএর এক-একটা পৃষ্ঠাকে বলতে পারি 'ফসিল'।

ফসিল কথাটার আসল অর্থ হচ্ছে 'জীবের পাথুরে চিহ্ন'। বাংলায় ওর নাম দেওয়া হয়েছে 'জীবাশ্ম'। অশ্ম মানে পাথর। লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর চেহারা যে একেবারেই অন্য রকম ছিল তা তো আগেই বলেছি। এখন যেখানে পাহাড় রয়েছে সেখানে হয়তো ছিল বিশাল সমুদ্র কিংবা বিস্তৃত জলাভূমি ; এখন যেখানে মরুভূমি রয়েছে সেখানে হয়তো ছিল বিরাট হ্রদ।

ঐ সব সমুদ্রে, হ্রদে যে সব প্রাণী বাস করত মৃত্যুর পর তাদের দেহাবশেষ ঐখানেই জলের তলায় গিয়ে জমতে শুরু করল। যে সব প্রাণী ডাঙ্গায় বাস করত তাদেরও দেহ বৃষ্টির জলে—বন্যার জলে ধুয়ে, ভেসে, পড়ল এসে নদীতে ; সেখান থেকে সাগরে। কতক হয়তো নদীর নীচেই বা ডাঙ্গাতেই কাদার তলায় চাপা পড়ল, তারপর দিনের পর দিন সেগুলির ওপর জমতে লাগল পলিমাটি। নরম মাটির তলায় সে দেহ অনেক সময় একেবারেই অবিকৃত রয়ে গেল। অবশ্য ধ্বংস হয়ে নিশ্চিহ্নও হয়ে গেল বহু। কোন কোনটার আবার নরম অংশ-গুলো নষ্ট হয়ে শক্ত খোলস বা হাড়গুলোই শুধু পড়ে রইল। বালির কণা এসে সেই সব ফাঁক ভর্তি করল। সবশুদ্ধ জমাট বেঁধে গেল, কিন্তু

আসল জন্তুটির চেহারা যেমন ছিল তেমনটিই রয়ে গেল তার মধ্যে। কালক্রমে সে হাড়ও ক্রমাগত ওপরকার চাপে একটু একটু করে



ফসিল কি করে হয়

পাথরে পরিণত হ'ল। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সমস্ত জন্তুটাই তার আসল চেহারা নিয়ে পরিবর্তিত হ'ল একটি পাথরের জন্তুতে। সব সময়ে যে পূরো জন্তুটাই এ ভাবে পাথরের ভিতর সংরক্ষিত হ'ল বা পাথরে রূপান্তরিত হ'ল তা নয়, অনেক সময় হয় তো তার শরীরের খানিকটা অংশ বা একটা টুকরো মাত্র এইভাবে রয়ে গেল। কিংবা হয়তো জন্তুটা মোটেই রইল না—রইল শুধু তার ছাপ। এর সবগুলোকেই আমরা বলি 'ফসিল'। ফসিল শুধু জীবজন্তুরই হয় না, গাছপালারও হয়। কলকাতার যাছুঘরে গেলে তোমরা ছু'রকম ফসিলই দেখতে পাবে।

যাক্, এইভাবে চল্‌ল কতদিন! ইতিমধ্যে হয়তো পৃথিবীতে আরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মাটি, কাদা রোদে শুকিয়ে ইটের মত শক্তহয়ে গেছে। ওপর থেকে ক্রমাগত নতুন নতুন মাটির স্তর এসে তাদের চাপা দিয়েছে। ফলে, সেই চাপে এবং প্রাকৃতিক অন্যান্য পরিবর্তনে সে মাটি—সে কাদা হয়ে গেছে পাথর। আমাদের সেই জন্তুটির পাথুরে দেহ কিন্তু তারই মধ্যে তখনও তেমনি চাপা রয়েছে।

শুধু কাদা-মাটিই বদলায় নি। সমুদ্রে, হ্রদেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হ্রদের জল হয়তো শুকিয়ে গেছে, সমুদ্রের জল হয়তো সরে গেছে। তারপর পৃথিবীর ভিতরটাও তো স্থির হয়ে নেই! ক্রমাগতই সেটা টলমল করছে। এক এক সময়ে তার কাঁপুনি—ফোঁস-ফোঁসানি এত বেশী হচ্ছে যে ওপরের খোলস ফাটিয়ে তলাকার গলন্ত পাথর বা 'লাভা' ঠেলে উঠছে ওপরে—ভূমিকম্পে যেমনটা হয়। কখনও বা ঠেলার চোটে মাটি কুঁচকে গিয়ে ঠেলে উঠছে পাহাড়ের মত।

ফলে, একদিন যেখানে সমুদ্র ছিল পরবর্তী কালে সেখানেই হয়তো গজিয়ে উঠছে পাহাড়, যেখানে একদিন বিস্তীর্ণ হ্রদ ছিল সেখানে হয়তো জেগে উঠছে মরুভূমি। আজ যেখানে আমাদের হিমালয় পাহাড় মেঘের রাজ্যে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেও যে একদিন ঐ রকম সমুদ্র ছিল তা কি বিশ্বাস হয়? কিন্তু সত্যিই তাই ছিল। বিজ্ঞানীরা নির্ভুল ভাবে তা প্রমাণ করেছেন। হিমালয়ের পাথরের ভাঁজে ভাঁজে তাঁরা নানা রকম সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ আবিষ্কার করেছেন —শামুক, ঝিনুক, শাঁখ,—যা নাকি সমুদ্রে ছাড়া হয় না।

কাজেই, বুঝতে পারছ,—ঐ পাহাড়-পর্বত, গুহা-গহ্বর, সাগর-মরুভূমি এগুলিকে কেন আমরা প্রকৃতির লেখা বই বলছি। ওরই ফাঁকে ফাঁকে, ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রয়েছে সেকালকার জীবজন্তুর অজস্র স্মৃতিচিহ্ন—তাদের পাথুরে ফসিল। যারা এ বই পড়তে জানে তারাই কেবল ও থেকে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য বার করে নিতে পারে, এবং তা নিয়েছেও।

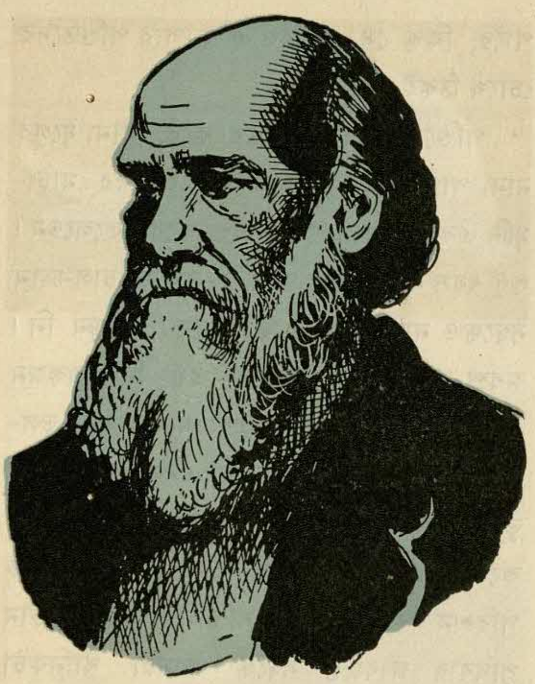
আমরা যখন বাক্সের ভিতর কাপড় রাখি তখন বাক্সের সবচেয়ে ওপরে থাকে সবচেয়ে শেষে যে কাপড়টা রাখা হ'ল সেইটে। আর বাক্সের তলায় থাকে সব-প্রথম যে কাপড়খানা রেখেছিলাম সেইটে। পৃথিবীর বেলাও তাই হয়েছে। সবচেয়ে নীচের স্তরে যে জন্তুর দেহাবশেষ পাওয়া গেছে সেটা যে তার ওপরের স্তরের জন্তুর চাইতে বয়সে অনেক প্রাচীন এ যুক্তি মানতে তো কোনও অসুবিধা নেই! অবশ্য অনেক সময় ভিতরের ঠেলা খেয়ে নীচেকার পাথর ওপরে চলে আসতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ঐ ব্যাপার পণ্ডিতদের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে।

পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে করে, নানা যুগের নানা পাথর ঘেঁটে ঘেঁটে এই সব জন্তুদের মোটামুটি একটা বয়সের হিসাবও করে ফেলেছেন। শুধু বয়স নয়, তাদের আকৃতি-প্রকৃতি, চাল-চলন সম্বন্ধেও নানা তথ্য বার করতে ছাড়েন নি। অবশ্য এ কাজ একদিনে হয় নি—একজন লোকের দ্বারাও হয় নি। এবং অনেক সময় ভুল-ভ্রান্তিও যে কিছু কিছু হয় নি এমন নয়। একজন ভুল করেছেন, আর একজন তা সংশোধন করেছেন। এমনি করে, দিনের পর দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে, অনেকের সম্মিলিত চেষ্টায় প্রাচীন পৃথিবীর জীবজন্তু সম্বন্ধে আমরা খানিকটা নিখুঁত ছবি পেয়ে গেছি।

একটা থেকে আর একটা—ক্রমবিকাশ

একটু আগেই জীবজগতে ক্রমবিকাশের কথা উল্লেখ করেছিলাম। বলেছিলাম—একটু একটু করে বদলাতে বদলাতে এক প্রাণী কি করে আর এক রকম প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। চার্ল্‌স্ ডারউইন নামে এক মস্ত বিজ্ঞানী এই ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব খুব ভাল করে প্রমাণ করেন। প্রথম প্রথম অবশ্য এ নিয়ে তাঁকে প্রচুর ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল; কিন্তু তাঁর মতবাদে যে বিশেষ ভুল নেই এ তিনি শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করতে ছাড়েন নি।

ধর, ভগবান্ তোমাকে হাত-পা দিয়েছেন নানা কাজে সেগুলি ব্যবহার করবার জন্য। তুমিও তাই করে যাচ্ছ। এখন, তুমি যদি তা না কর, আয়েস করে, অপরকে দিয়ে যথা



বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ চার্ল্‌স্ ডারউইন

সম্ভব খাটিয়ে নিয়ে নিজে হাত-পা চালনা করতে না চাও, তা হলে দেখবে, অব্যবহারের ফলে তোমার হাত-পায়ের জোর কেমন কমে গেছে! একজন কামারের সঙ্গে তোমার হাত মিলিয়ে তুলনা করে দেখলেই টের পাবে। কামারের কাজ লোহা পেটানো। দিবারাত্র সে ঐ কাজই করছে। লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে হাতের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে, দেখবে, তার ডান হাতটা হয়ে গেছে কেমন মোটা, পুষ্ট আর জোরালো! এখন, এই কামার যদি আবার অনুরূপ স্বাস্থ্যবতী একটি কামারের মেয়েকে বিয়ে করে—যে মেয়ের নিজেরও লোহা পেটানো অভ্যাস আছে এবং যার ফলে তারও হাত পুষ্ট ও জোরালো হয়েছে, তা হলে দেখা যাবে তাদের সন্তানও ঐ রকম সুপুষ্ট, মোটা, জোরালো হাতের মালিক হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। সেও যদি তার বংশগত পেশা মেনে চলে—অর্থাৎ বাপের মত কামারের কাজ করে যায় এবং তারও ছেলে, নাতিপুতিরা সে পেশা ত্যাগ না করে—তা হলে কয়েক পুরুষ পরে দেখা যাবে ঐ বংশের সমস্ত লোকেরই হাতের গড়ন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেকখানি তফাৎ হয়ে এসেছে। ডারউইনের মতে এইভাবেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলেই, জীবজন্তুর চেহারা বদলে গেছে। তবে ২।১ পুরুষে তো আর কিছু হয় না—হাজার হাজার পুরুষ গেলে—লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানেই কেবল তা হতে পারে।

নিরস্থিক প্রাণী থেকে অস্থিক প্রাণী মাছও নাকি এইভাবেই হয়েছিল। আদিম যুগের মাছ কিন্তু ঠিক এখনকার মাছের মত ছিল না। তাদের অনেকেরই গায়ে ছিল একটা করে খোলা। তা হলেও তাদের আমরা মাছই বলতে বাধ্য। তারপর সেই মাছেদেরই কতকগুলি একদিন জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠল—দেখা দিল প্রথম ডাঙ্গার অস্থিক প্রাণী। একদিন বলতে অবশ্য বিশেষ একটি দিন নয়। এ দিনকেও ঐ রকম লক্ষ লক্ষ বছরের মাপ্প দিয়েই হিসেব করতে হবে।

জল থেকে ডাঙ্গায়

জল থেকে কতক মাছ কেন ডাঙ্গায় উঠে এল সে সম্বন্ধে স্বভাবতঃই তোমাদের কৌতূহল হবে। আদ্যিকালের পৃথিবীর যে বিবরণ তোমরা পড়েছ তাতে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে পৃথিবীর শৈশবে তার ডাঙ্গাটা খুব লোভনীয় ছিল না। আবহাওয়াও ছিল তেমনি বিরক্তিকর। কিন্তু কালে কালে পৃথিবীর সে চেহারাও একটু একটু বদলাচ্ছিল। ধোঁয়াটে কুয়াশা দূর হয়ে সূর্যালোক

পৃথিবীকে রমণীয় করে তুলছিল, বড় বড় সুন্দর গাছ গজিয়ে উঠছিল ডাঙ্গায়। ওদিকে সমুদ্রে তখন বেশ ভিড়। সকলেই তো জলে থাকে। কাজেই ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি সেখানে লেগেই আছে। তারপর কোন কোন প্রাণী অপরদের তুলনায় আকারেও যেমন বিরাট, গায়ের জোরও তেমনি দৈত্যের মত। অপেক্ষাকৃত ছোট প্রাণীরা তাদের উৎপাতে সর্বদাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। তারপর বেঁচে থাকতে হলেই খাবার চাই। জীবজন্তুদের কাছে এই খাদ্যসমস্যাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। জলের নীচে সকলকার পর্যাপ্ত খাবার হয়তো জুটত না। বিশেষতঃ যারা একটু সাত্ত্বিক প্রকৃতির, অর্থাৎ নিরামিষ গাছপালা খাবার ভক্ত—তাদের কাছে জলের চাইতে ডাঙ্গাই যে লোভনীয় হবে সন্দেহ কি? হয়তো এই জন্যই একদল সাহসী মাছ (অ্যাডভেঞ্চার-লোভী সন্দেহ নেই) ডাঙ্গায় উঠে আসবার মতলব করতে লাগল।

কিন্তু উঠে আসব বললেই তো হয় না! জলের তলায় নিঃশ্বাস নেবার জন্য মাছেদের দেহে আছে কান্‌কো,—যাকে ইংরেজীতে বলে গিল্. ডাঙ্গায় কিন্তু সেটা দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া সুবিধাজনক নয়। ডাঙ্গার জন্য দরকার ফুস্‌ফুস্ বা 'লাংস্'।

প্রথম যখন মাছেরা কতক ডাঙ্গায় উঠে এল তখন এই নিঃশ্বাস নেবার সমস্যাই বোধ হয় ছিল তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কান্‌কোর পাশে যে পাতলা চামড়া আছে প্রথম প্রথম সেইটে দিয়েই সম্ভবতঃ তাদের সে অসুবিধা মেটাতে হয়েছে। পরে, দিনের পর দিন কান্‌কোর ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ায়, তাদের ওই জিনিসটাই লোপ পেয়ে গেল, আর তার বদলে দেখা দিল ফুস্‌ফুস্। অনেক বিজ্ঞানীর মতে মাছের পটকাগুলিই বদ্‌লে বদ্‌লে পরবর্তী যুগে ফুস্‌ফুসে রূপান্তরিত হয়। জলে ভাসতে না হলে আর পটকা দিয়ে কি হবে?

শুধু নিঃশ্বাস নেওয়া নয়। জলে চলাফেরা করতে হলে হাত-পা'র দরকার হয় না, ডানাই সে কাজ করে। মোড় ফিরবার জন্য লেজটা করে হালের কাজ। ডাঙ্গায় উঠে আসার পর কিন্তু ডানা আর কোন কাজে এল না—তখন দরকার হ'ল হাত-পা'র। যারা ডাঙ্গায় এল তারা প্রথম প্রথম ঐ ডানাগুলোকেই হিঁচড়ে হিঁচড়ে হাত-পা'র মত ব্যবহার করতে লাগল। এই ভাবে কিছু পুরুষ পরেই সেগুলিরও চেহারা একটু একটু করে বদলাতে লাগল এবং কালক্রমে তা-ই হয়ে দাঁড়াল সত্যিকার হাত-পা। অবশ্য যদি সামনের পা দু'টোকে হাত বলতে রাজী থাক।

বলা বাহুল্য ডাঙ্গায় এসে এই সব পরিবর্তনের পর মাছ থেকে যে নতুন ধরনের প্রাণীর সৃষ্টি হ'ল তাদের আর আমরা মাছ বলতে পারি না। সত্যি তারা ডাঙ্গার প্রাণী,—মাছ নয়। এদেরই বলা হয় "সরীসৃপ"। টিকটিকি, গিরগিটি, গোসাপ, কুমীর—এদেরই জাতভাই তারা। হাত-পা হ'ল বটে তবে তারা প্রায়ই সে হাত-পা মাটির সঙ্গে লেপ্টে চলত। সেই জন্যই আমরা সরীসৃপ বলতে সেই সব প্রাণীকেই বুঝি যারা বুকে ভর দিয়ে চলে। আমাদের টিকটিকি, গিরগিটি, কুমীর —এরা কি তাই নয়?



জল থেকে ডাঙ্গায়-উঠে-আসা প্রথম যুগের একটি প্রাণী

ক্রমে এই সব সরীসৃপ, যাদের ইংরেজীতে বলা হয় "রেপ্‌টাইল"—এদের মধ্যেও নানা শ্রেণী অর্থাৎ নানা জাত দেখা দিল। এদের কেউ কেউ আবার বাস করতে লাগল অপরিসর গর্তে। কাজেই তাদের আর হাত-পা'রও দরকার রইল না। তারা ধীরে ধীরে হাত-পাগুলি একেবারে দেহের নীচে এমন ভাবে লেপ্টে রাখতে লাগল যে অব্যবহারের ফলে পরে আর সেগুলির কোন অস্তিত্বই রইল না। এই জাতের সরীসৃপরাই হয়ে গেল সাপ। সাপের হাত-পা নেই, তোমরা সবাই জান। কিন্তু যদি ওদের শরীর চিরে ফেলা যায় তা হ'লে দেখবে চামড়ার তলায় ঐ হাত-পা'র চিহ্ন এখনও রয়ে গেছে। কোন কোন সাপের পা এখনও সম্পূর্ণ খসে যায় নি। আমেরিকায় এ রকম সাপ এখনও দেখা যায়। তাদের পেছনের হু'টি পা এখনও দিব্যি রয়ে গেছে। কালে অবশ্য সে হু'টিও নিশ্চয় একদিন লোপ পাবে। আমাদের দেশেও মাঝে মাঝে পা-ওলা সাপ এক-আধটা বেরোতে দেখা যায়। সেটাকে আমরা প্রকৃতির বৈচিত্র্য বলে ধরে নেই। কিন্তু ক্রমবিকাশের ইতিহাস ঘাঁটলে বোঝা যাবে ওটাতে অবাক্ হবার কিছু নেই।

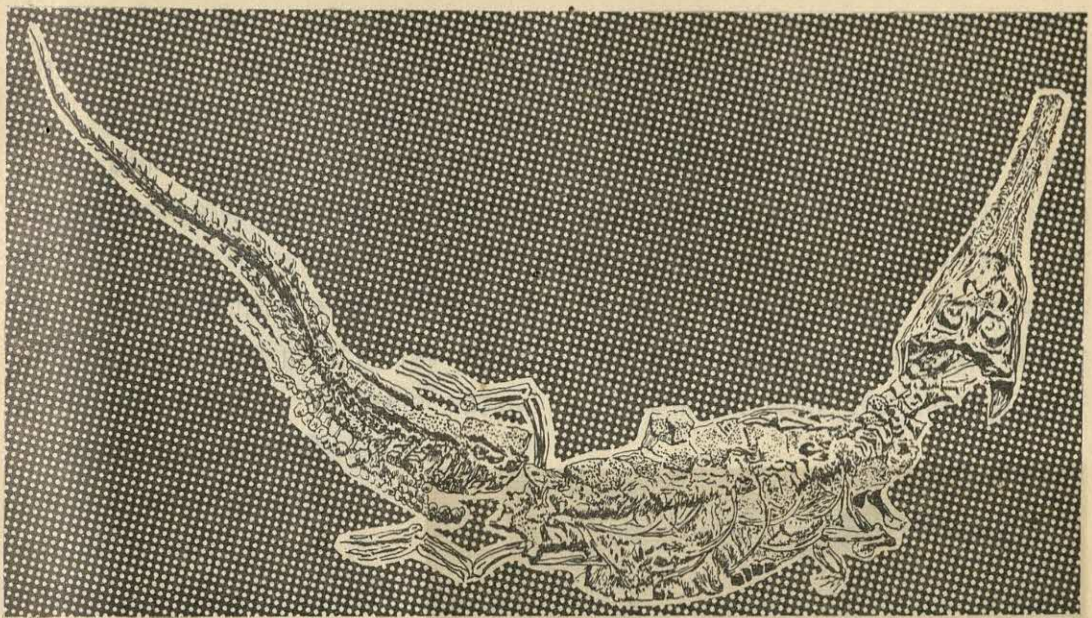
কিছু কিছু সরীসৃপ আবার ডাঙ্গায় এসেও জলের মায়া ছাড়তে পারল না। তারা দরকার মত ডাঙ্গা এবং জল হু'টোই আঁকড়ে রইল। প্রথম যুগের অনেক সরীসৃপই এই ধরনের ছিল। এখনও আমাদের কুমীর মশাই এ স্বভাব ছাড়তে পারেন নি। তবে জলটাই যেন তাঁর বেশী প্রিয়। কুমীর কিন্তু ডিম পাড়বার সময়ে ডাঙ্গাতেই এসে ডিম পাড়ে।

মাছ আর সরীসৃপের মাঝামাঝি

মাছ থেকে সরীসৃপ হবার সময়ে মাঝামাঝি আরও কিছু প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। এদের কারো কারো বংশধরদের আমরা আজও দেখতে পাই। যেমন ধর, এ যুগের ব্যাঙ। ব্যাঙকে বলা হয় উভচর প্রাণী (অ্যাম্‌ফিবিয়ান্)। ব্যাঙের ছানা লেজওয়ালা ব্যাঙাচি প্রথম জীবনে পুরোপুরি জলের প্রাণী। কিন্তু বড় হয়ে, লেজ খসিয়ে, চেহারা বদলে সে যখন ব্যাঙ হয়ে যায় তখন সে ডাঙ্গাতে থাকতে অভ্যস্ত। অবশ্য এদের কেউ কেউ পরেও জলে থাকাটাই বেশী পছন্দ করে।

এই মাঝামাঝি প্রাণীর কথা বলতে একটি বিশেষ প্রাণীর কথা মনে পড়ছে। প্রাণি-বিজ্ঞানীদের কাছে এটি একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক প্রাণী। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন "ইক্‌থিয়সরস্"। বাংলায় মেছো-টিকটিকি বা মেছো-কুমীর বলতে পার। এ জন্তুটি বা এর কোন সুপরিচিত বংশধর অবশ্য এখন আর নেই, বহুদিন হ'ল এরা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে।

ইক্‌থিয়সরসের চেহারা, হালচাল কতকটা



ইক্‌থিয়সরসের কঙ্কাল

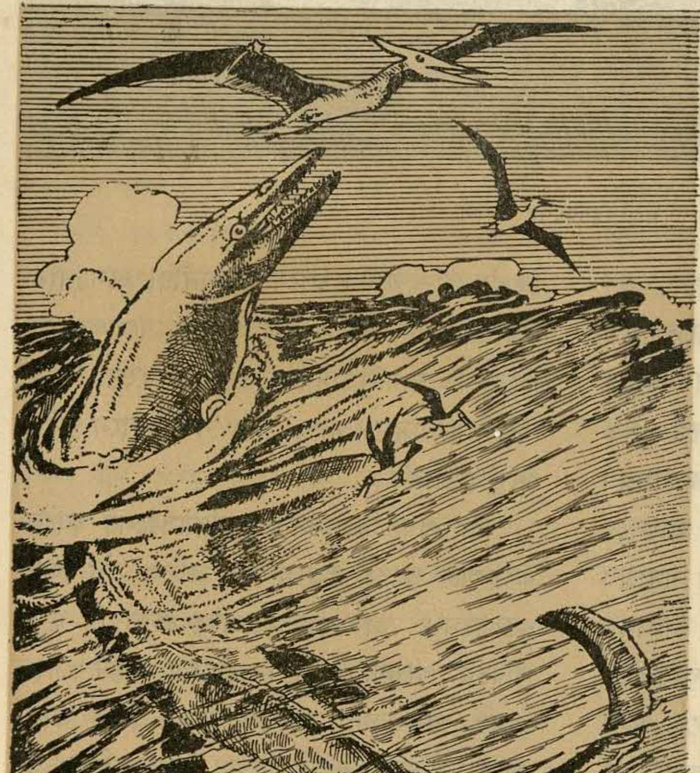
ছিল মাছের মত, কতকটা সরীসৃপের মত। কুমীরের মত লম্বাটে মুখ, তাতে করাতের মত ধারাল দাঁত। সেই দাঁত নিয়ে সে সমুদ্রে অন্যান্য নিরীহ জল-জীবদের মধ্যে আতঙ্কের মত ঘুরে বেড়াত। ঠিক যেন আজকালকার হাঙ্গর! অত্যন্ত হিংস্র ছিল এই ইক্‌থিয়সরস্। আকারে এক-একটা চল্লিশ ফুটও ছাড়িয়ে যেত। সমুদ্রের প্রাণী, কিন্তু কুমীর, কচ্ছপ এদের মত ডাঙ্গায়ও যখন তখন উঠে আসত—হয়তো রোদ পোহাতে।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ' বছর আগে একটি ইংরেজ মেয়ে সমুদ্রের কাছে পাথরের নীচে একটা অদ্ভুত জন্তুর কঙ্কাল দেখতে পায়। কঙ্কালটা ছিল ত্রিশ ফুট লম্বা, চেহারাটা অর্দ্ধেক মাছের মত, অর্দ্ধেক কুমীরের মত। তা ছাড়া তার ছিল চারটে বৈঠার মত ডানা। এই অদ্ভুত জন্তুর কঙ্কাল দেখে পণ্ডিতমহলে প্রথমটা খুব হৈ-চৈ পড়ে যায়। শেষে বিজ্ঞানীরা এসে নানা পরীক্ষার পর একে ইক্‌থিয়সরস্ বলে সনাক্ত করেন। নামটা অবশ্য তখনই দেওয়া হয়। 'ইক্‌থিয়স্' মানে মাছ, আর 'সরস্' মানে কুমীর জাতীয় জীব।

এর পর বিজ্ঞানীরা ইক্‌থিয়সরসের আরো কয়েকটি পূরো কঙ্কাল বা ফসিল আবিষ্কার করেছেন। তাই থেকে এদের চেহারার হুবহু পরিচয় পাওয়া গেছে। দেহের গড়ন দেখে এদের চাল-চলন সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা গেছে। এরা যে কি রকম হিংস্র ছিল তা এদের দাঁত দেখলেই বোঝা যায়। একটি ইক্‌থিয়সরসের কঙ্কালের মধ্যে আবার অনেক-গুলো ছোট ছোট বাচ্চা ইক্‌থিয়সরসের কঙ্কালও পাওয়া গেছে। এ থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন ইক্‌থিয়সরস্ হয়তো খিদে পেলে নিজের

বাচ্চাদের ধরেও জলযোগ করতে ছাড়ত না। আবার কেউ কেউ বলেন, না, মরবার সময় ওর পেটে যে বাচ্চা ছিল এগুলো সেই বাচ্চার কঙ্কাল। মাছ, কুমীর—এরা সকলেই বাচ্চা দেবার সময়ে ডিম পাড়ে, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। ইক্‌থিয়সরস্ কি তা হলে ডিম পাড়ত না, সোজাসুজি বাচ্চা জন্মাত তার? এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে যথেষ্ট। কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতির রাজ্যে বৈচিত্র্য তো থাকবেই! সাপের বাচ্চা তার ডিম থেকেই হয়, কিন্তু বিশেষ এক জাতের সাপ আছে যারা ডিম না পেড়ে সোজাসুজি বাচ্চা সাপ প্রসব করে।

ইক্‌থিয়সরসের চোখটাও নাকি ছিল অদ্ভুত! চোখের গড়ন দেখে মনে হয় সে চোখ দিয়ে ওরা দরকার মত দূরবীণ আর অণুবীক্ষণের কাজও চালাতে পারত। কী ভয়ঙ্কর কথা বল দেখি! এ হেন জীব যে একদা সমুদ্রের আতঙ্ক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ কি?



অতিকায় হিংস্র উভচর সরীসৃপ মোসাসরস্ টেরোডাক্‌টাইলকে আক্রমণ করেছে

ইক্‌থিয়সরসের প্রায় সমসাময়িক আর একটি প্রাণীর কথাও এখানে বলা দরকার। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন "প্লিসিওসরস্"—মানে 'প্রায়-কুমীর'। নাম শুনেই এদের খানিকটা পরিচয় অনুমান করা যায়। এরাও নাকি আকারে এক-একটা ৩০।৪০ ফুট হ'ত। এদেরও মুখ ছিল কুমীরের মত কিন্তু তার পেছনে ছিল সাপের মত লম্বা একটা গলা। এই ধরনের আর একটা হিংস্র প্রাণী ছিল মোসাসরস্। ডাইপ্লোডোকাসের চেহারা ছিল একটু আলাদা রকম। এরা খেতও নিরামিষ। লম্বায় হ'ত প্রায় ৭৫ ফুট, ওজন ২৫ টন। কিন্তু এদের মাথা এত ছোট হ'ত যে এদের বুদ্ধিসুদ্ধি বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না।

অতিকায় সরীসৃপের যুগ

ডাঙ্গায় সরীসৃপরা চরে বেড়াতে লাগল। ঐ অঞ্চলে



অতিকায় ডাইপ্লোডোকাস্—লম্বায় ৭৫ ফুট, খেত নিরামিষ

মানুষ তো দূরের কথা, অন্য কোন উল্লেখযোগ্য অস্থিক প্রাণীই তখন পর্যন্ত জন্মায় নি। কাজেই এই সরীসৃপরাই ছিল তখন স্থলরাজ্যের একচ্ছত্র মালিক। বিজ্ঞানীরা তাই এই যুগটিকে বলেন 'সরীসৃপ যুগ' বা 'রেপ্‌টাইল্ এজ্'।

তা দাপটের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে এদের সমকক্ষ জীব এ যুগেও মেলা ভার। টিকটিকি, গিরগিটি, গোসাপ—এদেরই জাতভাই, কিন্তু কী অতিকায় ছিল এদের চেহারা! পণ্ডিতেরা এদের নাম দিয়েছেন 'ডাইনোসর'। এদের যে সব ফসিল এ পর্যন্ত মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তা দেখলে সহজে বিশ্বাসই হতে চাইবে না যে ডাঙ্গায় কোন কালে এত বড় বড় প্রাণীরা চরে বেড়াতে পারে।

ডাইনোসর আবার নানান্ জাতের ছিল। কেউ কেউ নিরামিষ খেত, কেউ কেউ আবার ছিল ভয়ানক রকম মাংসখোর। নিরামিষাশীরাই কিন্তু আকারে বড় হ'ত। কত বড়? তা লম্বায় আশী-নব্বই ফুট! উঁচুতে গোটা ২।৩ হাতীর সমান! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের মগডালের পাতা মাটিতে দাঁড়িয়েই অনায়াসে সাবাড় করে দিতে পারত। লেজটা বেশীর ভাগই হ'ত গোসাপের



আদ্যিকালের আর একটি সরীসৃপ ডাইমেট্রোডন। পিঠের ওপর নৌকোর পালের মত হাড়ের তৈরী বিরাট ঝুঁটিটা দেখবার মত



অতিকায় মাংসভোজী ডাইনোসর সির‍্যাটোসরস্‌

মত, তবে অনেক—অনেক লম্বা। কেউ কেউ হাতীর মত চার পায়ে চলত, কিন্তু অনেকেরই সামনের পা ছু'টো হ'ত পেছনের পায়ের তুলনায় অনেক ছোট। তাই ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলত।

ইগুয়ানোডন নামে এক জাতের ডাইনোসর ছিল—তাদের দাঁত ছিল ইগুয়ানার (এক জাতের হিংস্র গোসাপ) মত, তাই ঐ নাম দেওয়া হয়েছে তাদের। এই ইগুয়ানোডনের টুকরো টুকরো দাঁত আর নখের ফসিল দেখে পণ্ডিতেরা প্রথমটা সেগুলিকে ওদের শিং মনে করেছিলেন। পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। দাঁত আর নখের তুলনায় সব জানোয়ারেরই শিং অনেক বড় হয়, সুতরাং এই ভুল করা থেকেই আন্দাজ করা যায় কি বিশাল ছিল এই জানোয়ারের চেহারা!

মাংসখোর ডাইনোসরগুলো আকারে একটু ছোট হ'ত, কিন্তু সে ত্রুটী তারা পুষিয়ে নিত বিক্রমে। অবশ্য ছোট বলতে তেমন কিছু একটা ছোট মনে ক'র না। আজকালকার একটা হাতীর চাইতে অনেক বড় হ'ত সেগুলো। যেমন ছিল এরা হিংস্র, তেমনি পারত লাফাতে, তেমনি পারত ছুটতে। এদের মধ্যে মেগালোসরস, ব্রণ্টোসরস্‌, সিটিওসরস্‌, সির‍্যাটোসরস্‌—এগুলিই ছিল বিশেষ করে দুর্দান্ত। কারো কারো আবার গায়ে বড় বড় কাঁটাও থাকত।

কোন কোন ডাইনোসর আবার ছিল শিংওয়ালা। শিংও বলতে পার, খড়্গও বলতে পার। গণ্ডারের মত আর কি! ট্রাইসিরেপ্টাসের ছিল পর পর তিনটে অতিকায় শিং বা খড়্গ। কারো কারো পিঠেও খড়্গ বা ঝুঁটি থাকত।



দেখতে ভীষণ এই খড়্গ আর শিংওয়ালা সরীসৃপ ষ্টির‍্যাকোসরস্‌ কিন্তু আদবেই হিংস্র ছিল না



বাঁ-দিকে ষ্টিগোসরস্। সিরাটোসরস্ তার দিকে যে এগিয়ে চলেছে তা ঠিক বন্ধুত্বের জন্য নয়।

আর একটা মজার সরীসৃপ ছিল তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ষ্টিগোসরস্'। আকারে এরাও কম যেত না, তবে চেহারাটা ছিল অদ্ভুত। পিঠটা খোড়ো ঘরের চালের মত বাঁকা, তাতে মস্ত মস্ত খড়্গ বসানো। কিন্তু মাথাটা এত ছোট যে পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন এদের বুদ্ধি বলে আদৌ কিছু ছিল কিনা। অত বড় শরীরের তুলনায় ঐটুকু মাথা থাকলে তার মধ্যে আর কতখানি মগজ থাকতে পারে? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই জানোয়ারের কোমরের কাছে একটা জায়গার গড়ন দেখলে মনে হয় সেখানেও বোধ হয় একটা দ্বিতীয় মগজ ছিল। যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে তা হলে এ রকম আজগুবি দু'-মগজ-ওয়ালা জানোয়ার পৃথিবীতে সত্যি 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।'

এই সব অতিকায় প্রাণী কত লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে রাজত্ব করত? বছর মেপে তার হিসেব দেওয়া কঠিন, তবে অন্য ভাবে একটা হিসেব দিচ্ছি।

আমাদের বাংলা দেশের পশ্চিম সীমানার দিকে রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর কয়লার খনি আছে এ তোমরা জান। আর এ কথাও হয়তো জান যে এই সব কয়লার উৎপত্তি হয়েছে আদ্যিকালের বনজঙ্গল থেকে। অর্থাৎ ঐখানে এক সময়ে ছিল এক বিস্তৃত বনভূমি। সেই বনভূমি কালের নিয়মে ধীরে ধীরে মাটি চাপা পড়ে যায়, তারপর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ওপরকার মাটি, পাথর তাকে চাপ দিতে থাকে। এইভাবে দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ওপরকার চাপে আর নানা রাসায়নিক পরিবর্তনে সেই বন রূপান্তরিত হয় কয়লায়। পণ্ডিতেরা নানা রকম তথ্যতল্লাসীর পর ঠিক করেছেন যে এই সব কয়লা যখন সত্যি কয়লা হয় নি—বনজঙ্গল হিসেবেই পৃথিবীর

ওপর শোভা পেত—তখন ঐ জঙ্গলে এই সব অতিকায় সরীসৃপরা ঘুরে বেড়াত। সুতরাং বুঝতেই পারছ—কোন্ আদ্যিকালের কথা বলছি আমি।

পাখীর জন্ম

প্রাচীন আর্যদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার রকম জাত বা বর্ণ ছিল, অস্থিক জীবদেরকেও তেমনি মোটামুটি চারটি বড় বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মাছ আর সরীসৃপের কথা তো আগেই বলেছি, বাকি হু'টো হচ্ছে পাখী (এভিস) আর স্তন্য-পায়ী (ম্যামেল্‌স্)।

পাখী কাকে বলে আমরা সবাই জানি ; স্তন্যপায়ী বা ম্যামেল্‌স্ হচ্ছে সেই সব প্রাণী যাদের বাচ্চারা মায়ের হুধ খেয়ে বড় হয়। পাখীরা সরীসৃপের মতই ডিম পাড়ে আর তাই ফুটে বাচ্চা হয়। স্তন্যপায়ীরা কিন্তু ডিম পাড়ে না, সোজাসুজি মায়ের পেট থেকে বাচ্চা হয়। স্তন্যপায়ীদের অধিকাংশই প্রায় ডাঙ্গার প্রাণী, তবে অন্য রকম ২।৪ জাতেরও আছে। যেমন ধর তিমি, সীল—এরা থাকে জলে। (তিমি যে মাছ নয়, স্তন্যপায়ী তা জান তো ?)। তেমনি বাহুড় আকাশে উড়লেও পাখী নয়,—স্তন্যপায়ী।

সরীসৃপদের রক্ত ভীষণ ঠাণ্ডা, এজন্য এরা শীত সহ্য করতে পারে না একদম ; কিন্তু স্তন্য-পায়ীদের রক্ত সে তুলনায় অনেক গরম। আর একটা তফাৎ আছে ওদের সঙ্গে স্তন্যপায়ীদের। মাছ, সরীসৃপ এদের গা সাধারণতঃ বড় বড় আঁশে ঢাকা থাকে। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের আঁশের বদলে থাকে লোম। এই লোম তাদের শীত নিবারণ করবার পক্ষে অনেক সাহায্য করে। তবে এক্ষেত্রেও ২।৪টি ব্যতিক্রম আছে। যেমন তিমির গায়ে লোম নেই, ওদের চামড়ার নীচে আছে পুরু চর্বির স্তর। ঐ চর্বিই তাদের শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

পাখীদের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। মাছ থেকে তো সরীসৃপ হ'ল, কিন্তু পাখীরা এল কোথা থেকে ?

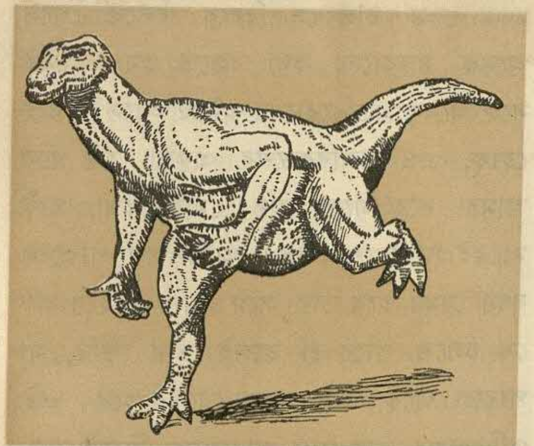
এ সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীদের জবাব ভারী কৌতুককর। তাঁরা বলেন,—মাছ থেকে যেমন এসেছে সরীসৃপের দল, তেমনি সরীসৃপ থেকেই বদ্‌লে বদ্‌লে সৃষ্টি হয়েছে পাখী।

পাখী কেন হ'ল সে সম্বন্ধেও তাঁরা একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন।

নানা তথ্য-প্রমাণের পর এ কথা এখন সবাই মেনে নিয়েছেন যে পৃথিবীর আবহাওয়া চিরকাল একভাবে নেই—যুগে যুগে তার পরিবর্তন হচ্ছে। কখনও এসেছে দারুণ শীত, সমস্ত পৃথিবী বরফে ঢেকে গেছে ; আবার কখনও এসেছে খরার যুগ—দিনের পর দিন চলেছে অনাবৃষ্টি। নদ-নদী, সাগর-হ্রদ শুকিয়ে গেছে, সব কিছু জমে পাথর হয়ে গেছে, দেখা দিয়েছে খাঁ-খাঁ-করা মরুভূমি। এখন, কয়েক লক্ষ বছর আগে একবার পৃথিবীতে ঐ রকম দারুণ শীত পড়ে, অর্থাৎ সুরু হয় তুষার যুগ। সে কি দারুণ শীত ! চার দিকে শুধু চাপ চাপ বরফ, আর কিছু না। সেই শীতে নদ, নদী, সমুদ্র সব জমে গেল, গাছপালার সমস্ত পাতা ঝরে গেল। সে এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ! আগেই বলেছি সরীসৃপদের রক্ত ছিল ঠাণ্ডা, শীত তারা একদম সহ্য করতে পারত না। কাজেই এই

শীতে তাদের কি দুর্গতি হ'ল বুঝতেই পার। যারা পারল প্রাণপণে টিকে থাকবার জন্য লড়াই করতে লাগল প্রকৃতির সঙ্গে। যারা পারল না তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ছুটোছুটি করলে শরীর গরম হয়—বিজ্ঞানের এটা একটা নিয়ম। বিজ্ঞানের বই পড়া না থাকলেও সরীসৃপরা তাদের সহজাত জ্ঞান থেকেই এ তথ্যটি আবিষ্কার করেছিল। শীত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য তাই তারা এই সময় খুব দৌড়োদৌড়ি করত। তাড়াতাড়ি



সামনের পা তুলে পেছনের পায়ে ভর করে ছুটতে শিখল

ছুটতে হলে সামনের পায়ের চেয়ে পেছনের পা দু'টোই বেশী কাজে আসে, তাই এদেরও অনেকে সামনের পা দু'টি তুলে শুধু পেছনের পায়ে ভর করে ছুটতে শিখল। সামনের পা দু'টি তখন অনেকটা হাতের মত ব্যবহৃত হতে লাগল এবং ছুটবার সময় হাওয়ার ধাক্কায় ক্রমে ক্রমে সেগুলি চ্যাপ্টা হয়ে অনেকটা পাখার মত হয়ে এল। এরপর সেই চ্যাপ্টা হাত তারা হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে ছুটতে শিখল এবং এইভাবে ক্রমে ক্রমে মাটি থেকে একটু উঁচু হয়ে চলতে লাগল। বুঝতে পারছ বোধ হয় আমি কি বলতে চাইছি। যে জিনিস যে ভাবে ব্যবহার করবে—ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে তা শেষ পর্যন্ত সেই চেহারাই নেবে। এই তো ক্রমবিকাশ! এইভাবেই লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টায় একদল সরীসৃপের সামনের হাত দু'টি রূপান্তরিত হ'ল পাখায়। অর্থাৎ তারা উড়তে শিখল।

উড়তে পারায় আর একটা সুবিধা হ'ল। ডাঙ্গায় খাদ্যের অভাব হলে এই পাখার সুযোগ নিয়ে তারা অনেকটা ওপরে উঠে গিয়ে যে সব গাছ তখনও টিকে ছিল তাদের মগডাল থেকেও খাবার সংগ্রহ করতে পারত।

কিন্তু, এ সব সত্ত্বেও, আমরা কিন্তু তখনও তাদের পাখী বলতে পারি না। কেন না এক ওড়া ছাড়া তারা তখনও পুরোদস্তুর সরীসৃপ। তাদের গায়ে তখনও পালক গজায় নি, লেজ খসে পড়ে নি। মুখের আকৃতি এবং দাঁতও



টেরোডাক্টাইল
বা উড়ুক্কু সরীসৃপ

সরীসৃপদের মতই ছিল। কাজেই এদের আমরা বলব উড়ুক্কু সরীসৃপ। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন 'টেরোডাক্‌টাইল'। টেরোডাক্‌টাইলই হচ্ছে পাখীর পূর্বপুরুষ।

টেরোডাক্‌টাইল ছোট-বড় সব রকমেরই ছিল। কোন কোনটা এত বড় ছিল যে পাখা মেললে ২৫।৩০ ফুট পর্যন্ত হ'ত।

আজকালকার পাখীদের দাঁত হয় না, কিন্তু এদের অনেকেরই শক্ত ছুঁচালো ঠোঁটও হ'ত, আবার তার মধ্যে ধারাল দাঁতও থাকত। পাখাটা ছিল অনেকটা বাদুড়ের মত,—অর্থাৎ হাত দু'টোই চামড়ার পর্দা দিয়ে যোড়া। লেজের কথা তো আগেই বলেছি,—ঠিক যেন গরুর লেজ,—লম্বা লেজের আগায় এক গুচ্ছ পালক। এই বিরাটকায় উড়ুক্কু সরীসৃপরাও কিন্তু কম হিংস্র ছিল না। দাঁতের গড়ন দেখলেই তা বোঝা যায়। এদের অনেকেরই পূরো ফসিল বিজ্ঞানীরা উদ্ধার করেছেন।

টেরোডাক্‌টাইলরাই ক্রমে বদ্‌লে বদ্‌লে পরবর্তী কালে পাখীতে রূপান্তরিত হয়। নানান্ জাতের পাখী। তাদের দাঁত খসে পড়ে। শরীর হাল্কা করার জন্য আঁশের বদলে দেখা দেয় পালক। লেজটিও তার লম্বা চেহারা বদ্‌লে অন্য রকম হয়ে যায়। পাখীর লেজ আর জন্তুর লেজে এখন অনেক তফাৎ। এই লেজ উড়বার সময় হালের কাজ করে। এই সব পাখীদের গল্প আমরা পরে যথাস্থানে আরও বলব।

স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা হচ্ছে একেবারে শেষ ধাপের জানোয়ার। এদেরও জন্ম কিন্তু ঐ সরীসৃপ থেকেই। সরীসৃপদের দৌড়োবার কথা বলেছি। সব সরীসৃপই যে সামনের পা তুলে ছুটত তা নয়। কেউ কেউ শরীরটাকে একটু ওপরে তুলে চার পায়ে ভর দিয়েই ছুটত। এরাই পরবর্তী কালে পাখী না হয়ে স্তন্যপায়ী জীবে পরিণত হয়েছে। ডিম পাড়া ছেড়ে সোজা-সুজি বাচ্চা পাড়তে কেন শিখল, সে বাচ্চারা আবার কেন মায়ের দুধ খেতে শিখল,—এক কথায় চাল-চলনে সরীসৃপদের থেকে স্তন্যপায়ীরা নানা দিক্ দিয়ে এত উন্নত রকম কেন হ'ল সে বিষয়ে বলতে গেলে অনেক মতবাদের কথা বলতে হয়। সেই সঙ্গে অনেক মতবিরোধের কথাও আসে। যাই হোক্, এও ক্রমবিকাশের একটা অঙ্গ বলে আমরা ধরে নিতে পারি। মোট কথা, প্রাণী মাত্রেই পরিবেশের দাস। আশপাশে পরিবেশ যখন যেমন হবে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যদি সে চলতে পারে তা হলেই তার স্থিতি, না পারলে তাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেই হবে। এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়েই স্তন্য-



প্লাটিপাস বা 'হাঁসঠুঁটো'

পায়ীরা এখন তাদের বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আবার সবচেয়ে পরে এসেছি আমরা—অর্থাৎ মানুষ।

মাছ থেকে সরীসৃপ হবার সময় যেমন কতকগুলি মাঝামাঝি জীব দেখা দিয়েছিল সরীসৃপ থেকে পাখী আর স্তন্যপায়ী হবার সময়েও ঠিক তেমনি মাঝামাঝি কতকগুলি জীবের দেখা পাওয়া যায়। এদের অনেকগুলি মানুষ জন্মাবার আগেই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। অবশ্য এদেরও ফসিল পাওয়া গেছে এবং তাই থেকেই এদের কথা আমরা কিছু কিছু জানতে পেরেছি। তবে এদের ২।১টি নমুনা পৃথিবীতে এখনও রয়ে গেছে। যেমন ধর, অষ্ট্রেলিয়া অঞ্চলের প্লাটিপাস, যার বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে হাঁসঠুঁটো। এদের ঠোঁটটা পাখীর মত, হঠাৎ দেখলে মনে হবে হাঁস। সরীসৃপদের মতই এরা এখনও ডিম পাড়ে, সেই ডিম ফুটেই বেরোয় বাচ্চা। বাচ্চা হবার পর কিন্তু সে বাচ্চা স্তন্যপায়ীদের মতই মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। একিড্না, অ্যান্ট-ইটার—এরাও ঐ রকম কতকটা মাঝামাঝি প্রাণী বলা চলে।



একিড্না

এ ছাড়া আর একরকম মাঝামাঝি জীব হচ্ছে "মার্সুপিয়াল্স্"। এরাও স্তন্যপায়ী।



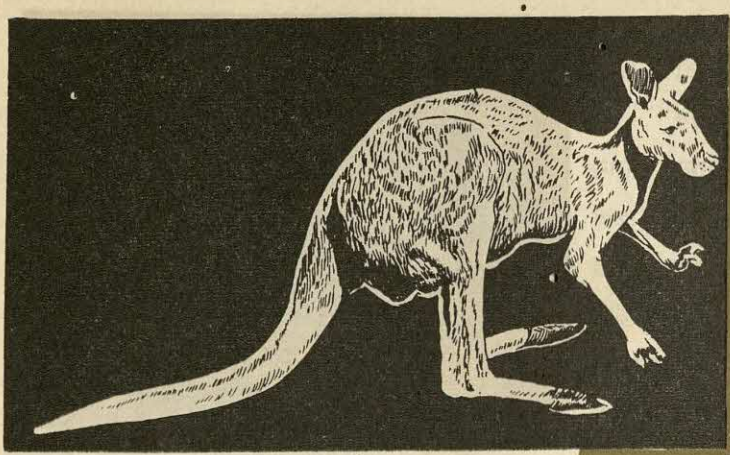
অ্যান্ট-ইটার বা পিপীলিকাভুক্

কিন্তু সাধারণ স্তন্যপায়ীদের মত নয়। এদের মায়েদের পেটের নীচে থাকে একটা করে থলি। বাচ্চা যতদিন না বড় হয় ততদিন মা তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখে ; আর, যখনই কোন বেগতিক দেখে, বাচ্চা গিয়ে সুড়ুৎ করে মায়ের পেটের ঐ থলির মধ্যে আশ্রয় নেয়। তোমরা চিড়িয়াখানায় এ রকম প্রাণী নিশ্চয়ই দেখেছ। কেন, ক্যাঙারু! এরাও অষ্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা। কোয়ালা, ওপোসাম প্রভৃতি জানোয়ারেরাও এই দলে পড়ে।

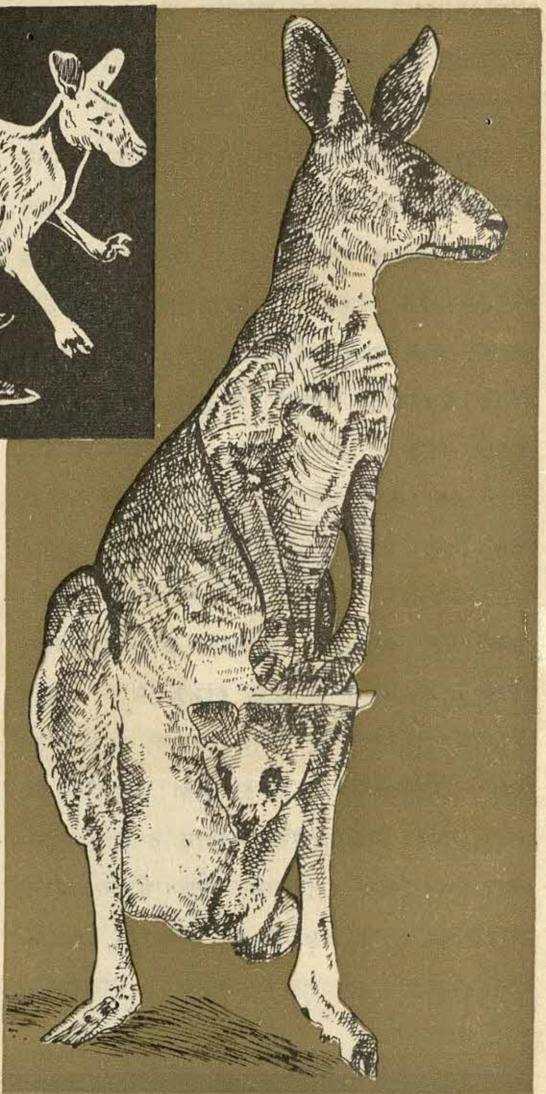
তিমি, বাদুড়—এদের কথা তো আগেই বলেছি। স্তন্যপায়ী হলেও এদের চালচলন সম্পূর্ণ আলাদা।

অতিকায় স্তন্যপায়ী

স্তন্যপায়ীদের বলেছি সকলকার শেষ ধাপের জানোয়ার। কিন্তু, তা হলেও, এরাও নেহাৎ কম দিন হ'ল পৃথিবীতে আসে নি। আর আদ্যিকালের সেই স্তন্যপায়ীরাও আকারে বা ভীষণতায় নেহাৎ তুচ্ছ করার মত ছিল না। সেকালকার চার-দাঁতওয়ালা অতিকায় হাতী ম্যাস্টোডন এখন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। এদেরই একটির কঙ্কাল—শুধু মাথা আর



ক্যাঙারু

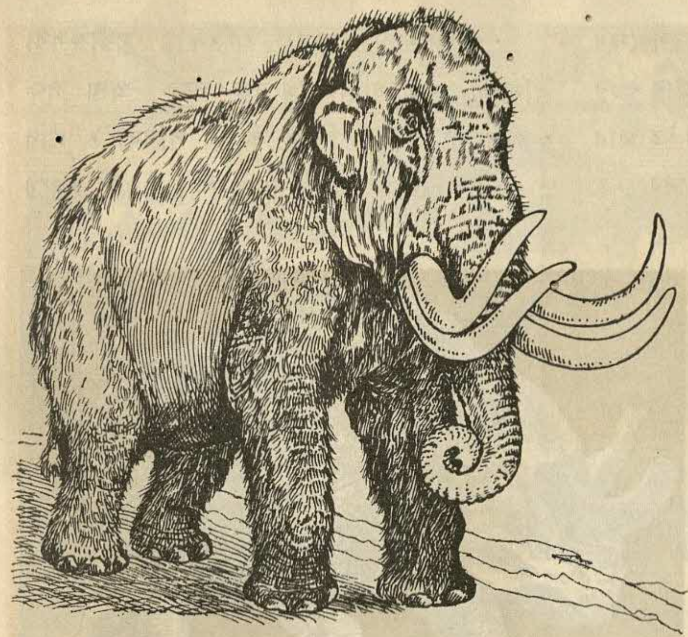


মা-ক্যাঙারুর পেটের থলিতে বাচ্চা-ক্যাঙারু গিয়ে ঢুকেছে।

দাঁত কলকাতার যাদুঘরে ভূতত্ত্ববিভাগে সংরক্ষিত আছে। সুবিধা পেলে একবার দেখে এস কী বিরাট তার আকার! দেরাদুনের কাছে সিউ-য়ালিক পর্বতমালার নাম শুনেছ কি? জায়গাটা ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের কাছে একটা পরম সম্পদ, কারণ ওখানে অল্প জায়গার মধ্যে এত অসংখ্য জন্তুর কঙ্কাল বা ফসিল পাওয়া গেছে যে কল্পনা করা কঠিন। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই স্তন্যপায়ী জন্তুর কঙ্কাল আর সে কঙ্কালের অধিকাংশই সেকালকার অতিকায় স্তন্যপায়ীদের —যারা এখন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

একই জায়গায় এত রকম মূল্যবান্ ফসিল পাওয়ার কারণ আর কিছুই নয়—একদা পুরাকালে হঠাৎ এখানে একটা বিরাট রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছিল। ফলে, সেই আবহাওয়ার সঙ্গে যারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি, তাদেরকেই হতে হয়েছে নির্বংশ। সে সময়ে যে সব প্রাণী ঐ অঞ্চলে বাস করত তাদেরই পাথুরে কঙ্কাল আজ পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে রয়েছে অতীতের সাক্ষী হয়ে।

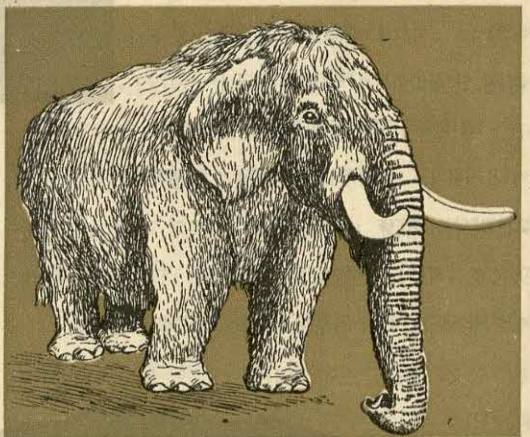
বিজ্ঞানীরা এই সব অতিকায় স্তন্যপায়ীর ফসিল খুঁজে খুঁজে উদ্ধার করেছেন, তা নিয়ে গবেষণা করেছেন আর তার ফলে সে যুগের একটা চমৎকার ছবি বেরিয়ে এসেছে আমাদের চোখের সামনে। ঐ সব লুপ্ত প্রাণীর একটা করে নামও দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আর, মজা হচ্ছে এই, ওদের নামকরণ করতে গিয়ে



সেকালের চার দাঁতওয়ালা অতিকায় হাতী 'ম্যাস্টোডন'

বৈজ্ঞানিক নামের সঙ্গে একটি করে ভারতীয় দেবদেবীর নামও যুড়ে দিয়েছেন তাঁরা।—দেবদেবীদের অসম্মানের জন্য নিশ্চয়ই নয়, ঐ সব জন্তুর ভারতীয়ত্ব দেখাবার জন্য। যেমন ধর, একটির নাম দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মাথেরিয়াম্, একটির—বিষ্ণুথেরিয়াম্, একটির শিবথেরিয়াম্ ইত্যাদি। অতিকায় সব প্রাণী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের মত ক্ষমতাশালী না হলেও তাঁদের বাহন হবার উপযুক্ত নিশ্চয়ই! চেহারা দেখলেই আন্দাজ করা যায়, আর তা থেকেই টের পাওয়া যায় কেমন মেজাজ ছিল এদের। এদেরও কিছু কিছু টুকরো ফসিল কলকাতার যাদুঘরে এনে রাখা হয়েছে। এবার যখন যাদুঘরে যাবে "সিউয়ালিক গ্যালারী" কোথায় আছে খোঁজ নিও। সেখানেই দেখতে পাবে তাদের। তা ছাড়া আরও অনেক ফসিল আছে ঐ যাদুঘরে। ইচ্ছা করলে দেখতে পার ফসিলের ঘরে গিয়ে। ভাল করে দেখতে গেলে গোটা দিনই কেটে যাবে।

ম্যামথের নাম জান? এও এক জাতের অতিকায় লোমশ হাতী। এদের নিবাস ছিল শীতের দেশ সাইবেরিয়ায়। আজ এদেরও বংশ নির্মূল হয়ে গেছে। বরফের নীচে থাকলে কোন জিনিস সহজে পচে না তা বোধ হয় জান। কলকাতার বাজারে আমরা যে সব মাছ দেখি তার বেশীর ভাগই বরফ দেওয়া। তার মানে মাছটা যখন ধরা হয়েছিল তখন হয় তো তা তাজাই ছিল, কিন্তু বাজারে এসেছে ২।১ দিন পরে। সুতরাং



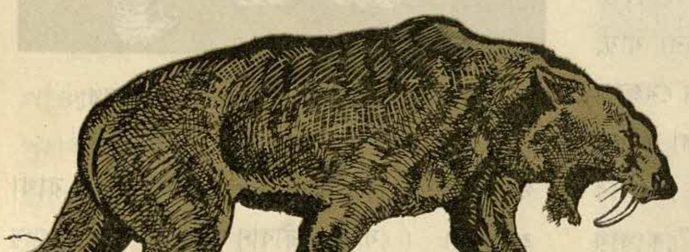
সেকালের অতিকায় লোমশ হাতী ম্যামথ্; এদেরও বংশ এখন লোপ পেয়ে গেছে।

যাতে না পচে যায় তাই বরফ দিয়ে রাখা হয়েছে। (যে সব জীবাণু শরীর পচিয়ে দেয় তারা অত ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে যায় কিনা!)

সাইবেরিয়ায়ও তাই হয়েছিল। সেখানে এমন অনেক জায়গা আছে যা নাকি সর্বদাই বরফে ঢাকা। কতকগুলি অতিকায় ম্যামথ

সাইবেরিয়ার সেই চিরতুষার রাজ্যে বরফের নীচে চাপা পড়ে ছিল। হাজার হাজার বছর পরেও সে বরফ গলে নি। হাজার হাজার বছর পরে বরফের নীচে থেকে তাদের দেহ উদ্ধার করে দেখা গেছে যে তাদের হাড়, মাংস, চামড়া—কিছুই নষ্ট হয় নি, শুধু শক্ত হয়ে গেছে মাত্র। এমন কি গায়ের বড় বড় লোমগুলো শুদ্ধু দিব্যি অক্ষত রয়ে গেছে। কত বড় বড় লোম শুনবে? এক-একটা লোম অন্ততঃ এক ফুট লম্বা। এদের অনেকেরই মুখের সঙ্গে দাঁতও পাওয়া গেছে—এক একটা দাঁত কম করে আট ফুট লম্বা। গোটা জন্তুটা উঁচুতে হ'ত প্রায় দেড়তলা বাড়ীর সমান।

ম্যামথ কিন্তু খুব বেশী দিন লোপ পায় নি। আদিম কালের মানুষ ম্যামথের সঙ্গে একত্র এক জঙ্গলে বাস করেছে, তাকে শিকার করেছে; এমন কি পাহাড়ের গুহায় তার ছবি পর্যন্ত এঁকে রেখে গেছে।



সেকালকার খাঁড়া-দেঁতো বাঘ; এদেরও বংশ এখন লোপ পেয়ে গেছে।

পণ্ডিতেরা বলেন, অতিকায় সরীসৃপরা বিলুপ্ত হয়ে যাবার অনেক পরে—প্রায় লক্ষ বছর বা তারও কিছু আগে পৃথিবীতে আর একবার এসেছিল তুষার যুগ। এই সময়ে



অধুনালুপ্ত লোমশ গণ্ডার

অনেক বড় বড় স্তন্যপায়ী জীব সে শীত সহ্য করতে না পেরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ম্যামথ শীতের দেশের প্রাণী হয়েও রক্ষা পায় নি। ম্যাস্টোডনও হয় তো ঐ সময়েই নির্বংশ হয়ে গেছে। সিউয়ালিক পর্বতমালায় যে সব অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালের কথা উল্লেখ করেছি তাদেরও বেশীর ভাগই হয় তো ঐ সময়টাতেই লোপ পেয়েছে। সেকালকার খাঁড়া-দেঁতো ('সেবার-টুথ্ড্') বাঘ, অতিকায় গুহা-ভালুক, লোমশ গণ্ডার—এদেরকেও পৃথিবীতে



আলকাৎরার মত পেট্রোলিয়ামের স্রোত। এর মধ্যে ডুবেও অনেক প্রাণী লোপ পেয়ে গেছে।

মানুষ আসবার পরেও দেখা গিয়েছিল কিন্তু আজ তাদের একটিও নেই। অল্প সময়ের মধ্যে একটা ভীষণ রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটলে একসঙ্গে এতগুলি প্রাণী লোপ পাওয়া সম্ভব নয়।

তুষার যুগের মত খরার যুগও বহু প্রাণীকে নির্বংশ করেছে। জল না পেলে কোন জীবই বাঁচতে পারে না। ঐ খরার দিনে জলের অভাবে হন্যে হয়ে বড় বড় প্রাণীরা যে যেখানে পেরেছে ছুটেছে। কেউ হয় তো কাদায় ডুবে গেছে, ভারী শরীর নিয়ে আর উঠতে পারে নি। কেউ বা আলকাৎরার মত পেট্রোলিয়াম্-প্রবাহের মধ্যে পড়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। আমেরিকার পেট্রোলিয়াম-খনি অঞ্চলে এ রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। জল মনে করে তৃষ্ণার্ত প্রাণীরা খনিজ তেলের খাদের দিকেই গেছে এগিয়ে। আবার এমনও ঘটেছে—জলের খোঁজে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে ছুটতে হয়তো কোন জলাশয়ের দেখা পাওয়া গেল, কিন্তু সেখানে নানারকম জন্তুর এত ভিড় যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণীদের পক্ষে আর সে জলের নাগাল পাওয়া সম্ভব হ'ল না। উপরন্তু সেখানেই, বলবান্ প্রাণীদের হাতেই, তাদের মৃত্যুবরণ করতে হ'ল।

সবশেষে মানুষ

মানুষ কবে পৃথিবীতে এল? এ সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব—"মানুষের কথায়"।

সত্যিই "লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা!" যত ভাবি ততই অবাক্ লাগে এই লক্ষ কোটি প্রাণীর অনেকেই এখনও পৃথিবীতে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরবর্তী খণ্ডে আমরা এক এক করে তাদের কথা আলোচনা করব—সমুদ্রের শামুক-ঝিনুক থেকে সুরু করে জলের ও ডাঙ্গার ছোট-বড় জন্তুদের কথা, আকাশে উড়ন্ত পাখীদের কথা, এমন কি কীটপতঙ্গের কথাও!



মানুষের কথা

পৃথিবীর সেরা জীব

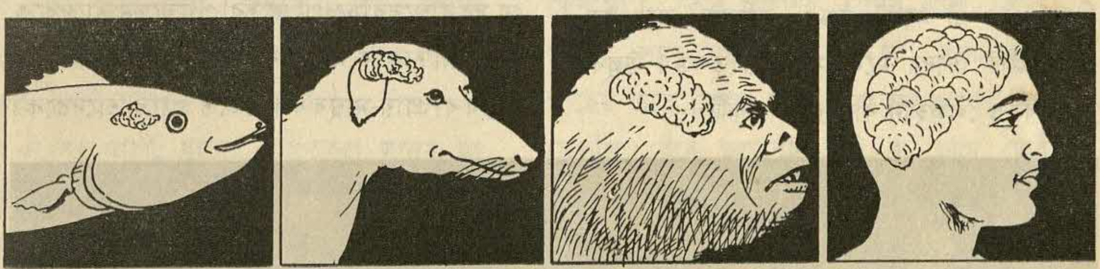
জীবজগতের সব-সেরা জীব হচ্ছে মানুষ। সবচেয়ে বুদ্ধিমান্, সবচেয়ে ক্ষমতাবান্। ধরতে গেলে গোটা পৃথিবীর ওপর সে-ই রাজত্ব করছে, আর সেই সঙ্গে পৃথিবীর চেহারাও বদলে দিয়েছে। সুতরাং এই মানুষের কাহিনী না জানলে পৃথিবীকেও সত্যি করে জানা যায় না।

এর আগে জীবজন্তুর গল্প বলতে গিয়ে তোমাদের বলেছিলাম কি করে মাছ থেকে বদলে বদলে সরীসৃপ, আর সরীসৃপ থেকে বদলে বদলে পাখী আর স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্ম হয়েছিল। অস্থিক অর্থাৎ হাড়ওয়ালা প্রাণীদের মধ্যে এই স্তন্যপায়ীরাই এসেছে সকলের শেষে। আবার স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে শেষ ধাপের জীব হচ্ছে এই মানুষ।

সরীসৃপ আর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য, যা বিজ্ঞানীদের চোখে পড়েছে, তা ঠিক তাদের চেহারায় ততটা নয় যতটা তাদের মানসিক পরিবর্তনে। এই পরিবর্তন বিশেষ করে আমরা দেখতে পাই বাচ্চাদের সঙ্গে বাপ-মার সম্পর্কের ভিতর দিয়ে। সরীসৃপরা ডিম পেড়েই খালাস। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে তার কি গতি হবে এ নিয়ে তাদের কোন মাথা-ব্যথা ছিল না। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের মধ্যে দেখা গেল, বাচ্চা হলেই মা-বাবার সঙ্গে—বিশেষ করে মায়ের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে না। বাচ্চা যতক্ষণ না বড় হয়ে নিজেরটা নিজে বুঝে নিতে শিখছে মা ততক্ষণ তাকে আগলে রাখছে। পরস্পরের সঙ্গে একটা বোঝাবুঝির ভাব রয়েছে। এই বোঝাবুঝির ভাবটা, স্তন্যপায়ী জীবেরা যতই উন্নত হতে লাগল, ততই যেন বাড়তে লাগল। তারা অনেকে দল বেঁধে, জোট পাকিয়ে একসঙ্গে থাকতে সুরু করল, একে অন্যকে দেখে তাকে অনুকরণ করতে শিখল, বিপদের সম্ভাবনা দেখলে একে অপরকে সতর্ক করে দিতে লাগল, আর খাবার সংগ্রহ, শিকার করা এ সবও দল বেঁধে করতে সুরু করল। একেই আমরা বলতে পারি সামাজিক জীবনের সূচনা —যা নাকি এর আগেকার প্রাণীদের মধ্যে দেখা যেত না। পাখীদের মধ্যেও এ জিনিসটা

খানিকটা এল, কিন্তু স্তন্যপায়ীদের মত অতটা নয়। এ যুগের মানুষ যে সব জন্তুকে পোষ মানাতে শিখেছে তারা প্রায় সকলেই স্তন্যপায়ী, অবশ্য পাখীও বাদ যায় নি। এরও কারণ পণ্ডিতেরা ঐ ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। স্তন্যপায়ী জীবদের মানসিক গঠনকেই বলতে পারি সেই কারণ। আমাদের সঙ্গেও সুযোগ পেলে ওরা একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক পাতাতে পারে।

এই মানসিক পরিবর্তন কি করে এল? তোমরা নিশ্চয়ই জান আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি, চাল-চলন—সবই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের মগজ বা মস্তিষ্ক। মাছ বা সরীসৃপের এই মগজ জিনিসটা মোটেই ভাল করে গড়ে ওঠে নি—যেমন গড়ে উঠেছিল স্তন্যপায়ীদের মধ্যে। আবার ধারণা যে ডারউইন সাহেব বলেছেন মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে বানর। সেদিন একখানা বাংলা বইএ পড়ছিলাম সাদা চামড়ার মানুষেরা নাকি শিম্পাঞ্জীর বংশধর, কালো নিগ্রোরা গরিলার, আর হলদে অর্থাৎ মঙ্গোলিয়ানরা নাকি ওরাংওটানের বংশধর। বিভিন্ন জাতের মানুষের সঙ্গে ঐ সব জানোয়ারের সাদৃশ্য দেখেই হয় তো ঐ রকম অনুমান করা হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা অমন কোন সঠিক প্রমাণ পেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। ডারউইনও অমন কথা বলেন নি। তবে ওরা সবাই যে একই জাতের প্রাণী থেকে বদলাতে বদলাতে এক একজন ঐ রকম নতুন নতুন জাতের প্রাণী হয়ে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ



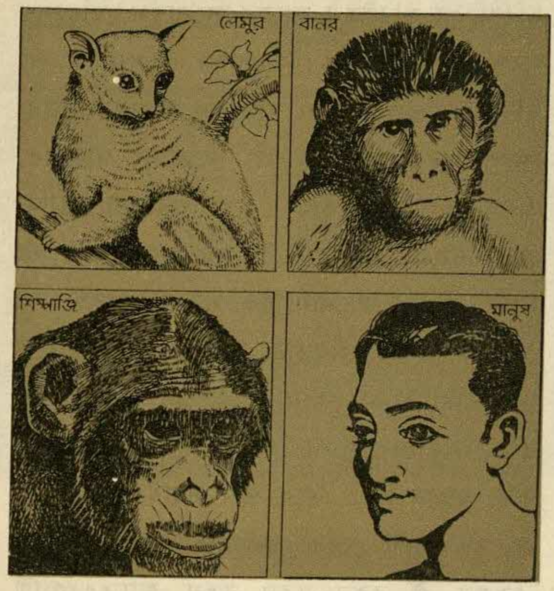
মাছ থেকে মানুষ; মগজের পরিবর্তন লক্ষ্য কর।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যেও, দেখবে, যে যত উন্নত ধরনের প্রাণী তার মগজ তত পুষ্ট,—সেই তুলনায় তত বড়। মানুষের বেলায় এই মগজ সবচেয়ে পরিপূর্ণ আকার পেয়েছে—তাই মানুষ আজ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জীব।

ডারউইন সাহেবের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব—যাকে বলা হয় 'থিওরি অব্ ইভলিউশন্' (অর্থাৎ কি করে ক্রমাগত বদলাতে বদলাতে এক প্রাণী থেকে আর এক প্রাণী হয়) নিয়ে আমরা আগে একটু-আধটু আলোচনা করেছি। আমাদের মধ্যে অনেকের

ওদের পূর্বপুরুষরা একই জাতের। সে হিসাবে মাছও তো আমাদের পূর্বপুরুষ!

বিজ্ঞানীরা স্তন্যপায়ীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করতে করতে শেষটায় 'প্রাইমেটিস্' নামে একটা বিশেষ শ্রেণীর কথা বলেছেন। এই প্রাইমেটিসের (যাদের বলা হয় প্রাইমেট) মধ্যে আছে বিশেষ করে চার জাতের জীব। এক—লেমুর, দুই—বানর, তিন—বনমানুষ বা 'এপ্', যাদের বানরের মত লেজ নেই, আর চার—মানুষ। বনমানুষ বা এপের মধ্যে গরিলার সঙ্গে মানুষের মিল



লেমুর, বানর, শিম্পাজী ও মানুষ

সব চাইতে বেশী ; তা ছাড়া ওরাংওটান আর শিম্পাঞ্জীও ঐ দলে পড়ে। বুদ্ধিতে বোধ হয় শিম্পাঞ্জীই এদের মধ্যে সবচেয়ে তুখড়। উল্লুক বা গিবন্‌ও লেজহীন বানরেরই একটি।

গরিলা, শিম্পাঞ্জী বা ওরাংওটানের সঙ্গে মানুষের খুবই মিল থাকলেও এঁদেরকে তোমরা নিশ্চয়ই মানুষ বলতে রাজী হবে না। সত্যি, এরা কেউ মানুষ নয়—আমরা খাতির করে বনমানুষ বললে কি হবে! তবে এদেরকে মানুষের নিকট-জ্ঞাতি বললে ভুল বলা হবে না।

সত্যিকার মানুষ আর প্রায়-মানুষ

পৃথিবীতে সত্যিকার মানুষের আবির্ভাব কবে হয়েছিল এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও তর্কাতর্কির অবধি নেই। তবে শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানীরা মোটামুটি মেনে নিয়েছেন যে আন্দাজ পাঁচ লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে সত্যিকার মানুষ দেখা দিয়েছিল। তারও আগেকার যে সব মানুষের চিহ্ন পণ্ডিতেরা পেয়েছেন তাদেরকে এঁরা সত্যিকার মানুষ বলতে রাজী ন'ন;—উপ-মানুষ বা প্রায়-মানুষ বলা যেতে পারে তাদেরকে।

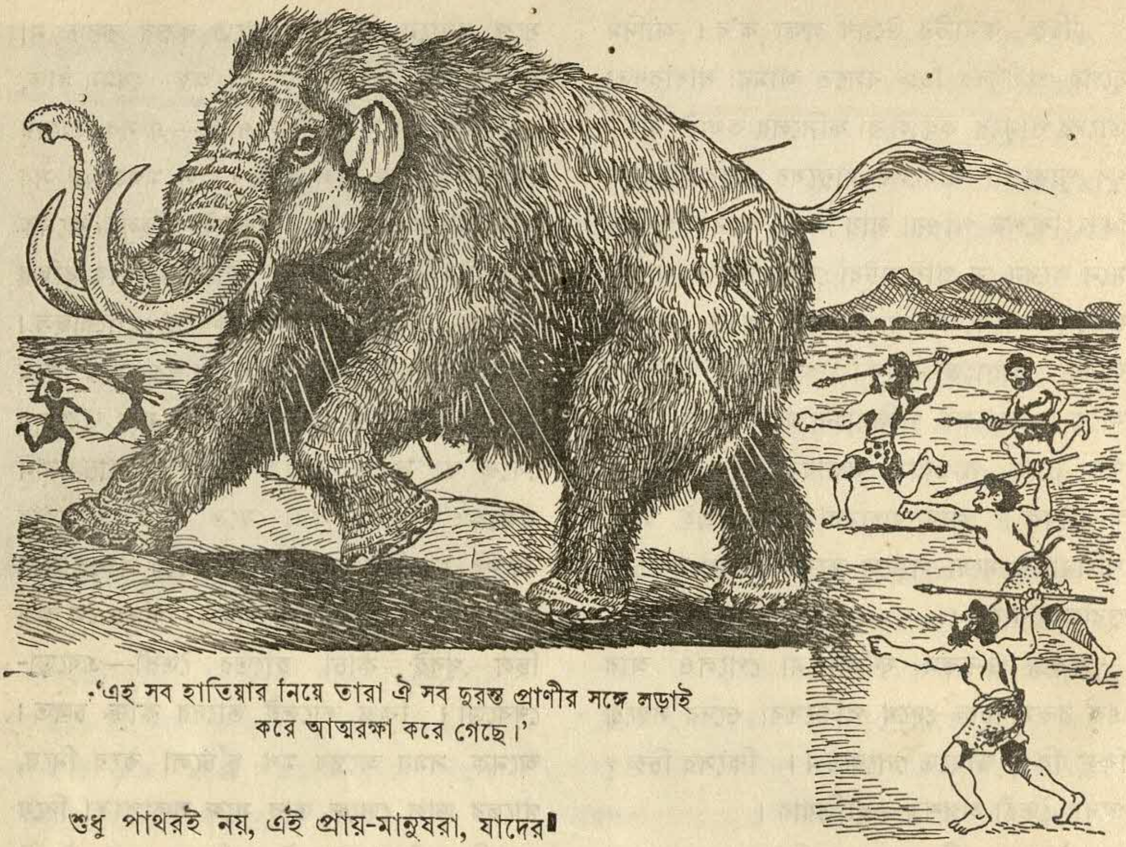


'পাথর ঘষাঘষি করে ছুঁচলো অস্ত্র তৈরী'

'চিহ্ন' কথাটির উল্লেখ লক্ষ্য ক'র। আদিম যুগের প্রাণীদের চিহ্ন বলতে আমরা সাধারণতঃ তাদের পাথুরে কঙ্কাল বা ফসিলের কথাই বুঝি। খুব পুরোনো আমলের মানুষের ও-রকম ফসিল কিন্তু বিশেষ পাওয়া যায় নি। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে প্রাইমেট্রা বেশীর ভাগই থাকত জঙ্গলে—অনেকেই গাছে বাস করত, নয়তো ফাঁকা পাহাড়ে—যেমন আজকাল বেবুনরা থাকে। কাজেই পলিমাটির মধ্যে ওদের চাপা-পড়া দেহ পাওয়ার সম্ভাবনা কম হওয়াই স্বাভাবিক। আর, তোমরা জান, এই রকম পলিমাটির মধ্যে পড়লে তবেই ফসিল সবচেয়ে সুরক্ষিত থাকে।

কিন্তু ও-রকম ফসিল না পেলেও আর এক রকম চিহ্ন দেখে পণ্ডিতেরা ওদের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পেরেছেন। কিসের চিহ্ন? ওদের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র—হাতিয়ার।

ঐ সব প্রাণী, যাদের পণ্ডিতেরা মানুষ না বলে প্রায়-মানুষ বলাই সমীচীন মনে করেন, যখন পৃথিবীতে বাস করত তখনকার পৃথিবীর চেহারা যে অন্য রকম ছিল সে কথা তো আগেই বলেছি। কোথাও বা গভীর ঘন জঙ্গল, কোথাও বা বিস্তৃত জলাভূমি, আবার কোথাও বা রুক্ষ পাহাড়ের গুহা। তারই মধ্যে পাশা-পাশি বাস করত সেকালের সেই ভীষণ ভীষণ জানোয়ার। খাঁড়ার মত দাঁতওয়ালা বাঘ, গুহাভালুক, লোমশ গণ্ডার, বাইসন, অতিকায় লোমশ হাতী ম্যামথ, আরও কত রকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রাণী! এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকাই ছিল সে যুগে একটা কঠিন ব্যাপার। তবু ঐ সব প্রায়-মানুষরা ওদের সঙ্গে সমানে লড়াই চালাতে কসুর করত না নিশ্চয়ই। বিধাতার দেওয়া অস্ত্র—যেমন দাঁত, নখ, খড়্গ বা অমানুষিক শক্তি—এ সব তাদের ছিল না; কিন্তু ছিল মগজ। সে মগজ ঐ সব জানোয়ারের চাইতে নিশ্চয়ই ছিল অনেক পরিপুষ্ট। ঐ মগজেরই জোরে—অর্থাৎ বুদ্ধির জোরেই তারা আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল। পাথর ঘষাঘষি করলে সে পাথর ক্ষয় হয়ে ছুঁচলো হয়ে যায়—ধারালো হয়ে যায় এবং দূর থেকে তা ছুঁড়ে মারলে বড় বড় পালোয়ান জন্তুকেও ঘায়েল করা যেতে পারে এ বোধ তাদের হয়েছিল। তারা ঐ ভাবে পাথর ঘষে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে শিখেছিল—যদিও সে অস্ত্র ছিল খুবই কাঁচা হাতের তৈরী—এবড়ো-খেবড়ো। কিন্তু তাতেই তাদের কাজ চলত। অনেক সময় অস্ত্রের মুখ ছুঁচলো করে নিয়ে, গাছের ডাল ভেঙ্গে তার সঙ্গে লতাপাতা দিয়ে সেগুলি বেঁধে চলনসই বর্শা বা বল্লম তৈরী করতেও তারা ছাড়ে নি। পাথর ঘষে ঘষে ধারালো করে, তার পর তার মধ্যে গর্ত করে সেই গর্তে গাছের ডাল ঢুকিয়ে কুড়ুল তৈরী করতেও তাদের বাধে নি। এই সব হাতিয়ার নিয়ে তারা ঐ সব দুরন্ত প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করে আত্মরক্ষা করে গেছে, হয়তো তাদের শিকারও করেছে। পণ্ডিতেরা এই সব অস্ত্রশস্ত্র, রুক্ষ হাতিয়ার সংগ্রহ করেছেন আর তাই থেকে তাদের হালচাল সম্বন্ধে নানা তথ্য বার করেছেন। এই সব অস্ত্রশস্ত্রই হচ্ছে সেই 'চিহ্ন', যার নাম দেওয়া হয়েছে "এওলিথ" অর্থাৎ ঊষা-পাথর। মানুষের জীবনে হয় তো সেটাই ঊষাকাল, তাই এই নাম।



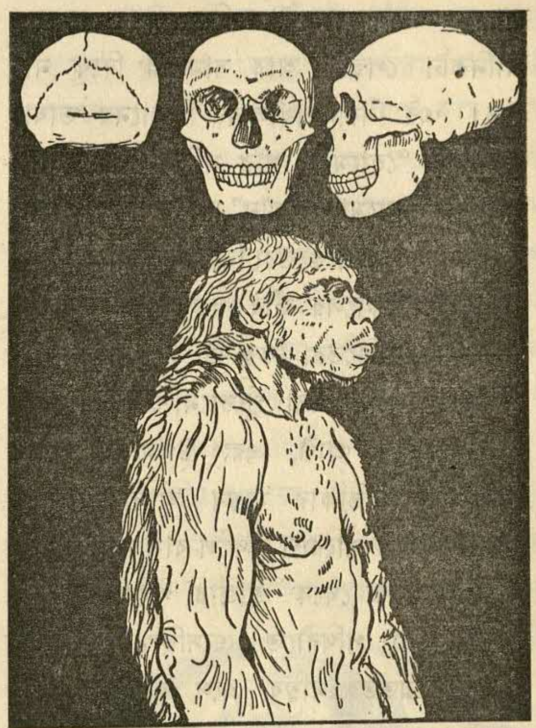
'এই সব হাতিয়ার নিয়ে তারা ঐ সব দুরন্ত প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করে আত্মরক্ষা করে গেছে।'

শুধু পাথরই নয়, এই প্রায়-মানুষরা, যাদের আমরা একজাতের প্রাইমেটই বলতে পারি, —মরা জীবজন্তুর হাড় নিয়েও অস্ত্রশস্ত্র বানাতে ছাড়ে নি। এমন কি গাছের ডালপালাও হয়-তো ব্যবহার করেছে হাতিয়ার হিসেবে। এদের অনেকে হয়তো গাছের ডালে ডালেই জীবন কাটিয়েছে। ফলে পেশী সঞ্চালনের নানা কৌশলও নিশ্চয়ই ওদের আয়ত্ত হয়েছিল। এর আগেকার স্তন্যপায়ীরা ঘ্রাণশক্তির ওপর অনেকটা নির্ভর করত, তাই তাদের বেশীর ভাগেরই মুখটা হ'ত ছুঁচলো, নাকটা হ'ত লম্বা। এরা কিন্তু নাকের চেয়ে চোখের দৃষ্টির ওপরই নির্ভর করত বেশী। ফলে এদের নাক হয়ে গেল ছোট, থ্যাবড়া; কিন্তু চোখ চলে এল মুখের আরও সামনের দিকে। এদের কেউ কেউ চার পায়ে চললেও গাছের ডাল জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত এবং পা দুই-ই ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারত। অনেক সময় হয়তো পা দু'টো জড়িয়ে ধরার জন্য রেখে হাত দু'টো অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য রাখত। যেমন নাকি গাছের ডাল ভেঙ্গে লাঠি তৈরী করে তা দিয়ে পেটান, ঢিল বা অস্ত্রশস্ত্র ছোঁড়া —এই সব। অনেক বানর জাতীয় প্রাণীর মধ্যে এখনও আমরা এ ধরণের পা দেখতে পাই। হাতের মত লম্বা আঙ্গুলওয়ালা পা দিয়েও তারা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে পারে। এর ফলে অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় হাতটাও এদের হয়ে গেল অনেক বেশী কাজের—একটা অতিরিক্ত হাতিয়ার বললেও দোষ নেই।

নিয়ান্‌ডার্থাল ম্যান

১৮৫৭ সালে জার্মেনীর ডুসেলডর্ফ শহরের কাছে নিয়ান্‌ডার্থাল নামে একটা জায়গায় ঐ রকম এক জাতের প্রাণীর মাথার খুলি আর কয়েকখানা হাড় পাওয়া যায়। ঐ ফসিল-খুলি আর ঐ ফসিল-হাড়ের সঙ্গে অন্যান্য বানর জাতীয় জীবের চাইতে মানুষের মাথার খুলি আর হাড়ের সাদৃশ্য এত বেশী যে পণ্ডিতেরা প্রথমটা এদেরকেই আদিমতম মানুষ বলে ধারণা করেছিলেন। এদের ঐ ফসিলের সঙ্গে যে সব অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার পাওয়া গেছে তাই দেখেও ঐ কথাই মনে আসা স্বাভাবিক। এমন কি এরা যে এখনকার মানুষের মত ডান হাত দিয়ে সব কাজ করত, আগুন জ্বালতে জানত এবং চামড়া দিয়ে শরীর ঢাকতে জানত তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু তবু, এখনকার বিজ্ঞানীরা বলেন, এরা সত্যিকার মানুষ ছিল না—বড় জোর এদের একরকম উপমানুষ বলা চলে। নিয়ান্‌ডার্থালে এদের চিহ্ন প্রথম পাওয়া গিয়েছিল, তাই পণ্ডিতেরা এদের নাম দিয়েছেন "নিয়ান্‌ডার্থাল ম্যান্‌", সংক্ষেপে নিয়ান্‌ডার্থাল।

নিয়ান্‌ডার্থাল মানুষের চোয়ালের সঙ্গে এখনকার মানুষের চোয়ালের কোনই সাদৃশ্য নেই। সে চোয়াল শুধু ভারীই নয়—মুখ থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে। এদের কপালও ছিল মানুষের চাইতে নীচু আর ভ্রূ দু'টো ছিল তেমনি উঁচু আর চওড়া। এদের ঘাড়ের গড়ন দেখলে মনে হয় এরা পেছন দিকে মাথা হেলাতে পারত না—কাজেই আমরা যেমন করে আকাশের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাই সে ভাবে তাকানো তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না।



'নিয়ান্‌ডার্থাল ম্যান্‌'

নিশ্চয়ই এরা মাথা নীচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে চলত—যেমন অনেক বানর জাতীয় জীব আজও চলে। এমন কি হয় তো হাঁটবার সময় হাত দু'টোকেও মাটিতে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে চলতে হ'ত এদের—অনেকটা ওরাংওটানদের মত।

এদের মাথার এবং দাঁতের গড়নেও ছিল এখনকার মানুষের চাইতে যথেষ্ট তফাৎ। আমাদের মুখের দাঁত চার রকমের। কষের দাঁত (মোলার), প্রি-মোলার, কুকুরে দাঁত (ক্যানাইন) আর কাটবার দাঁত (ইন্‌সিসর)। নিয়ান্‌ডার্থাল মানুষের এই কষের দাঁত ছিল একেবারে অন্য রকম, আর কুকুরে দাঁত (যা দিয়ে আমরা মাংস খাই) একেবারেই ছিল না। আমাদের মাথায় যেখানটায় মগজ বসানো

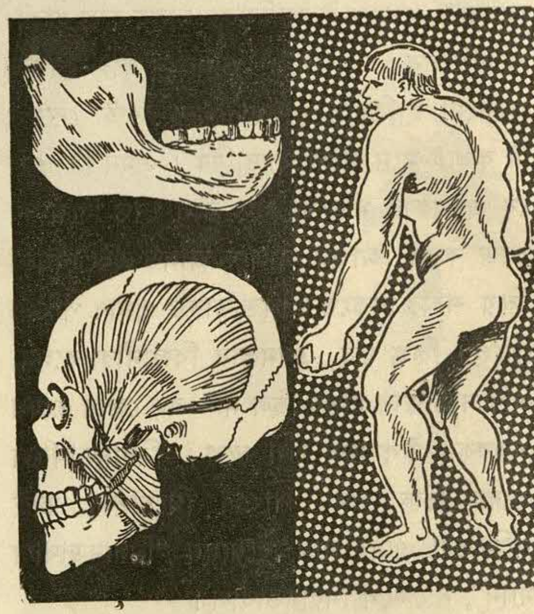
থাকে এদের মগজটা ছিল তার চেয়েও খানিকটা পেছনে আর সামনের দিকে নীচু মত। এই নিয়ান্‌ডার্থালদের বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় "হোমো", আর সত্যিকার মানুষদের বলা হয় "হোমোসেপিয়ান"।

আগেকার পণ্ডিতেরা নিয়ান্‌ডার্থাল মানুষকে যতটা আদ্যিকালের জীব বলে মনে করতেন এখনকার পণ্ডিতেরা কিন্তু তা মনে করেন না। তাঁদের ধারণা, এরা পুরোনো প্রস্তর যুগের শেষ দিকের প্রাণী, এবং উপমানুষ হলেও পৃথিবীতে সত্যিকার মানুষ আসার অনেক পরেও এরা ইয়োরোপ অঞ্চলে বাস করত। খুব সম্ভবতঃ আজ থেকে হাজার পঞ্চাশেক বছর আগে এরা পৃথিবীতে এসেছিল। পরবর্তী যুগের উন্নততর মানুষ এসে অনুমান ৩০।৩৫ হাজার বছর আগে এদেরকে হটিয়ে দিয়ে এদের জায়গা দখল করে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

নিয়ান্‌ডার্থাল মানুষরা মোটামুটি নিরামিষাশী ছিল। গাছের নরম ডাঁটা, মাটির তলায় গজানো কন্দ এবং সময় বিশেষে গাছের কচি পাতাও এদের খাদ্য ছিল বলে মনে হয়। বুনো ফল পেলে তো কথাই নেই! কিন্তু এদের গুহার মধ্যে বড় বড় জানোয়ারের ফাটানো হাড়ও পাওয়া গেছে। মনে হয় হাড় ফাটিয়ে এরা তার ভিতরকার মজ্জা চুষে খেতেও হয় তো ভালবাসত।

আর এক জাতের উপমানুষ

নিয়ান্‌ডার্থাল মানুষের কথা বলতে গিয়ে হাইডেলবার্গ মানুষের কথাও মনে আসছে। এদেরকেও মানুষ না বলে প্রায়-মানুষ বলা উচিত। নিয়ান্‌ডার্থাল নামক জায়গায় প্রথম নিয়ান্‌ডার্থাল মানুষের চিহ্ন পাওয়া যায় বলে যেমন তাদের ঐ নাম দেওয়া হয়েছে, তেমনি হাইডেলবার্গের এক বেলে গর্তে প্রথম এই জাতের উপমানবের হাড় পাওয়া গিয়েছিল বলে ওদের নাম দেওয়া হয়েছে "হাইডেলবার্গ ম্যান্"। হাড় বলতে—চোয়ালের একখানা হাড়। কিন্তু সত্যিকার মানুষের চাইতে তার তফাৎ অনেকখানি।



'হাইডেলবার্গ ম্যান্'

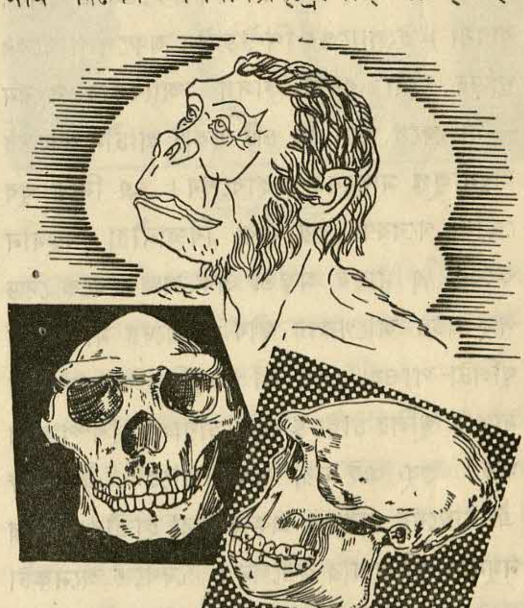
যেমন সরু, তেমনি ভারী, আর চিবুকের কোন বালাই-ই নেই বলা যায়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে এই "মানুষ" নিশ্চয়ই কথা বলতে পারত না,—কারণ মুখের ভিতরটা ঐ রকম হলে জিভ নেড়ে কথা উচ্চারণ করা খুবই কঠিন। হাইডেলবার্গ মানুষ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা—এদের ওজন খুব বেশী হ'ত,—এখনকার মানুষের চাইতে অনেক বেশী ভারী, প্রায় গরিলার মত। চেহারাটাও নিশ্চয়ই ছিল ছোট-

খাট দানবের মত। হাত-পাগুলো লম্বা লম্বা। মাথায় চুল ছিল, কিন্তু তা আমাদের মত নয়, —যেমনি পুরু, তেমনি চাপ বাঁধা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী-সাহিত্যিক এইচ্. জি. ওয়েল্স্ এই হাইডেলবার্গ মানুষের একটি চমৎকার কাল্পনিক ছবি দিয়েছেন। যতটা সম্ভব তাঁর অনুকরণেই বলি: আমি যেন একটা বাঁকা কাচের ভিতর দিয়ে দূর অতীতের দিকে চেয়ে আছি আর তারই ভিতর অস্পষ্ট মরীচিকাময় একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছি—সে ছায়া এই অদ্ভুত প্রাণী বা উপমানুষের ছায়া। বিজন বনের মধ্যে দিয়ে সে হেঁটে চলেছে এঁকেবেঁকে। তার চলার ভঙ্গী যেমন বেঢপ তেমনি হাস্যকর। হঠাৎ দূরে একটা খড়্গদন্তী বাঘ দেখে সে আত্মরক্ষার জন্য একটা উঁচু গাছে উঠে পড়ল,—অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এবং নিপুণ কৌশলে। গাছের ওপরে তাকে দেখলাম স্থিরদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে দূর জঙ্গলের মধ্যে একটা লোমশ গণ্ডারের দিকে। তারপর তাকে আরো ভালো ভাবে, খুঁটিয়ে দেখবার আগেই সে ঝাপসা হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল!

হাইডেলবার্গ মানুষরা সত্যিকার মানুষ না হ'লেও পাথর ঘষে, চেঁছে বেশ মজবুত সব হাতিয়ার তৈরী করতে পারত। তাদের বাসস্থানের কাছে এ সব স্মৃতিচিহ্ন প্রচুর পাওয়া গেছে।

যবদ্বীপের বানর-মানুষ

১৮৯১ সালে নৃতত্ত্ববিদ্দের (অর্থাৎ যাঁরা মানুষের কথা বা বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেন) মধ্যে খুব একটা বড় সাড়া পড়ে যায়। ইউজিন ড্যুবয় নামে এক ওলন্দাজ বিজ্ঞানী যবদ্বীপে (এখন যার নাম ইন্দোনেশিয়া) ট্রিনিটি নদীর ধারে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ এক রকম অদ্ভুত প্রাচীন মানুষের ফসিল আবিষ্কার করলেন। মাথার খুলি, পায়ের হাড় আর দু'টো দাঁত। ঐগুলি পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা ঠিক করলেন এ এক অদ্ভুত জাতের জীব—না মানুষ, না বনমানুষ, বরঞ্চ দুইএর সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। এই জীবটির মুখের সঙ্গে বানরের মুখের সাদৃশ্য যেমন খুব বেশী তেমনি মানুষের মুখের সঙ্গেও সাদৃশ্য বড় কম নয়! আর, সবচেয়ে বড় কথা, এরা এখনকার মানুষেরই মত খাড়া হয়ে দু'পায়ে হাঁটত, পায়ের গড়ন দেখেই তা বোঝা যায়। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিলেন "পিথাক্যান্থ্রোপাস্ ইরেক্টাস্"



'যাভা-ম্যান্'

অর্থাৎ খাড়া বানর জাতের মানুষ। সংক্ষেপে এদের "যাভা-ম্যান্" বা যবদ্বীপের বানর-মানুষ বলেও বলা হয়। এই মানুষও এবড়ো-খেবড়ো

অস্ত্র তৈরী করতে শিখেছিল এবং পশুশিকারে অভ্যস্ত ছিল। কাঁধে শিকার-করা শূওর নিয়ে যাভা-ম্যানের কল্পিত মূর্তির ছবি তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। এরা কিন্তু নিয়ান্-ডার্থালদের তুলনায় আরও অনেক পুরোনো যুগের প্রাণী। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে এরা যবদ্বীপে বাস করত।

বিয়াল্লিশ বছর ধরে ধাপ্পা?

বিজ্ঞানীদের মধ্যে এমনি আর একটি রহস্যময় আবিষ্কারের ফলে সাড়া পড়ে যায় ১৯১১ সালে। চার্ল্‌স্ ডসন নামে একজন সখের বিজ্ঞানী (আসলে তিনি করতেন ওকালতী ব্যবসা) ইংল্যাণ্ডের পিল্টডাউন অঞ্চলে পাথরের নুড়ির মধ্যে একটি ফসিল আবিষ্কার করেন —যা দেখে মনে হয় ওটি একটি প্রাচীন জাতের অধুনালুপ্ত মানুষের দেহাবশেষ। এ নিয়ে খুব জোর গবেষণা হয় এবং বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, এ মানুষ অন্ততঃ এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ বছর আগেকার জীব। এদের মাথার যে খুলিটা পাওয়া গেল তা আধুনিক বনমানুষদের মাথার খুলির চাইতে বড়, চোয়ালটা শিম্পাঞ্জীর মত। শুধু এই নয়, ডসন সাহেব ঐ সঙ্গে ঐ মানুষের ব্যবহৃত এক টুকরো হাতীর হাড়ের নমুনাও খুঁজে বার করলেন। দেখতে অনেকটা খেলবার ব্যাটের মত, কিন্তু তার ভিতরে বেশ বড় একটা ছেঁদা। দেখলেই মনে হয় কোনও বুদ্ধিমান্ জীব ওই হাতীর হাড়টি সযত্নে কেটেকুটে, চেঁছে তার ভিতর ঐ নিখুঁত গর্তটি বানিয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা দেখেশুনে বললেন, হ্যাঁ, এ একটা সত্যিকারের আবিষ্কার। অতি প্রাচীন জাতের মানুষের স্মৃতিচিহ্ন। তাঁরা এর নাম দিলেন "ইওনথ্রোপাস্" অর্থাৎ "প্রত্যূষের মানুষ"। সাধারণ ভাবে নাম দেওয়া হ'ল "পিল্টডাউন ম্যান্"। ডসন সাহেব এবং সেই পিল্টডাউন গ্রামের নাম বিখ্যাত হয়ে গেল বৈজ্ঞানিক-মহলে।

কিন্তু ও মা, এর প্রায় ৪২ বছর পরে, —১৯৫৩ সালে, কয়েকজন বিজ্ঞানী যে কথা শোনালেন তা যেমন অদ্ভুত তেমনি কৌতুককর। এঁরা কিন্তু কেউই হেঁজিপেঁজি লোক ন'ন— বৃটিশ মিউজিয়াম আর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন নামকরা বিজ্ঞানী,—সকলেই অ্যানাটমিতে বিশেষজ্ঞ। আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বিশেষ করে এক্স-রের সাহায্যে এঁরা ঐ সব ফসিল নতুন করে পরীক্ষা করে বললেন— জিনিসটা একেবারেই ফাঁকিবাজি। পিল্টডাউন ম্যান্ বলে যাকে বলা হচ্ছে তার মাথার খুলিটা হচ্ছে কোন বনমানুষের, আর চোয়ালের হাড় আর দাঁত একেবারেই নকল। কোন লোক হয় তো ইচ্ছে করে ফাঁকি দিয়ে নাম কিনবার জন্য বনমানুষের খুলির সঙ্গে ঐগুলি যুড়ে দিয়ে বিজ্ঞানীদের শুদ্ধু ধাপ্পা দিয়েছে। খুলির ওপরের দিক্‌টা অবশ্য পুরোনো যুগের হওয়া অসম্ভব নয়, —তা হলেও হাজার পঞ্চাশের বেশী পুরোনো নয়। কিন্তু তলার দিক্‌টা একেবারেই আধুনিক কোন বানর বা বনমানুষ থেকে সংগ্রহ করে যুড়ে দেওয়া। অর্থাৎ আদপেই ওগুলো কোন আদিম মানুষের কঙ্কাল নয়।

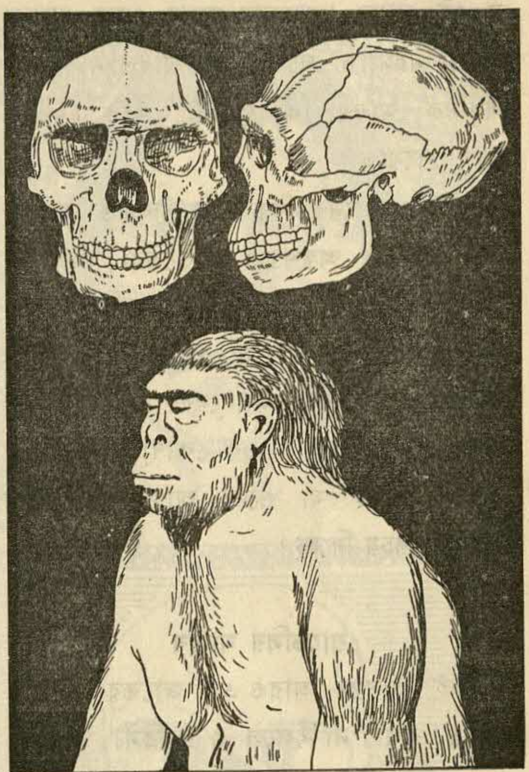
ডসন সাহেব বেঁচে থাকলে এর কি জবাব দিতেন বলা মুশকিল। তবে তাঁর ভক্ত দু'-এক জন বিজ্ঞানী বলেন—ওটা ধাপ্পা না হয়ে ভুলও তো হতে পারে! জানি না এ কি জাতের ভুল!

চৌকৌটিনের গুহায়

১৯২৭ সালে চীনের পিকিং শহর থেকে ৩৭ মাইল দূরে চৌকৌটিন নামে এক গুহায় আর এক রকম প্রাচীন মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া যায়। দেহাবশেষ বলতে একটি ফসিল দাঁত। কিন্তু তাই দেখেই ডঃ ডেভিডসন বললেন, এ নিশ্চয়ই কোন আস্থিযুগের মানুষের দাঁত—যে মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর ঐ অঞ্চলে বাস করত। ডেভিডসনের অনুমান যে ভুল নয় তা এর বছর দুই-এর মধ্যেই জানা গেল—যখন ওরই কাছাকাছি দু'টো পুরোপুরি মাথার খুলি, চোয়াল এবং আরও কতকগুলি দাঁত বেরিয়ে পড়ল—ঠিক ঐ একই জাতের। বিজ্ঞানীরা এবার সাহস করে গুহার ভিতর খুঁড়ে যেতে লাগলেন। ক্রমাগত খুঁড়তে খুঁড়তে বেরিয়ে পড়ল আরও প্রাচীন গুহা—যেখানে ঐ মানুষেরা থাকত। সেই গুহায় পাওয়া গেল একেবারে প্রায় পূরো মানুষের একাধিক কঙ্কাল আর তাদের ব্যবহৃত নানা জিনিস। যেন মা বসুন্ধরা তাঁর এই বিশেষ জাতের মানবসন্তানদের সযত্নে নিজের আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

হৈ-হৈ পড়ে গেল নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে। এত সুরক্ষিত আর এত পুরোনো মানুষ এর আগে তাঁরা দেখেন নি। তাঁরা এর নাম দিলেন "সিনান্‌থ্রোপাস্ পিকিনেন্‌সিস্"—অর্থাৎ পিকিং-এর চীনা-ম্যান্। সংক্ষেপে এদের বলা হয় "পিকিং ম্যান্"।

বিজ্ঞানীরা আজ প্রায় একমত যে এই পিকিং ম্যান্‌রা নিঃসন্দেহ প্রথম যুগের "সত্যিকার মানুষদের"ই স্বজাতি। অনুমান পাঁচ লক্ষ



'পিকিং ম্যান্'

থেকে আড়াই লক্ষ বছর আগে এরা পৃথিবীতে বাস করত। অর্থাৎ যবদ্বীপের বানর-মানুষ আর এই পিকিং ম্যান্ প্রায় সমসাময়িক জীব।

পিকিং ম্যান্‌দের সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাও কম কৌতূহলজনক নয়। সে যুগের তুলনায় এরা অনেকটা সভ্য ছিল। এরা আগুনের ব্যবহার শিখেছিল এবং শিকার-করা জীবজন্তুর মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে খেত। এদের গুহার মধ্যে সে যুগের নানা জানোয়ারের আধপোড়া হাড় পাওয়া গেছে, তাই থেকেই ও কথা প্রমাণিত হয়। তবে ঐ সব আধপোড়া হাড়ের মধ্যে মানুষের হাড়ও পাওয়া গেছে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন

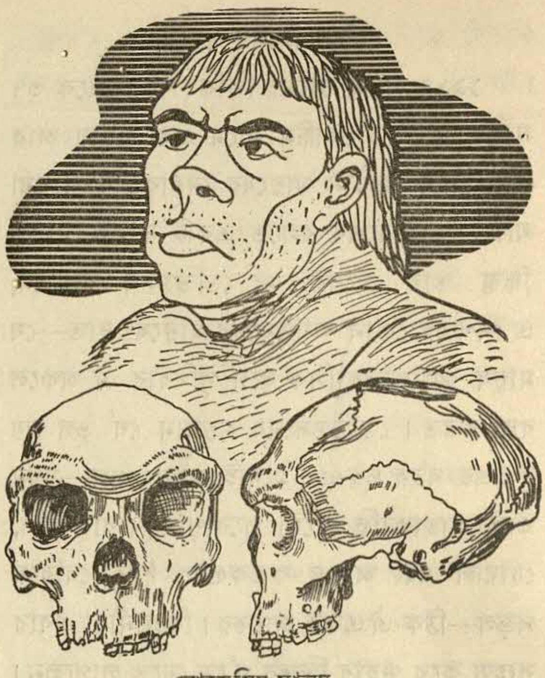
যে এই মানুষ তখনকার যুগের পক্ষে সুসভ্য হলেও নরমাংস খেতে ওদের বাধত না। তা নরখাদক মানুষ কি পৃথিবী থেকে এখনই লোপ পেয়েছে ?

পিকিং ম্যানের কিছু কিছু ব্যবহৃত জিনিস-পত্র, পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেছেন। একটা গুহায় কতকগুলি ফসিল বাদাম আর তার খোসা পাওয়া গেছে। ঐ বাদামগুলি যে পিকিং ম্যান্‌দেরই খাদ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক কোণায় কিছু ছাই পাওয়া গেছে যা ওদের আগুনের ব্যবহার জানার পরিচয় দিচ্ছে।

রোডেসিয় মানুষ

এই প্রসঙ্গে আরও এক জাতের প্রাচীন জীবের কথা না বললে এ কাহিনী অসমাপ্ত থেকে যাবে। ১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রোকেন হিল্ অঞ্চলে বিজ্ঞানীরা একটা কঙ্কালের কিছু টুকরো আর মাথার খুলি দেখতে পান। নিশ্চয়ই মানুষের কঙ্কাল, কিন্তু সত্যিকার মানুষ না বলে এদেরকেও প্রায়-মানুষ বললে ভাল হয়। পণ্ডিতদের কাছে এরা "রোডেসিয়ান্ ম্যান্" বা রোডেসিয় মানুষ ব'লে পরিচিত।

রোডেসিয় মানুষের মগজের খোল নিয়ান্‌-ডার্থালদের তুলনায় সামনের দিকে ছিল বেশী বড়, আর পেছন দিকে বেশী ছোট; মাথাটা শিরদাঁড়ার ওপর একেবারে খাড়া ভাবে বসানো, আর বাদ-বাকী হাড়গুলো প্রায় মানুষেরই মত। কিন্তু এদের ভুরুর হাড় আর মুখের গড়ন দেখলেই বোঝা যায় এদের মুখখানার সঙ্গে মানুষের চাইতে বানরের সাদৃশ্যটাই



রোডেসিয় মানুষ

যেন ছিল বেশী। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা, এরা সত্যিকার মানুষ আর নিয়ান্‌ডার্থালদের মাঝামাঝি কোন জীব। আবার কেউ কেউ বলেন, না, রোডেসিয় মানুষরা সত্যিই মানুষ, তবে বড় জোর ওদের বলতে পার বানরমুখো মানুষ। নিয়ান্‌ডার্থালদের চাইতে ওরা যে আমাদের নিকট-আত্মীয় সে বিষয়েও তাঁরা নিঃসন্দেহ।

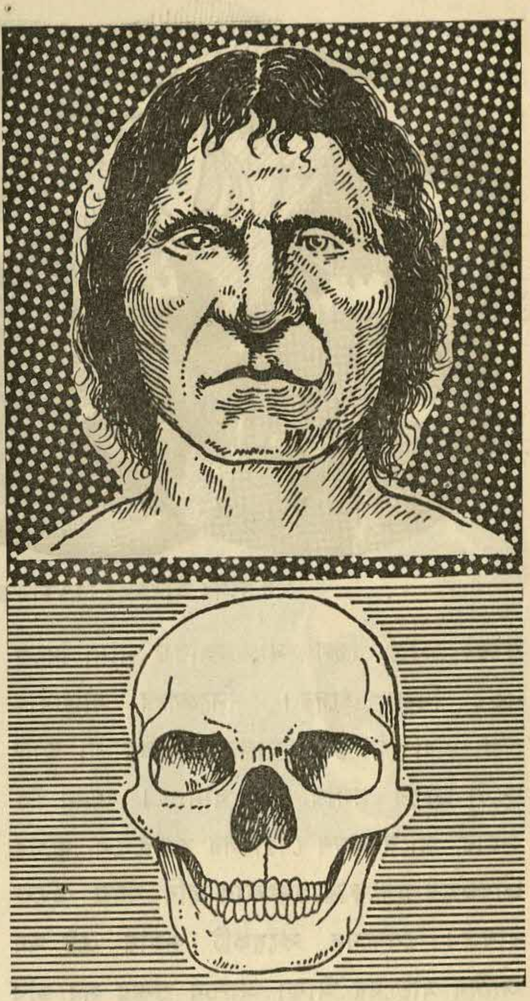
সত্যিকার মানুষ কবে এল ?

তা হলে সত্যিকার মানুষ কবে এল পৃথিবীতে ? যাভা-ম্যান্, পিকিং-ম্যান্—এদের বাদ দিলে আরও সভ্য মানুষের যে সন্ধান আমরা পাই তা অনেক পরবর্তী যুগের। এর আগে বলেছি, পরবর্তী যুগে উন্নততর জাতের মানুষেরা এসে নিয়ান্‌ডার্থাল মানুষদেরকে তাদের আড্ডা থেকে হটিয়ে দেয়।

এই উন্নত জাতের মানুষ, যতদূর মনে হয়, থাকত আরও দক্ষিণে কিংবা পূবে। এই সময়ে পৃথিবীর আবহাওয়া একটু গরম হওয়ায় এরা চলে আসে আরও উত্তরে এবং, যত দূর মনে হয়, নিয়ান্ডার্থালদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। এরা ছিল নিয়ান্ডার্থালদের তুলনায় অনেক বুদ্ধিমান্; এদের অস্ত্রশস্ত্রও, পাথরের হলেও, ছিল অনেক নিখুঁত—অনেক মসৃণ। এরা দল বেঁধে একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকত এবং কথাও বলতে পারত। খাঁটি মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি এরা হচ্ছে তাই। এদের মাথার খুলি আর কঙ্কালের সঙ্গে এখনকার মানুষের মিল খুব বেশী। অনুমান ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে এরা ইয়োরোপে ঘুরে বেড়াত। ক্রোম্যাগ্নন্ নামে এক গুহায় এদের প্রথম চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল, তাই এদের বলা হয় 'ক্রোম্যাগ্নন্ ম্যান্'।

ক্রোম্যাগ্নন্ মানুষেরা ছিল বেশ লম্বা-চওড়া। এদের একটি ছ' ফুট লম্বা কঙ্কালও পাওয়া গেছে। এদের মগজের খোলও ছিল খুব বড়। এমন কি এদের মেয়েদের মগজের খোলও এখনকার পুরুষদের মগজের খোলের চাইতে ছোট ছিল না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এদের শরীরের কাঠামোর সঙ্গে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের বেশ খানিকটা মিল দেখা যায়।

ঠিক এদেরই কাছাকাছি সময়কার আর এক জাতের মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে গ্রিমাল্ডি গুহায়। এরা কিন্তু অন্য জাতের মানুষ,—মনে হয় আফ্রিকার নিগ্রোদের সঙ্গে এদের বেশ মিল্ ছিল। আজকালকার হটেন্‌টট্, বুশম্যান্‌দেরই হয় তো স্বগোত্রীয় ছিল এরা।

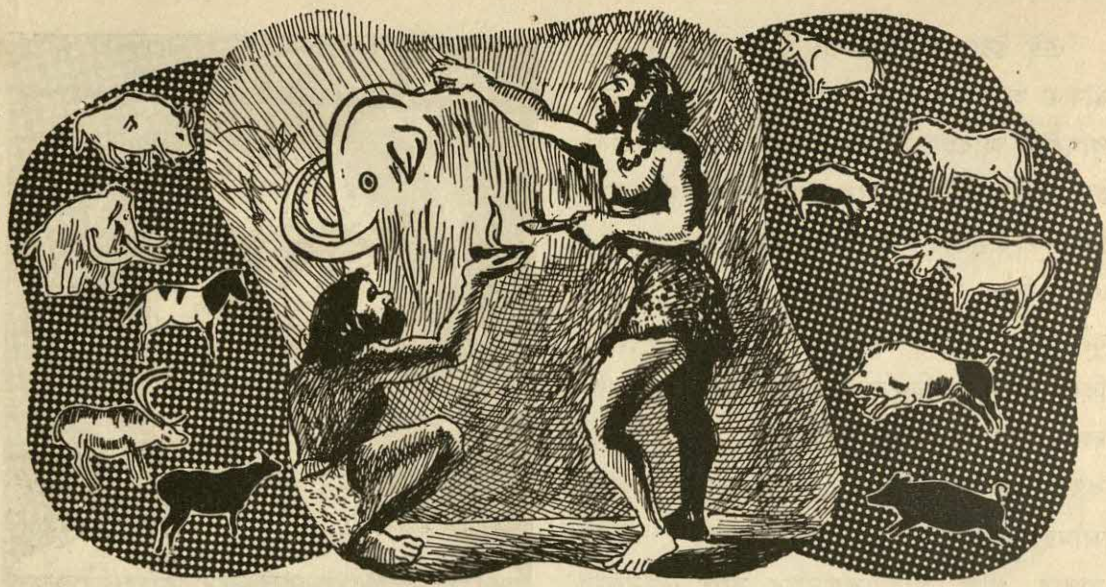


'ক্রোম্যাগ্নন্ ম্যান্'

ক্রোম্যাগ্ননদের তুলনায় এদের গায়ের রং-ও সম্ভবতঃ বেশী কালো ছিল।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগেকার মানুষের জীবনযাত্রা

৩০।৩৫ হাজার বছর আগেকার এই সব সত্যিকার আদিম মানুষের জীবনযাত্রার বহু পরিচয় পণ্ডিতেরা খুঁজে বার করেছেন। এরা শুধু নানা রকম হাতিয়ার তৈরী



'সে যুগের জীবজন্তুর চমৎকার চমৎকার ছবি পর্যন্ত এঁকে রাখত।'

করেই ক্ষান্ত ছিল না, আরও নানা দিকে নজর ছিল এদের। নিজেদের সাজাবার জন্য এরা গায়ে রং মাখত, পাথর বা হাড় ফুটো করে গলার হার বানাত। এমন কি গুহার গায়ে মসৃণ দেয়ালের ওপর সে যুগের জীবজন্তুর চমৎকার চমৎকার ছবি পর্যন্ত এঁকে রাখত। স্পেনের কয়েকটি গুহায় এই সব আদিম মানুষের আঁকা আশ্চর্য সুন্দর সব ছবি পাওয়া গেছে। বাইসনের ছবি, ম্যামথের ছবি, খাঁড়াদেঁতো বাঘের ছবি, সেকালকার ছোট ছোট ঘোড়ার ছবি এবং শিকারী মানুষের ছবি। অন্ধকার গুহার মধ্যে বসে এ রকম ছবি আঁকা সম্ভব নয়, কাজেই খুব সম্ভব এরা প্রদীপ জ্বালাতেও জানত। মরা জন্তুর মাথার খুলির মধ্যে চর্বি ভরে এবং তাতে পশুলোমের তৈরী সলতে বসিয়ে হয়তো এই প্রদীপ জ্বালানো হ'ত। আগুনের ব্যবহার যে মানুষ এর আগেই শিখেছিল সে কথা তো আগেই বলেছি। এই সব মানুষ সাধারণতঃ গুহায় বাস করত, তাই এদের বলা হয় গুহামানব। গুহায় ঢুকবার মুখে কাঠকুটো জড় করে রাত্রে এরা আগুন জ্বালিয়ে রাখত—যাতে হিংস্র জন্তুরা এসে আক্রমণ করতে না পারে। আগুনকে হিংস্র জন্তুদের ভারী ভয়, ঐ অদ্ভুত জিনিসটিকে তারা কোন কালেই সহ্য করতে পারে না। অথচ, মজা এই, সেই আদ্যিকালের অসভ্য মানুষ তখনই এই আগুনের ব্যবহার শিখে গিয়েছিল যা আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্য যুগেও অন্য কোন প্রাণীই শিখতে পারল না।

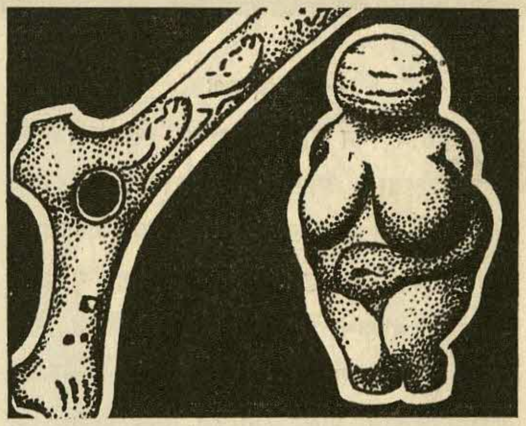
পাথর ঘষাঘষি করে অস্ত্র তৈরী করবার সময়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোয়। এই থেকেই মানুষ প্রথম আগুনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকবে। কিন্তু সেই আগুনকে তারা অত সহজে নিজেদের কাজে লাগিয়েছিল কি করে এ একটা সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার।

এই সব মানুষ কিন্তু চাষবাসের ধার ধারত

না। বুনো গাছের ফলমূল পেলে খেত, নরম কচি পাতাও হয় তো বাদ দিত না ; মাটি খুঁড়ে কন্দ বার করবার সময় শামুক, গেঁড়ি ইত্যাদি পেলে তাও খেতে ছাড়ত না। কিন্তু সেই সঙ্গে শিকার করে পশুমাংস সংগ্রহ করে খেতেও ওস্তাদ ছিল এরা। জলে নেমে মাছও শিকার করত। মাছ শিকারের সেই ছবিও তারা গুহার দেয়ালে এঁকে রেখে গেছে। শুধু আঁকা নয়, এদের গড়া পাথর-খোদাই-করা মূর্তিও পাওয়া গেছে।

শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এরা শিকার-করা জন্তুর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে গায়ে, কোমরে জড়াত। ঠাণ্ডা পড়লে লোমশ পশুর চামড়া সংগ্রহ করত।

এরা সকলেই যে শেষ পর্যন্ত গুহায় বাস করত তা নয়। খাবারের সন্ধানে এদের নানা জায়গায় ঘুরতে হ'ত। তখনকার দিনের জীবন-যাত্রা সত্যিই ছিল খুব কঠোর। এখন যেমন আমরা দেখি পশুপাখীদের খাদ্য সংগ্রহ করাটাই হচ্ছে প্রধান কাজ, সে যুগের মানুষেরও ছিল প্রায় তাই। এরই ফলে মানুষ হয়ে পড়ল যাযাবর। কিন্তু যেখানেই যাও, মাথা গুঁজবার একটা জায়গা চাই। রোদ-বৃষ্টি আছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভয় আছে যখন তখন জংলী হিংস্র জানোয়ারদের আক্রমণের। বিশেষ করে রাত্রে। তাই এরা পশুর চামড়া দিয়ে তাঁবু বানাতে শিখল। কিন্তু সব সময়েই যে এক-একখানা বড় চামড়া পাওয়া যাবে তার কোন মানে নেই। তাই দরকার মত একটা চামড়ার সঙ্গে আর একটা চামড়া যুড়ে নেবার প্রয়োজন হ'ল। শিকার-করা পশুর লোম পাকিয়ে সুতো বানিয়ে, সেই সুতো হাড়ের সূচের মধ্যে ঢুকিয়ে এই চামড়া যুড়তে অর্থাৎ সেলাই করতে শিখেছিল তারা। এ সব সূচ মাঝে মাঝে এত সূক্ষ্ম হ'ত যে একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে প্রাচীন রোমানরাও ও-রকম সূক্ষ্ম সূচ ব্যবহার করে নি। কথাটা হয় তো একটু বাড়িয়ে বলা, কিন্তু ওর থেকেই ওদের শিল্প-চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।



প্যালিওলিথিক যুগের মানুষের রেখে-যাওয়া চিহ্ন ; পাথরে-খোদাই মূর্তিও বাদ নেই।

এই যুগটাকে পণ্ডিতেরা বলেন "প্যালিও-লিথক" যুগ, যার বাংলা হচ্ছে "পুরোনো প্রস্তর" যুগ। এর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। "পুরোনো" এই কথাটা ব্যবহার করা হয় এই জন্য যে এর পরবর্তী যুগের মানুষরাও পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত, কিন্তু সে সব হাতিয়ার ছিল অনেক উঁচুস্তরের। তাই দু'টোর তফাৎ বোঝাবার জন্যই পরবর্তী সে সময়টাকে বলা হয় "নিওলিথিক" বা "নতুন প্রস্তর" যুগ।

নিওলিথিক যুগের মানুষদের কথা আমরা পরে আলোচনা করব।



ইতিহাসের কথা

প্রথম যুগ

প্রাচীন দিন বা চলে-যাওয়া দিনের বিবরণ সংগ্রহ করাই ইতিহাসের কাজ। বিবরণটি শুনতে বা পড়তে ভাল লাগবে যদি একেবারে গোড়া থেকে আরম্ভ করা যায়। মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। তার মানে কিন্তু গায়ের জোরে নয়, মানুষ বুদ্ধির বলেই বলীয়ান্। আজকালকার মানুষ চোখের নিমেষে পৃথিবীর এক পিঠ থেকে অন্য পিঠে খবর দেওয়া-নেওয়া করতে পারে, যখন খুশী সোঁ সোঁ করে ঝিলেত, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ঘুরে আসতে পারে, এমন কি দরকার পড়লে চাঁদের দিকে পাড়ি জমাতেও তাদের আটকায় না। কি করে মানুষ এত শক্তিশালী হয়ে উঠল? কি করে এত সব ঘর, বাড়ী, গাড়ী, এঞ্জিন, কলকব্জা, শহর, বন্দর গড়ে তুলতে পারল সেটা জানবার জন্য তোমাদের কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক।

আমরা যেমন ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকি, সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও বড় হয়ে ওঠে, বুদ্ধি বাড়তে থাকে, গায়ের জোর বাড়ে, ঠিক সেই রকম ভাবেই হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ আস্তে আস্তে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বড় হয়ে উঠেছে। আজকের দিনের ছোটরা প্রথমে বাবা-মার কাছে শুনে শুনে বাইরের পৃথিবীকে চিনতে শেখে, আমাদের চারদিকে যে সব জীবজন্তু রয়েছে তাদের চালচলন, আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করে। কতক বা হাতে ধরে এবং চোখ দিয়েও চিনতে শেখে। একটু বড় হলে মাষ্টার মশাইদের কাছে পড়াশোনা করে আর হাতে-কলমে কাজ শিখে এক সময় চৌকস হয়ে ওঠে। আদিম কালের মানুষও অনেকটা এই রকম ভাবেই পৃথিবীর নানা জিনিসপত্র দেখেশুনে, ব্যবহার করে এবং অনেকটা ঠেকে শিখেই এত বিশাল সভ্যতা গড়ে তুলতে পেরেছিল।

চার লক্ষ বছর আগে

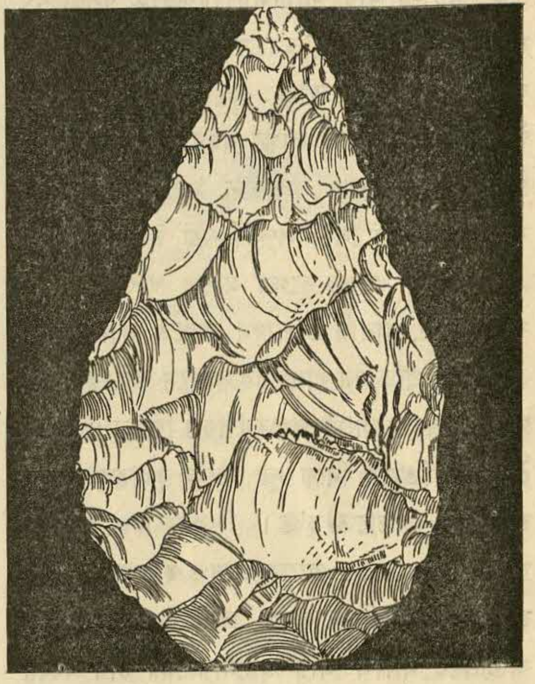
এখন থেকে অনুমান প্রায় চার লক্ষ বছর আগে এক ধরনের আদিম মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। উত্তর চীনের পিকিং শহরের কাছাকাছি চৌকৌতিয়েন (বা চৌকৌটিন) গুহায় এদের মাথার খুলি, পাথরে-তৈরী অস্ত্রশস্ত্র এবং এদের শিকার-করা অনেক জীবজন্তুর হাড়গোড় পাওয়া

গেছে। এই মানুষের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হ'ল, যে, এরা যে শুধু মাত্র অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারই করত তাই নয়, সেগুলো তৈরীও করে নিতে পারত। সাধারণ এক টুকরো পাথর বা কাঠকুটো নিয়ে কাজে লাগানো থেকে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় সত্যি, কিন্তু ভেবে-চিন্তে একটা পাথর বা জন্তুর হাড় থেকে হাতিয়ার তৈরী করার মধ্যে দিয়ে আরও বেশী বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যাই হোক, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার হওয়ার গোড়ার দিকে মানুষ পাথরের নুড়ি নিয়ে এক ধরনের ছেদক বা একটা এবড়ো-খেবড়ো ধারওয়ালা পাথরের অস্ত্র তৈরী করে নিত। এই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ভারতবর্ষ সমেত পৃথিবীর বহু জায়গা থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে।

আবার ঐ পিকিং মানুষদের কথায় ফিরে আসা যাক। এরা নানা রকমের জন্তু-জানোয়ার, এমন কি মানুষের মাংস, মগজ ও মজ্জা খেতে ভালবাসত। তা হলেও এরা মূলতঃ ছিল উদ্ভিজ্জভোজী। তুঁত গাছের ফল খাওয়ার চিহ্ন এরা রেখে গেছে। আগুনের ব্যবহার আর কাঠের ডালের একটা দিক্ পুড়িয়ে-শক্ত-করা বর্শার ব্যবহারও এরা জানত। ইন্দোনেশিয়ার যাভা দ্বীপ থেকেও এই ধরনের মানুষের হাড়-গোড় পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেছেন। এই সব আদিম মানুষের কাহিনী তোমরা 'মানুষের কথা'য় আগেই কিছু কিছু পড়েছ।

প্রস্তর যুগ

প্রথম প্রস্তর যুগের মানুষ পাথরের অস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে আরও দক্ষতা অর্জন করল। একটা গোটা পাথরকে মোটামুটি চারদিক্ থেকে ভেঙ্গে নেওয়ার পর খুব হিসেব করে আঘাত করে করে ন্যাসপাতি ফলের মত গঠন দেওয়া হ'ল—যার ওপর দিক্‌টা সরু আর ছুঁচালো ধরনের, আর দু'পাশের ধারগুলো কিছু কাটা-



ইয়োরোপে প্রচলিত এক ধরনের হাত-কুড়ুল

কাটি করার উপযুক্ত। এ অস্ত্রগুলোকে আমরা এক ধরনের হাত-কুড়ুল বলতে পারি, কেন না এগুলো ধরার জন্য কোন হাতলের ব্যবস্থা ছিল না। ধীরে ধীরে পাথর দিয়ে আরও ভালো অস্ত্র তৈরী করার পদ্ধতি চালু হ'ল।

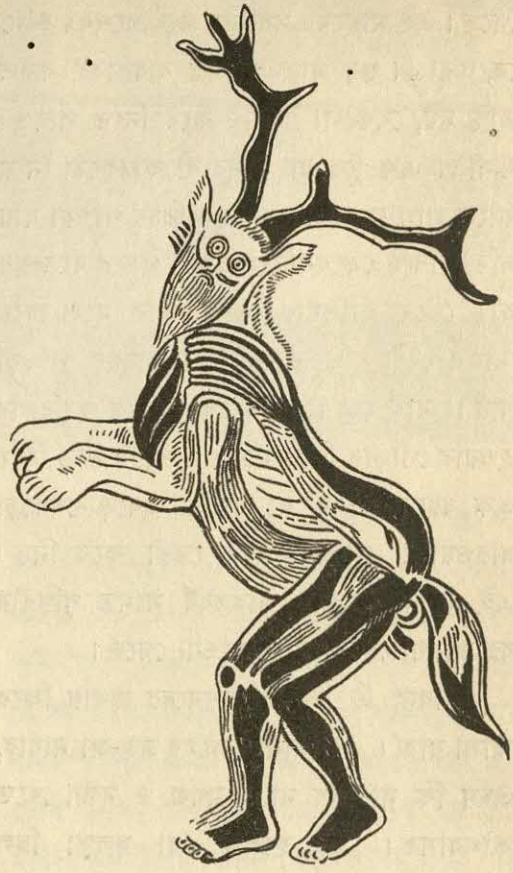
ইয়োরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নিয়ান-ডার্থাল প্রভৃতি উপমানুষের কথা তোমরা আগের একটি পরিচ্ছেদেই পড়েছ। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ হাজার বছর আগে বরফে-ঢাকা উত্তর ইয়োরোপের ঠিক তলার দেশ দক্ষিণ

ফ্রান্স, স্পেন আর ইতালীর বিভিন্ন স্থানে ঐ সময়কার সবচেয়ে অগ্রসর মানুষের সংবাদ পাচ্ছি। এই সময়ে বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্যে পাহাড়ের গুহায় বাস করতে শিখেছিল এরা। এই গুহা-বাড়ীর সামনের দিক্‌টাই বসবাসের জন্য ব্যবহার করা হ'ত। সামনের দিকে পাওয়া জন্তু-জানোয়ারের হাড়, অস্ত্রশস্ত্র, উনুন আর উনুনের ছাইই তার সাক্ষ্য বহন করছে। গুহার ভেতরের দিক্‌টাও প্রাচীন মানুষেরা ব্যবহার করেছে ; তবে সেটা সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ খাবার সংগ্রহ করত মাত্র, খাবার উৎপাদন করতে জানত না। এর ফলে প্রতিদিন খাবারের সন্ধানে তাদের হিংস্র অথবা খুব দ্রুতগামী পশুর পিছন পিছন পাথরে-তৈরী হাতিয়ার নিয়ে দূর থেকে দূরান্তরে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। শিকার করতে গিয়ে অনেকে বন্য জন্তুর হাতে প্রাণও হারাত। এর জন্যে তারা কি করল জান? গুহাগৃহের অভ্যন্তরে মশাল আর জানোয়ারের চর্বি দিয়ে



প্রস্তর যুগের গুহাচিত্রে ম্যামথ, ঘোড়া ও হরিণ

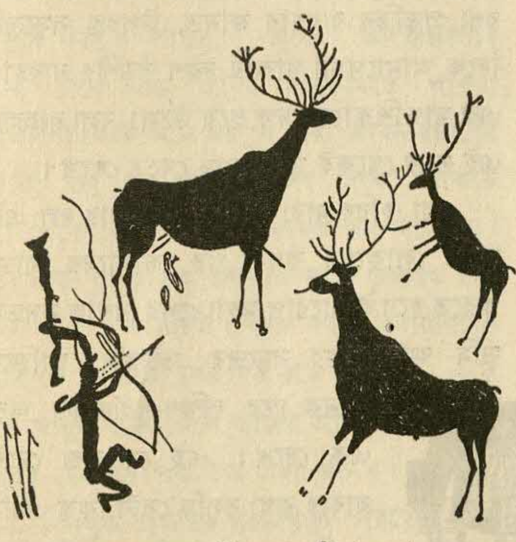


নৃত্যরত যাদুকর : ফরাসী দেশের প্রস্তর যুগীয় গুহাচিত্র

তৈরী প্রদীপ জ্বেলে, রক্ত এবং লাল, হলদে, কালো মাটি আর চর্বি-মেশানো রঙ দিয়ে তারা আঁকল প্রাচীন কালের বন্য ষাঁড়, হরিণ, অতিকায় হাতী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের ছবি। এই ছবিগুলো এত সুন্দর হয়েছিল—এত স্বাভাবিক হয়েছিল যে আমরা আজকেও মোহিত হয়ে এদের দিকে তাকিয়ে থাকি। কেউ কেউ মনে করেন এই জন্তু-গুলোর ছবি এঁকে প্রাচীন কালের মানুষ মনে করল যে এর ফলে শিকারের সময় তাদের ধরে ফেলার সুবিধে হবে। কারণ তাদের প্রতিরূপ তো বাড়ীর দেওয়ালে আঁকা হয়েই

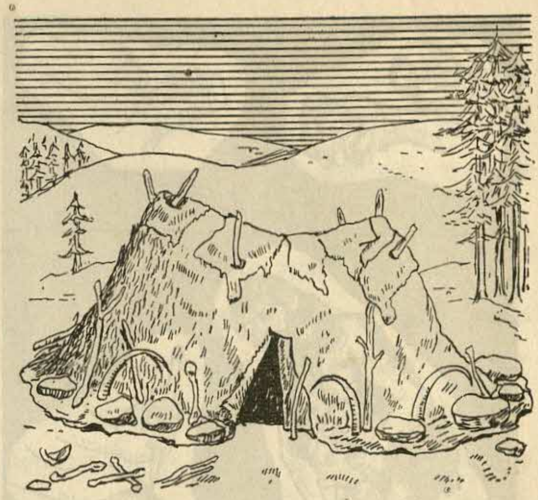
গেছে! প্রাচীন মানুষের এ রকম বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় ফরাসী দেশের কতকগুলো গুহায়, যেখানে আমরা দেখতে পাই প্রাচীন কালের যাদুকর জন্তু-জানোয়ারের চামড়া গায়ে জড়িয়ে, মাথায় হরিণের শিং এঁটে নাচতে আরম্ভ করেছে। অথবা কোথাও দেখি, জন্তু-জানোয়ারের চামড়ায় সাজিয়ে, জন্তুর প্রতিমূর্তি বানিয়ে তার চারদিকে তারা ঘুরে ঘুরে নাচছে আর বর্শাবিদ্ধ করে চলেছে প্রতিমূর্তির গায়ে।

এ সব ছাড়াও এই সময়ের আঁকা দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ছবিও দেখতে পাওয়া যায় পূর্ব স্পেনের গুহাগুলোতে। এখানে আমরা শিকার করার, মধু সংগ্রহ করার, যুদ্ধের আর দল বেঁধে নাচের ছবি দেখতে পাই। আমাদের মনে



প্রস্তর যুগের চিত্রকলায় শিকার-দৃশ্য

রাখতে হবে যে এই যুগের মানুষ কেবলমাত্র যে গুহাতেই বাস করত তা নয়। আড়াল-করা পাহাড়তলী, চামড়া ও কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরী উত্তুরে হাওয়া-আটকানো তাঁবুর চারিদিকে অতিকায় হাতীর দাঁত দিয়ে ঘেরা ঘরেও বাস করত।



প্রাচীন প্রস্তর যুগের তাঁবুর ঘর : ইয়োরোপ

এরা প্রথম ধর্ম-কর্মের ও পূজোর জিনিস হিসাবে খুব মোটামুটি ধরনের পাথর বা হাড়ের তৈরী মাতৃমূর্তি ব্যবহার করতেও অভ্যস্ত ছিল। প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষের দিকে পাথরকে ঠুকে, চেঁছে, ছুলে, ভেঙ্গে নানা রকম সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হতে লাগল। এগুলো পাথরের তৈরী হলেও ছুরি, নরুণ, সূচ, তীরের ফলা, ব্লেড (ক্ষুর) প্রভৃতির কাজে খুবই ব্যবহৃত হতে লাগল।

আজ থেকে হাজার দশ-বারো বছর আগে কোন সময়ে দক্ষিণ পশ্চিম-এশিয়ার আবহাওয়া ক্রমশঃ শুকনো হয়ে আসতে থাকে। অন্য দিকে উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপে শুরু হয় ঘন জঙ্গল আর জলা অঞ্চলের রাজত্ব। প্রস্তর যুগের মাঝামাঝি সময়ে মানুষ সাধারণতঃ জলের ধারে বাস করত। মাটিতে গোল করে গাছের গুঁড়ি বা নমনীয় ডালের খুঁটি দিয়ে তৈরী গম্বুজের মত ঘর ছিল এদের বাসস্থান। মাছ মারার বর্শা, 'স্কী' বা 'শী', গাছের গুঁড়ি-কোঁদা নৌকো ও দাঁড়ের ব্যবহারও ছিল এদের



পাথরের অস্ত্র তৈরী করার বিভিন্ন পদ্ধতি

বিশেষত্ব। কুকুরকে মানুষের বশ্যতা স্বীকার করানোরও অনেকখানি কৃতিত্ব এদের। এদের সব অস্ত্রশস্ত্রই হয় পাথর, নয় কাঠ অথবা হাড়ের তৈরী হ'ত। খুব ছোট ছোট পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র তৈরীর ক্ষমতাও এই যুগের একটা বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পণ্ডিতেরা ইয়োরোপ মহাদেশের এই লোকেদের "ড়জলা" অঞ্চলের লোক বলে থাকেন, আর এদের জীবনযাত্রার নাম দিয়েছেন 'মধ্যপ্রস্তর-যুগীয় জীবনযাত্রা'।

ক্রমে এদের মধ্যেও কেউ কেউ সাহস করে খোলা সমুদ্রের দিকে পাড়ি জমাতে লাগল। এদের অনেকেই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নরওয়ে, সুইডেন আর বাল্টিক সাগরের কাছাকাছি উপ-কূলগুলোতে বাস করত। কাঠের কাঠামোর ওপর চামড়া চড়িয়ে এরা এক রকমের নৌকো তৈরী করত। তাতে চড়ে তিমি ও সীল শিকার করা ও সামুদ্রিক ঝিনুক সংগ্রহ করাই ছিল এদের প্রধান কাজ। এরা এদের ঠিক আগেকার যুগের লোকদের তৈরী করা অস্ত্রশস্ত্র, তীর-ধনুক, চামড়ার কাজ করার উপযুক্ত অস্ত্র, কাঁটাওয়ালা বর্শা প্রভৃতির ব্যবহার জানত, উপরন্তু সমুদ্রের দিকে আনাগোনা থাকার দরুণ বঁড়শীর ব্যবহার এবং মাছ শিকারেও দক্ষ হয়ে উঠল। বলা বাহুল্য, এই সময় থেকেই তারা মাছ খেতে শেখে।

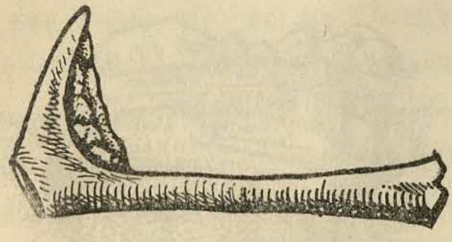
বল্গা হরিণ-মারা আর মাছ-মারার দল এই সমস্ত লোকদের কথার পর আমাদের যাত্রা করতে হবে ইয়োরোপ মহাদেশের বিশাল সমতল ভূমি আর উত্তর সমুদ্রের তটভূমি ছাড়িয়ে অনেক দূরে দক্ষিণ-পূর্বদিকের অন্য এক দেশে। এই যে অন্য দেশে যাবার কথা বলছি সেটা কিন্তু এমনি এমনি নয়। পূর্ব-দক্ষিণের এই দেশ-গুলোতেই মানুষের সভ্যতার সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্র-গতির সূচনা হয়েছিল।



মধ্য প্রস্তর যুগের বসতি : ইয়োরোপ

প্রস্তর যুগের শেষের দিকে পশ্চিম এশিয়ার প্যালেষ্টাইন দেশের

পাহাড়ে এবং অরণ্যে এক ধরনের লোকের জীবন-যাত্রার চিহ্ন আমরা ওয়াদি-অল্‌-নাটুফ বলে একটা জায়গায় পেয়েছি। এরা এদের পূর্বপুরুষদের মতই হরিণ প্রভৃতি বন্য প্রাণী শিকার করেই খাবার যোগাড় করত।



শিংয়ের মধ্যে পাথরের দাঁতওয়ালা কাস্তে : ডেনমার্ক

এরা এক ধরণের পাথরের ক্ষুর (ব্লেড), তীর-ধনুকের ফলা আর পাথরের দাঁতওয়ালা কাঠ বা জন্তু-জানোয়ারের হাড়ের তৈরী কাস্তে তৈরী করতে পারত। এদের কাস্তেগুলোর ধার দেখে এবং এদের বাসভূমিতে পাওয়া শস্যকণা থেকে মনে হয় যে এরা জীবন-ধারণের জন্যে শুধু জন্তু-জানোয়ারদের দিকে তাকিয়ে না থেকে চাষবাস করার দিকেও মন দিয়েছিল। তা ছাড়া প্রাকৃতিক শুষ্কতার জন্যে জঙ্গলও দিন দিন শুকিয়ে আসছিল। ফলে জন্তু-জানোয়ারদের সংখ্যাও আসছিল দিন দিন কমে।

মানুষ মারা গেলে তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে কবর দেওয়ার পদ্ধতিও এরা জানত। পাথর, কাঠ, শামুক প্রভৃতির গয়নাগাটি পরতেও এরা ভালবাসত।

কৃষিজীবী প্রথম মানুষ

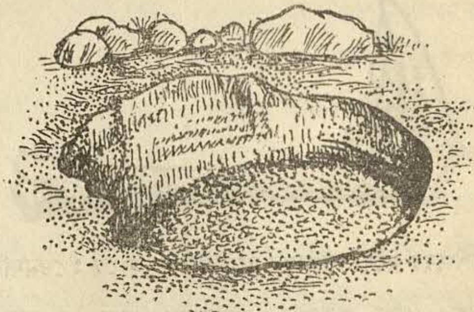
এখন থেকে প্রায় দশ হাজার থেকে ছ' হাজার বছর আগে পশ্চিম এশিয়ার নানা অংশে প্রথম চাষীদের গ্রামগুলোর গোড়াপত্তন হয়েছিল। তোমাদের মনে হতে পারে, এটা এমন কী একটা খবর যেটা না জানালেই চলছে না এখানে! খবরটা কিন্তু সত্যিই বড় খবর। চাষবাস করবার জন্য এক জায়গায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে হয় মানুষকে। এক জায়গায় বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আর কেবলমাত্র প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করে রইল না। দেশে-বিদেশে, দিক্‌বিদিকে খাবারের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে না বেড়িয়ে মানুষ এক জায়গায় বসে বসেই জন্তু-জানোয়ার পোষ মানাতে, শস্য, মাংস, ফলমূল, খাবার জিনিস রাখবার জন্য বাসন-কোসন আর থাকবার এবং ঐ সব শস্য রাখবার জন্য ঘরবাড়ী তৈরী করতেও শিখেছিল এই সময়ে।

মিশর দেশের উত্তরে ফেয়ুম বলে একটা জায়গায়, বাইবেলে বর্ণিত জেরিকো বলে একটা শহরের কাছে আর ইরাকের কালাত জারমো বলে একটা গ্রামে এই সময়কার লোকদের বসতির চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে।

এখন আমাদের মনে হতে পারে যে এত জায়গা থাকতে পশ্চিম এশিয়াতেই বা কেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম চাষবাসের উৎপত্তি হ'ল? কেন হ'ল সে কথা বলতে গেলে বলতে হয় মানুষ যে সব জায়গায় থাকে এবং ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে সেই সব জায়গার গাছপালা, জীবজন্তু আর জল-হাওয়ার কথা। মানুষের ইতিহাস থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য গাছপালা আর জীবজন্তুদের পুরোনো দিনের বিবরণের দিকে তাকাই তা হলেই জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে ব্যাপারটা।

প্রথমেই একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত। ঠাণ্ডা আর শুকনো জল-হাওয়ার জন্যে পশ্চিম এশিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলেই আমরা বুনো ঘাসের সঙ্গে গজিয়ে-ওঠা আদিম গম আর যবের চারা দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমে কৃষ্ণসাগরের তলার দিক্‌টায় সমস্ত তুর্কীদেশটাকে নিয়ে কাস্পীয়ান সাগরের দক্ষিণে উত্তর পারস্য পর্যন্ত এবং বর্তমানের সিরিয়া, লেবানন, ইস্রায়েল, জর্ডন এবং ইরাক দেশের উত্তরাংশের কিছু কিছু জায়গায় এগুলিকে দেখতে পাওয়া যেত। বুনো ছাগলের বাসভূমি ছিল এ সব জায়গা আর প্রায় সমস্ত পারস্য দেশটাই। শূওর দেখতে পাওয়া যেত এই অঞ্চলের উত্তর-পূর্বদিকে আর দক্ষিণ দিক্‌টায়, অবশ্য মিশর বাদে—এক কথায় বলা যায়, বর্তমানের আরব দেশে। ভেড়া থাকত এই অঞ্চলেরই কাছাকাছি মধ্য এশিয়ার পশ্চিম দিক্ ঘেঁষে, পূর্ব পারস্যে আর উত্তর-পশ্চিম ভারতে। কৃষিকার্যের জন্য সবচেয়ে দরকারী প্রাচীন কালের গরুও দেখা যেত সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় আর মোটামুটি তুর্কীদেশ বাদে পশ্চিম এশিয়ার সমস্ত জায়গায়। এবার ভেবে দেখ, প্রকৃতি যেন মানুষকে চাষবাস শিক্ষা দেবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে ছিল। শুধু চোখ মেলে দেখার আর বুদ্ধি করে কাজে লাগানোর চেষ্টার অপেক্ষা আর কি!

সে যাই হোক, এবার চল ফিরে যাই আমাদের পুরোনো কথায়। মানে, এই নতুন যুগের জীবন-যাত্রার বর্ণনায়। মরু সাগরের উত্তর দিকের জেরিকোর লোক-বসতি অঞ্চলে আমরা প্রথম এসে পড়ছি। এখানকার অধিবাসীরা প্রথম দিকে ঘর তৈরী করেছে কাঠ ইত্যাদি দিয়ে। কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করার জিনিস হ'ল, যে, এরা ঘরের মেঝেটাকে মাটি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে বেশ শক্ত একটা আস্তরণ তৈরী করে নিত। শস্য বুনলেই হ'ল না, সেটাকে খাবার উপযুক্ত করে তোলার জন্য যে শিলনোড়া দরকার তারও দেখা আমরা এখানেই পাচ্ছি।



মাটিতে ঝুড়ির দাগওয়ালা শস্য জমিয়ে রাখার
গর্ত : ফায়ুম, মিশর দেশ

তবে প্রথম দিকে এরা মোটেই বাসনকোসন তৈরী করতে জানত না। কী আর করা যায় বল? মাটিতেই গর্ত করে বেচারারা শস্যকণা জমিয়ে রাখত।

প্রথম মাটির তৈরী পাত্র

বহুদিনের কঠোর খাটাখাটনির ফলে যে শস্য বা ফসল ঘরে তোলা হ'ল তা রাখার জায়গা কি থাকবে না? ফসল থেকে অপ্রয়োজনীয় খোসা ভেঙ্গে ফেলে দেওয়াও কি যাবে না? মানুষ ভাবতে লাগল। শেষে বুদ্ধি করে মাটি পেটানো শক্ত মেঝেতে গর্ত করে তারা কাজ চালাতে লাগল। বাসন-কোসন তৈরী করার কৌশলটা অবশ্য মানুষ শিখল নতুন প্রস্তর যুগের ঠিক আগে। লতা অথবা নলখাগড়ার তৈরী ঝুড়ির ওপর মাটির পলেস্তারা চড়িয়ে নিয়েই প্রথম প্রথম পাত্রের অভাব মেটানো চলতে লাগল। কখনও বা

এই রকম একটা ঝুড়ি আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে মাটির আস্তরণটাকে একটা বাটির গড়ন দেওয়া হ'ত। এতে করে মানুষ ভাবতে শিখল একটা নতুন সম্ভাবনার কথা। তা ছাড়া শুকনো লাউ বা ঐ জাতীয় অন্য কোন ফলের খোলও মানুষকে ঐ রকম গড়নের পাত্র তৈরী করতে উৎসাহিত করে থাকবে। একেবারে প্রথমে কুমোরের চাক তৈরী হয় নি—যাতে করে বাসনপত্র তৈরী করা যেতে পারে। চাকের বদলে মাটির তৈরী পাত্র বানানোর জন্যে যে উপায়ের সাহায্য নেওয়া হ'ত তা এই রকম : প্রথমে একটা লম্বা কাদার লেচি করে নিয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা উঁচু দেওয়ালের মত তৈরী করা হ'ত। তারপর সেটাকে আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে সমান করে দিলেই মোটামুটি একটা পাত্রের আকার পেত। মনে রাখতে হবে মাটির পাত্র কিন্তু একদিনেই তৈরী হয় নি। এর জন্যে প্রয়োজন হয়েছে দীর্ঘ দিনের সাধনা।

আদিম যুগের ঘরবাড়ী

জেরিকো সহরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে মাটির পাত্র তৈরী হবার বহু আগেই মানুষ প্রাচীরে-ঘেরা গ্রাম আর শহরের পত্তন করেছে। প্রথম দিকের ঘরগুলো দেখতে ছিল এক একটা গোল গম্বুজের মত। পরের দিকে অবশ্য দেখতে পাচ্ছি যে আজকের দিনের মত চৌকো বা লম্বাটে ধরনের ঘরও তৈরী আরম্ভ হয়েছে। এই ব্যাপারে তুর্কীদেশের দক্ষিণে সাইপ্রাস দ্বীপের কথা না বলে থাকতে পারছি না।

এই দ্বীপে খিরোকিতিয়া নামে একটা জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নব্যপ্রস্তর যুগের একটা ছোট জনপদ আবিষ্কার করেছেন। এখানকার বাড়ীগুলো ছিল গম্বুজাকৃতি। দেখতে অনেকটা ইগলু বা এস্কিমোদের বাসস্থানের মত। কাঠের চৌকাঠওয়ালা দরজা দিয়ে এই বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে ঘরের মাঝখানে শক্ত, পেটানো মেঝেতে রয়েছে একটা উনুন। চূণাপাথরের থামের উপর কাঠের কড়ি-বরগা আর কাদা দিয়ে দোতলা করা হয়েছে ঘরটা। ঘরের মধ্যে রয়েছে তাক—জিনিসপত্র রাখবার জন্য। তা ছাড়া দোতলায় উঠবার জন্য একটা সিঁড়িও রয়েছে।

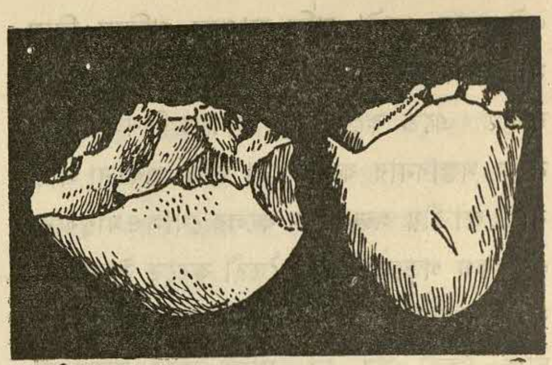
তবে সাইপ্রাসের এই ছোট্ট জনপদের অধিবাসীরা মাটির পাত্র তৈরী করতে তেমন পারত না ; তাই কিছু দিন বৃথা চেষ্টা করার পর তারা পাথরের পাত্রই ব্যবহার করতে সুরু করে। সাইপ্রাস দ্বীপের মানচিত্রের দিকে একবার তাকাও। মনে হবে যেন দ্বীপটা তর্জনী বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে পূর্বদিক্‌টা। সত্যি সত্যিই পূবদিকের শহরগুলির মধ্যেই নিহিত ছিল নতুন সভ্যতার অঙ্কুর।

পশ্চিম এশিয়ার জেরিকো ও জারমো এই দু'টি জনপদ থেকেই নতুন যুগের বসতির প্রভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। শিল্পের উন্নতিতেও এই বসতি দু'টির দান বড় কম নয়। জেরিকোর একটা মানুষের মাথার খুলির ওপর কাদামাটির পলেস্তারা চড়িয়ে নাক, মুখ, কান প্রভৃতির আকার দেওয়া হয়েছিল, মুখের ভাবও যথাসম্ভব ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। চোখের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল কড়ি। এখানকার অধিবাসীরা মন্দির তৈরী করে পূজা-অর্চনা করতেও আরম্ভ করেছিল।

ক্রমে নতুন সভ্যতার পরিধি ছড়িয়ে পড়ল তুর্কীদেশের দক্ষিণ দিকে, মিশরে আর পারস্যে। ঘি-রংয়ের জমির ওপরে লাল নক্সার কাজ-করা অতি সুন্দর মাটির পাত্রই ছিল এ যুগের বিশেষত্ব। নানা রকমের ফুল, লতাপাতা আর জন্তু-জানোয়ারের ছবিই ছিল এদের মধ্যে প্রধান। আরও বহুদিন চলে যাবার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে, ধাতু তৈরী করার পদ্ধতির সঙ্গেও মানুষ একটু একটু করে পরিচয় লাভ করছে, আর ধাতুর তৈরী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করার জ্ঞান আহরণ করতে যাচ্ছে। বর্তমান ইরাকের দক্ষিণ দিকের নীচু জমিতে আর নীল নদের অববাহিকার সমতটে গড়ে উঠছে দিগন্তবিস্তারী নতুন সভ্যতা।

অতি প্রাচীন কালের ভারত

তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করে যে প্রাচীন এবং নব্যপ্রস্তর যুগের সমসাময়িক যুগে আমাদের অতিপ্রিয় জন্মভূমিতে কী ঘটনা ঘটেছিল। সব কথা নিশ্চয়ই আমরা জানতে পারি নি, তবে যেটুকু জেনেছি তার কথাই গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করব। এটা খুবই দুঃখের কথা যে ভারতের মাটিতে বসবাসকারী একেবারে আদিম মানুষের কোন দেহাবশেষ, বাসগৃহ বা সাজসজ্জা—কোন কিছুর সন্ধানই আমরা পাই নি। পেয়েছি শুধু মাত্র কিছু পাথরে-তৈরী অস্ত্রশস্ত্র—যা থেকে তাদের জীবনযাত্রার খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। এরা বাস করত নদীর ধারে, পাহাড়ের কিনারে বা ঐ ধরনের অন্য কোন জায়গায়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে আমরা নুড়িপাথর থেকে

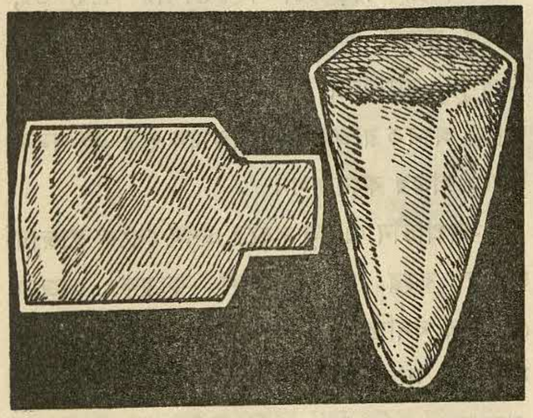


নুড়ি থেকে ভাঙ্গা হাতিয়ার : প্রাচীন প্রস্তর যুগের ভারত

তৈরী কাটা-ছেঁড়ার উপযুক্ত এক ধরনের অস্ত্র পাই। এর পর ধীরে ধীরে এই নুড়িপাথরের অস্ত্র-ব্যবহারকারী মানুষেরা ডিমের মত বা ন্যাসপাতি ফলের মত দেখতে এক রকম অস্ত্র তৈরী করতে শিখল। অস্ত্রটা ভারী আর মোটা; এর তলার দিক্‌টা হাতে ধরে কাজ করা হ'ত। ছুঁচালো ওপর দিক্‌টা পাথর ঠুকে ঠুকে তীক্ষ্ণ করে তৈরী, পাশের ধারগুলো দিয়েই গাছ কাটা, ছাল ছাড়ানো, মাংস কাটা প্রভৃতি নানা রকমের কাজ করার অনেক সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শুধু মাত্র উত্তর ভারতেই নয়, পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, পশ্চিম ভারতের গুজরাট অঞ্চলে, মধ্য ভারতের নদীগুলির ধারে ধারে আর দক্ষিণে মাদ্রাজের বিভিন্ন নদী আর সমুদ্রসৈকতে এ ধরনের অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ক্রমে পাথরের অস্ত্র নির্মাণের কাজে এই ভারতীয় পথিকৃৎরা অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। শুধু মাত্র পাথর দিয়েই চমৎকার সব ছেদক, র‍্যাঁদা, ফোঁড় আর ছুরি তৈরী করেছেন সেকালকার অধিবাসীরা। কাশ্মীর উপত্যকায় শ্রীনগর থেকে কিছুদূরে বুরজাহম

বলে একটা জায়গায় আমরা সর্বপ্রথম মসৃণ করে তৈরী পাথরের কুড়ুল ব্যবহারকারী নব্য-প্রস্তর যুগের অধিবাসীদের সন্ধান পাচ্ছি। এরা মাটির মধ্যে গর্ত করে তার মধ্যে বসবাস করত। এই গর্তগুলো ছিল প্রায় বৃত্তাকার। এগুলোতে ঢুকবার জন্য বাইরের দিকে সরু থেকে ক্রমশঃ-চওড়া-হয়ে-আসা ঢালু পথ তৈরী করা হ'ত। দেওয়ালে কুলুঙ্গী, মাটিতে ছাইএর চিহ্ন এবং বাসস্থানের ওপরের দিকে খুঁটি পোঁতার গর্ত এদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির পরিচয় দেয়।



নব্যপ্রস্তর যুগের দু'ধরনের কুড়ুল : ভারত

এরা মসৃণ পাথরের কুড়ুল ছাড়াও রকমারি যন্ত্রপাতি—ছুঁচ, বাটালি প্রভৃতি হাড়ের জিনিসও তৈরী করতে জানত এবং তলার দিকে ঝুড়ির বুনটের ছাঁচ তোলা এক ধরনের ধূসর বর্ণের পাত্র তৈরী করে ব্যবহার করত।

নগর-সভ্যতার ক্রমবিকাশ

মানুষ যখন ধীরগতিতে নতুন নতুন অবস্থায় পড়ে নতুন পদ্ধতিতে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করে তখন সেটাকে বলে 'বিবর্তন', আর সমস্যার তাগিদে বিশেষ অবস্থায় যখন পরিবর্তনের এই গতি খুব তাড়াতাড়ি একটা ওলট্‌পালট্‌ ঘটিয়ে দেয় তখন তাকে আমরা সাধারণতঃ 'বিপ্লব' বলে থাকি।

নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ-দিকে-গড়ে-ওঠা গ্রাম ও গ্রাম্য শহরগুলোর কথা আগেই বলেছি। এই গ্রামগুলোর খুব তাড়াতাড়ি শহরে পরিণত হবার ইতিহাসকে আমরা নগর বা শহর-সভ্যতার বিপ্লবের যুগ বলে ধরে নিতে পারি। ব্রোঞ্জের প্রচলনও এই সময়েই হয়েছিল।

পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শহরগুলির উৎপত্তিও সব চাইতে পুরোনো গ্রামগুলোরই মত পশ্চিম এশিয়া ও মিশর দেশেই হয়েছিল। তবে গ্রামগুলোর অবস্থান ছিল অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাগুলোতে, কিন্তু শহরগুলোর পত্তন হয়েছিল পলিমাটি দিয়ে গড়া নদীর মোহনার কাছাকাছি নীচু জমিতে। এগুলি কিন্তু নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম মানুষ চাষ-আবাদ করার জন্য বৃষ্টির মুখ না চেয়ে অথবা শীতের তুষার-গলা জলের অপেক্ষা না করে খুব বড় বড় ক্ষেতে নদীর জল ব্যবহার করে শস্য বুনতে শিখেছিল।

সুমেরীয় সভ্যতা

এই ব্যাপারে প্রথমেই মনে পড়ে দক্ষিণ ইরাকের কথা। তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস নদী দু'টির মোহনায় ছিল শরবন আর নীচু জলাজমির দেশ। ক্রমে নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্রের পলিমাটি জমে জমে গড়ে উঠল খুব উর্বর আর ফলদা[illegible]

জলা-জমি। খাদ্যশস্যের সন্ধানে উত্তর-পূর্ব, উত্তর আর পশ্চিম দিকের পাহাড়ী গ্রামগুলো থেকে নেমে এল নানা জাতের মানুষ আর আস্তে আস্তে জলনিকাশী ব্যবস্থার জন্য খাল কেটে তৈরী করা হ'ল চাষের জমি; গড়ে উঠল বাঁধের প্রাচীর-দেওয়া সব ছোটবড় শহর। এদের মধ্যে সব-চাইতে-আগে-আসা লোকদের নাম সুমেরীয়। এদের কাছে পাথর সহজলভ্য ছিল না; কাজে কাজেই মাটির ইট তৈরী করে তাই দিয়েই এরা ঘরবাড়ী, শহর, বন্দর আর মন্দির তৈরী করত। সাধারণ মানুষ নদীর ধারের শরবন থেকে শর কেটে নিয়ে গোছা গোছা করে বেঁধে তাই দিয়ে ঘর তৈরী করত। এই রকমের ঘর আজও ইরাক দেশের বাগ্‌দাদ বা মসুল শহরের আশেপাশে দেখতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভবতঃ এই রকমের ঘর থেকেই পরের দিকে খিলান তৈরী করার আর ঢেউ-খেলানো থামের উৎপত্তি হয়েছে।

যাই হোক, ক্রমে সুমেরীয়রা পাথরের দাঁত-বসানো কাস্তে ব্যবহার করে তাদের গোলায় প্রচুর শস্য জমিয়ে ফেলতে লাগল। শস্যের এই প্রাচুর্য তাদের জীবনে এনে দিল কতকগুলি নতুন রকমের সমস্যা।

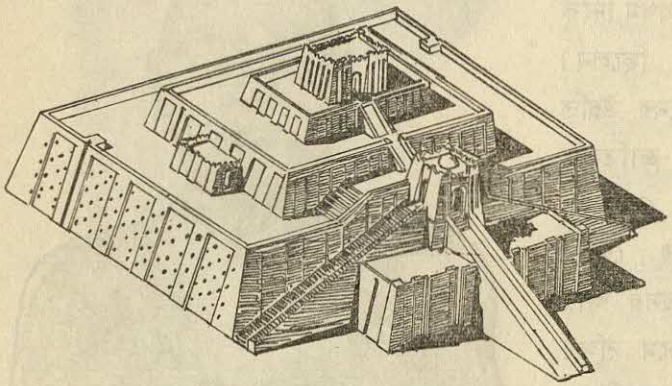
এর মধ্যে সর্বপ্রধান হ'ল—সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ কেবল মাত্র চাষবাসের জন্যই সারাক্ষণ ব্যস্ত রইল। কোন কোন দল আবার সর্বক্ষণই ব্যস্ত রইল খাল কাটতে আর নদীর জল বেড়ে গিয়ে শহর বিপন্ন করে তুলছে কিনা তার দেখাশোনা করতে। আর একদল ব্যস্ত রইল চাষীদের জিনিসপত্র, জামাকাপড়, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরী করার কাজে। বাইরের ও আশ-পাশের পাহাড়ীরা ওদের চমৎকার জমিজমা, ক্ষেতের আবাদ আর ঘরদোরের দিকে লোভীর মত নজর দিত। কাজেই ওদের বিষয়সম্পত্তি পাহারা দেবার জন্যে রক্ষীরও প্রয়োজন দেখা দিল। এইভাবে দিনে দিনে তখনকার মানুষের মধ্যে এমন কয়েকটা দল তৈরী হয়ে উঠল যারা নিজেদের দরকার মত শস্য অথবা গৃহপালিত পশু ইত্যাদি দিয়ে তার বদলে অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিত।

ইরাক দেশের দক্ষিণ দিকের এই অঞ্চলটাতে এই সময়ে গড়ে-ওঠা শহরগুলোর মধ্যে উর, এরিডু, উরুক, আক্কাদ, নিনেভে, লাগাশ, কিশ, নিপ্‌পুর, ব্যাবিলন প্রভৃতি প্রধান। পরবর্তী কালে অনেক রাজবংশ অনেকদিন ধরে এই সমস্ত শহরে রাজত্ব করেছিল।

সর্বপ্রাচীন এরিডু শহরে এখন থেকে হাজার ছয়েক বছর আগে বেশ কয়েক হাজার লোকের বসতি ছিল। আগেই আমরা দেখেছি, সমাজের নানা রকমের লোক বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল। ক্রমে এই সমস্ত লোকের ওপর শাসনব্যবস্থা চালানোর জন্যে পুরো সময়ের জন্য কাজ করবে এই রকম কর্মচারীর ও কর্তা ব্যক্তিদের প্রয়োজন দেখা দিল। এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন সাধারণ লোকের পূজা-উপাসনার জন্যে নির্মিত বিরাট বিরাট মন্দিরের পুরোহিতেরা। সবশেষে পুরোহিত আর রাজপুরুষেরা মিলে দেবতাদের সন্তান রূপে নিজেদের পরিচয় দিয়ে দেশ শাসন করতে সুরু করলেন। এই ভাবেই সম্ভবতঃ রাজবংশের সুরু হয়। তখনকার দিনের শহর-গুলোর মধ্যখানে থাকত স্তরে-স্তরে-উঠে-যাওয়া

বিরাট মন্দির। শহরগুলোকে এই সমস্ত মন্দিরের সম্পত্তি বলে মনে করা হ'ত। সাধারণ লোকেরা খাজনা দিত এই দেবতাদের মন্দিরে। এই মন্দিরগুলোর, সেই সময়কার ভাষায়, নাম ছিল 'জিগ্‌গুরাত'।

এই জিগ্‌গুরাতগুলোর মধ্যে উরুকের আকাশদেবতা আন্নুর সাদা রংয়ের চূণকাম করা জিগ্‌গুরাতটি ও উর শহরের উর-নাম্মুর তৈরী বড় জিগ্‌গুরাতটি খুবই উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চল থেকেই পৃথিবীর সবচাইতে পুরোনো ধর্মবিশ্বাসগুলোর পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানেই অনেক মহাকাব্য আর পুরাণ-কথার সৃষ্টি হয়েছিল। তার মধ্যে সুমেরীয় মহাপ্লাবনের গল্পের বীর উটা-নাফিস্‌তিম্‌, আকাশ দেবতা আন্নু, মাটির দেবতা এনলিল্‌ আর জলদেবতা এনকি খুবই নামকরা। তবে ভগবানের কল্পনায়ও তখনকার দিনের লোকেরা সব দিক্‌ দিয়ে পূরোপূরি অজ্ঞ ছিল না। সর্বদৃষ্টিমান্‌, অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন দেবতারও পূজো হ'ত পাথর বা পোড়ামাটির উপর খোদাই-করা অথবা গর্ত-করা চক্ষুর পূজোয়।



উর-নাম্মুর জিগ্‌গুরাত

মন্দির আর ধর্মই ক্রমে সুমেরীয়দের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন করল। খাজনা বুঝে নেওয়ার প্রয়োজনের তাগিদে এখন থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই আরম্ভ হ'ল সাংকেতিক লেখা, যাকে আমরা বলি লিপি। হিসাব ঠিক রাখার উপযুক্ত সাংকেতিক অঙ্ক-চিহ্নের উদ্ভবও এর কিছু পরেই হয়েছিল। সুমেরীয়রা মাস গণনা করতেন আকাশে চাঁদের অবস্থান অনুসারে। বছর ভাগ করা হ'ত বারো মাসে। তবে সূর্যের গতিবিধি অনুসারে সাল গণনা করবার পদ্ধতির মধ্যে যে সুষ্ঠু ও সঠিক ভাব আছে তা অবশ্য এতে ছিল না। সুমেরীয়রাই পরবর্তী কালে কীলক দিয়ে লেখা এক রকমের কীলক-লিপির প্রচলন করে। এ সব লিপি নরম মাটির টালির ওপরে লিখে নিয়ে পরে পুড়িয়ে নেওয়া হ'ত। চাকা আবিষ্কারও এদের একটা খুব বড় কাজ বলা যেতে পারে। কাপড় বুনতেও এরা পারদর্শী ছিল।

লেখাপড়া ও বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে এদের মধ্যে বেশ একটা উদ্যোগ দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মন্দিরের আশেপাশেই গুরুমশাইরা তাঁদের পাঠশালা চালাতেন। আবার মন্দিরের আশেপাশেই টালির বইয়ের লাইব্রেরী থাকত। আলাদা স্কুল-বাড়ীরও অভাব ছিল না। প্রায় চার হাজার বছর আগেকার উর শহরের একটি স্কুল-বাড়ীর খবর মাটির তলা থেকে পণ্ডিতেরা বার করেছেন। বাড়ীর মালিকের নাম ছিল ইগমিল্‌-সিন। তিনি ছিলেন একজন পুরুত ঠাকুর। স্কুলে মাটির

টালির তৈরী 'রাফ্' খাতা আর 'ফেয়ার' খাতা পাওয়া গেছে। ছেলেদের বসবার জায়গা আর শ্রুতিলিখন অর্থাৎ ডিক্‌টেশনের জন্যে ধর্মকথার গল্প, অঙ্কের জন্য নামতার তালিকা, 'স্কোয়ার রুট্' আর 'কিউব রুটের' টালি খুঁজে পাওয়া গেছে সেই স্কুল থেকে।

স্থমেরীয় সভ্যতায় অনেক বড় বড় রাজা আর রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। এ সব রাজাদের মধ্যে উর শহরের রাজারা প্রথম দিকে প্রাচীন রাজবংশের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রাচীন স্থমেরীয়দের নাগরিক জীবনের উন্নতি আশপাশের সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের ঈর্ষ্যার কারণ হয়েছিল। ভাষা, বেশভূষা, সাহিত্য ও জীবনধারণের অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থমেরীয় ভাবধারাই সবচেয়ে অগ্রসর আর উত্তম বলে গণ্য করা হ'ত। ক্রমে দক্ষিণ ইরাকের শহরগুলো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করে করে দুর্বল হয়ে পড়ল। এই দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে আরবীয় জাতি-গোষ্ঠীর নবীন ও উদ্যমী যোদ্ধারা যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ২৩৭০ বছর আগে সারগন বলে একজন নেতার অধীনে সমস্ত ইরাক দেশের উত্তর ও দক্ষিণের নগর-রাজ্যগুলোকে পদানত করে ইতিহাসবিখ্যাত আগাদী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর সাম্রাজ্য পৃথিবীর ইতিহাসে আক্‌কাদীয় সাম্রাজ্য বলে পরিচিত।

সারগনের স্থাপিত রাজবংশের রাজত্ব-কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইরাকের প্রাচীন নগরগুলি অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছিল। একদিকে ভারতবর্ষের মহেন-জো-দাড়ো ও অন্য দিকে মিশর দেশের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই সময়েই এদের গড়ে ওঠে। ঘন গোঁফ-দাড়িওয়ালা, যুদ্ধ-পারদর্শী এই রাজবংশের রাজারা কিন্তু স্থমেরীয় ভাবধারায় পুরোপুরি ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এমন কি তাঁদের আমলে আক্‌কাদীয় ভাষায় স্থমেরীয় লিপিই ব্যবহৃত হ'ত। তা ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য-গুলোও ঐ ভাষাতেই চলত। এই সময়কার



রাজা গুডিয়ার মূর্তি

ঠিক পরবর্তী কালের রাজাদের মধ্যে লাগাশ শহরের রাজা গুডিয়ার প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে।

এর পর বেশ কয়েক শ' বছর চলে যাওয়ার পর স্থমেরীয় অঞ্চলের আরবীয় গোষ্ঠীর রাজা হাম্মুরাবি খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।



রাজা হাম্মুরাবি

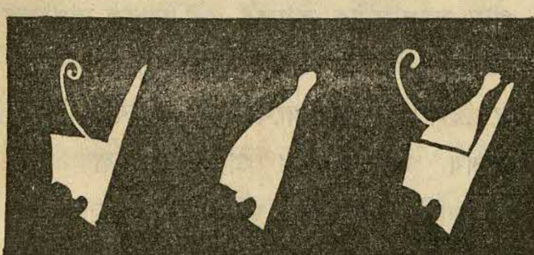
উত্তর দিকের ব্যাবিলন শহরই এঁর রাজ্যের রাজধানী ছিল। বহু বিদ্রোহী রাজ্য সমেত উত্তর-পূর্বের এলাম দেশের আক্রমণকারীদের পরাজিত করে ইনি সুমের ও আক্কাদের রাজা বলে উপাধি নিয়েছিলেন। হাম্মুরাবির বিভিন্ন শাসন-পদ্ধতির মধ্যে আইন-কানুনই প্রধান ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে ইনিই ছিলেন কঠোর সামাজিক আইনের স্রষ্টা। এঁর আইনগুলো ছিল কীলক লিপিতে লেখা। তবে তাঁর আগেকার রাজকীয় আইন-কানুনের ওপর নির্ভর করেই হাম্মুরাবি তাঁর আইন তৈরী করেছিলেন। তাঁর অনুশাসনে দেখান হয়েছে যে সূর্যদেব 'শামাশ'-এর কাছ থেকে ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষ আইন রচনার অধিকার তিনি গ্রহণ করেছেন। হাম্মুরাবির আইনের কঠোরতা সুবিদিত। এই আইন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ঐ সময়ে সুমেরীয় দেশে খুব শক্তিশালী কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। 'চোখের বদলে চোখ'—এই নির্মম নীতিই ছিল এই আইনের ভিত্তি। অপরাধীর শাস্তিবিধান ছাড়াও এই আইনে চিকিৎসক, গ্রাম্য চাষী, মধ্যবিত্ত, বিত্তবান্, শ্রমিক, শিক্ষক ও সমাজের সমস্ত নর-নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। পোড়া মাটির ফলকে রাজার লিপিকারের লিখিত হাম্মুরাবির চিঠিপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব, এমন কি জাতীয় অর্থনীতি নিয়ে তাঁর বিচার-বিবেচনা প্রভৃতি সেই সময়কার উন্নত জীবন-যাত্রার সাক্ষ্য দেয়।

মিশরীয় সভ্যতা

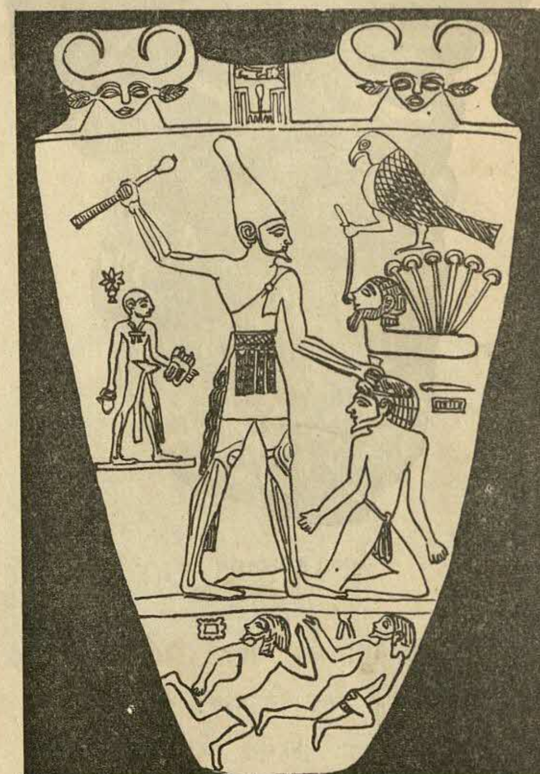
সুমের-আক্কাদের গল্পের পর এবারে আমাদের যেতে হবে আরও পশ্চিমে—পশ্চিম এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ধরে আফ্রিকার উত্তর দিকে, নীল নদের দেশ মিশরে। সুমেরীয় সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক কালেই এই অঞ্চলে নাগরিক সভ্যতার পূর্বলক্ষণগুলি ফুটে ওঠার সূচনা হয়েছিল। মিশর দেশের সভ্যতা কোন একটা বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর প্রচেষ্টার ফল নয়। বহু জাতি জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনে নীল নদের পলিমাটি-পড়া উপত্যকায় বসবাস আরম্ভ করার ফলেই মিশরের পৃথিবীখ্যাত বিরাট সভ্যতা গড়ে ওঠে।

মিশর দেশে রাজাদের আগে নীল নদের ধারে গ্রাম্য সমাজই ছিল প্রধান। পারস্য উপসাগরের তীরে যে সমস্ত জাতি সুমের দেশে তামার আকরের ব্যবসা-বাণিজ্য করত মিশরের মাটিতে তাদের এক অংশও বসতি স্থাপন করে উন্নত সুমের দেশীয় জীবনযাত্রা চালু করেছিল মিশরে। সুমেরীয় কারুকার্যের প্রভাব একেবারে প্রথম দিকেই দেখা গিয়েছিল। সুমেরীয় লিপি মিশরীয়দের লিখবার প্রেরণা দিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রচেষ্টাতেই মিশরীয়রা প্রথমে লিপিচিত্র, পরে চিত্রিত জিনিসের উচ্চারণের প্রতীক হিসাবে লিপির ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। আজকাল আমরা যে উপায়ে মাস, বছর গণনা করি মিশরেও ঐ রকম ভাবেই ও কাজটি করা হ'ত। সুমেরীয়দের ছাড়া মিশরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত লিবীয়া, দক্ষিণের সুদান ও দক্ষিণ-পূর্বের ইথিওপিয়ার নিগ্রো জাতিদের সম্পর্ক ও প্রভাবও পড়েছিল মিশরীয় সভ্যতার ওপর।

প্রাচীন কালে মিশর উত্তর রাজ্য আর দক্ষিণ রাজ্য—এই দুই রাজ্যে বিভক্ত ছিল। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার দু'শ' বছর অর্থাৎ এখন থেকে পাঁচ হাজার বছরের কিছু আগে মিশরের বিখ্যাত রাজা মেনেস বা নারমার বহুদিন ধরে বিভক্ত উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঐক্যবদ্ধতার প্রতীক চিহ্ন তিনি ধারণ করতেন তাঁর রাজমুকুটে। তিনি উত্তর মিশরের লাল রাজমুকুট ও দক্ষিণের চোঙ্গার মত দেখতে সাদা মুকুটের সমন্বয় করেছিলেন। রাজমুকুটটি আবার ঐ দুই অঞ্চলের প্রতীক চিহ্ন ঈগল পাখী আর সাপ দিয়ে সজ্জিত ছিল। 'নারমারের চিত্রিত ফলক' নামে একটা পাথরের টুকরোর দু'দিকে দক্ষিণের রাজা নারমার কর্তৃক উত্তরের রাজাকে পরাজিত করার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। দুই দিকেই



উত্তর মিশরের লাল মুকুট, দক্ষিণ মিশরের সাদা চোঙা-মুকুট এবং এ দু'য়ের সমন্বয়-করা মুকুট



নারমারের ফলক : মিশর দেশ



রাজা হাম্মুরাবির বিচার সভা

—ইতিহাসের কথা—পৃঃ১৫৩

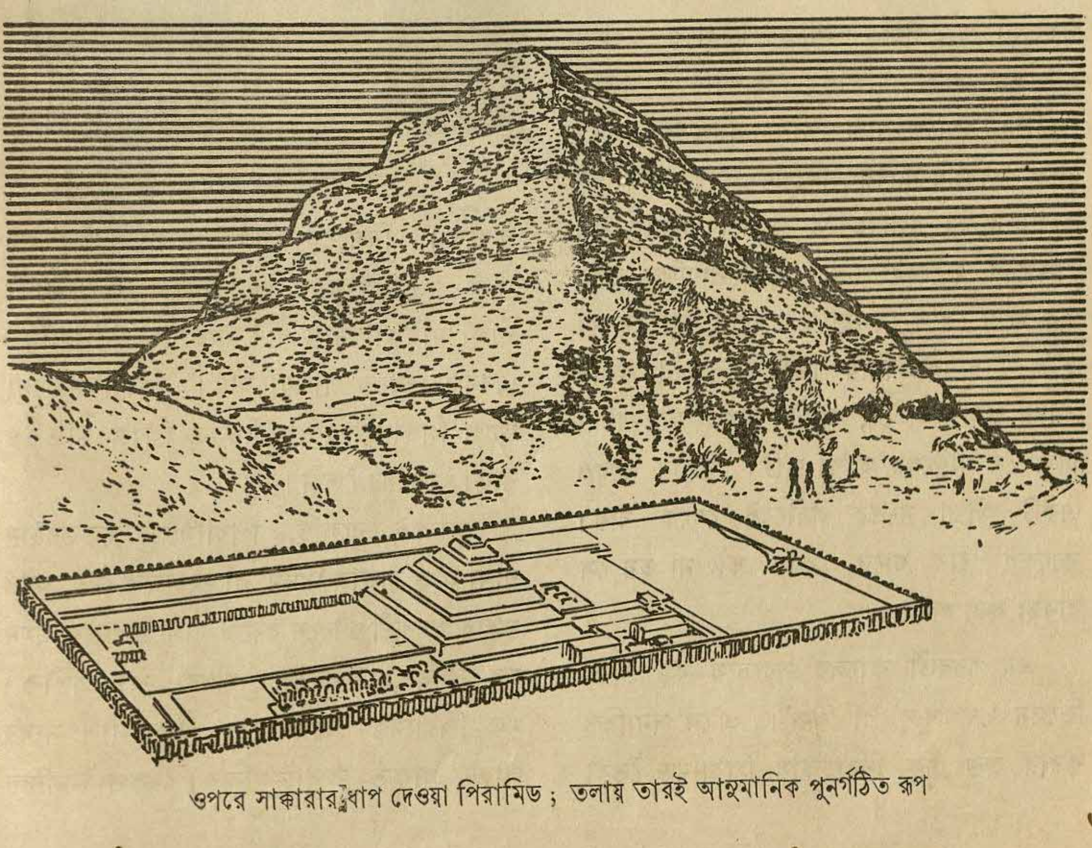
রাজা নারমারের নাম ও মাতৃদেবতা গোমুখ হাথরের ছবি আছে।

মিশরের ইতিহাসের গোড়া থেকেই রাজা ঈগল দেবতা হোরাসের অবতার,—মর্ত্যের ভগবানের রূপ ধারণ করেছেন। এই সময়ে নারমার মেমফিস্ অঞ্চলে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। নারমারের প্রতিষ্ঠিত মিশর দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের আমলে লিপির শুদ্ধিকরণ, তামার তৈরী জিনিসের ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নীল নদের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ উন্নতির সূচনা হয়। রাজধর্মের প্রবর্তন হয় সূর্যদেবতা 'রে' ও নীল নদের পূজোকে ঘিরে। ঈগল দেবতাকে সূর্যসম্ভূত বলে কল্পনা করা হয়। তা ছাড়া



ফারাও জোসেরের অমাত্য 'হেসি-রে'র কাঠ খোদাই করা প্রতিমূর্তি

অসিরিস আর ইসিস বলে দুই দেবদেবীকে হোরাস বা ঈগলরূপী সূর্য দেবতার জন্মদাতা রূপে মনে করা হ'ত। এই সময়েই সমস্ত



ওপরে সাক্কারার ধাপ দেওয়া পিরামিড ; তলায় তারই আনুমানিক পুনর্গঠিত রূপ

রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করার রীতি ও বিলাস-ব্যসনসমন্বিত রাজ-দরবারের প্রতিষ্ঠা হয় ; তামার তৈরী কীলক ও করাতের সাহায্যে চূণাপাথর সংগ্রহ করা হতে থাকে রাজ-সমাধি নির্মাণের জন্য।

এই রকম ভাবে প্রায় তিন-চার শ' বছর চলে যাবার পর মিশরের তৃতীয় রাজবংশের রাজা জোসের বা নেতের-খেতের আমলে প্রযুক্তিবিদ্যার (এঞ্জিনীয়ারিং) প্রভূত উন্নতি হয়। এই মিশরীয় রাজার প্রধান মন্ত্রী ইমহোটেপ রাজ্য-শাসনে, পাণ্ডিত্যে ও জ্ঞানে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। এঁর পরিকল্পিত সাদা চূণাপাথরে গড়া ধাপওয়ালা সাক্কারার পিরামিডের চারদিকের প্রাচীরই ছিল প্রায় এক মাইল লম্বা। এর মধ্যে রাজার ব্যবহার-করা বিভিন্ন ঘরবাড়ী ও সৌধের প্রতিরূপ গড়ে তোলা হয়েছিল মৃত রাজার সুবিধার জন্যে। পিরামিড কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই জান। একে সমাধি-মন্দির—বিশেষ করে রাজাদের সমাধি-মন্দির বলা যেতে পারে। মৃত্যুর পর রাজাদের মৃতদেহ ওষুধ দিয়ে সংরক্ষিত করে ওর মধ্যে রেখে দেওয়া হ'ত আর সঙ্গে দেওয়া হ'ত তাঁর যত প্রিয় জিনিস। এটা করার কারণ হ'ল এই, যে, প্রাচীন মিশরীদের ধারণা ছিল যে মানুষের আত্মা দু'টি। মৃত্যুর পরেও একটি আত্মা মৃতের শরীরেই থেকে যায়। কাজেই তার যাতে কোন কষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা করা দরকার।

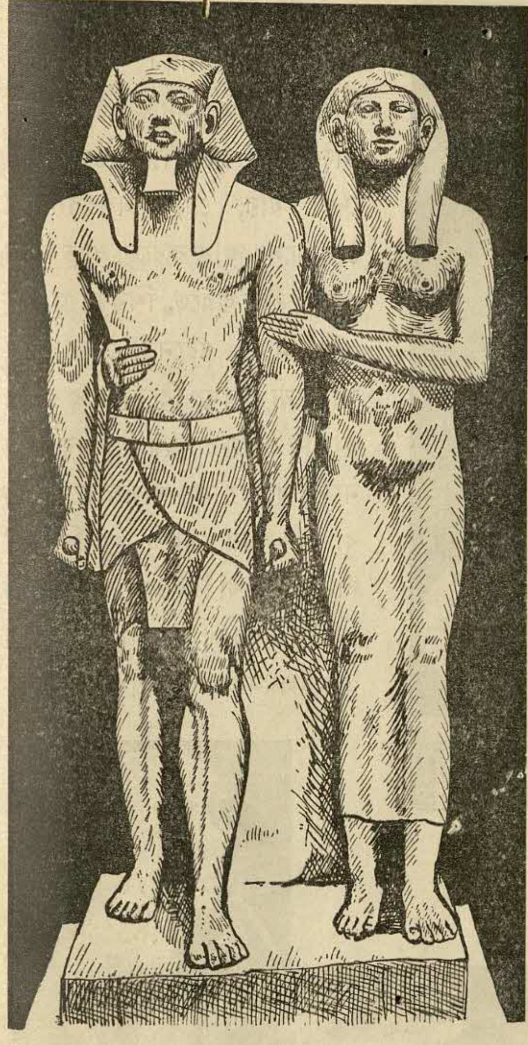
এর পরবর্তী কালের সবচেয়ে বড় রাজা ছিলেন 'খেঅপ্‌স্' বা 'খূফূ'। এঁকে সমাধিস্থ করার জন্য এক বিরাটকায় পিরামিড তৈরী করা হয়েছিল। প্রায় কুড়ি লক্ষ ভারী ভারী পাথরের খণ্ড লেগেছিল এটির নির্মাণ সম্পূর্ণ



ফারাও খাফরে

করতে। মিশরের গিজা প্রান্তরে 'খূফূ' ও তাঁর পুত্র, খেফ্‌রেন্ বা 'খাফরে' ও পরবর্তী রাজা 'মাইকারিনাস' বা 'মেনকাউরের' পিরামিড এখনও দেখতে পাওয়া যায়। পিরামিডগুলো ছাড়া গিজা প্রান্তরের বিখ্যাত স্ফিংক্স মূর্তিটিও রাজা খাফরের তৈরী।

আগেই বলেছি, পিরামিডের ভেতরটায় রাখা হ'ত রাজার 'ম্যমি' বা সংরক্ষিত দেহ, আর মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কাজে লাগতে পারে এমন সব জিনিস,—তৈজসপত্র অথবা তার প্রতীক। মূল পিরামিড থেকে দূরে ঠিক নীল নদের পাড়ে থাকত কপাট-মন্দির। কপাট-মন্দির



সস্ত্রীক ফারাও মেনকাউরে

থেকে পিরামিডের সামনের মৃতদেহ রাখবার মন্দির পর্যন্ত থাকত ঢাকা পথ। সবশেষে থাকত আসল পিরামিড। শত শত 'টন' ওজন বহন করবার ক্ষমতাসম্পন্ন . পিরামিডের অভ্যন্তরের এই সমস্ত সুরম্য কক্ষগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে মিশরীয় শ্রমিক ও স্থপতিদের কারুকার্যের ও কর্মক্ষমতার ওপর শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। পিরামিডের চারদিকে কাঠের গুঁড়ির ওপর পাথর চাপিয়ে ধাপে ধাপে সেগুলো টেনে তোলা হ'ত ওপরে। এমনি ভাবেই গাঁথা হ'ত পিরামিড। এ কাজে শত শত মজুর ও ক্রীতদাস নিয়োগ করা হ'ত। এই সময়ে মিশরীয় শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। মিশরের রাজাদের বলা হ'ত 'ফারাও'। ফারাও খুফুর মা রাণী 'হেতেপ্‌হারেস্‌'-এর আসবাবপত্রের সূক্ষ্ম কারুকার্য, ফারাও ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতিমূর্তি প্রভৃতির মধ্যে দিয়েই তা বেশ বুঝতে পারা যায়।

এমনি ভাবে বহুদিন গত হবার পর মিশর দেশের প্রাচীন রাজত্বের পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজবংশের আমলে ফারাওদের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে। সূর্যদেব 'রে'র পূজা ক্রমে সুপ্রচলিত হয়ে ওঠে। নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'সূর্য-নগর' 'হেলিওপলিস' শহরে 'রে'র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ বংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা ফারাও দ্বিতীয় পেপীর রাজত্বের শেষে অকর্মণ্য শাসনকর্তাদের ঔদাসীন্যের জন্য শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে। বিরাট বিরাট পিরামিড ও রাজপ্রাসাদ তৈরীর ব্যয়বাহুল্য রাজকোষ শূন্য করে দেয়। ফলে সমগ্র মিশর দেশে অর্থলোলুপ সামন্তদের প্রাধান্য এসে দেখা দেয়। এই দুরবস্থা ও অন্তর্বিবাদ কাটিয়ে উঠে, আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে ফারাও তৃতীয় সেনুসেরেত দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন।

এঁর সুযোগ্য পুত্র আমেনেমহেত নিজে রাজ্যশাসনের সমস্ত দিক্‌ পর্যালোচনা করতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে সমগ্র রাজ্য পরিক্রমা করতেন, মিশরের নৌ-বাহিনী পাঠাতেন বহু দূরদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে। তাঁর



লিখনরত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও বিচারক 'কে'

পৃথিবীর ইতিহাসে মিশরের দান সামান্য নয়। পৃথিবীকে মিশর দিয়েছে গগনচুম্বী স্থাপত্যের নিদর্শন। মিশরীয় চিত্রকলায় দেখা যায়, যে, মিশরবাসীরা চাষবাসের কাজ করছে, ধাতু দিয়ে অস্ত্র তৈরী করছে, শিকার করছে এবং নানা ধরনের খেলাধূলার সাহায্যে অবসর বিনোদন করছে। হাজার হাজার বছর আগের নীল নদের ধারের নল-খাগড়ার কাগজ বা লম্বা আর যোড়া 'প্যাপিরাস' আঁশে লেখা অত্যন্ত সুন্দর সব চিত্রিত বিবরণ! এখানে আমরা এক লিখনরত প্রাদেশিক শাসন-

সময়ে ক্রীট, সীরিয়া আর ব্যাবিলনের সঙ্গে বাণিজ্য বেড়েই চলেছিল। নীল নদের খাল-গুলোর পূনর্বিন্যাস করা এবং কৃষির উন্নতিসাধন করাও তাঁর অন্যতম কাজ ছিল। তাঁর সময়ে লোহিত সাগর আর নীল নদ একটি খালের দ্বারা সংযুক্ত ছিল। এমন কি, সুদূর দক্ষিণের নিগ্রোদের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য আর সভ্যতা-বিস্তারের সম্পর্ক ছিল।

এই বিখ্যাত রাজার পরে পশ্চিম এশিয়ার অপেক্ষাকৃত বর্বর হিক্‌সস্‌ নামে এক দুর্দ্ধর্ষ উপজাতির আক্রমণে আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মিশরীয় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিদেশী রাজাদের পদানত হয়।



কুমোর নী-ইনপু-কাউ

কর্তা ও বিচারক 'কে'-র আর 'নী-ইনপু-কাউ' নামক এক দুঃস্থী কুমোরের মূর্তির ছবি দিলাম। আজ আমাদের মন যেন এই সব মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়।

আমরীয়, হিব্রু ও ফিনিশীয় জাতি

মিশরের পর এবারে আমাদের দৃষ্টি পশ্চিম এশিয়ার উপকূলে, বর্তমান কালের তুর্কীদেশে আর ভূমধ্যসাগরের পূর্বমুখী ভূখণ্ডের দিকে ফেরাতে হবে। মিশর ও ইরাক দেশের প্রধান দু'টি সভ্যতা ছাড়া মধ্যবর্তী এই অঞ্চলেও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

প্রথমে ধরা যাক পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের কথা। এই অঞ্চলকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একেবারে উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল বিবলস্ শহর। এর আশেপাশে বসতি স্থাপন করেছিল 'আমরীয়' অথবা সুমেরীয় ভাষা অনুসারে 'পশ্চিমা' লোকেরা। দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত সমভূমি অঞ্চলে বাস করত 'কানানীয়রা'। আমরীয়দের মধ্যে ছিল সুমেরীয় এবং আরও উত্তরের সংস্কৃতির প্রভাব। দক্ষিণের লোকেরা স্বভাবতঃই মিশরীয় আচার-ব্যবহারেই বেশী অভ্যস্ত ছিল। সামান্য তফাৎ থাকলেও এই দুই গোষ্ঠীই সেমিটিক ভাবধারা-সম্পন্ন (আরবীয় বা ইহুদীয় ধরনের) ছিল। বর্তমানের লেবানন দেশের বিবলস্ শহর থেকে মিশরীয় ফারাওরা দামী সিডার গাছের কাঠ আমদানী করতেন। অন্য দিকে সুমেরীয় শহর লাগাশের রাজা গুডিয়া কাঠের সন্ধানে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মিশরীয় রাজাদের নামাঙ্কিত জিনিসপত্র ও উপহার এই অঞ্চলের রাজপুরুষদের সমাধি থেকে পাওয়া গেছে।

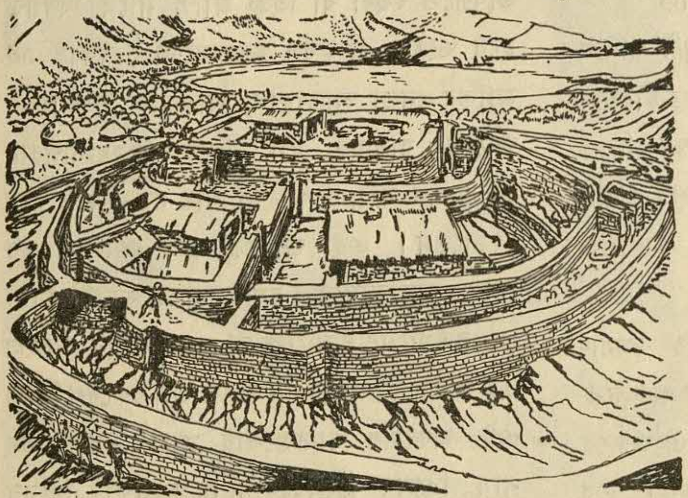
সুমেরীয় বিবরণ থেকে আমরা 'হাবিরু' বলে এক জাতির বিবরণ পাই। খুব সম্ভবতঃ সুমেরীয় সংস্কৃতি-ভাবাপন্ন এই যাযাবর জাতিই ভবিষ্যতে ইহুদী বা হিব্রু জাতি নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। হিকসস্ আক্রমণের পূর্বেকার এই জাতির নেতা আব্রাহাম, আইজাক ও জ্যাকব তাঁদের যাযাবর দল নিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের নদী, উপত্যকা আর মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতেন। এই জাতির এক অংশ মিশর দেশের জলাভূমিতেও বসতি স্থাপন করেছিল।

বর্তমানের ইস্রায়েল বা প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে এই সময়ে কানানীয় নামে এক জাতির দেশ ছিল। এই অঞ্চলের শহরগুলোর মধ্যে উগারেতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখনকার দিনের বিচারে এটাকে একটা মস্ত বড় আন্তর্জাতিক বন্দর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মোটামুটি এই অঞ্চলের লোকেরা সমুদ্রযাত্রায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। ফলে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসারে এদের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। তা ছাড়া সমুদ্রের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ফিনিশীয় জাতির উত্থানেও বিশেষ সহায়তা করেছিল। এই ফিনিশীয়রা ছিল সাহসী নাবিক শ্রেণীর জাত। সমস্ত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ব্যাপারে এদের দান অদ্বিতীয় বলা চলে।

ক্রীট ও প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা

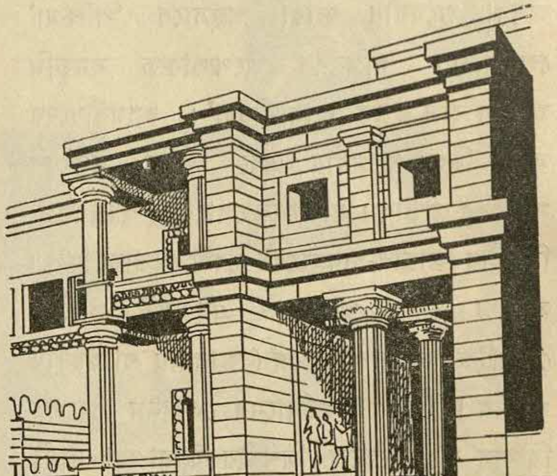
এবারে আমরা ক্রীট দ্বীপের আর প্রাচীন কালের গ্রীস দেশের কোন কোন অঞ্চলে সম-

সাময়িক সভ্যতার বিকাশের কথা আলোচনা করব। প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ছে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার নব্যপ্রস্তর যুগের বসতিগুলোর ওপর। ক্রীট দ্বীপের মধ্যভাগে অবস্থিত ক্লসস ও ফাইসাস্ নামে দু'টি

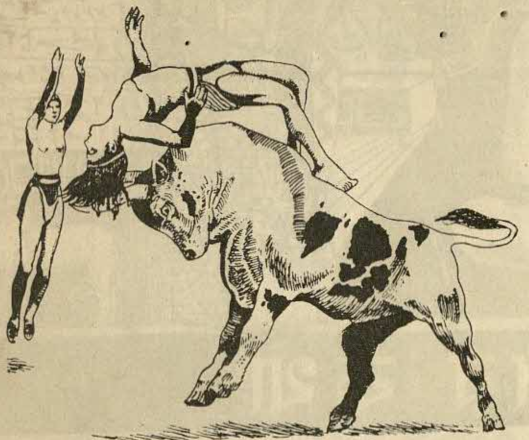


দিমিনির নব্যপ্রস্তর যুগের জনপদ

জায়গায় ও মূল গ্রীক ভূখণ্ডের থেসালীতে দিমিনি নামে একটা জায়গায় ছোট ছোট সর্দারদের বাড়ী ও নব্যপ্রস্তর যুগের শেষের দিকের ঘরবাড়ীর চিহ্ন পাওয়া যায়। এর প্রায় পাঁচ-ছ'শ' বছর পরে ক্রীটের মল্লিয়া, গুরনিয়া, ভাসিলিকি প্রভৃতি জায়গায় আর মূল গ্রীসের লারনা নামক শহরে ব্রোঞ্জ যুগের শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সমৃদ্ধি আর জীবনযাত্রার উন্নততর পদ্ধতিতে ক্লসস্ সর্বাগ্রগণ্য হয়ে উঠে। উত্তর ক্রীটের উপকূলে এই শহরেই বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আর্থার ইভান্স 'মিনস্ রাজপ্রাসাদ' নামে এক অপূর্ব সুন্দর রাজপ্রাসাদ আবিষ্কার করেছেন। পরস্পর ঘেঁষাঘেষি করে এই রাজপ্রাসাদে দোতলা উঁচু মস্ত বাড়ী ছিল। শহরের চারদিকে সুন্দর রাস্তা আর ঘরবাড়ী ছাড়াও এখানে অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল। ক্রীট দ্বীপবাসী এই উন্নত সহরের নাগরিকেরা সাপের দেবীর পূজো করত। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজার দরবারে এখনও অপূর্ব দেয়ালচিত্র আঁকা দেখতে পাওয়া যায়। পাথরে তৈরী রাজসিংহাসনটিও সুন্দর। ক্রীট দ্বীপবাসীরা চিত্র-কলায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে আর মাটির পাত্র তৈরীর ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। সমুদ্রতীরবাসী এই সাহসী জন-সমাজ খেলাধূলায় এবং আমোদ-প্রমোদেও বিন্দুমাত্র পিছপা ছিল না। তেজী ষাঁড়ের শিং ধরে ডিগ্‌বাজি খাওয়া এদের কাছে



মিনস্ রাজপ্রাসাদ



তেজী ষাড়ের শিং ধরে ডিগ্‌বাজি খেলা

একটা আনন্দদায়ক খেলা বলেই মনে করা হ'ত। বহিঃশত্রুর আক্রমণে ক্রমশঃ এই সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং গ্রীস দেশের মূল ভূখণ্ডে নতুন সভ্যতার জন্ম হয়।

প্রাচীন তুরস্কের কথা

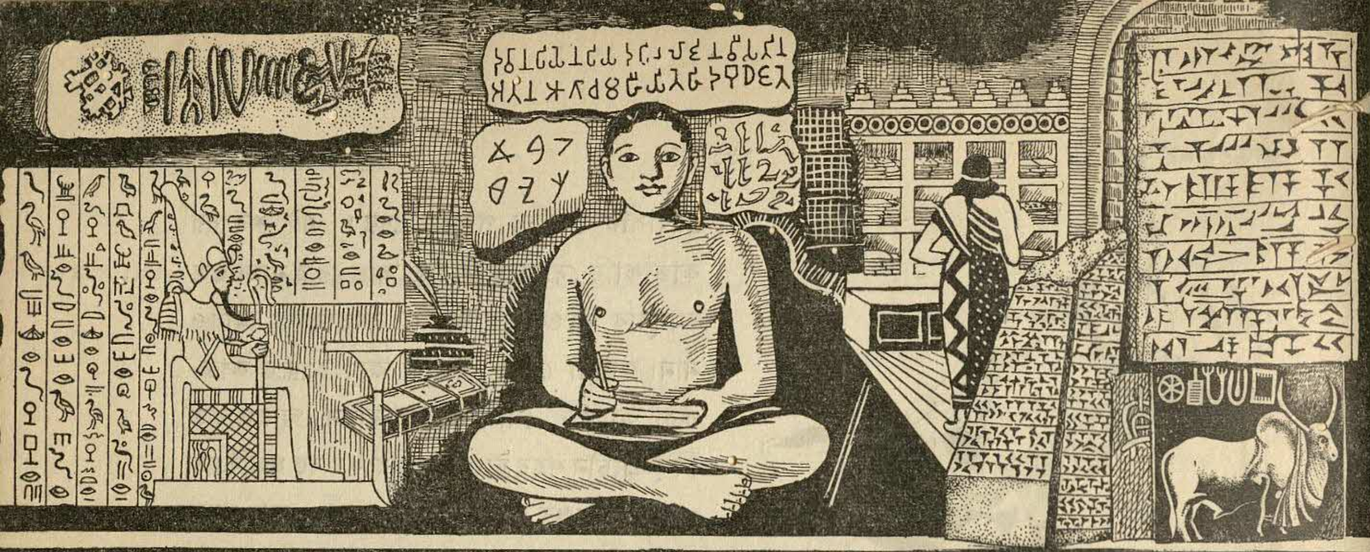
এবারে আমরা তুরস্ক দেশের দিকে তাকালে দেখতে পাব যে উত্তরের বিরাট তৃণভূমি এবং কাছাকাছি মালভূমি অঞ্চলও সভ্যতার স্পর্শ পেয়েছে।

তুরস্ক দেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে দার্দানেলস প্রণালীর মুখে, মধ্য ও দক্ষিণ তুর্কীদেশে আমরা নানা ধরনের সভ্যতার সন্ধান পাই। এর মধ্যে প্রথমটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। গ্রীসের মহাকবি হোমারের বর্ণিত ট্রয় শহরের ধ্বংসাবশেষ এখানেই। প্রাচীন ট্রয়ের কাছে আজকালকার হিসারলিক্ গ্রাম এবং দোরাক প্রভৃতি অঞ্চলে আমরা বহুযুগ-ব্যাপী এক বিরাট সভ্যতার সন্ধান পাই। ট্রয় শহর তার মস্ত বড় দুর্গ, রাজদরবার, প্রাসাদ এবং বহু ঘরবাড়ী নিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এখান থেকে পাওয়া কারুকার্যখচিত নানারকম জড়োয়া গয়না ট্রয়বাসীর সুরুচির পরিচয় দেয়। এই শহরের কাছাকাছি দোরাকে ফারাও 'সাহু-রে'র নামাঙ্কিত আসবাব পাওয়া গিয়েছে। কাছাকাছি আরও নানা জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কাজ-করা কার্পেট, সোনার থালা-বাসন, আরও কত কি! প্রাচীন শহর ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ বহু যুদ্ধবিগ্রহ ও অগ্নিকাণ্ডের স্বাক্ষর রেখে গেছে। কম পক্ষে ছ'-সাতবার এই শহর নতুন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের কর্মক্ষমতার এই পরিচয় অবাক্ হয়ে যাবার মত নয় কি?

মধ্য-দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চলে হুয়ুক, আলিশর, বোঘাসকোই, মারসিন প্রভৃতি জায়গায় আমরা উত্তরের অধিবাসীদের শিল্প-রীতিসম্পন্ন সমাধি প্রভৃতির চিহ্ন পাই। এদের মধ্যে মধ্য-দেশের কুলটিপি বা প্রাচীন কানেশ শহর খুবই উল্লেখযোগ্য। এ শহরটি তাইগ্রাস নদীর তীরবর্তী আসুর শহরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। কাজে কাজেই এখানে পাওয়া সমস্ত শিল্পনিদর্শনের ওপর দুই-নদীর-দেশ ইরাক ও মিশর দুইয়েরই প্রভাব পড়েছিল। অন্য স্থানগুলোর মধ্যে বোঘাসকোই হিটাইট্ রাজাদের 'হাত্তুসাস' নামক রাজধানীরূপে বিখ্যাত হয়। হিটাইট রাজারা ছিলেন স্তেপভূমি অঞ্চলের আদিম অধিবাসী; পরে অবশ্য তাঁরা তুর্কীদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি। পরবর্তী খণ্ডে আমরা প্রাচীন ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতার কথা বলব।*

* ১৪৪ পৃষ্ঠায় "ড়জলা" স্থলে "বড়জলা" ও ১৬০ পৃষ্ঠায় "ক্লসস" স্থলে ক্নসস বা নসস পড়তে হবে।



ভাষা ও লিপির কথা

ধ্বনি ও শব্দ

আমরা কত কথা ভাবি, কত জটিল বিষয়ে চিন্তা করি। আর সেই ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণাকে কত সহজেই না প্রকাশ করি!

আজকাল এক একটি ভাষার শব্দ-সংখ্যাই বা কত! অভিধান খুলে গুণতে বসলে দেখা যাবে যে সে সংখ্যা লক্ষকেও ছাড়িয়ে গেছে।

অথচ মানুষের ইতিহাসে এমন দিনও ছিল যখন তারা আজকের মানুষের মত চিন্তা করতে পারত না, কথা বলতেও জানত না।

তবে কি তখনকার মানুষ বোবা ছিল?

এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে, দেখা যাক্, কথা বলার মানে কি।

আমাদের কণ্ঠনালীর মধ্যে যে বাক্‌যন্ত্র আছে, তা থেকে যে বিশেষ বিশেষ ধ্বনি বার হয়, তাই হ'ল কথা বা ভাষার ভিত্তি।

এখানে ধ্বনি আর শব্দের তফাৎ জেনে রাখা দরকার। আমাদের বাক্‌যন্ত্রের কম্পনের ফলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। একক ভাবে এই ধ্বনির বিশেষ কোন অর্থ নেই। কিন্তু কয়েকটি ধ্বনি পর পর উচ্চারিত হলেই একটি শব্দের সৃষ্টি হয়, যা একটা বিশেষ ভাব বা বস্তুকে বোঝায়। 'ম্' বা 'আ'—এই দুইটি ধ্বনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কোন অর্থ প্রকাশ করে না। অথচ এই দুইটি ধ্বনির সমষ্টিই হ'ল আমাদের অতি আদরের 'মা'। এমনি 'কবি' ক্+অ+ব্+ই—এই চারটি ধ্বনির সমষ্টি। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের বাক্‌যন্ত্র থেকে যে সব ধ্বনি বার হয় সেগুলিকে সুসমঞ্জস ভাবে সাজালেই কথা বা শব্দের সৃষ্টি হয়।

ইতর প্রাণীদের অনেকেই তাদের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনির সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু আমরা যে অর্থে কথা বলি সেই অর্থে কথা বলার ক্ষমতা তাদের নেই।

ধ্বনি সৃষ্টি না করেও কথা বলা চলে। যখন কেউ ফিস্ ফিস্ করে কানে কানে কথা বলে তখন কথা বলা হয়, কিন্তু ধ্বনির সৃষ্টি হয় না। আবার যখন গানের সুর সাধা হয় তখন বিভিন্ন রকম ধ্বনির সাহায্যে শুধু তান-লয়-সুরের খেলাই দেখানো হয়, তার মধ্যে কথা থাকে না।



ফিস্ ফিস্ করে কানে কানে কথা বলা

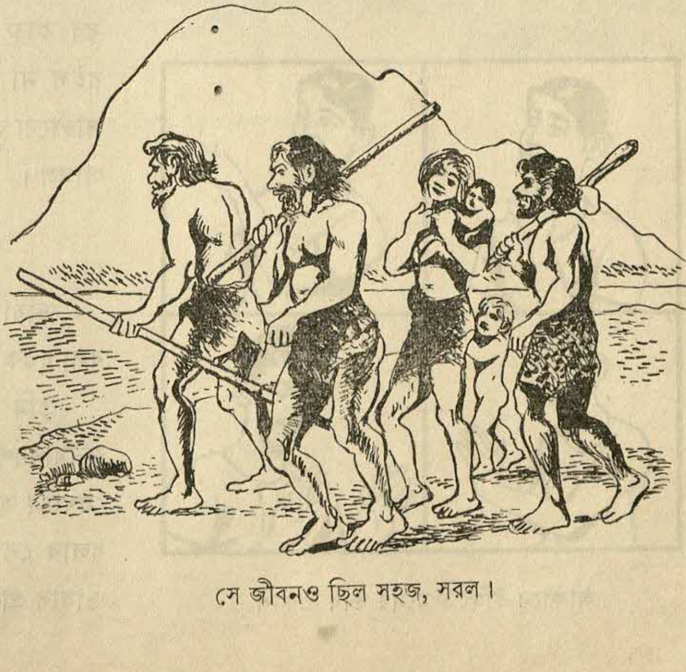
ধ্বনি ও শব্দের এই পার্থক্য মনে রেখে আমরা অনায়াসেই বলতে পারি, প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এক রকম বোবাই ছিল। কোন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে তাদের মুখ থেকে এক ধরণ শব্দ বেরুত বটে, কিন্তু তারা আজকের মানুষের মত কথা বলতে পারত না।

আকারে-ইঙ্গিতে কথা

আজকাল আমরা বৃহৎ সমাজে বাস করি। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ। বিচিত্র আমাদের চিন্তাধারা। জটিল আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী। এই চিন্তাকে রূপ দেওয়া, মনের শত সহস্র ভাবকে প্রকাশ করা, বিশ্ববাসীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা—এ সবের জন্যই আজকাল এত কথার প্রয়োজন।

কিন্তু আদিম যুগে মানুষের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। তখন সমাজ বলতে ছিল ছোট ছোট যাযাবর দল। পাহাড়ের গুহায় বা অরণ্যের অন্ধকারে ছিল তাদের উলঙ্গ বন্য জীবন। আর সে জীবনও ছিল সহজ, সরল, জটিলতা-বর্জিত। জীবনযাত্রার প্রয়োজনও ছিল অতি সামান্য, চিন্তার পরিধিও ছিল নিতান্তই সংকীর্ণ। তাই আকারে-ইঙ্গিতেই তারা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। এতেই তাদের কাজ চলে যেত, কোন অসুবিধা হ'ত না।

আদিম জীবনের সে অভ্যাস এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান। আজকালও আমরা অনেক সময় ইঙ্গিতে, ইশারায় আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি।

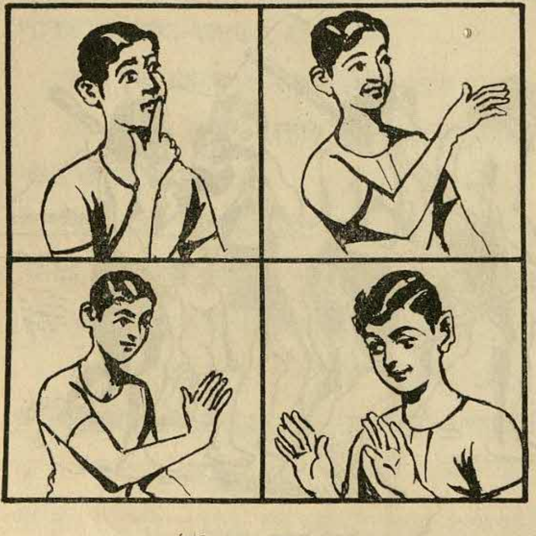


সে জীবনও ছিল সহজ, সরল।

তোমার ছোট্ট শিশু ভাইটির কথা ভাবো। জন্মের পর তার বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে সে যে ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে, সে তার কান্না—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া। তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা, বেদনা সব কিছু সে কান্নার দ্বারাই বোঝাতে চায়। তোমার আমার পক্ষে সকল সময় এ কান্নার অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়। মা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেন, কখন তার খিদে পেয়েছে বা কখন তাকে আদর করতে হবে।

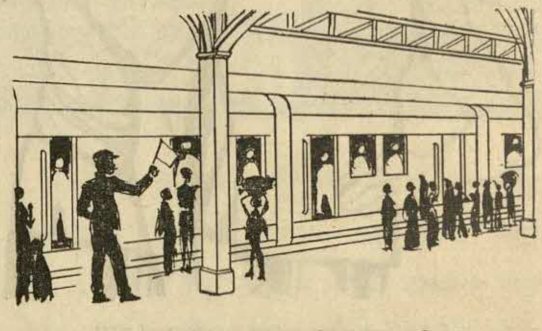
শুধু শিশু কেন? আমরা, বড়রাও কি আকারে-ইঙ্গিতে অনেক সময় আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি না?

হাঁ বা না বোঝাতে বিশেষ ভঙ্গীতে মাথা নাড়া, মুখের উপর তর্জনী দেখিয়ে অন্য কাউকে চুপ করতে বলা, হাতের ইশারায় কাছে ডাকা, আবার সেই হাতেরই বিশেষ ভঙ্গীতে দূর দূর করা—এ সব তো আমরা ঘরে ঘরেই করে থাকি।



আকারে-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ

ঘরের বাইরে পথেও আমরা হাতের ইশারায় ট্রাম, বাস্, ট্যাক্সি থামাই। ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখিয়েই গাড়ী চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। রেল-গাড়ীর গার্ড সবুজ নিশান উড়িয়ে, বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছাড়বার নির্দেশ দেন। স্কুল-কলেজের ছুটী হলে ঘণ্টা বাজিয়েই তা জানানো হয়। এমনি আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।



সবুজ নিশান উড়িয়ে গাড়ী ছাড়ার নির্দেশ

ভাষার গোড়াপত্তন

কিন্তু মানুষের দল বা গোষ্ঠী যখন আকারে বড় হতে সুরু করল, তখন ইঙ্গিতে-ইশারায় সব কাজ চালানো, সব কথা বোঝানো সম্ভব রইল না। মানুষ তখন মুখের কথায়, শব্দের সাহায্যে তার মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করতে লাগল। সেই হ'ল ভাষার গোড়াপত্তন।

ভাষা সমাজের সৃষ্টি

ভাষা সমাজের সৃষ্টি। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

তুমি যদি রবিন্‌সন্ ক্রুসোর মত কোনও জনমানবশূন্য দ্বীপের একমাত্র অধিবাসী হও, যেখানে আর দ্বিতীয় মানুষ নেই, সেখানে কথা বলার কোন প্রয়োজনই হয় না। সেখানে ভাষার প্রশ্নও নিরর্থক।



শীতের দিনে হিমালয় অঞ্চল ।

কিন্তু মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বাস করতে হলে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান না করে উপায় নেই। কথাই হচ্ছে সেই উপায়।

কিন্তু কথা বলতে হলে অন্ততঃ দু'জন চাই। একজন বলবে, দ্বিতীয় জন শুনবে। পাগল আপন মনে একাই বিড়্ বিড়্ করে প্রলাপ বকতে পারে, কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

আমরা বাঙ্গালী। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। তার মানে, আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি, লিখি, আর সব বাঙ্গালীই তা বুঝতে পারে। তার কারণ, বাঙ্গালী সমাজ বাংলা যে-শব্দটির যে-অর্থ বেঁধে দিয়েছে বা স্বীকার করে নিয়েছে, সকল বাঙ্গালীই তা মেনে নিচ্ছে।

এ কথা বাংলা ভাষা সম্পর্কে যেমন সত্য, অন্য যে-কোন ভাষা সম্পর্কেও তেমনি সত্য। এ বিষয়ে পরে আমরা বিশদ আলোচনা করব। আপাততঃ আমাদের এটুকু মনে রাখলেই চলবে, যে, সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া কোন ভাষারই সৃষ্টি বা বিকাশ হতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে যে মুখ না খুলেও আমরা কথা বলতে পারি, অর্থাৎ আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি।

ভাবভঙ্গী বা আকার-ইঙ্গিত এবং ভাষা —এই দু'য়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে বক্তা যখন কথা বলে, তখন তার মনের মধ্যে যে সব ভাবের উদয় হয়, শ্রোতা তারও কিছুটা বুঝতে পারে। কোন্ কথার পর কোন্ কথা আসবে, কেন আসবে, তাও খানিকটা আন্দাজ করতে পারে। আকার-ইঙ্গিতের ভাষায় তা সাধারণতঃ বুঝবার উপায় থাকে না।

তবে এও ঠিক, মুখের কথাকে যখন লেখায় ফুটিয়ে তুলি তখন সবটা প্রকাশ করা যায় না। আমি যখন কথা বলি তখন শুধু আমার বাক্‌যন্ত্রই কাজ করে না, আমার চোখ-মুখের ভঙ্গীও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। সেটা চোখে দেখার জিনিস, কাগজের বুকে কলমের আঁচড়ে তা ষোল আনা প্রকাশ করা যায় না।

তুমি—দুই অক্ষরের এই ছোট্ট কথাটির উচ্চারণের বিভিন্নতায় প্রশ্ন, বিস্ময়, ঘৃণা প্রভৃতি অনেক কিছুই প্রকাশ করা যায়, যা লেখায় প্রকাশ করা সহজ-সাধ্য নয়।

ভাষা শেখার ভিত্তি

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় চেহারা, গায়ের রং ইত্যাদি মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। প্রত্যেক মানুষকেই ভাষা শিখবার জন্য পরিবেশের ওপর নির্ভর করতে হয়।

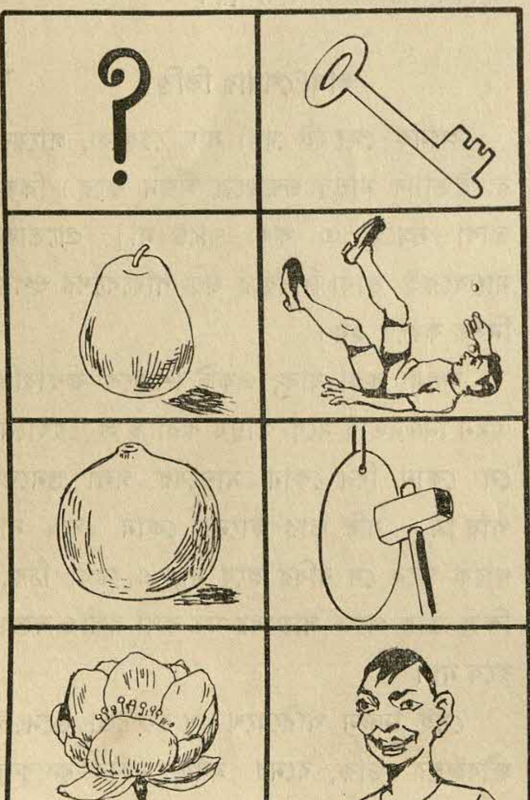
কল্পনা করা যাক্, একটি শিশুকে জন্মাবধি এমন নির্জনতার মধ্যে মানুষ করা হ'ল যেখানে সে কোন দিন কোন মানুষের গলা শুনতে পায় নি। যদি তার কানের কোন দোষ না থাকে তবে সে বধির হবে না, এ কথা ঠিক, কিন্তু তার পক্ষে মানুষের মত কথা বলাও সম্ভব হবে না।

সেই নির্জন পরিবেশে সে হয় তো শুনেছে জীবজন্তুর ডাক, বনের মর্মর, নদীর কুলুকুলু ধ্বনি, পাখীর কাকলী। এই সব শব্দ শুনে জীবজন্তু, গাছপালা, পাখী, নদী ইত্যাদি

সম্পর্কে সে একটা অস্পষ্ট ধারণাও করবে, কিন্তু আমাদের মত তাদের নাম বলতে পারবে না।

তার ভাষায় হয় তো গরুর নাম হবে হাম্বা, বিড়ালের নাম মিউ, কুকুরের নাম ঘেউ ঘেউ, গাছের নাম মর্মর্, কাকের নাম কা-কা, পায়রার নাম বক্ বকম্, নদীর নাম কুল্ কুল্ ইত্যাদি।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, শব্দ দিয়ে আমরা আমাদের মনের ধারণা প্রকাশ করি। ধারণা না থাকলে কোন শব্দেরই কোন মানে হয় না। কিন্তু কোন্ শব্দ দিয়ে কি ধারণা প্রকাশ করব তা কি ভাবে ঠিক করা যাবে?



একই শব্দে দু'দেশে দু'রকম ধারণা

আমি যদি বলি 'কি?' তুমি বুঝবে আমি একটা প্রশ্ন করছি। কিন্তু একজন ইংরেজ কাছে থাকলে সে বুঝবে আমি চাবির কথা বলছি। কারণ ইংরেজী ভাষায় কি (Key) কথাটির অর্থ চাবি। তেমনি 'পট' বললে তুমি বুঝবে চিত্র, আর ইংরেজ বুঝবে পাত্র (Pot)। ফল বললে তুমি বুঝবে গাছের ফল, ইংরেজ বুঝবে পড়ে যাওয়া (Fall)। বেল বললে তুমি বুঝবে বিল্ব ফল, ইংরেজ সন্তান বুঝবে ঘণ্টা (Bell)। ফুল বললেও তাই। তুমি বুঝবে পুষ্প, ইংরেজ বুঝবে বোকা (Fool) বা পূর্ণ (Full)।

কেন এমন হয়? একই শব্দের দু'জনের ধারণা দু'রকম কেন? তার কারণ, শব্দের ধারণা বা অর্থ স্থির করে দিয়েছে সমাজ। অর্থাৎ সমাজের সকলে মিলে স্থির করেছে কোন্ শব্দের কি অর্থ বা ধারণা হবে।

অবশ্য চিরদিনই যে এক সমাজে এক শব্দের একই অর্থ বা ধারণা থাকে, তাও নয়। অর্থেরও পরিবর্তন হয়। কিন্তু সে পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে হয় এবং এত অল্প ক্ষেত্রে হয়, যে, সাধারণ ভাবে আমরা শব্দের ধারণা বা অর্থ এক রকম স্থির বলেই ধরে নিতে পারি।

অবশ্য যদি সমাজের সকলে মিলে স্থির করে যে কোন শব্দের আজ যা অর্থ আছে কাল আর তা থাকবে না, তবে তাই মেনে নিতে হবে।

ছোট বেলায় আমরা যে জন্তুটির দুধ খেয়ে বড় হয়েছি বাংলায় তার নাম গরু। সবাই তা মেনে নিয়েছে বলেই গরু বলতে আমরা এই বিশেষ জন্তুটিকেই বুঝি, বা এই জন্তুটি

সম্বন্ধেই আমাদের ধারণা হয়। কিন্তু আজ যদি সমাজের বা জাতির সবাই মিলে স্থির করে, কাল থেকে এর নাম গরু না হয়ে 'রুগ' হবে, তবে এর পর থেকে এই জন্তুটি রুগ নামেই পরিচিত হবে। অর্থাৎ তখন রুগ বললে গরু সম্পর্কেই আমাদের ধারণা হবে।

এ যে হয়, এ তো তোমরা চোখের ওপরেই দেখতে পাচ্ছ। আগে যে ভূখণ্ডের নাম ছিল ভারতবর্ষ, আজ তারই একাংশের নাম ভারত, আর এক অংশের নাম পাকিস্তান। পৃথিবীর আরও বহু দেশের নামের এমনি পরিবর্তন হয়েছে। সবাই তা মেনেও নিয়েছে।

আগেই বলেছি, ভাষা সমাজের সৃষ্টি। কাজেই যে সমাজ যে শব্দের যে ধারণা বা অর্থ বেঁধে দিয়েছে সে সমাজে সে শব্দের সে অর্থই হবে। ফলে একই শব্দের বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন অর্থ হয়।

পৃথিবীতে যদি একটি মাত্র মানুষ থাকত তা হলে ভাষার কোন প্রয়োজন হ'ত না। আবার পৃথিবীর সব মানুষ যদি একই সমাজের হ'ত, তা হলেও পৃথিবীতে মাত্র একটি ভাষাই থাকত। সে ক্ষেত্রেও একটি শব্দের মাত্র একটি অর্থই হ'ত।

কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের সমাজ বা গোষ্ঠীর সংখ্যা এক নয়। তাই আমরা যে সমাজে বাস করি সে সমাজে পরস্পরের মধ্যে মনের ভাব বোঝাবার জন্য আমাদের সে সমাজেরই ভাষা-জ্ঞান প্রয়োজন।

মানুষ ভাষা নিয়ে জন্মায় না। জন্মের পর মা, বাবা, ভাইবোন সকলের কথা শুনে শুনে সে কথা শেখে। একটি বাঙ্গালীর ছেলে যদি জন্মাবধি ইংরেজ পরিবারে মানুষ হয় তবে সে যে ভাষা শিখবে তা বাংলা নয়, ইংরেজী। তেমনি কোন ইংরেজ শিশু যদি বাঙ্গালী পরিবারে লালিত পালিত হয় তবে তার মুখে ইংরেজী বুলির পরিবর্তে ফুটবে বাংলা কথা।

ইতর প্রাণীদের তুলনায় মানব-শিশুর শৈশব অনেক দীর্ঘকাল স্থায়ী। এক বছরের আগে মানব-শিশু হাঁটতেই শেখে না, দেড় বছর দু' বছর হবার আগে তার মুখে কথা ফোটে না। অথচ একটা বাছুর জন্মের পরক্ষণেই হাঁটতে পারে, হাম্বা হাম্বা ডাক দিতেও পারে।

মানব-শিশুর এই যে সুদীর্ঘ শৈশব, এর মধ্যে তার মনে অলক্ষ্যে তার সমাজের জ্ঞান, আচার-ব্যবহার, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সঞ্চারিত হতে থাকে। তাই মানব-শিশু যখন বড় হয় তখন সে আর অনভিজ্ঞ শিশু মাত্র থাকে না, তখন সে সামাজিক জীব হয়ে ওঠে।

আদি ভাষা

এ যাবৎ যতগুলি ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে তার মোট সংখ্যা দু'হাজারেরও বেশী। এদের কতকগুলি নিয়ে পণ্ডিতেরা রীতিমত গবেষণা করে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। আবার কয়েকটি ভাষার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা ছাড়া তাদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

ভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁদের কেউ কেউ এই মত প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন, যে, পৃথিবীর সব ভাষাই এক আদি

ভাষা থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ আদিতে একটি মাত্র ভাষা ছিল। ক্রমপরিবর্তন ও ক্রম-বিবর্তনের ফলে তা থেকেই বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়েছে। এ মতের যাঁরা পরিপোষক তাঁদের মধ্যে জেকব গ্রিম ও ইটালীর ভাষা-বিজ্ঞানী ট্রমবেটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের এই মতের সমর্থনে তাঁরা অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ পণ্ডিতই তাঁদের এই মতকে গ্রহণ করেন নি।

এ যাবৎ যতগুলি ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের কোন একটির সঙ্গে আর একটির নানা বিষয়ে এত বৈষম্য, যে, এগুলি যে একই আদি ভাষার বংশধর—এ কথা সহজে মেনে নেওয়া যায় না।

তবে এও মনে রাখতে হবে, যে, পণ্ডিতেরা এ যাবৎ যত ভাষার সন্ধান পেয়েছেন, তাদের প্রাচীনত্ব যতই বেশী হোক না কেন, মানুষের প্রাচীনত্বের সঙ্গে তুলনা করলে তারা কিছুই নয়। অর্থাৎ আমরা যাকে প্রাচীন ভাষা বলি তা মানুষ সৃষ্টি হবার বহু পরে প্রচলিত পুরোনো ভাষার সে-সময়কার প্রচলিত রূপ মাত্র। এদের আদি রূপ কি ছিল, এ যাবৎ সংগৃহীত তথ্য থেকে সে সম্বন্ধে জোর করে কোন কথা বলা চলে না।

তবে পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত, যে, অন্ততঃ কতকগুলি ভাষা-গোষ্ঠী একটি বিশেষ আদি ভাষা থেকে উদ্ভূত। সেমিটিক ভাষা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, হিব্রু, আরামাইক্, অ্যাসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, আরবী, আবিসিনীয় প্রভৃতি ভাষায় শব্দগঠন ও ব্যাকরণের বিধি-নিয়মে এত বেশী সাদৃশ্য আছে যে একমাত্র আবিসিনীয় ছাড়া অন্য যে-কোন ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকলেই এদের যে-কোন ভাষা অনায়াসেই আয়ত্ত করা চলে। এ থেকে বলা যেতে পারে, এই সব ভাষা হয় একই মূল ভাষা থেকে উদ্ভূত, অথবা এরা যে আদি ভাষা থেকে এসেছে তার সঙ্গে এদের খুব বেশী গরমিল থাকবার কথা নয়।

আবার ককেশাস্ অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণ অধিবাসীদের মধ্যে যে সব ভাষা প্রচলিত, তাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মিল বা সামঞ্জস্য থাকলেও, অন্যান্য অনেক বিষয়ে এত বেশী বৈষম্য যে এ কথা কিছুতেই বলা চলে না যে এ সব ভাষার মূল এক।

তেমনি আবার এমন ভাষাও আছে, যাদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন ভাষারই এ যাবৎ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় নি। প্রাচীন স্পেনের বাস্ক্ (Basque) ও প্রাচীন ইতালীর ইট্রাস্কান্ (Etruscan) ভাষার নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্য ভাষার সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুজে বার করবার বহু



ভারতের সিন্ধুলিপি

চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত তা সফল হয় নি।

তা ছাড়া এখনও অনেকগুলি প্রাচীন লিপির



প্রাচীন লিপি

পাঠোদ্ধারও সম্ভব হয় নি। এই সব অপঠিত লিপির মধ্যে আছে—ভারতের সিন্ধু-লিপি, মধ্য আমেরিকার মায়া-লিপি, মেক্সিকোর এজটেক-লিপি, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইষ্টার দ্বীপের ও অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপের লিপি। এ সমস্ত লিপির পাঠোদ্ধার হলে হয়ত অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে ; এখন পর্যন্ত যে সব জিনিস অন্ধকারে আছে তার ওপরও আলোক-সম্পাত হবে।

ভাষার গোষ্ঠী বিভাগ

পণ্ডিতেরা পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাকে প্রধানতঃ সাতটি গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন। সে ভাগগুলি হ'ল :—

(১) সেমিটিক ভাষা—হিব্রু, আরবী, সিরীয়াক, ফিনিশিয়ান্ ইত্যাদি ভাষা ঐ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

(২) ইন্দো-ইয়োরোপীয়ান্ বা ইন্দো-জারমেনিক বা আদি আর্য ভাষা। বর্তমান চল্‌তি ভাষার মধ্যে বেশীর ভাগই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই আদি আর্য ভাষাকে আবার নয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হ'ল :—

(ক) হেলেনিক্—গ্রীক্ ও আলবেনিয়ান্।

(খ) লাটিন—ইতালিয়ান্, ফরাসীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগীজ, রুমানীয়।

(গ) কেল্‌টিক্—আইরিশ, ওয়েল্‌স্, কর্নিশ ও ব্রিটন।

(ঘ) টিউটনিক—জার্মান, ওলন্দাজ, ফ্লেমিশ, আইসল্যাণ্ডীয়, নরওয়েজিয়ান্ ডেনমার্কীয়, সুইডিশ ও ইংরেজী।

(ঙ) স্লাভ্—রাশিয়ান, পোলিশ, চেক্, বুলগেরিয়ান্ ও সার্বিয়ান্।

(চ) ইরানীয়—প্রাচীন পারসিক, পহ্লবী (মধ্যযুগীয় পারসিক), আধুনিক পারসিক ও পুস্তু।

(ছ) ভারতীয়—(এ সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করব।)

(জ) এনাটোলিক—আর্মেনিয়ান্, ফ্রিজিয়ান্।

(ঝ) সিরীয়—হিটাইট্।

(৩) তুরানীয়ান্—চৈনিক বা চীনে, সাইবেরিয়ান্, ফিন্‌ল্যাণ্ডীয়, হাঙ্গারিয়ান্, তুর্কী প্রভৃতি ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৪) জাপানী—কোরিয়ার ভাষা।

(৫) মালয়—পলিনেশিয়ার ভাষা।

(৬) আফ্রিকান্—নিগ্রো ভাষা।

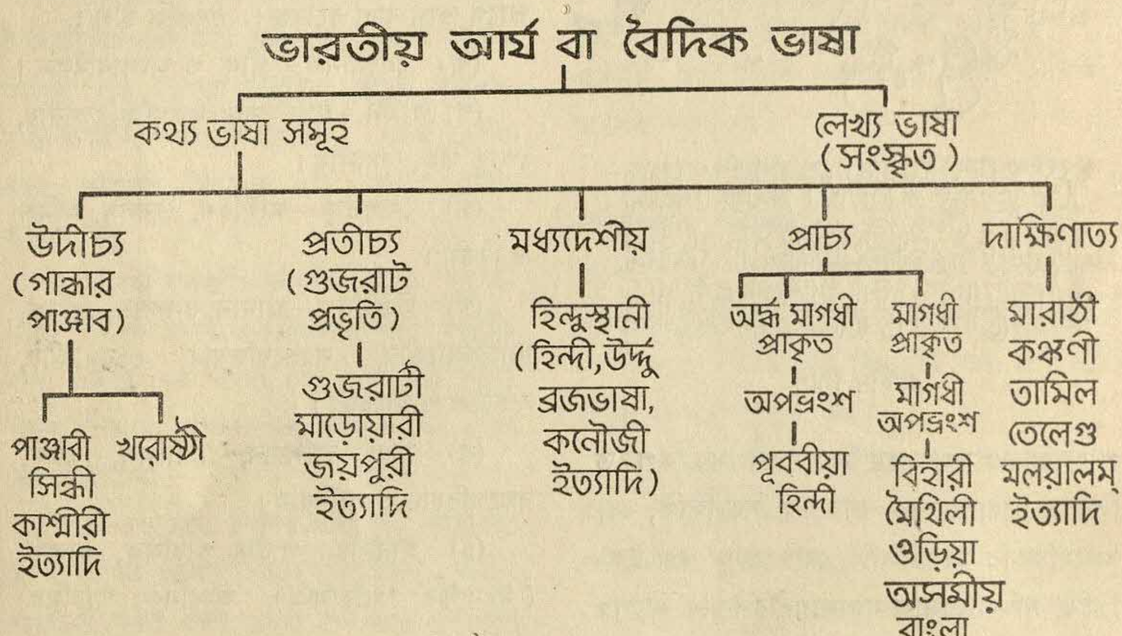
(৭) আমেরিকার আদিবাসীদের ভাষা।

ভারতীয় আর্য ভাষা

ভারতীয় আর্য বা বৈদিক ভাষা থেকেই ভারতের সব ভাষার সৃষ্টি। নীচে সংক্ষিপ্ত আকারে যে তালিকা দেওয়া হ'ল, তা থেকেই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে।

যুগ। ঋগ্বেদ এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন।

খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে খ্রীঃ অব্দ ১০০০ পর্যন্ত প্রাকৃতের যুগ। এই প্রাকৃতের যুগকে আবার তিন ভাগ করা হয়েছে। প্রথম যুগের



ভারতীয় আর্য ভাষার তিন যুগ

ভারতীয় আর্য ভাষা যে সব ধ্বনিগত ও শব্দগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে তাকে তিনটি সুস্পষ্ট যুগে ভাগ করা হয়েছে। সে তিনটী যুগ-বিভাগ হ'ল—বৈদিক যুগ, প্রাকৃতের যুগ এবং ভাষার যুগ। প্রাকৃত ও ভাষার মধ্যবর্তী কালকে অপভ্রংশের যুগ বলা হয়। বলা প্রয়োজন, যে, এখানে ভাষা বলতে বর্তমান আঞ্চলিক ভাষাকেই বোঝাচ্ছে।

সময় হিসাবে যুগ বিভাগ করলে, খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৬০০ সাল পর্যন্ত বৈদিক

নিদর্শন অশোক-লিপি, দ্বিতীয় যুগের নিদর্শন সে যুগের নাটকের প্রাকৃত ভাষা। তৃতীয় যুগ অপভ্রংশের যুগ। এই সময় আর্যেরা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কজেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনার্যপ্রভাবে এই যুগের বৈদিক ভাষার নানা পরিবর্তন ঘটে। অপভ্রংশের যুগে (আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ অব্দ) প্রাকৃতের আরও পরিবর্তন সাধিত হয়। বস্তুতঃ এই অপভ্রংশই পরবর্তী যুগের আঞ্চলিক ভাষার জন্মদাতা।

খ্রীঃ অব্দ ১০০০ থেকে ভাষার যুগ সুরু হয়েছে। এর আগে প্রাকৃতের আমলেই বৈদিক ভাষার যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সরল ও কোমল হয়।

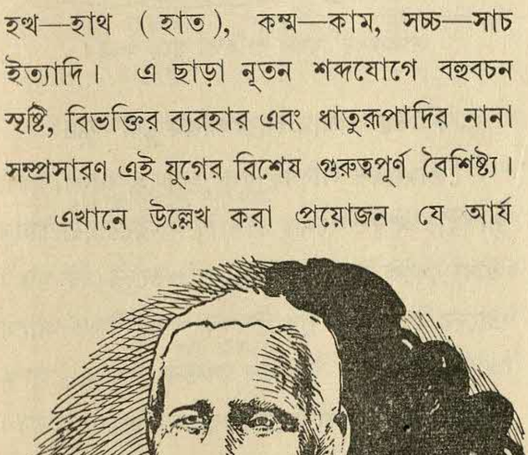
যেমন কার্য হয় কজ্জ, বন্যা—বন্না, হস্ত—হ্থ, কর্ম—কম্ম, সত্য—সচ্চ ইত্যাদি।

ভাষার এই সব পরিবর্তন সুনির্দিষ্ট প্রণালীতেই সাধিত হয়েছে। এই সঙ্গে যে তালিকাটি দেওয়া হ'ল তা থেকে এই পরিবর্তনের ধারাটি পরিষ্কার বোঝা যাবে।

বৈদিক বা সংস্কৃত রূপ	প্রাকৃত রূপ	অপভ্রংশ রূপ	প্রাচীন বাংলা রূপ	আধুনিক বাংলা রূপ
অবিধবা	অবিহবা	অইহঅ	আইহ	আইয়, এয়ো
অষ্টাদশ	অট্‌ঠারহ	অট্‌ঠারহ	আঠারহ	আঠার
অস্মে	অম্‌হে	অম্‌হি	আম্মি	আমি
গ্রাম	গাম	গাঁব	গাঁও	গাঁ
শৃণোতি	সুনই	সুণই	শুণহ	শুনে বা শোনে

ভাষার যুগে প্রাকৃতের বা অপভ্রংশের এই দ্বিত্ব উচ্চারিত ব্যঞ্জন বর্ণ এক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়। যেমন কজ্জ হয় কাজ, বন্না—বান, হ্থ—হাথ (হাত), কম্ম—কাম, সচ্চ—সাচ ইত্যাদি। এ ছাড়া নূতন শব্দযোগে বহুবচন সৃষ্টি, বিভক্তির ব্যবহার এবং ধাতুরূপাদির নানা সম্প্রসারণ এই যুগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আর্য



মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

মগধ অঞ্চলে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। ওড়িয়া, অসমীয় ভাষারও এই একই আদি। সে দিক্ থেকে এ দু'টি ভাষা বাংলার সহোদরা।

বাংলা ভাষাকেও তিন যুগে ভাগ করা হয়েছে। আদি বা প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও বর্তমান যুগ।

আনুমানিক ৯০০ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১২০০ খ্রীঃ অব্দ অবধি আদি যুগ। খুব সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর আগেই বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু ভাষা তখনও প্রাকৃতের প্রভাববিমুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে পারে নি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নেপালে আবিষ্কৃত "বৌদ্ধ গান ও দোহা"র চর্যাপদগুলি এ যুগের একমাত্র সাহিত্য-নিদর্শন। আর সবই লুপ্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

এই দোহাগুলি থেকে দু'-একটি নমুনা দেওয়া গেল :

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥

ধামার্থে চাটিল সঙ্কম গড়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥

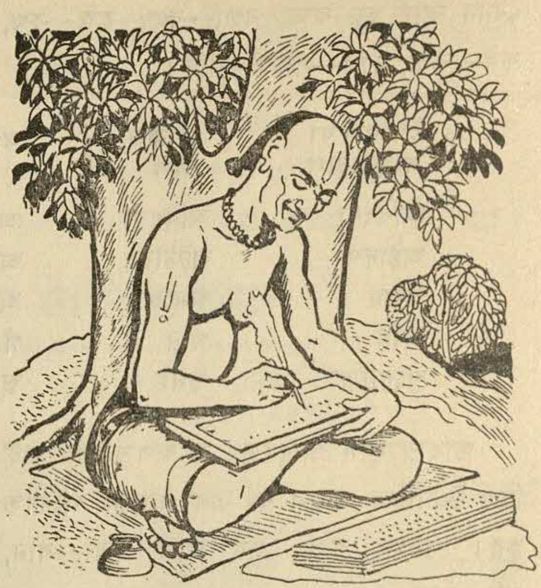
ভবনদী গহন গভীর বেগে প্রবাহিত হয়। দুই অন্তে পঙ্কিল, মাঝে থই নাই। ধর্মের জন্য আচার্য চাটিল সাঁকো গড়ে। পারগামী লোক নির্ভয়ে তরিয়া যায়।

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চিএ পইঠো কাল ॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ ॥

কায়া তরুবর। ইহার পাঁচটি ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল (ইহাতে) প্রবেশ করিয়াছে। দৃঢ় ভাবে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলিতেছেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও।

খ্রীঃ অব্দ ১২০০ থেকে খ্রীঃ অব্দ ১৮০০ পর্যন্ত কালকে বলা হয় মধ্য যুগ এবং খ্রীঃ অব্দ ১৮০০ সালের পর থেকে বর্তমান কালকে বলা হয় আধুনিক যুগ। মধ্য যুগেই বাংলা ভাষার পূর্ণ বিকাশ ঘটে, সংস্কৃতের প্রভাবে ভাষার রূপ পরিবর্তন হয় এবং বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদ, শ্রীকর নন্দীর মহাভারত ইত্যাদি এ যুগেরই রচনা। এই যুগের শেষের দিকে শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের ধর্মপ্রচারের ফলে এক ভক্তি-মধুর শক্তিশালী বৈষ্ণব সাহিত্যও গড়ে ওঠে, যার রস আজও গৌড়জনের অন্তরে সুধা সিঞ্চন করছে।

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে কি অনন্ত ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে উঠেছে, এক রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।



ভক্তিমধুর বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে ওঠে।

বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক যোগসূত্র

তোমাদের আগেই বলা হয়েছে, বাংলা এবং পৃথিবীর আরও অনেক ভাষা ইন্দো-ইয়োরোপীয়ান্ ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, পণ্ডিতদের এই মত। তাঁদের মতে খ্রীঃ পূর্ব ১৫০০ শতাব্দীরও আগে আর্য নামে এক জাতির কতক কতক লোক ইরান দেশের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এরাই ভারতীয় আর্য নামে পরিচিত। বৈদিক ভাষা এদেরই প্রাচীনতম ভাষা।

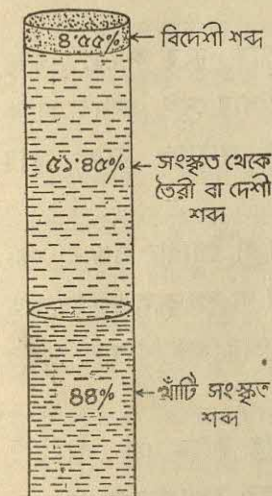
এই আর্যদেরই এক শাখা ইরানে বসবাস করে। তাদের ভাষার নাম ইরানীয়ান্। আবার এই আর্যদেরই আর এক শাখা ইয়োরোপে বসতি স্থাপন করে। ইয়োরোপের বর্তমান ভাষাগুলি এই ইয়োরোপীয় আর্য ভাষা থেকেই এসেছে।

সুতরাং বর্তমান ভারতীয়, ইরানীয় ও ইয়োরোপীয় ভাষার মধ্যে একটি যোগসূত্র বিদ্যমান আছে। মা কথাটির বিভিন্ন ভাষার

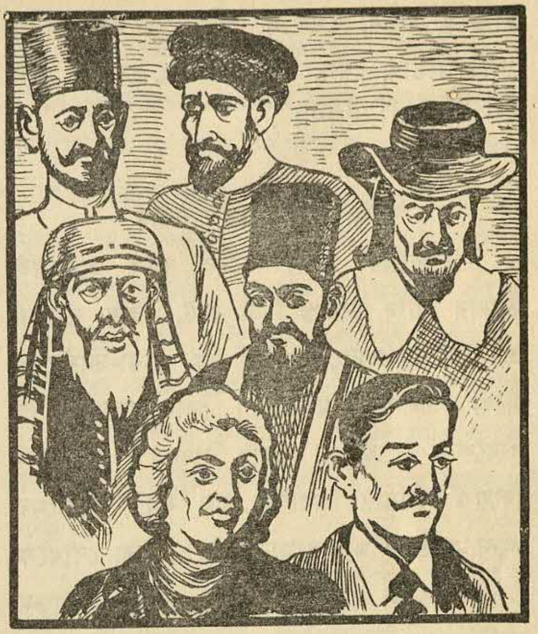
রূপ বিচার করলেই আমাদের এ মতের সত্যতা বোঝা যায়। বাংলা মা ইংরেজীতে Mother, জার্মানে Muttar, লাতিনে Mater, গ্রীক ভাষায় Meter, সংস্কৃতে মাতৃ ও রুশ ভাষায় Mat। কাজেই ভাষার দিক্ থেকে বিচার করলে বলা যায়, ভারতীয়, ইরানীয় ও ইয়োরোপীয় ভাষা সমগোত্র।

জীবন্ত ও মৃত ভাষা

জীবন্ত ভাষার লক্ষণ এই যে সেটা অন্যান্য বিদেশী ভাষা থেকে নতুন নতুন শব্দ আহরণ করে নিজের সম্পদ্ বৃদ্ধি করে। বাংলা ভাষাও ইংরেজী, ফরাসী, পোর্তুগীজ, উর্দু, হিন্দী, ফারসী, আরবী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা থেকে অনেক শব্দ গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেরই এক ভাষাবিদ্ পণ্ডিত হিসেব করে দেখিয়েছেন যে বাংলা ভাষায় প্রায় সওয়া লক্ষ শব্দের মধ্যে শতকরা ৪৪ ভাগ সংস্কৃত শব্দ, শতকরা ৫১'৪৫ ভাগ সংস্কৃত থেকে তৈরী বা দেশী শব্দ এবং শতকরা ৪'৫৫ ভাগ বিদেশী শব্দ আছে। তার মানে বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজারের উপর। অবশ্য এদের অনেকগুলি এত দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে যে এগুলি যে কোন কালে বিদেশী ভাষা থেকে আমদানী হয়েছে তা আর মনেই হয় না। যেমন—



বাংলা ভাষার উপাদান খুঁজলে কি পাওয়া যাবে



আরব, পারস্য, পোর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি সমস্ত দেশের লোকের ভাষা থেকেই শব্দসম্পদ্ নিয়ে বাংলা ভাষা গড়ে উঠেছে

'আরবী—আক্কেল, কলম, কেচ্ছা, জিলা, দফা।

ফারসী—আন্দাজ, খরচ, জাহাজ, কবর, আয়না, দোয়াত, তোপ, বুলবুল, গোলাপ, ইজ্জৎ।

পোর্তুগীজ—আলকাতরা, আনারস, আতা, তামাক, চাবি, বালতি, ইস্ত্রী, কামরা, গুদাম, নীলাম, পেঁপে, কপি, বোতল, বোতাম।

ওলন্দাজ—হরতন, ইস্কাপন, ইস্ক্রুপ।

ফরাসী—কার্তুজ, কুপন, ডিপো, কিউ।

তুর্কী—আলখাল্লা, উজবক, কোর্মা, চক্‌মকি, বক্‌সী, বাহাদুর, বোচকা, লাস, সওগাত।

ইংরেজী—ব্যাট্, বল, ফুটবল, কোট, টেনিস, ব্যাড্‌মিণ্টন, সেক্রেটারী, হেড্ মাষ্টার, বয়কট, লাইট, ভোট, ফ্যান্, পোষ্ট, স্কুল, লাট, হাসপাতাল,

ডাক্তার, লণ্ঠন, গেলাস, সুট, সুটকেস, ব্যাগ, পোষ্ট মাষ্টার, রেল, গার্ড, টেবিল, চেয়ার এবং সদ্য আমদানী 'র‍্যাশন্'।

ভাষা জাতীয়তার বনিয়াদ

পরস্পরের মধ্যে মনের ভাব প্রকাশই ভাষার আদি উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু ভাবের এই আদান-প্রদানের ফলে এক ভাষা-ভাষীদের মধ্যে ক্রমেই আত্মীয়তা বোধ জন্মায়, যা অবশেষে জাতীয়তা বোধে দাঁড়ায়। সে দিক্ দিয়েও ভাষার অবদান কম নয়। বঙ্কিমের বন্দে মাতরম্ মন্ত্র আমাদের জাতীয়তা বোধকে যে কতখানি এগিয়ে দিয়েছে, সহস্র নির্যাতন হাসিমুখে অক্লেশে সহ্য করবার শক্তি যুগিয়েছে, এ কথা আজ আর কারও অজানা নয়।

লেখা

ভাষা সৃষ্টির অনেক পরে লেখার জন্ম। লেখার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দু'টী। মানুষের চিন্তাকে বাইরে চাক্ষুষ রূপ দেওয়া এবং সে রূপকে স্থায়ী করে রাখা। কাজেই লেখার জন্য এমন একটি লিপির প্রয়োজন যা সবাই বুঝতে পারে, অন্ততঃ যে ভাষায় লেখা সেই ভাষা-ভাষীদের বুঝতে কষ্ট না হয়।

বলা বাহুল্য, এ কাজ একদিনে সম্ভব হয় নি। বহু রূপ পরিবর্তনের পর তবে সর্বজন-বোধ্য বর্তমান লিপির বিকাশ ঘটেছে। মানুষ এখন তার কীর্তি-কলাপকে ইতিহাসে স্থায়ী রূপ দিতে শিখেছে।

আদিম যুগে লিপির উদ্ভব হয় নি বলে, সে যুগের মানুষ কি চিন্তা করত, কি ভাবে জীবন যাপন করত ইত্যাদি কোন কিছুরই সুলিখিত সাক্ষ্য নেই। যদি তা থাকত, তবে আমরা অনায়াসেই আমাদের সেই পূর্বগামীদের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারতাম।

আগেই বলেছি, প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ইশারায় ইঙ্গিতেই প্রথম প্রথম মনের ভাব প্রকাশ করত। গোড়ার দিকে এতে কোন অসুবিধা হ'ত না। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল, ইশারা ইঙ্গিতে সব জিনিস সহজে বোঝান যায় না। তা ছাড়া মানুষের সমাজজীবন যেই একটু দানা বাঁধতে সুরু করল, অম্‌নি জীবনের জটিলতাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাদের সামনে তখন খুবই সাধারণ অথচ তিনটি আশু সমস্যা দেখা দিল ঃ

ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন একটি কাজ করতে হবে। তা যাতে মনে থাকে তার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়তঃ, যে লোক দূরে আছে, এখন হাতের কাছে পাবার উপায় নেই, এখনই তাকে একটা জরুরী সংবাদ পাঠাতে হবে,—তার ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়তঃ, এক দল বা গোষ্ঠীর পশু বা যন্ত্র-পাতি যাতে অন্য গোষ্ঠী বা দল ভুলে তাদের বলে দাবী না করতে পারে, তার জন্য বিশেষ চিহ্নের ব্যবস্থা করা।

আজকাল তোমাদের কাছে এর কোনটাই কঠিন মনে হবে না। কিন্তু তখনকার যুগের স্বল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন সরল মানুষের কাছে এগুলির কোনটাই সহজ ছিল না। তারা তাদের এই প্রাথমিক সমস্যার কি ভাবে সমাধান করেছিল পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে তা জানা গেছে। সে কথা আমরা পরবর্তী খণ্ডে বলব।

দেশবিদেশের সেরা বই

কাউণ্ট অব্ মণ্টেক্রিস্টো

দ্বিতীয় পর্ব

শ্যাতু দ্য ঈফ্‌এর কারাগার থেকে এডমণ্ডের পলায়নের পর অনেক দিন কেটে গেছে। খবরটা অবশ্য জেলের কর্তৃপক্ষ দু'-একদিনের মধ্যেই টের পেয়েছিলেন; কিন্তু যে বস্তাটার মধ্যে অ্যাবে ফারিয়াকে পুরে রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে তিনিই থাকুন আর এডমণ্ডই থাকুক, সেটা যে গোটা মানুষটি সমেত সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে তো আর সন্দেহের কোন কারণ ছিল না! তাঁরা ভাবলেন এডমণ্ড জেলের ভিতর তিলে তিলে মৃত্যুবরণের চাইতে সমুদ্রে ডুবে মরাটাই হয়তো বেশী কাম্য মনে করে এই কাণ্ডটি করেছে। নইলে, ও ভাবে বস্তায় পূরে, বস্তা সেলাই করে, যদি কাউকে ওপর থেকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় তা হলে সে যে আবার বেঁচে উঠতে পারে এ কথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। কাজেই তাঁরা ঘোষণা করে দিলেন এডমণ্ড সত্যি সত্যি মারা গেছে।

এর বছর দুয়েক পরে ফ্রান্সেরই একটি শহর ব্যোকেয়ারের এক সরাইখানায় একদিন এক পাদরী এসে হাজির হলেন। সরাই তখন একেবারে খালি, একটিও বাইরের লোক নেই। ভারি দুর্দিন চলছে সরাইওয়ালার। পাদরীর সাড়া পেয়ে সরাইওয়ালা,—তার নাম কাদেরুসে,—বেরিয়ে এল। পাদরী তার সঙ্গে নানা গল্প সুরু করে দিলেন। একটু পরেই সরাইওয়ালা বুঝতে পারল যে এ লোকটি তার অতীত ইতিহাস—নাড়ীনক্ষত্র সবই জানেন। কথায় কথায় এডমণ্ডের কথা উঠল। পাদরী বললেন, "ছোকরা যখন জেলে মারা যায় তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মরবার সময়েও সে আমাকে বলেছিল যে সত্যি সে কোন অপরাধ করে নি।"

সরাইওয়ালা সায় দিয়ে বলল, "সত্যি-ই তাই, আমিও তো তাই জানি। আহা, বেচারা—"

পাদরী বললেন, "সারা জীবন, এবং মৃত্যুর পরেও, তার নামে একটা মিথ্যা কলঙ্ক থেকে যাবে এটা স্বভাবতঃই সে চায় নি। তাই সে মরবার সময় আমাকে এই হীরেটা দিয়ে গিয়েছিল, আর বলেছিল এটা যেন আমি মার্সাইএ এসে বিক্রী করে সেই টাকাটা তার পাঁচজন বন্ধুকে সমান ভাবে ভাগ করে দি—যারা তার ধারণায় সত্যিই তার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। তারাই হয়তো চেষ্টা করলে তাকে ঐ মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্তি দিতে পারবে।"

"হীরে!"—কাদেরুসে অবাক্ হয়ে বলল, —"হীরে সে পেল কোথায়?"

"ওটা সে ঐ জেলেরই আর একজন বন্দীর কাছে পেয়েছিল। দু'জনে খুব ভাব হয়েছিল কিনা! সে লোকটি মুক্তি পায়। মুক্তি পাবার সময় সে ওটি তার বন্ধু এডমণ্ডকে চুপি চুপি দিয়ে যায় আর পরামর্শ দেয় সে যেন ওটা

জেলারকে ঘুষ দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এডমণ্ডকে তো জানেন, সে ও ভাবে ঘুষ দিয়ে নিজের মুক্তি আদায় করতে রাজী হয় নি; তবে হীরেটা সে নিয়েছিল আর বরাবর নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল। মরবার সময় সে ওটা বিশ্বাস করে আমার হাতে দিয়ে গেছে।"

সরাইওয়ালার চোখ লোভে চক্ চক্ করে উঠল; সে বলল, "তাই নাকি? তা সে পাঁচজন কারা?"

"একজন আপনি। আর চারজন হচ্ছে মার্সিডিস—যার সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল, তার জাহাজের সহকর্মী ড্যাংলার্স, ফার্নাণ্ড এবং তার নিজের বাবা। এডমণ্ডের বাবা, শুনলাম, বেঁচে নেই। শেষ বয়সে এক রকম অনাহারেই তাঁকে মরতে হয়েছে, দেখবার কেউ ছিল না তো! বাকি ক'জনের খবর আপনার কাছেই জানতে এসেছি।"

কাদেরুসের ততক্ষণে আহ্লাদে প্রায় বিগলিত অবস্থা। তা ছাড়া পাদরী তো তার কথা সবই জানেন দেখা যাচ্ছে। সে তখন অকপটে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। অর্থাৎ ড্যাংলার্স, ফার্নাণ্ড—যাদের এডমণ্ড পরম মিত্র বলে মনে করত তারা যে আসলে তার কত বড় শত্রু ছিল তা জানাতে দ্বিধা করল না। সরাইওয়ালার বৌ পাশের ঘর থেকে সব শুনছিল। বাইরের একজন লোকের কাছে স্বামী সমস্ত ঘরের কথা ফাঁস করে দিচ্ছে দেখে সে ইশারায় কয়েকবার বারণও করেছিল, কিন্তু কে শোনে তার কথা? কাদেরুসের চোখের সামনে তখন জ্বল্ জ্বল্ করছে সেই হীরের টুকরো, আর অনর্গল বকে চলেছে সে।

"আমিই কেবল কিছু করতে পারলাম না!" বলল কাদেরুসে,—"আর ওরা সবাই এখন এক-একজন কোটিপতি। ড্যাংলার্স্ তো জাল-জোচ্চুরি করে শেয়ারের ব্যবসায় লাল হয়ে গেছে; এখন সে নিজেই একটা মস্ত বড় ব্যাঙ্কের কর্তা। ফার্নাণ্ড গিয়েছিল গ্রীকদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে, সেখানে সে তুর্কীদের কাছে টাকা খেয়ে তাদের সব গোপনীয় খবর বলে দিয়েছে। ফলে আলি পাশা, যার দলে সে চাকরী নিয়েছিল, তার হয়েছে সর্বনাশ। আর সেই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে সে শত্রুদের কাছ থেকে পেয়েছে প্রচুর অর্থ-সম্পদ্। এখন আর সে ফার্নাণ্ড নয়—তার নাম এখন হয়েছে কাউন্ট অব্ মর্সার্ফ। এডমণ্ডের বাগ্‌দত্তা মার্সিডিসকে সে এডমণ্ডের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরেই বিয়ে করেছে—মার্সিডিস্ও তাই এখন হয়েছে কাউন্টেস্ অব্ মর্সার্ফ্।"

"আর মসিয়ঁ ভিলফোর্ট?"—পাদরী জিজ্ঞেস করলেন।

"সেও আজ ঐ রকম বিরাট ধনী। এডমণ্ডকে ধরিয়ে দেবার পরেই সে এক ধনীর কন্যা মাদামোয়াজেল সেন্ট মেরানকে বিয়ে করে মার্সাই ছেড়ে চলে যায়।"

"আর মসিয়ঁ মোরেল? তাঁর জাহাজের ব্যবসা কেমন চলছে? তিনি তো আর লোক খারাপ ছিলেন না?"

"না, তা ছিলেন না; কিন্তু দেখছেন তো, পৃথিবীতে যারা খল, যারা চতুর তারাই ভাগ্যবান্। ভগবান্ যেন তাদেরই জন্য দু'হাত ভরে টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দেন। মসিয়ঁ মোরেল ভাল লোক বলেই বোধ হয় তাঁর ওপর

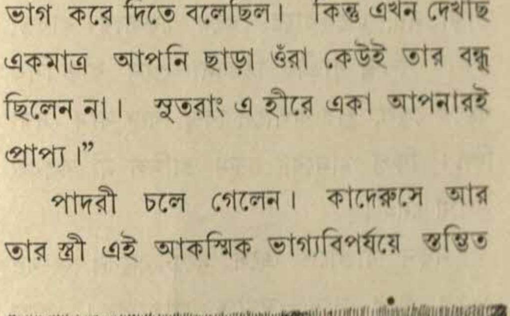
ভগবানের দয়া হয় নি। তিনি এখন সর্বহারা। পর পর কয়েকটা দুর্ঘটনায় তাঁর জাহাজের ব্যবসা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।”

পাদরী দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলেন। মনে হ'ল সমস্ত খবর শুনে তাঁর শরীর থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সে ভাব সামলে নিলেন। পকেট থেকে হীরেটা বার করে কাদেরুসের সামনে ধরে বললেন, “নিন, এ হীরেটা আপনার একারই প্রাপ্য।”

কাদেরুসে শুনে চমকে উঠল, যেন বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, “কেন মিছেমিছি ঠাট্টা করছেন?”

পাদরী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, “না। এডমণ্ড তার পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে এ হীরে-বেচা টাকা ভাগ করে দিতে বলেছিল। কিন্তু এখন দেখছি একমাত্র আপনি ছাড়া ওঁরা কেউই তার বন্ধু ছিলেন না। সুতরাং এ হীরে একা আপনারই প্রাপ্য।”

পাদরী চলে গেলেন। কাদেরুসে আর তার স্ত্রী এই আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে স্তম্ভিত



‘এ হীরে একা আপনারই প্রাপ্য।’

হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোভ মানুষের পরম শত্রু। এই লোভই হ'ল তাদের কাল। হীরেটাকে বেচবার জন্য তারা এক জহুরীকে ডেকে পাঠাল। জহুরী হীরে কিনবার জন্য প্রচুর টাকা নিয়ে হাজির হ'ল সেই নির্জন সরাইএ। সেদিনও সেখানে বাইরের কোন লোক ছিল না। কাদেরুসে ভাবল, এই তো সুযোগ। হীরেও দেব না, অথচ টাকাটাও ছাড়ব না।

বেচারা জহুরীকে খুন করে তার সব টাকা-কড়ি স্বামীস্ত্রী মিলে কেড়ে নিল।

কিন্তু ধর্মের কল কি এড়ানো যায়? শেষ পর্যন্ত কাদেরুসে ধরা পড়ল এবং বিচারে তার হ'ল প্রাণদণ্ড।

এই ঘটনার পর আরও প্রায় আট বছর কেটে গেল। হঠাৎ প্যারিসে এসে দেখা দিলেন ধনকুবের কাউন্ট অব্ মন্টেক্রিস্টো। সমস্ত শহরে ধনী-মহলে হৈ-চৈ পড়ে গেল যেন! এত বড় ধনীর কথা বড় একটা শোনা যায় না তো! তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম সম্ভব-অসম্ভব গল্পও রটনা হতে লাগল চারদিকে—সে গল্প যেন “আরব্য রজনীর” গল্পগুলোকেও হার মানায়। প্যারিসের ধনী-সমাজে কাউন্টকে কিন্তু পরিচয় করিয়ে দিল অ্যালবার্ট মর্সার্ফ—কাউন্ট অব্ মর্সার্ফের ছেলে। রোমে ওঁদের মধ্যে পরিচয় হয় আর সেই সময়ে কাউন্ট অব্ মন্টেক্রিস্টো অ্যালবার্ট আর তার বন্ধু ব্যারন্ ফ্রাঁজ দ্য এপিনেকে খুব বড় একটা বিপদ্ থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করেন।

এই ধনকুবের কাউন্টের চেহারার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে সহজে লোকে

তাঁর ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করতে পারত না। ব্যারন্ ফ্রাঁজের কেবলই মনে হ'ত কোথায় যেন এঁকে সে দেখেছে। অবশেষে, অনেক ভেবে ভেবে মনে পড়ল—একবার মণ্টেক্রিস্টো দ্বীপে একদল চোরাকারবারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। ঐ দলের সর্দার তাকে চোখ বেঁধে একটা গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। অমন বিলাস-ভবনে ব্যারন জীবনে কোন দিন ঢোকে নি। গুহার ধনসম্পদ্ দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল তার। মনে পড়ে সর্দার তাকে রূপোর গেলাসে করে একটা অদ্ভুত সুস্বাদু পানীয় খেতে দিয়েছিল—তার নাম নাকি হাশিশ্। খাবার পরেই তার চোখ ঘুমে ঢলে পড়ে আর নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে থাকে সে। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখে—কোথায় গুহা আর কোথায় সর্দার আর তার দলবল! খোলা সমুদ্রের ধারে বালির ওপর সে পড়ে আছে। কোন দিকে কোন গুহার চিহ্নমাত্র নেই! এখন মনে হচ্ছে কাউন্টের চেহারাটা যেন সেই সর্দারেরই মত। তবে কি ওরা হু'জনে একই লোক?

কিন্তু এ সব হ'ল সন্দেহের কথা। ইতিমধ্যে প্যারিসে কাউন্টের প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছে। তাঁর সম্বন্ধে আরও নতুন নতুন গল্প নিত্যই শোনা যাচ্ছে। কাউন্ট যখন অপেরায় বা ঐ রকম কোন বড় সভাসমিতিতে যান তখন প্রায় সব সময়েই তাঁর সঙ্গে একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকেও আসতে দেখা যায়। সবাই বলে মেয়েটি আসলে গ্রীক্ এবং নিশ্চয়ই রাজপরিবারের মেয়ে। নাম হাইডি। কাউন্ট অব্ মণ্টেক্রিস্টো নাকি তার অভিভাবক।

ব্যারন্ ফ্রাঁজের মত আরও একজন কিন্তু কাউন্টকে দেখে চমকে উঠেছিল। সে আর কেউ নয়, মার্সিডিস—অর্থাৎ বর্তমানে যিনি কাউন্টেস্ অব্ মর্সার্ফ। তাকে দেখে কিন্তু মণ্টেক্রিস্টোর মুখে সামান্য পরিবর্তনও দেখা যায় নি। মার্সিডিসের মনে হয়েছিল—মানুষে মানুষে এত সাদৃশ্যও থাকে? কিন্তু এডমণ্ড তো কবে মারা গেছে! তবে এ কে?

ইতিমধ্যে প্যারিসের এক শহরতলীতে একটা বিরাট বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞাপন দেখা গেল। কাউন্ট অব্ মণ্টেক্রিস্টো তাঁর স্টুয়ার্ড বার্তুসিওকে বললেন, "বাড়ীটা ভাড়া নয়, একেবারে কিনে ফেলার ব্যবস্থা কর।" কিন্তু বাড়ীর ঠিকানা শুনে বার্তুসিও থমকে গেল, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। কিন্তু মনিবের হুকুম তামিল না করেও উপায় নেই।

নতুন বাড়ীতে এসে মণ্টেক্রিস্টো এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। সঙ্গে বার্তুসিও। ক্রমে তাঁরা সিঁড়ি বেয়ে একটা বাগানে এসে হাজির হলেন। মণ্টেক্রিস্টো একটা গাছ দেখিয়ে বললেন, "দেখ তো গাছের নীচে কাউকে কবর দেওয়া হয়েছে নাকি?"

বার্তুসিও এবার কাঁপতে কাঁপতে মণ্টে-ক্রিস্টোর পায়ের তলায় বসে পড়ল। বল্ল, "হ্যাঁ, কবর খোঁড়া হয়েছিল, কিন্তু কবর দেওয়ার সময় পাওয়া যায় নি। তার আগেই—"



কাঁপতে কাঁপতে মণ্টেক্রিস্টোর
পায়ের তলায় বসে পড়ল।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকমঃ বাতু´সিওর ছিল ভিলফোর্টের ওপর ভীষণ রাগ, কারণ— একবার সে তাকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করেছিল। সে তাই সুযোগ মত প্রতিশোধ নেবার জন্য ভিলফোর্টের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াত। একদিন এইভাবে তাকে অনুসরণ করতে এসে দেখে ভিলফোর্ট গাছের তলায় একটা কবর খুঁড়েছে আর একটা ছোট ছেলেকে তার মধ্যে পুঁতবার আয়োজন করছে। শিশুটি কিন্তু মরে নি, দিব্যি জ্যান্ত রয়েছে। ভিলফোর্ট যখন নীচু হয়ে শিশুটিকে গর্তে শোয়াতে যাচ্ছিল তখন বাতু´সিও এসে পেছন থেকে তার মাথায় আঘাত করে। ফলে নিশ্চয়ই ভিলফোর্টের মৃত্যু হয়। সে অবশ্য আর সেখানে অপেক্ষা করে নি, শিশুটিকে নিয়ে পালিয়ে আসে। কিন্তু এ ঘটনা তো এক পাদরী ছাড়া আর কেউ জানেন না, মণ্টেক্রিস্টো কি করে জানলেন? শিশুটিকে অবশ্য বাতু´সিওই মানুষ করেছে— নাম দিয়েছে বেনেদেত্তো। কিন্তু আসলে সে মানুষ হয় নি, হয়েছে একটা আস্ত জানোয়ার। অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল তার প্রকৃতি, আর কোন অপরাধ করতেই তার বাধে না। সমাজে আর তার ঠাঁই হয় নি।

নিজের দুষ্কর্মের কথা স্বীকার করে বাতু´সিও একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। কাউণ্ট তাকে অভয় দিয়ে বললেন, "তোমার কোন ভয় নেই। পরের খবর তুমি জান না। ভিলফোর্ট তোমার আঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়েছিল, কিন্তু মরে নি; আর আজও সে বেঁচে আছে।"

এর পর একদিন মণ্টেক্রিস্টো প্যারিসের সমাজপতিদের তাঁর নতুন-কেনা বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে বিরাট ভোজ দিলেন। সে এমন জাঁকজমকওয়ালা ভোজ যে প্যারিসের ধন-কুবেররাও অমনটা ভাবতে পারেন নি। ভোজের পর কাউণ্ট অতিথিদের এ-ঘর ও-ঘর করে সমস্ত বাড়ীটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন।

"জানেন, এ সব পুরোনো বাড়ী সময় সময় কত রহস্যময় ব্যাপারের সাক্ষী হয়ে থাকে! ধরুন, এই যে সামনের বাগানটা দেখছেন আর ঐ যে দেখছেন গাছটা,—ওর তলায়, আমার কেমন মনে হয়,—একটি ছোট্ট শিশুকে জ্যান্ত গোর দেওয়া হয়েছিল।" বলে ভিলফোর্টের দিকে তাকালেন কাউণ্ট অব্ মণ্টেক্রিস্টো। ভিলফোর্টের মুখ পলকে শাদা হয়ে গেল। কাউণ্ট কি তা হলে সর্বজ্ঞ? কাউণ্ট এমন চমৎকার অভিনয় করলেন যে উপস্থিত অতিথিরা

সকলেই সেই রহস্যময় গাছটির দিকে সভয় কৌতূহলে তাকিয়ে রইলেন।

সেদিনকার মত ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হ'ল, কিন্তু ভিলফোর্টের মনে আর শান্তি রইল না।

ভিলফোর্ট যে ধনী-কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন সেই মাদাম্ ভিলফোর্ট ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী আগেই মারা যান কিন্তু তাঁর একটি মেয়ে ছিল। তার নাম ভ্যালেণ্টাইন। ভারী সুন্দরী সে, আর স্বভাবটাও তার ভাল, বাপের মত নয় মোটেই। ভ্যালেণ্টাইনের ইচ্ছে ছিল ম্যাক্সমিলিয়ান্ মোরেল বলে একটি ছেলেকে সে বিয়ে করে। এই ম্যাক্সমিলিয়ান্ হচ্ছে এডমণ্ডের পুরোনো মনিব সেই জাহাজ-ব্যবসায়ী মসিয়ঁ মোরেলের ছেলে। মসিয়ঁ মোরেলের অবস্থা এখন একেবারেই পড়ে গেছে, তাই ভিলফোর্টের এই বিয়েতে মোটেই আগ্রহ ছিল না। এক রকম জোর করেই সে মেয়েকে ধনী ব্যারন ফ্রাঁজ দ্য এপিনের সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে ঠিক করে। বাগ্দানও হয়ে যায়, যদিও ভ্যালেন্টাইনের ছিল এ বিয়েতে ঘোরতর আপত্তি। ম্যাক্সমিলিয়ান্ও ভ্যালেণ্টাইনকে খুব পছন্দ করত। কিন্তু তার তো আর তখন টাকার জোর নেই!

ব্যারন্ ফ্রাঁজ একদিন কথা প্রসঙ্গে ম্যাক্সমিলিয়ান্কে বলেছিল যে কাউন্ট অব্ মণ্টে-ক্রিস্টোর বহু গোপন দান আছে। বহু লোককে তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে অর্থসাহায্য করে থাকেন—দাতার নাম জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'নাবিক সিন্দবাদ'। কথাটা শুনে ম্যাক্সমিলিয়ান্ও চম্কে উঠেছিল; কেন না, তার মনে পড়ল, অল্প কিছুদিন আগে তার বাবা মসিয়ঁ মোরেলও ঐ রকম এক অজ্ঞাত দাতার কাছ থেকে অভাবিত ভাবে অর্থসাহায্য পেয়ে ভীষণ একটা বিপদ্ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। সে দাতার নামও বলা হয়েছিল 'নাবিক সিন্দবাদ'। ব্যারন্ ফ্রাঁজের মুখে সিন্দবাদের আসল পরিচয় পেয়ে সে ছুটল কাউন্ট অব্ মণ্টেক্রিস্টোর বাড়ীতে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে আর সেই থেকে হয়ে গেল তাঁর একজন পরম ভক্ত। কথায় কথায় কাউন্ট তার কাছে ভ্যালেণ্টাইনের কাহিনীও শুনলেন।

ইতিমধ্যে ড্যাংলার্স্—সেও এখন একজন ব্যারন্—হঠাৎ একটা গোপন টেলিগ্রাফ পেল শেয়ার বাজার সম্পর্কে। টেলিগ্রাফের পরামর্শ মত গোপনে লাভ করতে গিয়ে সে এমন একটা ঘা খেল যার তুলনা নেই। ফলে তার ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেল, সে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল তাকে জব্দ করার জন্যই কেউ চক্রান্ত করে ঐ টেলিগ্রাফটা করিয়েছিল। কে সে? আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। এদিকে তার মেয়ের সঙ্গে কাউণ্ট মর্সার্ফের (আসলে ফার্নাণ্ড) ছেলে অ্যালবার্ট্ মর্সার্ফের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে ছিল, আর ঠিক এই সময়েই কাউণ্ট মর্সার্ফের আলি পাশার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতার কাহিনী রাষ্ট্র হয়ে পড়ায় সে সে-বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে কাউণ্ট ক্যাভলকান্টি নামে আর এক ধনী-পুত্রের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল। ক্যাভলকান্টির পূর্ব-পরিচয় কিন্তু কেউ জানত না। কাউণ্ট অব্ মণ্টে-ক্রিস্টোই তাকে প্যারিসের ধনী-সমাজে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, কাউন্ট মর্সার্ফের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আদালত অবধি গড়াল। বিচারে অবশ্য সে খালাস হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ শেষ মুহূর্তে সাক্ষী হয়ে এল একটি ঘোমটা-পরা মেয়ে। সে এসে বলল, তার নাম রাজকুমারী হাইডি—সে আলি পাশারই মেয়ে। জজের সামনে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল--কেমন করে ফার্নাণ্ড তার বাবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুর্কীদের গোপন খবর সরবরাহ করেছিল ইত্যাদি অনেক



সাক্ষী হয়ে এল একটি ঘোমটা-পরা মেয়ে

কথা। শুধু তাই নয়, ফার্নাণ্ড যে তাকে আর তার মাকে ক্রীতদাসী হিসেবেও বিক্রী করে দিয়েছিল এবং কাউন্ট অব্ মন্টেক্রিস্টোই যে তাদের রক্ষা করেন সে খবরও বেরিয়ে পড়ল। মন্টেক্রিস্টোই এখন তার অভিভাবক।

এইভাবে ফার্নাণ্ডের পতন ঘটিয়ে মন্টে-ক্রিস্টো সেদিন গেলেন অপেরা দেখতে। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হ'ল অ্যালবার্ট মর্সার্ফ্—ফার্নাণ্ডের ছেলে। বাপের ঐ অপমান সে সহ্য করতে পারে নি, আর মন্টেক্রিস্টোই তার জন্য দায়ী বুঝে তাঁকে সে অপেরার মধ্যেই যা নয় তাই বলে অপমান করল। শেষে ঠিক হ'ল দু'জনের মধ্যে ডুয়েল লড়ে এর মীমাংসা হবে।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ কাউণ্টেস্ মর্সার্ফ্ মন্টে-ক্রিস্টোর বাড়ীতে এসে হাজির। আসলে সে তো মার্সিডিস, যার সঙ্গে এডমণ্ডের বিয়ে হতে হতেও হয় নি। আর ফার্নাণ্ড, ভিলফোর্ট—এরা সবাই মিলে চক্রান্ত করে যে এডমণ্ডকে সরিয়ে দিয়েছিল আর তাকে মিথ্যা করে বুঝিয়েছিল যে এডমণ্ড মারা গেছে—তাও এত দিনে তার বুঝতে বাকি নেই।

মার্সিডিস মন্টেক্রিস্টোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "এডমণ্ড, আর কেউ তোমাকে চিনতে পারুক আর নাই পারুক, আমাকে তুমি ঠকাতে পার নি। তুমিই যে সেই এডমণ্ড তা আমি প্রথম দিন তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরে-ছিলাম। কিন্তু যা হয়ে গেছে তার তো আর কিছু করার নেই! তোমার কাছে আজ আমি শুধু একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি। আমার ছেলে অ্যালবার্ট তার বাপের অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে তোমাকে ডুয়েল লড়াইএ আহ্বান করেছে। তুমি কথা দাও, তাকে মেরে ফেলবে না। তোমার সঙ্গে লড়াই হলে সে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না।"

মন্টেক্রিস্টো স্থিরভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "বেশ, তোমার কথাই রাখব। আমার মৃত্যুতে নিশ্চয়ই পৃথিবীর কারো কিছু এসে যাবে না।"

"তুমি মরবে! কেন, তা তো আমি বলি নি!"

"বল নি, কিন্তু ঐ ব্যাপারের পরেও—একটা ছোট ছেলে,—প্রায় বালকই বলা যায় যাকে—

তার কাছে অমন ভাবে প্রকাশ্যে অপমানিত হয়েও আমি যদি তাকে ক্ষমা করে ডুয়েল না লড়ি তা হলে কি আমার মানসম্ভ্রম বলে কিছু থাকবে ? তার পরেও কি আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ?"

"আত্মহত্যা ? না—না—না ! আমি সে কথা বলি নি, ভাবতেও পারি না অমন কথা।" —আকুল কণ্ঠে বলে উঠল মার্সিডিস্।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডুয়েল হ'ল না। অ্যালবার্ট হয়তো মা'র কাছে সব কথা শুনে থাকবে, সে প্রকাশ্য সভায় কাউন্ট অব্ মন্টেক্রিস্টোর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল।

কাউন্ট মার্সার্ফ অর্থাৎ ফার্নাণ্ড কিন্তু ব্যাপারটায় মোটেই খুসী হ'ল না। সে সরাসরি মন্টেক্রিস্টোর বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল, বলল, "ছেলে যদি ভয় পায় তবে বাপকেই আসতে হয় লড়াই করতে।"

মন্টেক্রিস্টো হেসে বললেন, "খুব ভাল কথা। আপনি কি তৈরী হয়ে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ, তৈরী হয়েই এসেছি। আর এ ডুয়েলে সাক্ষীরও কোন দরকার দেখি না, কারণ আমাদের মধ্যে পরিচয় এত কম—"

বাধা দিয়ে মন্টেক্রিস্টো বললেন, "না, সাক্ষীর দরকার করে না ; তবে পরিচয় কম বলে নয়, পরিচয় খুব বেশী বলে।"

"তার মানে ?"

"তার মানে কাউন্ট মর্সার্ফ্ নিজেই জানেন। কারণ এক সময় তাঁর নাম ছিল ফার্নাণ্ড,— ওয়াটারলুর যুদ্ধের আগেভাগে যিনি পলায়ন করেছিলেন, তার পর স্পেনে যিনি গুপ্তচরের কাজ করতেন আর শেষ পর্যন্ত অন্নদাতা



তুমি কে ?

আলি পাশার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যিনি তুর্কীদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থলাভ করেছিলেন আর যার ফলে সেই আলি পাশাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এই সবের জন্যেই তো সেই অখ্যাত ফার্নাণ্ড আজ লেফ্টেনাণ্ট জেনারেল কাউন্ট মর্সার্ফ্ হতে পেরেছেন। কেমন, ঠিক কিনা ?"

মর্সার্ফ্ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, "কে তুমি ? তোমার সত্যিকার নাম বল। তোমার বুকে তলোয়ার বসাবার সময়ে সে নামটাই না হয় আমি উচ্চারণ করব।"

"বলব বৈ কি! একটু দাঁড়াও ফার্নাণ্ড!" বলে মন্টেক্রিস্টো পাশের ঘরে চলে গেলেন। একটু পরেই দেখা গেল তাঁর পরনে পুরোপুরি নাবিকের বেশ—ঠিক যখন জাহাজে কাজ করতেন তখন যেমন পোষাক পরতেন তিনি। সে মূর্তি দেখে ফার্নাণ্ড পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেল।

(গল্পের শেষাংশ পরে দেওয়া হ'ল।)

দেশ বিদেশের ছড়া

ইংরেজী ছড়া



জ্যাক্ জিল্ দুই জন হাত ধরে ভাইবোন
জল নিতে পাহাড়েতে চড়লো,
জ্যাক্ পড়ে উল্‌টে, জিল্ তাকে তুল্‌তে
গড় গড় গড়িয়ে যে পড়লো।



ভ্যা ভ্যা কালো ভেড়া,
লোম তোর কই ?
হ্যাঁ মশাই, রাখা আছে
তিন ঝুড়ি ওই।
এক ঝুড়ি দাদা নেবে,
আর ঝুড়ি ছেলে,
আর নেবে ও-পাড়ার
খোকাবাবু এলে।



হিগ্‌লেডি পিগ্‌লেডি
মুরগীটা যে কালো,
ভদ্রলোক খাবেন বলে
ডিম পেড়েছে ভালো।
নয়টা ডিম দশটা ডিম—
ডিমের ঝুড়ি ঢালো ;
হিগ্‌লেডি পিগ্‌লেডি
মুরগীটা যে কালো।



ছোট্ট আমি, নই কো মোটা,
দেখতে আমি মিঠে—
মিষ্টি খেতে ভালবাসি
পায়েস, পুলি-পিঠে।
চাখতে যদি দাও গো কিছু
সবটা খেলে তবে,
বড্ড মজা হবে রে ভাই,
বড্ড মজা হবে।

ফুটফুটে ছোট মেয়ে শোনো পরিচয়—
মাঠে আসে ভেড়া নিয়ে মিঠে কথা কয়।
মজা করে কেউ বলে, "এই দিকে যাও,"
কেউ বলে, "কোন্ দিকে যেতে তুমি চাও?"
"ফিরে যাও, ফিরে যাও,"—যেই সবে বলে
ছোট ছোট খুদে ভেড়া খুট্ খুট্ চলে।





ফরাসী ছড়া

ভাইটি আমার কোলিন সোনা,
বন্ধ করো কান্না;
চুপ্ চুপ্ চুপ্—আর না।
ওপরতলায় জান না মা
কেক করেছেন ধামা ধামা,
আরও হরেক রান্না ;
বন্ধ করো কান্না।
নীচের তলায় বাবা বানান
চকোলেট সে রকম নানান্,
হিসেব তবু পান না ;
বন্ধ করো কান্না।
ভাইটি আমার কোলিন সোনা,
চুপ্ চুপ্ চুপ্—আর না ;
বন্ধ করো কান্না।



বিশ্বসাহিত্যের কথা

সাহিত্য বলতে কি বুঝি

এর আগে আমরা ভাষা ও লিপি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। মনের ভাব অপরকে বুঝিয়ে বলার জন্যই ভাষার সৃষ্টি। নানা ভাব, নানা অভিজ্ঞতা মানুষের মনে জমে ওঠে আর সেইগুলিই সে নানাভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে অপরকে জানাতে ভালবাসে। এই ভাবেই নাকি সাহিত্যের সৃষ্টি। 'সাহিত্য' শব্দটির ব্যাকরণগত অর্থও ঐ রকম। 'সহিতের ভাব' অর্থাৎ মিলন। একের মনের ভাবের সঙ্গে অপরের মনকে মিলিত করাই হচ্ছে সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

কিন্তু মুখের কথা তো বেশী দিন ধরে রাখা যায় না! মানুষের স্মৃতিশক্তি যতই প্রখর হোক না কেন, কোন-না-কোন দিন তা হারিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। তাই মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টি হবার পর মানুষ তাকে পাকাপাকি ভাবে ধরে রাখবার জন্য কি করে লেখার চলন সুরু করল সে কাহিনীও তোমরা কিছু কিছু পড়েছ। ঐই লিখিত সাহিত্যকেই আমরা সত্যিকার সাহিত্য বলতে পারি—যদিও লেখার চলন হবার আগে পৃথিবীর নানা দেশে মুখে মুখেও কম সাহিত্য রচিত হয় নি।

তুনিয়ায় সব মানুষেরই স্বভাব মোটামুটি প্রায় একই রকম। সে জন্য কোন সত্যিকার ভাল রচনা বা সাহিত্য শুধু যে ভাষায় লেখা সেই ভাষার মধ্যেই আটকে থাকে না—আর পাঁচটি দেশের লোকও তা পড়ে আনন্দ পায়, —হাসে, কাঁদে, নিজেদের অন্তরের কথা খুঁজে পায় তার মধ্যে। এই রকম সাহিত্যকে আমরা বলি বিশ্বজনীন সাহিত্য বা সংক্ষেপে 'বিশ্বসাহিত্য'।

আদি সাহিত্য—বেদ

ওপরের গুণাগুণ দিয়ে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, আজ অবধি যত বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে বিশ্বজনীন সাহিত্য বা বিশ্ব-সাহিত্যের সংখ্যা খুব বেশী নয়। সকলের আগে যে বইখানিকে এই সাহিত্যের মধ্যে ধরা হয় সেটি হ'ল আমাদেরই বেদ। এটিকে সবার আদি সাহিত্যও বলা যেতে পারে। অবশ্য বেদ যখন রচিত হয় তখনও লিখিত

সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নি—বেদও মুখে মুখেই রচিত, হয়েছিল এবং শুনে শুনেই ঋষিরা তা মুখস্থ করে নিয়ে শিষ্য পরম্পরায় প্রচার করে গিয়েছিলেন। সেজন্য এর আর এক নাম "শ্রুতি"।

বেদ কি ভাবে রচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে পুরাণে একটি গল্প আছে।



ব্রহ্মা…আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন।

একদিন আদিপুরুষ ব্রহ্মা যোগাসনে বসে আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন, এমন সময়ে তাঁর হৃদয়ে অস্ফুট নাদধ্বনি হ'ল। পরে তাই থেকে প্রণব এবং সেই প্রণব থেকে বেরিয়ে এল স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণরাশি। ব্রহ্মা সেই বর্ণগুলি একত্র করে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করলেন। তাই হ'ল বেদ। অর্থাৎ বেদ কোন মানুষের রচনা নয়—স্বয়ং ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাই বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়।

পুরাণে অনেক ঘটনাকেই এই ভাবে কোন-না-কোন দেবতার সঙ্গে জড়িয়ে অলৌকিক ভাবে দেখান হয়েছে, হয়তো লোকের শ্রদ্ধা বাড়াবার জন্যই। তবে ঐতিহাসিকদের মতে আর্য ঋষিরা যখন প্রথম ভারতে এসে সিন্ধু নদের ধারে বসতি স্থাপন করলেন তখন ওখানকার সৌন্দর্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন এবং প্রকৃতির এক-একটি রূপকে দেবতা বলে ধরে নিয়ে যাগ-যজ্ঞের সাহায্যে তাঁদের আরাধনা করতে সুরু করেন। এই সময়ে তাঁরা সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক শক্তি উপলব্ধি করতে থাকেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সামনে খুলে যায় সত্যের নানান্ রূপ। যাঁদের সামনে সৃষ্টিকর্তার সেই অসাধারণ শক্তি আর সত্যের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল তাঁদের বলা হ'ত ঋষি এবং যে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তাঁরা তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করেছিলেন তারই নাম বেদ।

বেদ কথাটি এসেছে 'বিদ্' ধাতু থেকে। বিদ্ ধাতু মানে জানা। অর্থাৎ যে সাহিত্যে জ্ঞানের নানা বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তাই হ'ল বেদ।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা অবশ্য 'বেদ' শব্দটির অর্থ নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন এবং নানা ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন, যা দিয়ে ধর্ম জানা যায় বা লাভ করা যায় তাই হ'ল বেদ। কেউ বলেছেন, যা থেকে কিসে আমাদের ইষ্টলাভ হবে, কি করলে আমরা অনিষ্ট এড়িয়ে যেতে পারব—এই সবের উপায় আমরা জানতে পারি তাই হ'ল বেদ। কেউ বলেছেন, প্রত্যক্ষ ভাবে বা অনুমান করেও

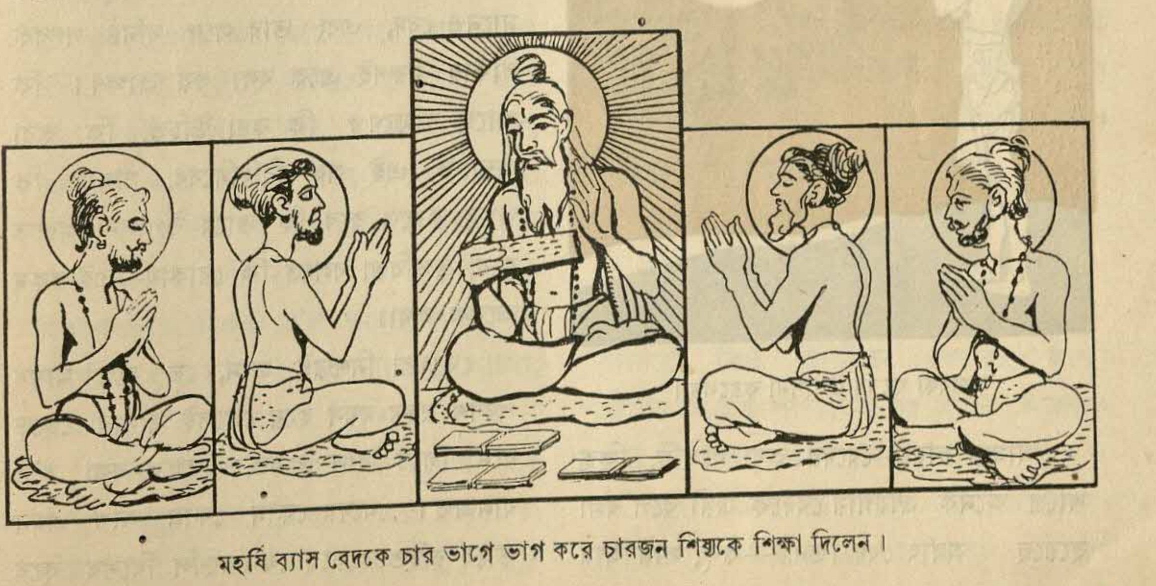
যা জানা যায় না—বেদের সাহায্যে তা আমরা জানতে পারি, তাই এর নাম বেদ। এ রকম আরও নানা রকম অর্থ করেছেন নানা জনে। এঁদের মধ্যে সায়ণাচার্যের টীকা বা ভাষ্যই হচ্ছে সব চেয়ে নামকরা।

যাই হোক, এ সব থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে পরম সত্য কি সে সম্বন্ধে ঋষিদের চিন্তার ফলে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল তাই হচ্ছে বেদ।

চতুর্বেদ বলে কেন

বেদের কোন কোন অংশ ছন্দোবদ্ধ স্তব বা স্তোত্র দিয়ে রচিত হয়েছিল, আবার কোন কোন অংশ রচিত হয়েছিল গান দিয়ে। তা ছাড়া গদ্যে রচিত মন্ত্র দিয়েও এর কিছু কিছু অংশ রচিত হয়। মহর্ষি ব্যাস যজ্ঞে ব্যবহার করবার জন্য এই বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র সংকলন করে চারটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বেদকে ভাগ করেন। বেদের যে সব অংশ বা মন্ত্র স্তোত্র বা ছন্দোবদ্ধ ভাবে রচিত হয়েছিল সেগুলি একত্র করে তৈরী হ'ল ঋক্‌বেদ। যজ্ঞের সময় যজ্ঞের হোতা ও তাঁর সঙ্গীরা এই ঋক্‌মন্ত্র বা স্তোত্র আবৃত্তি করে দেবতাদের স্তব করতেন এবং তাঁদেরকে যজ্ঞে আহ্বান করতেন। বেদের যে অংশ গান দিয়ে রচিত হয়েছিল সেগুলি একত্র করে তৈরী হ'ল সামবেদ। ঋষিরা—বিশেষ করে যজ্ঞের উদ্গাতা এবং তাঁর সঙ্গীরা যজ্ঞের সময় এই মন্ত্রগুলি গান করতেন। অমনি ধারা গদ্যময় মন্ত্রগুলি একত্র করে তৈরী হ'ল যজুর্বেদ। যজ্ঞে আহুতি দেবার সময় অধ্বর্যু ও তাঁর সহকারীরা এই যজুর্মন্ত্র ব্যবহার করতেন। এ ছাড়া আর যে সব মন্ত্র সেগুলি সংকলন করে তৈরী হ'ল অথর্ব বেদ। তা হলে বেদ হ'ল চার রকম। মহর্ষি ব্যাস বেদকে এই ভাবে ভাগ করেছিলেন বলে তাঁকে বলা হয় বেদব্যাস।

বেদব্যাসের চার শিষ্য। পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি আর সুমন্তু। গুরু এই চার শিষ্যের



মহর্ষি ব্যাস বেদকে চার ভাগে ভাগ করে চারজন শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন।

প্রথম জনকে ঋক্‌বেদ, দ্বিতীয় জনকে যজুর্বেদ, তৃতীয় জনকে সামবেদ এবং চতুর্থ জনকে অথর্ব বেদ শিক্ষা দিলেন। বৈশম্পায়নের এক শিষ্য ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি গুরুর কাছে যজুর্বেদ শিক্ষা করে নিজের ওপর অত্যধিক আত্ম-বিশ্বাসের ফলে সে বিদ্যা ত্যাগ করেন। বলা বাহুল্য গুরুও তাঁকে পরিত্যাগ করেন। পরে যাজ্ঞবল্ক্য, হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পেরেই, সূর্যের উপাসনা করে তাঁকে তুষ্ট করে আবার সেই বেদবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাকি যাজ্ঞবল্ক্যের পরিত্যক্ত যজুর্বেদকে কৃষ্ণ যজুর্বেদ এবং নতুন-করে-শেখা যজুর্বেদকে শুক্ল যজুর্বেদ বলা হয়ে থাকে।



যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যের উপাসনা করলেন।

আমরা চারটি বেদের কথা বলেছি, কিন্তু শাস্ত্রে অনেক জায়গায় বেদকে ত্রয়ী বলে বলা হয়েছে অর্থাৎ বেদ তিনটি—ঋক্, সাম আর যজুঃ। এ থেকে কারও কারও ভুল ধারণা আছে যে অথর্ব বেদ সত্যিকার বেদ নয়। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। অথর্ব বেদে যে সব মন্ত্র আছে তা যজ্ঞে ব্যবহার করা হ'ত না বলেই ওকে ত্রয়ীর সঙ্গে যোগ করা হয় নি।

বেদের আরও নানা ভাগ

প্রতিটি বেদে আবার দু'টি করে বিভাগ আছে—'মন্ত্র' আর 'ব্রাহ্মণ'। মন্ত্রকে 'সংহিতা'ও বলা হয়, কারণ মন্ত্রগুলি সম্‌হিত বা একত্র করে সাজানো হয়েছিল। এই সম্‌হিত কথাটা থেকেই সংহিতা কথাটি এসেছে। 'ব্রাহ্মণ' বলতে কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণের ব্রাহ্মণ মনে ক'র না। এ ব্রাহ্মণ আলাদা। আসলে বেদের যে অংশে তার অপ্রকাশিত অর্থ ভালো করে বোঝানো হয়েছে, সংহিতার প্রয়োগ দেখানো হয়েছে—তারই নাম দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম (ন্) শব্দের মানেও বেদ, এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার দরুণই একে বলা হয় ব্রাহ্মণ। কি আছে ব্রাহ্মণে? কি করা উচিত, কি করা অনুচিত এই সব বিধিনিষেধ, যাগযজ্ঞ কি ভাবে করতে হবে, কি ভাবে উপাসনা করতে হবে, ব্রহ্মবিদ্যা বলতে কি বোঝায়—এই রকম অনেক কথা।

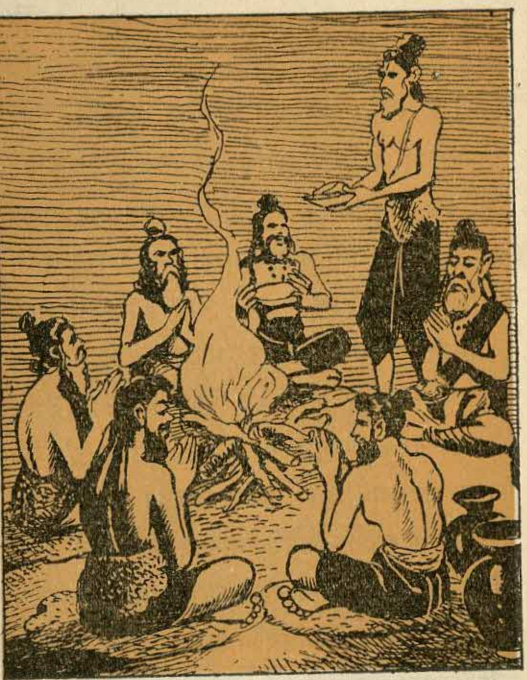
তোমরা নিশ্চয়ই জান, সে যুগে মানুষ পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেলেই সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করত। তাকে বলা হ'ত বানপ্রস্থ। বেদের কোন কোন অংশ এমন ভাবে রচিত হয়েছে যে সেগুলি বিশেষ করে

এই বনে অর্থাৎ অরণ্যে বসে চর্চা করবার উপযোগী। তাই এই অংশগুলোকে বলা হয় 'আরণ্যক'। বনে গিয়ে তো আর লোকে যাগযজ্ঞের দিকে বেশী নজর দিতে পারে না —তখন মন চায় আরও উচ্চতর এবং দুরূহ তত্ত্বের কথা জানতে, আপন মনে ধ্যান বা উপাসনা করতে। আরণ্যক তাই অনেকটা সেই ভাবেই রচিত।

এ ছাড়া আরও একভাবে বেদকে ভাগ করা যেতে পারে—মোটামুটি দু'টি ভাগে। কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড। অবশ্য এ দু' নামে কোন আলাদা বই নেই। সমস্ত বেদেই এই দুই অংশ, অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞানের আলোচনা, দেখতে পাওয়া যায়। কর্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞের বিধি এবং নানা রকম লৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথাই বিশেষ করে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে আছে আরও উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক সব আলোচনা।

বেদের আর একটি বিষয়কে বলা হয় সূত্র। এক কথায় একে বলা যেতে পারে জ্ঞানলাভের বিধি। এই সূত্রকে আবার ছ'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ আর কল্প। শিক্ষা হ'ল স্তোত্রগুলি বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করার রীতি, ছন্দ হ'ল স্তোত্র রচনার ভঙ্গী, ব্যাকরণ হ'ল শুদ্ধ ভাবে প্রকাশপদ্ধতি, নিরুক্ত হ'ল শব্দের অর্থব্যাখ্যা, জ্যোতিষ হ'ল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আলোচনা, আর কল্প হ'ল যাগযজ্ঞের বিধান।

বেদের খানিকটা মোটামুটি পরিচয় শুধু এখানে দেওয়া হ'ল, কিন্তু ভেতরের সব কথা বুঝিয়ে বলা এখানে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু



যজ্ঞের সময় ঋষিদের বেদমন্ত্র গান

বলা যেতে পারে, যে, যে সব গূঢ় তত্ত্ব অপূর্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে এতে প্রকাশ করা হয়েছে তার কথা ভাবলে এই এত দিন পরেও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। অথচ সেই কোন্ অতীত যুগে আর্য ঋষিরা এই সব সত্য উপলব্ধি করে গেছেন! এই কারণেই আজও তাঁদের বলা হয় সত্যদ্রষ্টা।

উপনিষদের কথা

বেদের পরেই আসে উপনিষদের কথা। আসলে কিন্তু উপনিষদ্ বেদেরই অংশ। বেদের প্রতিটি শাখাতেই বহু ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ্ (বা উপনিষৎ) ছড়িয়ে আছে।

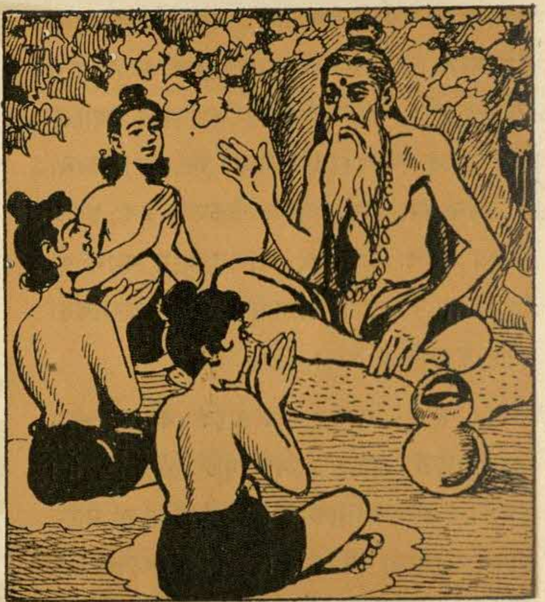
উপনিষৎ শব্দের আসল অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। কথাটা কি ভাবে এসেছে বলে নেই। ব্যাকরণ

দিয়ে বোঝাতে গেলে বলতে হয়—উপ ও নি পূর্বক সদ্ ধাতুর সঙ্গে ক্বিপ্ প্রত্যয় যোগ করে শব্দটি তৈরী হয়েছে। 'উপ' বলতে খুব তাড়াতাড়ি বা কাছাকাছি এই রকম বোঝায়। 'নি' শব্দটিতে নিশ্চয় অর্থ বোঝাচ্ছে। সদ্ ধাতুর অর্থ হচ্ছে আল্‌গা করে দেওয়া। এ ছাড়া গতি, প্রাপ্তি এবং বিনাশ—এও বোঝায়। তা হলে উপনিষদের ব্যাকরণগত মানে হচ্ছে একান্ত ভাবে নিশ্চয়তার সঙ্গে যে বিদ্যা খুব তাড়াতাড়ি জগতের রহস্য আল্‌গা করে দেয়। আরও দু'-তিন ভাবে এর অর্থ করা যেতে পারে। যে বিদ্যার সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চিত ভাবে নিজেকে নিজের কাছে পাওয়া যায় অর্থাৎ নিজের স্বরূপ জানা যায়, কিংবা যে বিদ্যা তাড়াতাড়ি নিশ্চিত ভাবে সমস্ত বন্ধন বিনাশ করে দেয়।

উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদের অন্ত। এই নামকরণেরও একটা কারণ আছে। বেদের শেষ যে জ্ঞানকাণ্ড তাই হচ্ছে উপনিষদ্। কিংবা বেদের শেষ লক্ষ্য বা শেষ সিদ্ধান্ত যে শাস্ত্রে সংকলন করা হয়েছে তাকেই বলা যেতে পারে বেদান্ত (বেদ + অন্ত = বেদান্ত)।

উপনিষদ্ অনেকগুলি

উপনিষদ্ অনেকগুলি। ঈশ, কেন, কঠ, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর ইত্যাদি। সত্যি কথা বলতে গেলে, উপনিষদের সঠিক সংখ্যা ঠিক করা কঠিন। বেদের সময় থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কালেও অনেক সম্প্রদায় তাঁদের নিজের নিজের শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করে তাকে উপনিষদ্ নামে অভিহিত করেছেন। এমন কি মুঘল সম্রাট্



ঋষিবালকেরা গুরুর কাছে উপনিষদের কাহিনী শুনছে।

আকবরের আমলেও আল্লার নামের সঙ্গে জড়িয়ে "অল্লোপনিষদ্" নামে একখানি উপনিষদ্ রচিত হয়েছিল।

যাই হোক, অধিকাংশ উপনিষদ্ই যে অতি প্রাচীন কালে রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে যে সব আলোচনা আছে তা আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়ে এত উঁচুস্তরের যে আজও সমস্ত সভ্য জগৎ তা পড়ে বিস্ময় দমন করতে পারেন না। শুধু সাহিত্যের দিক্ থেকেই নয়, দর্শন শাস্ত্র (যাকে ইংরেজীতে আমরা বলি 'ফিলজফি') হিসেবেও এর সমকক্ষ বই পৃথিবীতে অল্পই রচিত হয়েছে।

উপনিষদে কি আছে

উপনিষদে কি আছে? আছে নানা রকম দার্শনিক আলোচনা—এই জগৎ কেমন করে

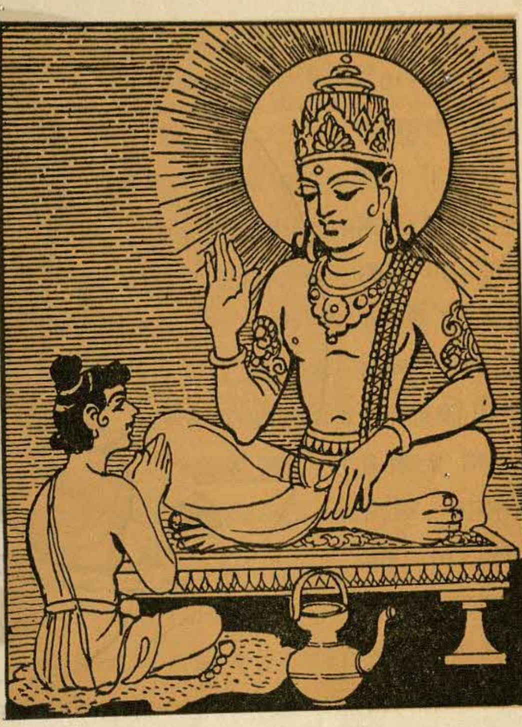
সৃষ্টি হ'ল, ঈশ্বর আছেন তা জানব কেমন করে, মানুষের সুখদুঃখের কারণ কি এবং তা থেকে মানুষ কি করে মুক্তি পেতে পারে ইত্যাদি। এ ছাড়া পরলোকের কথাও নানা ভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে অনেক উপনিষদে। এ সব আলোচনা হাজার হাজার বছরের পুরোনো হলেও তা এতই সুন্দর যে আজও পণ্ডিতেরা তা পড়ে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। অনেক উপনিষদে এমন সব দার্শনিক কথা আছে আজও মানুষের জ্ঞান যার চেয়ে বেশী এগোয় নি। এমন অনেক তত্ত্বকথা আছে যা, মনে হয়, মানুষের চিন্তার শেষ কথা। তার পর আর ভাবা যায় না।

উপনিষদ্‌কে দর্শনের সঙ্গে সাহিত্যও বলেছি। সত্যিই সাহিত্য। এতে অসংখ্য ছোট ছোট গল্পও আছে—যার ভিতর দিয়ে ঋষিরা তাঁদের বক্তব্য সহজ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ রকম একটি গল্প শোন। কঠোপনিষদে নচিকেতার কাহিনী।

নচিকেতার কাহিনী

নচিকেতার বাবা ঋষি উদ্দালক বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞ শেষ করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি দান করে দিলেন। দানের শেষে দক্ষিণা দিলেন একপাল গরু। পিতা সবই দিয়ে দিচ্ছেন দেখে নচিকেতা বললেন, "বাবা, সবই তো দান করে দিলেন, তা আমাকে কাকে দান করলেন ?"

ছোট ছেলের কথায় ঋষি প্রথমে কোন জবাব দিলেন না। বার বার ছেলে জিজ্ঞাসা করায় ঋষি বিরক্ত হয়ে এক সময় বলে ফেললেন—"তোমাকে দান করেছি যমকে।"

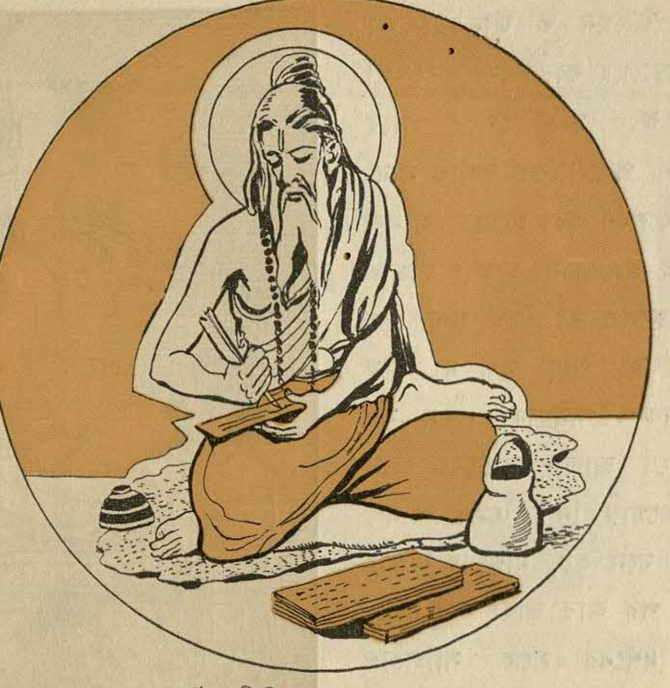


যম ও নচিকেতা

ঋষিবাক্য তো মিথ্যা হবার নয়! পুত্র নচিকেতা বিশ্বজিৎ যজ্ঞের শেষ দান হলেন। নচিকেতা এলেন যমের বাড়ী। যম বাড়ী ছিলেন না। তিন দিন নচিকেতা তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। চতুর্থ দিনে যমরাজ ফিরলেন। তিন দিন ব্রাহ্মণবালক উপবাসী হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে তিনি দুঃখিত হলেন, বললেন,—"তুমি কি চাও বল, আমি তোমাকে তিনটি বর দেব।" নচিকেতা তিনটি বর চাইলেন। প্রথম বরে তিনি আবার পিতৃগৃহে ফিরে যাবেন। দ্বিতীয় বরে কি ভাবে যজ্ঞ করলে যজ্ঞ সফল হয় ও যজ্ঞকারী স্বর্গে যেতে পারে তা জেনে নিলেন। আর তৃতীয় বরে জেনে নিলেন আত্মার কথা। দেহ নষ্ট হলেও আত্মা থাকে। ঋষিরা সত্যপালন

করে ও তপস্যা করে, এই আত্মাকে বুঝতে পারেন। এই আত্মজ্ঞান জেনে নিয়ে নচিকেতা যমরাজকে প্রণাম করে বাড়ী ফিরলেন।

আত্মজ্ঞান দর্শনের কঠিন তত্ত্বকথা। সেই সম্পর্কে বোঝানোর জন্যই এই নচিকেতার গল্প।



মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনায় ব্যস্ত

এদেশের মহাকাব্য

এদেশের মহাকাব্য বলতে রামায়ণ এবং মহাভারত। দু'খানিই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তখনকার দিনে সংস্কৃতই ছিল ভারতের সর্বজনীন ভাষা। রামায়ণ লিখেছিলেন মহর্ষি বাল্মীকি। প্রথম জীবনে ইনি নাকি রত্নাকর নামে এক দস্যু ছিলেন,—নিরীহ মানুষকে হত্যা করে তার সর্বস্ব লুঠে নিয়ে সংসার চালাতেন। শেষে দেবর্ষি নারদের উপদেশে ইনি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে বহু বছর তপস্যা করলেন। ব্রহ্মার আশীর্বাদে সিদ্ধিলাভ করে দস্যু রত্নাকর হলেন মহর্ষি বাল্মীকি।

একদিন মহর্ষি নদীতে স্নান করতে নামছেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল সামনে গাছের ওপর দু'টি ক্রৌঞ্চ (কোঁচ বক) খেলা করছে। সহসা কোথা থেকে এক ব্যাধ এসে তার একটিকে তীরবিদ্ধ করল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ক্রৌঞ্চটি তখনই মরে গেল। অপর পাখীটি সেই শোকে কাতর ভাবে ডাকতে লাগল। বাল্মীকির চোখে জল এল। ব্যাধকে তিনি বললেন—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীসমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

এর ভাবার্থ হচ্ছে—ওরে ব্যাধ, তুই কি নিষ্ঠুর, তোর প্রাণে কি এতটুকু দয়ামায়া নেই যে দু'টি ক্রৌঞ্চের একটিকে তুই এ ভাবে হত্যা করলি! জীবনে তোর যেন কোন দিন প্রতিষ্ঠা না হয়।

নিজের বাণী শুনে পরক্ষণেই মহর্ষি নিজেই চমকে উঠলেন। আমার মুখ থেকে এ কি বেরুল!

এমন সময় আকাশ থেকে দৈববাণী হ'ল—তুমি যা উচ্চারণ করলে তারই নাম শ্লোক অর্থাৎ কবিতা। এইভাবে শ্লোক দিয়েই তুমি রামচরিত রচনা কর।

ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখে কাতর বাল্মীকির মুখ

থেকে বেরিয়ে-আসা এই দু'টি পংক্তিই নাকি জগতের প্রথম কবিতা। শোক থেকে এর উৎপত্তি বলে এর নাম হ'ল শ্লোক।

মহর্ষি বাল্মীকি এই রকম শ্লোকের পর শ্লোক লিখে বিরাট সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করলেন।

রামায়ণের গল্প

রামায়ণ অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের কাহিনী।

পুরাকালে সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নামে এক সুন্দর নগর ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন দশরথ। তাঁর তিন রাণী ও চার ছেলে। বড় রাণী কৌশল্যার ছেলে শ্রীরামচন্দ্র সকলের বড়। তাঁর হাতে রাজ্যভার দিয়ে দশরথ অবসর নেবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু রামের অভিষেকের দিনে মেজ রাণী কৈকেয়ী রাজার কাছ থেকে দু'টি বর চেয়ে বসলেন,— "আমার ছেলে ভরতকে রাজা করুন আর রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠিয়ে দিন।"

রাণী কৈকেয়ী একবার অসুখের সময়ে রাজাকে সেবা করে সুস্থ করেছিলেন। তখন রাজা দশরথ তাঁকে দু'টি বর দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এখন রাণী সেই বর দু'টি চেয়ে বসলেন।

আসলে কিন্তু কৈকেয়ী অতটা মন্দ ছিলেন না। সপত্নীপুত্র রামকে তিনি ভালও বাসতেন। কিন্তু তাঁর বাপের বাড়ীর এক দাসী মন্থরার কুমন্ত্রণায় তিনি এই কাজ করে বসলেন।

রাজা দশরথকে প্রতিজ্ঞা রাখতে হ'ল।

শ্রীরামচন্দ্র বনে চলে গেলেন। সঙ্গে গেলেন স্ত্রী—জনক রাজার কন্যা সীতা, আর ভাই লক্ষ্মণ— ছোটরাণী সুমিত্রার ছেলে। রাজা দশরথ মনে বড় কষ্ট পেলেন, এবং সেই দুঃখেই তিনি মারা গেলেন।

কৈকেয়ীর পুত্র ভরত ছিলেন মামার বাড়ী। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই তিনি ছুটে এলেন। রাজাহীন রাজ্য চলবে কেমন করে? ভরত গেলেন বনে, রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে এনে সিংহাসনে বসাবেন। কিন্তু রামচন্দ্র ফিরলেন না। পিতা চৌদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠিয়েছেন। পিতা নেই কিন্তু তাঁর কথা তো আছে! ভরত বড় ভাইকে খুব ভক্তি করতেন। অনেক পীড়াপীড়ি করেও যখন রামকে ফেরাতে পারলেন না তখন বললেন, "তা হলে তোমার খড়ম দু'টি খুলে দাও। ওদেরই আমি সিংহাসনে বসাব, আর তুমি না ফেরা পর্যন্ত তোমার হয়ে রাজ্য চালাব।"

রামের পাদুকা মাথায় নিয়ে ভরত ফিরে এলেন। সেই খড়ম দু'টি সিংহাসনে রেখে দাদার নামে তিনি রাজ্য চালাতে লাগলেন।

এদিকে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণ ভারতে এসে পৌঁছলেন। গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটী বনে যখন তিনি বাস করছেন সেই সময়ে লঙ্কার রাজা রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে এসে সীতাদেবীকে চুরি করে নিয়ে গেলেন। সীতাকে তিনি লঙ্কার অশোক-বনে বন্দী করে রাখলেন।

সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যায় এলেন। বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের দেখা হ'ল। সুগ্রীব তখন বনবাসী। সুগ্রীবের বড় ভাই বালী। কিন্তু দু'জনে ঘোরতর শত্রুতা। বালীকে বধ করে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে সিংহাসনে বসালেন। বন্ধুত্ব পাকা হ'ল।

বানরেরা এবার সীতার সন্ধান করতে সাহায্য করল। সুগ্রীবের অনুচর হনুমান একলাফে সাগর ডিঙ্গিয়ে লঙ্কা থেকে সীতার খবর এনে দিল। রামচন্দ্র বানর সেনার সাহায্যে সমুদ্রে সেতু বাঁধলেন,



স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে রামচন্দ্র বনে গেলেন।

তারপর সেই সেতু দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে ঐ বানর সেনা নিয়েই লঙ্কা আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'ল। কিন্তু রাবণ পারল না। রাবণকে বধ করে রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করলেন।

ইতিমধ্যে চৌদ্দ বছর কেটে গেছে। এবার রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজা হলেন।

কিন্তু প্রজারা বলল, "সীতাদেবী এতদিন রাক্ষসের ঘরে বন্দী ছিলেন, তাঁকে আমরা রাণীর সম্মান দিতে পারব না।"

রামচন্দ্র মনে অত্যন্ত কষ্ট পেলেন, কিন্তু প্রজা-রঞ্জক রাম প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইলেন না। তিনি সীতাকে আবার বনবাসে পাঠালেন। লক্ষণ সীতাদেবীকে রেখে এলেন তমসা নদীর তীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে।

সেই আশ্রমে সীতাদেবীর দু'টি ছেলে হ'ল। যমজ ছেলে—লব আর কুশ।

দেখতে দেখতে আঠারো বছর কেটে গেল। শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে চাইলেন। পত্নী ছাড়া যজ্ঞ করা চলে না। প্রজারা রামচন্দ্রকে আবার বিয়ে করতে বললেন, কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। সোনা দিয়ে সীতা দেবীর মূর্তি গড়ে, সেই মূর্তি পাশে রেখে তিনি যজ্ঞ করতে বসলেন। সেই যজ্ঞে অনেক মুনিঋষি নিমন্ত্রিত হলেন। বাল্মীকিও এলেন লব ও কুশকে সঙ্গে নিয়ে। রাজসভায় লব ও কুশ রামায়ণ গান গাইলেন। এই গান বাল্মীকি তাঁদের শিখিয়েছিলেন। গানের মাঝে লব-কুশ যখন সীতার বনবাসের দুঃখ বর্ণনা করছিলেন তখন শ্রীরামচন্দ্র কেঁদে ফেললেন।

গান শেষ হলে মহর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে লব-কুশের পরিচয় দিলেন। তখনই লক্ষ্মণ বাল্মীকির তপোবনে গিয়ে সীতাদেবীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

সন্ন্যাসিনীর বেশে সীতাদেবী রাজসভায় এসে দাঁড়ালেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে সিংহাসনে বসাবার জন্য এগিয়ে গেলেন। কিন্তু প্রজারা আবার আপত্তি তুলল।

সীতাদেবী মর্মাহত হলেন, ধীরে ধীরে বললেন, "হে স্বর্গের দেবতারা, যদি আমি সত্যিই নিষ্পাপ হই, যদি রাক্ষসগৃহে বাস করেও কোন দোষ আমাকে স্পর্শ করতে না পেরে থাকে,

তা হলে এই মুহূর্তে ধরিত্রী দ্বিধা হোন এবং আমাকে তাঁর গর্ভে স্থান দিন।"

সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী টলমল করে কেঁপে উঠল, মাটি ফেটে গেল, সেই বিরাট ফাটলের মধ্যে সীতাদেবী তলিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই সেই মাটির গহ্বর আবার বন্ধ হয়ে গেল, সীতাদেবীর চিহ্নমাত্র আর রইল না। শ্রীরামচন্দ্র 'সীতা' 'সীতা' বলে বিলাপ করতে লাগলেন।

দিন যায়, রামের রাজকাজে আর মন নেই। একদিন কালপুরুষ এলেন রামচন্দ্রের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে। সর্ত রইল, তাঁদের কথার মাঝে যে ঘরে প্রবেশ করবে তাকেই রামচন্দ্র পরিত্যাগ করবেন। ইতিমধ্যে মহামুনি দুর্বাসা এলেন রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। মুনি হলেও দুর্বাসা ভারী বদ্‌মেজাজী, কথায় কথায় শাপ দিয়ে বসেন। তাঁর অভিশাপের ভয়ে লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে সংবাদ দিতে গেলেন। ধর্মরাজের সর্ত অনুযায়ী শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ত্যাগ করলেন। লক্ষ্মণ সরযূর জলে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এবার শ্রীরামচন্দ্রের মন ভেঙে গেল। ছেলেদের হাতে রাজ্য দিয়ে তিনিও ভরত ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে সরযূর জলে আত্মবিসর্জন করলেন।

এই হ'ল মোটামুটি রামায়ণের কাহিনী। অবশ্য এর মধ্যে আরও অনেক ছোটবড় কাহিনী আছে। এতে রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ-স্নেহ ও সীতার পতিভক্তির যে আদর্শ আছে ভারতবাসী এখনও তা অনুসরণ করে চলতে চায়। সামান্য কিছু লিখতে-পড়তে শিখলেই এই বইখানি হিন্দুরা আগে পড়ে। ভারতের প্রত্যেকটি ভাষায় এর ছোট-বড় অসংখ্য অনুবাদ হয়েছে। ভারতের বাইরেও প্রায় প্রতিটি ভাষায় এই বইখানি অনূদিত হয়েছে।

রামায়ণ বিশ্বসাহিত্যের একখানি অপরূপ গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

পরবর্তী খণ্ডে আমরা এদেশের আর একটি মহাকাব্য মহাভারত এবং সেই সঙ্গে অন্য দেশের মহাকাব্য সম্বন্ধেও আলোচনা করব।



মুনি হলেও দুর্বাসা ভারী বদ্‌মেজাজী



ধর্মের কথা

ধর্মের গোড়ার কথা

'ধর্ম' কথাটার নানারকম মানে হয়। কথাটার আসল মানে হচ্ছে—'যা করলে ভাল হয়, যা করা উচিত এমন কাজ'। যেমন, অহিংসা পরম ধর্ম—এ কথা বললে বোঝায় যে 'কারও হিংসা না করাই ভাল, হিংসা না করাই উচিত।' এ ছাড়া আরও একটা অর্থে আমরা 'ধর্ম' কথাটাকে খুব বেশী ব্যবহার করি। তা হচ্ছে 'ঈশ্বর-উপাসনার প্রণালী', মানে, 'ভগবান্‌কে খুশী করবার উপায়'। যেমন, হিন্দুধর্ম বললে বোঝায় এমন কতকগুলি উপায় বা নিয়ম যেগুলোকে মেনে চললে ভগবান্ খুশী হ'ন বলে হিন্দুরা মনে করেন। তেমনি, খৃষ্টানদের যে ধর্ম, তাও ভগবান্‌কে খুশী করবার কতকগুলি নিয়ম বা উপায়েরই কথা; কিন্তু সেগুলো আলাদা ধরনের।

সব ধর্মে অবশ্য ভগবানের কথা নেই, যেমন বৌদ্ধ ধর্ম। সে সব জায়গায় 'ধর্ম' কথাটাকে প্রথম অর্থে ব্যবহার করা হয়। বৌদ্ধ ধর্ম বললে বুদ্ধের সেই সব উপদেশকে বোঝায় যা মেনে চললে মানুষের নিজের আর সংসারের ভাল হবে বলে বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন।

বেশীর ভাগ ধর্মেই কিন্তু ভগবান্‌কে মানে। তার মধ্যে অবশ্য রকমারি আছে অনেক। যেমন, কেউ বলে যে ভগবান্ এক, কেউ বা বলে তা নয়, দেবতা বহু। কারও মতে ভগবানের কোনও আকার নেই, আবার কারও মতে ভগবানের একটা চেহারা ধরে নিয়ে তবে পূজা করতে হয়। এই রকম অনেক মত, অনেক তফাৎ। আর তাই নিয়ে আলাদা আলাদা ধর্ম।

মতের তফাৎ যাই হোক না কেন, এই সব ধর্মেরই মোট কথাটা কিন্তু এক। তা হচ্ছে, ভগবান্ বা দেবতারা আছেন, আর তাঁকে বা তাঁদেরকে খুশী রাখতে পারলে তবে মানুষের মঙ্গল হয়। মানুষের কিসে ভাল হবে, সেটা বলে দেওয়াই তো ধর্মের আসল উদ্দেশ্য! সব ধর্মের বেলাতেই তাই। যে সব ধর্মে ভগবানের কথা নেই, তারাও মানুষের কিসে ভাল হবে তা-ই বলে দিতে চায়। তফাৎ শুধু এই, যে, এরা বলছে যে ভগবান্‌কে না মেনেও মানুষের ভাল হতে পারে, আর ওরা বলছে যে শুধু ভগবান্‌কে তুষ্ট করতে পারলেই মানুষের ভাল হওয়া সম্ভব।

আচ্ছা, ভগবানের কথা মানুষের মনে প্রথম এল কেমন করে ?

একেবারে গোড়ার দিকে মানুষ অবশ্য ভাববার বা চিন্তা করবার বেশী সুযোগ পেত না। তখন মানুষ ছিল আর সব জন্তু-জানোয়ারেরই মত। বেঁচে থাকার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করবার সময় তার থাকত না। ক্রমে তার অবস্থা একটু একটু করে ফিরতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাও খেলতে লাগল।

মানুষ তার আশপাশের সব কিছু দেখে দেখে অন্য সব প্রাণীর চালচলন সব বুঝে নিল। কিন্তু জল, হাওয়া, আগুন, আলো, মেঘ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি অসংখ্য অন্য জিনিস যে কি, তা বোঝা মুস্কিল হ'ল তার পক্ষে। এরা তার ভালও করে, মন্দও করে। যে জল তার পিপাসা মেটায়, সেই জলই বন্যা হয়ে তার সর্বনাশ করে। যে হাওয়া নইলে তার প্রাণ বাঁচে না, সেই হাওয়াই ঝড় হয়ে তার কত ক্ষতি করে! অন্য প্রাণীদের মত এরাও তার শত্রু, কিন্তু সব সময়ে শত্রুতা করে না, ভালও করে। কেন ?

তবে কি এরা মানুষেরই মত খুশী হতেও পারে, আবার রাগ করতেও পারে, এমন কিছু ? নিশ্চয় তাই। নিশ্চয় তাদের প্রাণ আছে, মন আছে, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা আছে। আর, সেই অনুসারে তারা আমাদের ভাল করে কিংবা মন্দ করে। তা করবার অসীম শক্তি ধরে তারা। সে-শক্তির কোনও তুলনা নেই। ছোট্ট মানুষ তো কোন ছার, বিরাট্ বিরাট্ বলবান্ প্রাণীরাও আগুনকে, ঝড়কে, বন্যাকে ঠেকাতে পারে না। এদের হাত এড়ানও যায় না। কাজেই, এদের খুশী রাখাই দরকার। খুশী থাকলেই এরা আমাদের আর ক্ষতি করবে না, শুধু ভালই করবে।

পৃথিবীর প্রথম ধর্ম

মানুষ ভেবে-চিন্তে এই রকম ঠিক করে নিল। সব জিনিসে প্রাণ আছে, আর তারা বুঝেসুঝে আমাদের ভাল কিংবা মন্দ করতে পারে, এমন কথা ভাবাকে বলে 'সর্বপ্রাণবাদ' বা অ্যানিমিজ্‌ম্ (Animism)। এই সর্বপ্রাণবাদ দিয়েই ধর্মের আরম্ভ। যে সব বুদ্ধিমান্ লোকেরা প্রথমে এই কথাটা ভেবে বার করেছিল তারাই হ'ল পৃথিবীর প্রথম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তারাই বলে দিল কি করলে মানুষেরা ভাল থাকতে পারে, কি করা তাদের উচিত। তারা বললে যে এই আগুন, জল, হাওয়া ইত্যাদিকে খুশী রাখতে হবে, যদি নিজের ভাল চাও। তাই, সর্বপ্রাণবাদ হ'ল পৃথিবীর সব চাইতে পুরোনো ধর্ম আর আগুন, জল, হাওয়া ইত্যাদি শক্তিগুলি হ'ল মানুষের প্রথম দেবতা। কাজেই দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ প্রথমেই ভেবে নিল যে নানা রকমের শক্তিধারী বহু দেবতা আছেন। সর্বশক্তিমান্ এক ভগবানের কথা তারা ভেবেছিল অনেক পরে।

কয়েকজন দেবতার নাম করা যাক। সূর্য অনেক দেশেই একজন বড় দেবতা। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর অনেক নাম। বেদে তাঁকে মিত্র বলেছে, পার্শীরা বলেন মিথ্র। পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন কালের অনেক ধর্মে বাআল (Baal) বা বেল (Bel) নামে, প্রাচীন মিশর দেশে কখনও ওসিরিস (Osiris), কখনও-বা রা (Ra) নামে, প্রাচীন গ্রীসে হেলিওস (Helios) নামে, আর


সূর্য


ওসিরিস্


হেলিওস


সল


ইন্দ্র


থর


জিউস


জুপিটার

প্রাচীন রোমে সল (Sol) নামে সূর্য দেবতার পূজা হ'ত। বজ্রের দেবতা বেদে দ্যৌঃ (পরে ইন্দ্র), নরওয়েতে থর (Thor), গ্রীসে জিউস (Zeus) আর রোমে জুপিটার (Jupiter)। জলের দেবতা বরুণের গ্রীক নাম পসিডন (Poseidon) আর রোমান নাম নেপচুন (Neptune)। হাওয়ার দেবতা বেদে মাতরিশ্বা, গ্রীসে ঈওলাস (Aeolus), মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন আজ্‌টেক জাতের মধ্যে কেটসাল-কোআট্‌ল (Quetzalcoatl) নামে পূজা পেতেন।

প্রকৃতি, পশু, গাছপালা ও পূর্বপুরুষের মধ্যে দেবতা

এতক্ষণ যেগুলির কথা বলেছি তা সবই হ'ল প্রাকৃতিক শক্তি। তা থেকে ক্রমে সব কিছুতেই এক একজন আলাদা দেবতা আছেন বলে মনে করা হতে লাগল। সব প্রাকৃতিক

জিনিসে তো দেবতা আছেনই, তার ওপর আবার পশুপাখীতেও দেবতা আছেন বলে বিশ্বাস হ'ল মানুষের। পশুরা আমাদের কত উপকার করে! যেমন গরু; আবার, কত শত্রুতাও করে! যেমন সাপ। তাই গরু হলেন



বরুণ পসিডন নেপচুন

এক দেবতা, আর সাপেদের রাণী মনসা হলেন আর এক দেবী। এই যে জীবজন্তুদের দেবতা বলে মনে করা, একে বলে 'পশুদেববাদ', যার ইংরেজী নাম হলো টটেমিজ্‌ম্ (Totemism)। অনেক জায়গায় এই রকম পশুদেবতার ভক্তরা মনে করে যে তারা সেই দেবতার সন্তান। যেমন, উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা। তাদের কোনও জাত মনে করে তারা সর্প দেবতার সন্তান, কোনও জাত মনে করে যে কচ্ছপ দেবতা তাদের পূর্বপুরুষ। এও এক রকমের ধর্ম।

পূর্বপুরুষের পূজা অনেক ধর্মেরই অঙ্গ। বাবা কিংবা ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে হয় তো তাঁদের মানুষের বেশী কিছু বলে মনে হয় নি, কিন্তু স্বর্গে গেলে তাঁরাও দেবতাদের মধ্যে গিয়ে দেবতা হয়ে যান। ঐ ভাবটা অনেক ধর্মে আছে। আর, এমন ধর্মও আছে, যাতে মৃত পূর্বপুরুষ ছাড়া আর কোনও দেবতাই নেই। যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দ্বীপগুলিতে। পূর্বপুরুষদের পূজাই তাদের ধর্ম। তার মধ্যে আবার যিনি যত আগেকার দিনের, কিংবা যত বেশী বীর, তিনি তত বড় দেবতা।

জীবজন্তুর পূজা থেকে এল গাছপালার, এমন কি মাটি-পাথর ইত্যাদির পূজা। এরাও আমাদের ভাল করে, এদের মধ্যেও অনেক দেবতা থাকেন। হিন্দুরা তুলসী, বট, অশ্বত্থ গাছের পূজা করেন। আবার, যন্ত্রেরও পূজা হয়,—তার দেবতা বিশ্বকর্মা। শালগ্রাম পাথরে নারায়ণ থাকেন বলে মনে করা হয়। একে বলে 'জড়দেববাদ' বা 'ফেটিশিজ্‌ম্' (Fetishism)।

তবে, একটা কথা। ঝড়, বৃষ্টি, গাছ, পাথর-পূজাটা আসলে কিন্তু এদের পূজা নয়। এদের এক-একটার ভিতরে এক-একটা শক্তি বাস করেন, পূজা করে খুশী রাখতে হয় তাঁদেরকেই। তাঁরাই হলেন দেবতা। তাঁরাই ভালও করতে পারেন, মন্দও করতে পারেন।

ভাল দেবতা আর মন্দ দেবতা

কিন্তু যারা ভাল করতে না পারুক মন্দই শুধু করতে পারে, তাদেরও তো ভয় করতে হয়; তাদেরও খুশী রাখতে হয়। শুধু এদের পূজা নিয়েই কোনও কোনও ধর্ম আছে— যেমন আফ্রিকায় কাফ্রিদের মধ্যে। ভূত, প্রেত ইত্যাদি দুষ্ট শক্তির পূজাই তাদের ধর্ম। হিন্দুদের মধ্যেও যেমন শনির পূজা, অলক্ষ্মীর পূজা।

মানুষ যখন আরও ভেবে দেখল, তখন নানা ধর্মেই এই ভাবটা এল যে দুষ্ট শক্তিদের খুশী রাখবার দরকার নেই, তাদের জব্দ করতে হয়। মানুষের তো তা করবার সাধ্য নেই, তাই ভাল দেবতাদের সাহায্যে তাদের হারিয়ে দিতে হয়। হিন্দুদের অসুর, মুসলমানদের ইবলিশ, প্রাচীন মিশরীয় ধর্মে সেট (Set), খৃষ্টানদের শয়তান আর পার্শীদের আহ্‌রিমান হচ্ছে এ রকম দুষ্ট শক্তি। দেবতাদের দয়া হলে তাঁরা দুষ্ট শক্তিদের হটিয়ে দেন। কাজেই, দেবতাদের খুশী রাখাই একমাত্র কথা। সে-রকম দেবতা বা ভগবান্‌ও আছেন এ সব ধর্মে—প্রাচীন মিশরে তাঁকে বলত ওসিরিস (Osiris), পার্শীরা তাঁকে বলেন অহুর-মজ্‌দা (Ahura-Mazda), আর মুসলমানরা আল্লাহ্‌।

ঈশ্বর এক

এ সব কথা হচ্ছে মানুষের ইতিহাসের প্রথম দিকের ধর্মের কথা। একেবারে প্রথমে কোনও দেশের কোনও ধর্মের লোকই এ কথা ভাবে নি যে ভাল আর মন্দ এই সব শক্তিই এক। সে ধারণাটা এল অনেক পরে। মানুষ যখন খুব তলিয়ে ভাবতে শিখল, তখন বুঝল যে আলাদা আলাদা অনেক দেবতা আর অনেক অসুর আছে বলে মনে করাটা ভুল। দেবতা একজনই,—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব ভাল আর সব মন্দ একা তাঁরই হাতে। অসংখ্য জিনিসে আর অসংখ্য ব্যাপারে তাঁর আলাদা আলাদা প্রকাশ, কিন্তু আসলে তিনি এক।

এই যে একজন, যিনি একাই সব,—তাঁকে বলা হয় ঈশ্বর কিংবা ভগবান্‌। হিন্দুদের উপনিষৎ বলে যে-সব শাস্ত্র আছে তাতে তাঁকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম। অনেকের মত এই, যে, পৃথিবীতে এই উপনিষদের ঋষিরাই সকলের আগে এক ঈশ্বরের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। আবার কেউ বা মনে করেন যে এ বিষয়ে ইহুদী ধর্মই সকলের আগে। ইহুদীরাও এক ঈশ্বরকে মানত, তাঁকে তারা বলত জিহোভা (Jehovah)। তবে, তাদের একটা ধারণা ছিল যে জিহোভা শুধু ইহুদীদেরই ভগবান্‌, তিনি আর সব জাতের লোকদের কেউ ন'ন। তারপর আরও কয়েকটা ধর্মে একজন ঈশ্বরের কথাই মেনে নিয়েছে,—যেমন পার্শীদের ধর্মে অহুর-মজ্‌দা, খৃষ্টধর্মে গড্‌ (God) (যীশু বলতেন Eloi) আর মুসলমান ধর্মে আল্লাহ্‌।

কিন্তু ভগবান্‌ একজনই থাকুন কিংবা একশ' জনই থাকুন, তাঁকে কিংবা তাঁদেরকে খুশী রাখাই হচ্ছে আসল কথা। কী করলে তিনি বা তাঁরা সন্তুষ্ট হন?

কি করে খুশী করা যায়

মানুষ ভাবল যে সে যা পেলে খুশী হয় দেবতারাও তা পেলেই খুশী হবেন। আমরা প্রশংসা শুনতে ভালবাসি, দেবতাদেরও প্রশংসা কর। একে বলে স্তব করা। আমরা খেতে ভালবাসি, দেবতাদেরও খেতে দাও। তাই হিন্দুরা পাঁঠা বা মোষ কেটে দেয়, সাঁওতালরা তাদের দেবতা 'বোঙ্গা'র কাছে মুরগী কেটে দেয়, প্রাচীন গ্রীক্‌রা দেবতার সামনে ষাঁড় কেটে দিত এবং মেক্‌সিকো দেশের প্রাচীন আজ্‌টেক জাতের লোকেরা মানুষ পর্যন্ত কেটে খেতে দিত দেবতাকে। এদেশেও কালীর সামনে

তান্ত্রিকদের মানুষ কেটে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এ ভাবে কিছু কেটে তার রক্তমাংস দেবতাকে দেওয়ার নাম বলি দেওয়া। অন্য কিছু খাবার দিলে তাকে বলে নৈবেদ্য কিংবা ভোগ। ফুলচন্দন, ধূপদীপ দিয়ে আর শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়েও দেবতাকে খুশী করবার চেষ্টা করা হয়। এই সব উপায়ে খুশী করবার চেষ্টাকে বলা হয় পূজা।

প্রতীক বা প্রতিমা

পূজার সুবিধের জন্যে পূজার সময় সামনে এমন একটা কিছু রাখতে হয় যাতে দেবতা আছেন বলে মনে করা যায়। প্রথমে, এমনি কোনও একটা কিছুতে দেবতা আছেন মনে করে নিয়ে তাকে পূজা করা হ'ত। যেমন, শালগ্রাম পাথরকে বিষ্ণু বলে ধরে নিয়ে এখনও পূজা করা হয়। একে বলা হয় প্রতীকের পূজা। প্রতীক মানে চিহ্ন।

তারপর লোকেরা পছন্দমত কিছু তৈরী করে নিয়ে তার পূজা করতে লাগল। তার বেশীর ভাগই হয় মানুষ কিংবা অন্য কোনও প্রাণীর মত করে গড়া। তবে, দেবতারা মানুষের বা অন্য প্রাণীর চাইতে শ্রেষ্ঠ বলে, এগুলোতে কোনও না কোন বিশেষত্ব থাকত। তাই হিন্দুদের দুর্গা-দেবীর দশখানা হাত, আর ব্রহ্মার মুখ চারটি। প্রাচীন মিশরের এক দেবতা আনুবিস (Anubis), তাঁর মুখখানা শেয়ালের। আর এক দেবী আইসিস (Isis), তাঁর মাথায় একটি চাঁদ। এইভাবে মানুষের গড়ে-নেওয়া দেবতাকে বলে প্রতিমা।

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার

অনেক দেবতাকে মানতে হলে তাদের প্রতীক বা প্রতিমা ঠিক করে নিতেই হয়, নইলে তাদের আলাদা বলে বোঝা যাবে কি করে? কিন্তু যদি বলা যায় যে ভগবান্ একজনই, তা হলে আর তাঁর চেহারা থাকবার দরকার থাকে না। আকার বা চেহারা বা মূর্তির দরকার হয় অন্যের থেকে আলাদা করবার জন্যেই তো! ভগবান্ কি তা হলে নিরাকার, মানে, তাঁর কি কোনও আকার নেই? না, তিনি সাকার, মানে, আকার-বিশিষ্ট?



প্রাচীন মিশরের দেবতা ব্রহ্মা দুর্গা

এই নিয়ে ঘোরতর মতভেদ হ'ল। একদল বললে, আমরা যা কিছু ভাবতে পারি, তার চাইতেও ভগবান্ ঢের ঢের বড়। তাঁর অন্ত নেই, সীমা নেই। কিন্তু চেহারা যত বড়ই হোক না কেন, তার শেষ থাকবে, সীমা থাকবে। হিমালয়েরও শেষ আছে, পৃথিবীরও সীমা আছে, সূর্যেরও গণ্ডী আছে। ভগবানের তা নেই, কাজেই তাঁর চেহারা হতে পারে না। তিনি নিরাকার। এ কথা বলে হিন্দুদের উপনিষদে, আর ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান ধর্মে। এরা হ'ল নিরাকারবাদী। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মরা নিরাকারবাদী।

আর একদল বললে, তা কেন? ভগবান্ যখন সব কিছু যুড়ে রয়েছেন তখন সব কিছুতেই তিনি। সূর্যও ভগবান্, পাথরও ভগবান্, মাটির প্রতিমাও ভগবান্। এদের পূজা করলে ভগবানেরই পূজা করা হয়, কেন না তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই কোথাও। যার যা ভাল লাগে, সে সেই আকারেই তাঁর পূজা করবে, তাতে দোষ নেই। বরং তাতে তাঁকে ডাকবার সুবিধে, পূজা করবার সুবিধে। প্রতীকেই হোক, প্রতিমাতেই হোক, ভগবান্‌কে পূজা করা ভাল।

এ কথা যারা মানে তারা হ'ল সাকারবাদী। পৃথিবীর বেশীর ভাগ ধর্মই সাকারবাদী। যে সব ধর্মে অনেক দেবতা, তারা তো সবাই সাকারবাদী হবেই—এমন কি যারা এক ভগবান্ মানে তারাও কেউ কেউ সাকার পূজা করে। যেমন খৃষ্টানদের মধ্যে রোম্যান-ক্যাথলিকরা। তাঁরা যীশুখৃষ্টের মা মেরীর মূর্তির পূজা করেন। আবার, পার্শীরা এক ভগবান্ অহুর-মজ্‌দাকে মানলেও তাঁর প্রতীক বলে আগুনের পূজা করেন। তাই তাঁদের অগ্নিপূজক বলা হয়।

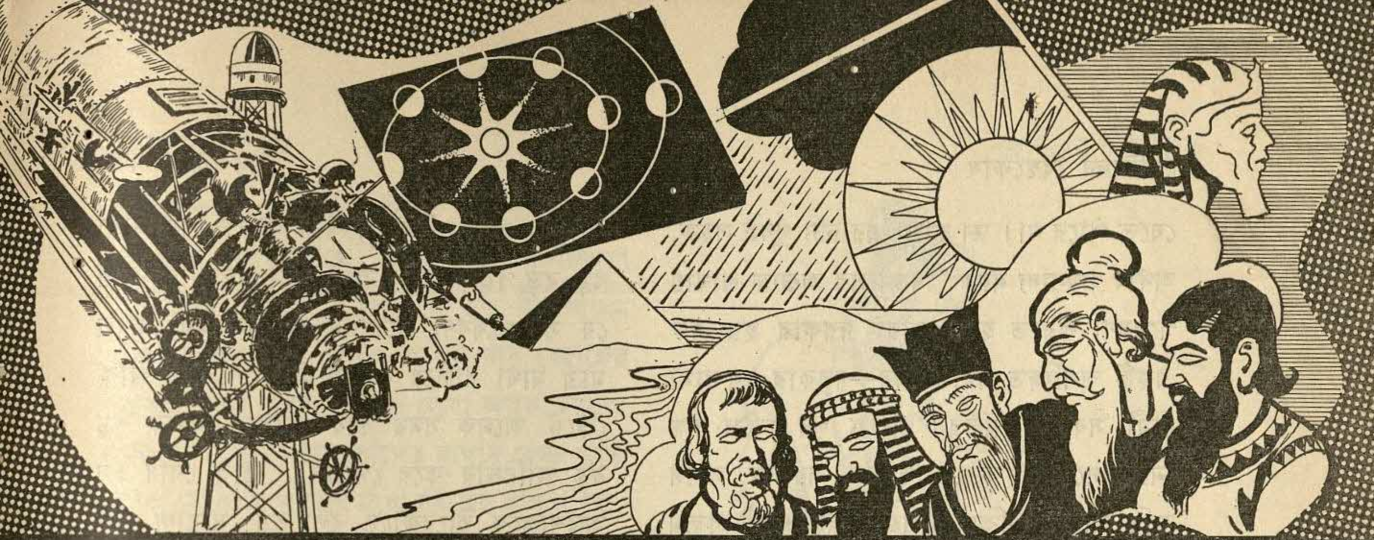
একেবারে নিরাকারবাদী যাঁরা, তাঁরা বলি দেন না, ফুলচন্দন দেন না, শঙ্খ-ঘণ্টা, ঢাক-ঢোল বাজান না। তাঁরা বলেন যে ভগবান্‌কে ভালবেসে তাঁকে ডাকলেই, তাঁকে মনে করলেই, তাঁকে মেনে চললেই তিনি সন্তুষ্ট হন। তাঁরা তাই ভগবানের উপাসনা, ধ্যান আর স্তব করতে বলেন।

কথাগুলো যত সোজা করে বলা হ'ল কেউই অত সহজ করে নেয় নি। প্রতি পদে এর ফ্যাঁকড়া বার করে, তার প্রতিটি খুটিনাটি নিয়ে ঝগড়া করে আলাদা আলাদা দল হয়ে গিয়েছে, আলাদা আলাদা ধর্ম তৈরী হয়েছে। আসলে হয় তো মিল রয়েছে, কিন্তু যত খুটিনাটি বিষয় নিয়ে তফাৎ হয়ে হয়ে পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আর অনেক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে।

পরবর্তী খণ্ডে আমরা তাদের কথা বলব।



মনসা দেবী



অঙ্ক শাস্ত্রের কথা

অঙ্ক কি করে মানুষের মাথায় এল

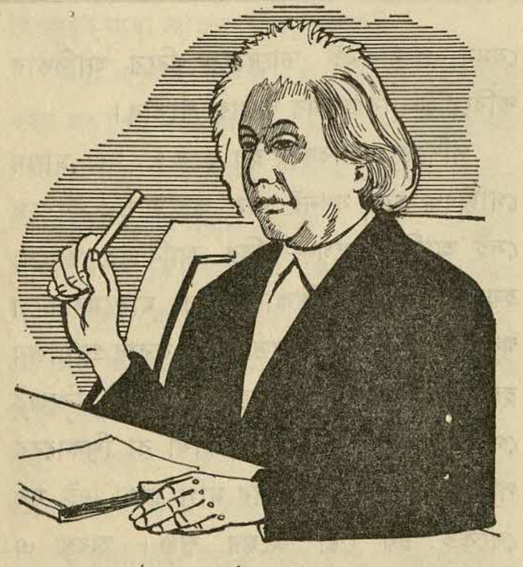
স্কুলের কোন ছাত্রকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, 'কোন্ বিষয়টি তোমার সবচেয়ে শক্ত লাগে,' তবে সে এক কথায় উত্তর দেবে, 'অঙ্ক'। সত্যি, অঙ্কের মত বিদ্ঘুটে বিষয় বোধ হয় দ্বিতীয়টি আর নেই। শুধু স্কুলের ছাত্রের কথাই বা বলি কেন, যে কোনও সাধারণ শিক্ষিত লোককে ঐ প্রশ্ন করলে সম্ভবতঃ হুবহু ঐ একই জবাব মিলবে। তবে এমন দু'-চারজন লোকও আছেন যাঁদের কাছে অঙ্ক খারাপ লাগে না, বরঞ্চ তাঁরা উল্টে আনন্দ পান ওতে। আমাদেরই এই রকম এক পণ্ডিত বন্ধু একবার বলেছিলেন, তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে প্রত্যহ একটা করে অতি কঠিন অঙ্ক কষে বার করা।

অথচ তোমরা শুনলে আজ অবাক্ হবে, যে, সম্ভবতঃ সভ্য মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের যতগুলি বিভাগ প্রচলিত রয়েছে অঙ্ক অর্থাৎ গণিতই হ'ল তার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো। মানুষ বোধ হয় প্রয়োজনের তাগিদেই অঙ্কের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছিল, যেমন প্রয়োজনই তাদেরকে দিয়ে আবিষ্কার করিয়েছিল বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার।

গণিতের আবিষ্কার হয় কবে? বন্য মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে যখনই বাস করতে সুরু করেছে সেই আদিম যুগে—কৃষির আবিষ্কার তখনো হয় নি, বন্য পশু শিকার করে মানুষের চলে ক্ষুন্নিবৃত্তি—তখনই সম্ভবতঃ গণনা করার প্রয়োজন হয়েছিল মানুষের জীবনে। নিজের নিজের গোষ্ঠীর লোকদের হিসেব রাখা বা শিকারের পরিমাণ কতটুকু হ'ল তার মাপ রাখা এই সব থেকেই হয় তো অঙ্কের সুরু। অবশ্য এ কাজটি সে সময়ে কি ভাবে, কি পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে তারা করত তা আজ নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু সে সব পুরোনো কথা থাক, আর একটু পরের যুগে চলে আসি। বিজ্ঞানের যত রকম শাখার সঙ্গে আজ আমাদের পরিচয় হয়েছে গণিতই হ'ল তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান এবং গোড়াকার জিনিস—এ কথা বললে হয় তো ভুল বলা হবে না। কারণ গণিতের সাহায্য ছাড়া প্রায় কোন বিজ্ঞানই তেমন করে এগিয়ে

যেতে পারে না। তা ছাড়া এর চর্চা খুবই সহজ, অর্থাৎ ব্যয়সাধ্য নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় গবেষণা করতে হলে প্রায়ই দরকার হয় এক একটি সুসজ্জিত পরীক্ষাগার—দরকার হয় দামী দামী সব যন্ত্রপাতির। কিন্তু খুব জটিল অঙ্ক নিয়ে গবেষণা করতে হলেও সরঞ্জাম লাগে অতি সামান্য—কিছু কাগজ এবং একটি কলম বা পেন্সিল। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নাম তোমাদের জানা আছে নিশ্চয়ই।

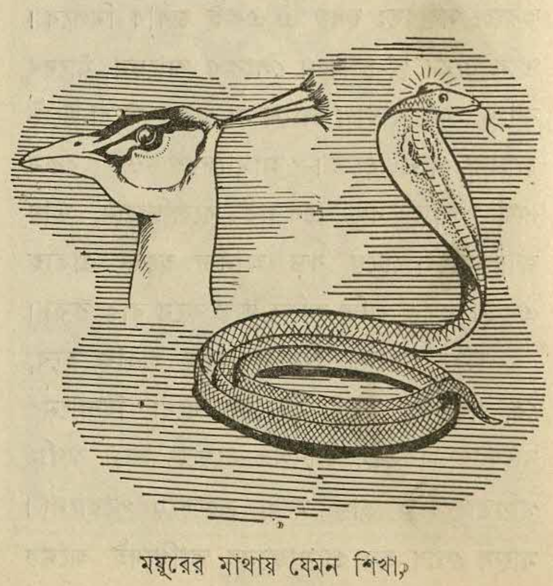


এই আমার বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম।

তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনার ল্যাবোরেটরী অর্থাৎ পরীক্ষাগার কোথায়? গবেষণার সাজ-সরঞ্জামই বা কোথায়?" তিনি তাঁর মাথায় দু'টো টোকা দিয়ে বলেছিলেন, "এই আমার ল্যাবোরেটরী আর—", তার পর হাত দিয়ে একটা কাগজ আর একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে বলেছিলেন, "এই আমার বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম।" আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অঙ্কশাস্ত্রের ওপর। আর সত্যি, পৃথিবীর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বড় বড় পরীক্ষাগারে দামী দামী যন্ত্রপাতি নিয়ে যে সব গবেষণা করেছেন আইনস্টাইন কেবল মাত্র মাথা খাটিয়ে কাগজ আর পেন্সিলে আঁক কেটে অনেক সময় তার চেয়েও অনেক বড় বড় আবিষ্কার করে গেছেন। তাই বোধ হয় অঙ্কশাস্ত্রকে ইংরেজীতে বলা হয় 'সায়ান্স অফ অল্ সায়ান্সেস্।'

নানা রকমের গণনা—তাই থেকে গণিত

গণিত কথাটি এসেছে 'গণনা করা' থেকে। কথাটির অর্থ হ'ল 'গণনা-বিজ্ঞান' অর্থাৎ যে বিশেষ জ্ঞান দ্বারা গণনা করা হয়ে থাকে। কথাটি অনেক দিনের পুরোনো। আর্যদের প্রাচীন শাস্ত্র যে বেদ, সেই বেদেরও বিভিন্ন জায়গায় 'গণিত' কথাটির বিশেষ উল্লেখ আছে। বেদের একটি অংশের নাম 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ'। পণ্ডিতেরা মনে করেন, বেদাঙ্গ রচনা করা



ময়ূরের মাথায় যেমন শিখা,
সাপের মাথায় যেমন মণি…

হয়েছিল যীশু খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ বারো শ' বছর বা তারও আগে। প্রাচীন আর্য বা হিন্দুরা গণিতকে বিজ্ঞান হিসেবে যে কত উঁচু আসন দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বেদাঙ্গের একটি বাক্য থেকে। তাতে লেখা আছে, ময়ূরের মাথায় যেমন শিখা, সাপের মাথায় যেমন মণি, ঠিক সে রকম শাস্ত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'ল গণিত।

নামকরণ হ'ল কি করে

এক কথায় 'গণিত' বলে প্রকাশ করলেও এর বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধেও হিন্দু পণ্ডিতেরা বেশ কিছু জানতেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় যে গণিতের রয়েছে তিনটি বিভাগ: (১) মুদ্রা অর্থাৎ আঙ্গুলের সাহায্যে গণনা করা যায় যে গণিত, (২) গণনা অর্থাৎ মনে মনে হিসেব করে করা যায় যে গণিত এবং (৩) সংখ্যায়ন অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের গণিত। অবশ্য সংখ্যায়ন কথাটি গণিতের সব রকম শাখা সম্বন্ধেই ব্যবহার করা চলে। আজকালকার দিনে আমরা গণিত বা অঙ্ক বলতে শুধু মাত্র গণনা বা সংখ্যায়ন বুঝি না, কথাটি আজ আরও ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি। কিন্তু সেকালে গণিত-শাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যাকেও ধরা হ'ত। (এখনও যে খানিকটা ধরা হয় না তা নয়।) জ্যামিতিও পরবর্তী কালে খাঁটি গণিতশাস্ত্রের আওতা থেকে বেরিয়ে যায়। জ্যামিতির সে সময়ে নাম ছিল ক্ষেত্র-গণিত বা কল্পসূত্র। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

পাটীগণিত, বীজগণিত প্রভৃতির কথা উল্লেখ করলাম, এ নামগুলো কি করে এল? যে কোন



ধূলি-কর্ম

শাখার গণিতের কথা ধরা যাক না কেন, না লিখে কোন গণনাকার্য করা যায় না। অবশ্য আঙ্গুলে গুণে বা মনে মনে হিসেব করে ছোটখাট অঙ্কের সমাধান করা যায় বটে, কিন্তু জটিল কিছু করতে গেলেই তার জন্যে কোন লিখবার সরঞ্জাম দরকার। এ কাজে দু'টি জিনিস চাই। এক,—যার ওপর লেখা হবে; দুই,—যা দিয়ে লেখা হবে। যার ওপর লেখা হবে সে কাজে কোন বোর্ড বা 'পাটী' ব্যবহার করা চলে; যা দিয়ে লেখা হবে তা কোন খড়িমাটি হতে বাধা নেই। এইভাবে পাটী বা বোর্ডের ওপর লিখে যে গণনাকার্য করা হ'ত তারই নাম দেওয়া হয় পাটীগণিত। সেকালে মাটি বা পাটীর উপর বালি ছড়িয়েও এ কাজটি সমাধান করা হ'ত। এজন্যেই পাটীগণিতের আর এক নাম দেওয়া হয়েছিল ধূলি-কর্ম। অবশ্য এ নামটার তেমন চল নেই, কিন্তু পাটীতে

লেখার চল উঠে গেলেও পাটীগণিত নামটি রয়ে গেছে। পাটিগণিত বলতে এখন আমরা বুঝি—যে শাস্ত্রের সাহায্যে উচ্চ পর্যায়ের গণনাকার্য করা যায়।

পাটীগণিত আর বীজগণিতে তফাৎ কি তোমরা খানিকটা জান। পাটীগণিতে কতগুলি সংখ্যা ব্যবহার করার রীতি। কিন্তু বীজগণিতে অজানা সংখ্যা বা "বীজ" ব্যবহার করা হয় সংখ্যার বদলে। কোনও প্রতীক (ইংরেজীতে যাকে বলে "সিম্বল") বা কোন অক্ষর দিয়ে এই অজানা সংখ্যা বা বীজ বোঝানো হয়।

প্রাচীন ভারতের একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত। তিনিই সর্বপ্রথম পাটীগণিত এবং বীজগণিতের মধ্যে প্রভেদ করেন। তিনি



একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত

একটি বিখ্যাত অঙ্কের বই লিখেছিলেন 'ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত' নাম দিয়ে। এই বইটিতে বীজগণিত সম্বন্ধে যে অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন সে অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন তিনি 'কুট্টক'।



শ্রীধর আচার্য

প্রাচীন ভারতের আর একজন বিশেষ নাম-করা গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি হলেন শ্রীধর আচার্য। তিনিও বীজগণিত এবং পাটীগণিতকে আলাদা আলাদা ভাবেই বিচার করেছেন এবং গণিতের এই শাখা তু'টি সম্বন্ধে আলাদা আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

অঙ্কশাস্ত্রের ইংরেজী নাম ম্যাথেম্যাটিক্স। কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'ম্যাথিন' থেকে ; এ কথাটির মানে হ'ল শিক্ষা করা। পাটীগণিতের ইংরেজী নাম অ্যারিথম্যাটিক ; এ শব্দটি 'অ্যারিথমোস' কথার রূপান্তর। অ্যারিথমোস মানে সংখ্যা। জ্যামিতি বা ক্ষেত্রগণিতের ইংরেজী নাম জিওমেট্রি। এ শব্দটি এসেছে পৃথিবী এবং পরিমাপ থেকে। (জিও হচ্ছে পৃথিবী, মেট্রি হচ্ছে পরিমাপ করা)। ত্রিভুজের তিনটি কোণ ; ত্রিভুজের গুণাগুণ নিয়ে গণিত শাস্ত্রের যে বিভাগটি গড়ে উঠেছে তার সংস্কৃত

এবং বাংলা নাম ত্রিকোণমিতি। ইরেজীতেও 'ট্র্যাঙ্গেল' (ট্রাই-অ্যাঙ্গেল) অর্থাৎ ত্রিভুজ থেকেই ট্রিগোনোমেট্রি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর যেখানেই গণিতশাস্ত্রের আরম্ভ হয়ে থাকুক না কেন, গণিতশাস্ত্র দু'টি মূল ধারণার ওপর নির্ভর করেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, গণনা করা; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, প্রাচীন কালের লোকের পৃথিবী এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ধারণা। অবশ্য আজকের দিনে আমরা যে গণিতের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে পরিচিত তার মধ্যেও এই দু'টি মূল ধারণার প্রভাব পূরোপুরি বর্তমান। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গণিতের আর একটি নতুন শাখার প্রবর্তন হয়। সেটি হচ্ছে 'বিশ্লেষণ গণিত', যাকে ইংরেজীতে বলা হয় অ্যানালিটিক্যাল ম্যাথেম্যাটিক্স। বিশ্ববিখ্যাত



মহাবিজ্ঞানী নিউটন

বিজ্ঞানী নিউটনের নাম তোমরা সবাই জান। তিনি গণিতশাস্ত্রে নানা আবিষ্কার করে গেছেন।



নিউটনেরও ৩।৪ শ' বছর আগে ভাস্করাচার্য বিশ্লেষণ গণিত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন।

সে যুগের আর একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন লিব্‌নিৎস্। লিব্‌নিৎস্ এবং নিউটনই হলেন 'বিশ্লেষণ গণিতের' প্রবর্তক। তোমরা যখন কলেজে পড়বে তখন অঙ্ক নিয়ে পড়লে ইন্‌টিগ্রাল এবং ডিফারেন্‌শিয়াল ক্যালকুলাসের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটবে। এই ক্যালকুলাস আসলে বিশ্লেষণ গণিতেরই অংশ বিশেষ। কিন্তু তোমরা শুনে অবাক্ হবে, যে, নিউটন বা লিব্‌নিৎসেরও বহু পূর্বে—প্রায় তিন-চার শ' বছর আগে—প্রাচীন ভারতেরই একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য এ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর আগে কোন দেশের কোন গণিতজ্ঞ এ সম্বন্ধে কোন কাজ করেছেন ব'লে আমাদের জানা নেই।

বিশুদ্ধ গণিত ও ফলিত গণিত কা'কে বলে

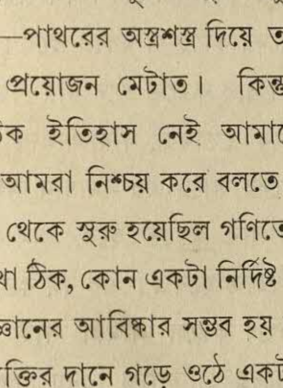
আজকের দিনের গণিতকে আমরা মোটামুটি দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করে থাকি। একটিকে বলি বিশুদ্ধ গণিত, অন্যটিকে ফলিত গণিত। গণিতের যে সব শাখা সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা হ'ল তা সবই বিশুদ্ধ গণিতের অংশ বিশেষ। গণিতের নানা প্রক্রিয়া অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানের নানা কাজে লাগে। এর মধ্যে রয়েছে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি। গণিতের যে যে অংশ এ সব ব্যাপারের বিভিন্ন সমাধানের কাজে লাগে তাকেই আমরা বলে থাকি ফলিত গণিত।

গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে একটা ধারণা হওয়ার পর আমরা আলোচনা করতে চাই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন সভ্য সমাজে কি ভাবে গণিতের প্রসার এবং প্রচারলাভ হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল, বিশুদ্ধ গণিতের সব ক'টি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা করলেও ফলিত গণিতের একটিমাত্র শাখা অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধেও আমরা আলোচনা করব। অন্যান্য শাখা, যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধেও এ বইএর অন্য জায়গায় আলোচনা করা হচ্ছে। জ্যোতির্বিদ্যাকে গণিতের আলোচনার মধ্যে রাখার কারণ অবশ্য আছে। সব দেশেই গণিতশাস্ত্রের প্রসার লাভ করেছে তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে : (১) কাল গণনা, (২) বস্তু গণনা ও (৩) ক্ষেত্র গণনা। প্রাচীন কাল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত কাল গণনা করা হয় আকাশের সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের সাহায্যে। কাজেই জ্যোতির্বিদ্যাকে আমরা গণিত থেকে আলাদা করে ভাবতে পারছি না। দ্বিতীয় হচ্ছে বস্তু গণনা। পাটীগণিত, বীজগণিত প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে। আর তৃতীয়, ক্ষেত্র গণনা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রগণিত বা জ্যামিতি।

অঙ্কের সুরু কোন্ দেশে

প্রধানতঃ প্রাচীন পৃথিবীর তিনটি বিভিন্ন অংশে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত অঙ্ক বা গণিতেরও প্রবর্তন হয়েছিল, এ কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। প্রাচীন কালে মানুষের সভ্যতা নির্ভর করত কৃষির ওপর। সবচেয়ে আগে দরকার খাবার। পেটে খাবার না জুটলে জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই অর্থহীন। প্রাচীন সভ্য মানুষরাও তাই চাষবাসের সাহায্যেই খাদ্য উৎপাদন করত। তাই তারা বসতি স্থাপন করেছিল এমন সব জায়গায় যেখানে সহজে কৃষিকাজ চলে। কৃষির জন্যে প্রথম প্রয়োজন জল। সুতরাং যে সব জায়গায় কৃষির জন্যে সহজে জল মেলে সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই বসবাস করা নানা দিক্ দিয়ে সুবিধা-জনক। তাই আমরা দেখতে পাই ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় এবং ভারতীয়—এই তিন সভ্যতার উদয় হ'ল পৃথিবীর এমন তিনটি অংশে যেখানে নদীর ওপর নির্ভর করে কৃষি-সভ্যতা সহজেই গড়ে উঠতে পারে। যে অঞ্চলে তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস নদী বয়ে চলেছে সে অঞ্চলে গড়ে উঠল ব্যাবি-লনীয় সভ্যতা, নীল নদের ধারে গড়ে উঠল মিশরীয় সভ্যতা আর পূর্বাঞ্চলে সিন্ধু-নদবিধৌত অঞ্চলে উদয় হ'ল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার। কৃষি-কাজের জন্যে কাল গণনা, মাস গণনা, ক্ষেত্রের পরিমাণ গণনা একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। তাই মনে হয়, স্বাভাবিক ভাবেই এ তিনটি

অঞ্চলেই প্রথম গণিতের প্রসার লাভ ঘটেছিল। আগেই বলেছি, মানুষ যেদিন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শিখল তখনই তাদের মধ্যে গণনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই পণ্ডিতদের অনুমান—ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় বা ভারতীয় সভ্যতার অনেক আগেই হয়তো গণিতের প্রচলন হয়েছিল। সে যুগকে আমরা বলি প্রস্তর বা নব্য-প্রস্তর যুগ, অর্থাৎ সে যুগে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শেখে নি—পাথরের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তারা তাদের নিত্যকার প্রয়োজন মেটাত। কিন্তু সে-যুগের কোন সঠিক ইতিহাস নেই আমাদের কাছে যা থেকে আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি ঠিক কোন্ দিন থেকে সুরু হয়েছিল গণিতের প্রচলন। তবে এ কথা ঠিক, কোন একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে একটা বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্ভব হয় না। বহুদিন ধরে বহু ব্যক্তির দানে গড়ে ওঠে একটা বিজ্ঞান। গণিতের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এর অন্যথা হয় নি।



কিউনিফর্ম লিপি

তিন দেশের হিসাবনিকাশ: (১) ব্যাবিলন

এর পর আমরা একে একে বলব ব্যাবিলন, মিশর এবং ভারতে কি ভাবে গণিতশাস্ত্র গড়ে



সরু কাঠি দিয়ে কোন সংখ্যা লিখে তা পুড়িয়ে নিত।

উঠেছিল, আর ঐ সব দেশের লোকেরা গণিতের কোন্ কোন্ শাখায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল।

ব্যাবিলনবাসীরা গণনা কার্যের জন্যে যে লিপির ব্যবহার করত তার নাম কিউনিফর্ম লিপি। সেখানে বহু ধরনের লিপির ব্যবহার প্রচলন ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে বা তারও আগে। একবার লিখলে তা যাতে মুছে না যায় সে জন্যে ওখানকার লোকেরা একটা ভারী মজার উপায় অবলম্বন করত। নরম মাটির চাকতির ওপর সরু কাঠি দিয়ে কোন সংখ্যা লিখে তারা তা পুড়িয়ে নিত। তার পর ঐ সব চাকতির সাহায্য নিয়ে সহজেই অঙ্কের হিসেব রাখা চলত। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এ যাবৎ পঞ্চাশ হাজারের মত ঐ জাতীয় চাকতির সন্ধান পেয়েছেন।

'এক' সংখ্যাটি লিখবার জন্যে ব্যাবিলন-বাসীরা ব্যবহার করত অনেকটা ইংরেজী ছোট

হাতের 'আর' (r)-এর মত দেখতে একটি লিপি। আবার দশ লিখত ঠিক < এইভাবে ; একশ' লিখিবার জন্যে ব্যবহার করা হ'ত > এই রকম একটা লিপি। এই নিয়মে যদি তিন লিখতে হয় তা হ'লে লেখা হ'ত rrr। সংখ্যা প্রকাশ করার এই ব্যাবিলনীয় পদ্ধতি দিয়ে সহজেই বোঝা যায় যে এরা অঙ্কের দু'টি প্রক্রিয়া —যোগ এবং গুণ-এর সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিল। এদের গণিতশাস্ত্র আলোচনা করলে আরও একটা ব্যাপার বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। একের দশগুণ দশ, দশের দশগুণ একশ', একশ'র দশ গুণ এক হাজার। ব্যাবিলন-বাসীরা কোন উর্ধ্ব সংখ্যা প্রকাশ করবার জন্যে দশগুণ করে বাড়িয়ে যেত। আজকের দিনে যে দশমিক পদ্ধতির গণনা বা মাপজোঁকের পদ্ধতি চালু হয়েছে প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীর গণনার উপায়ও ছিল অনেকটা সেই ধরনের। তবে এদের মধ্যে ষাট সংখ্যাটির ওপর নির্ভর করে যে গণনার উপায় তারই বেশী প্রচলন' ছিল ব'লে মনে হয়। এক ঘণ্টায় ষাট মিনিট, প্রতি মিনিটে আবার ষাট সেকেণ্ড। সময় মাপবার এই পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের আজও পরিচয় রয়েছে পূরোমাত্রায়। তা ছাড়া কোনও সংখ্যার বর্গ বার করার পদ্ধতিও এদের জানা ছিল। গণিতশাস্ত্রে শূন্য আবিষ্কারও একটা বিরাট ব্যাপার। প্রাচীন হিন্দু গণিতজ্ঞরাই নাকি শূন্যের আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। তবে যত দূর মনে হয়, ব্যাবিলনবাসীরাও শূন্যের ব্যবহার জানত হিসেবের সুবিধার জন্যে এরা আমাদের আধুনিক কালের ধারাপাতের মত ধারাপাত ব্যবহার করত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ ও বর্গমূল—এই সব ক'টি পদ্ধতিরই ব্যবহারে এরা বেশ পটু ছিল।

এরপর বীজগণিত ও জ্যামিতি। আমরা জানি, বীজগণিতে সংখ্যার বদলে কোন লিপির অক্ষর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খুব সহজ এবং সাধারণ একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আশা করি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। ধর, এমন একটি সংখ্যা বার করতে হবে যার বর্গের দ্বিগুণ করলে ৮ হবে। তোমরা, যারা সামান্য বীজগণিত শিখেছ, তাদের কাছে এর সমাধান অজানা নয়। যে সংখ্যাটি বার করতে হবে, অর্থাৎ অজানা সংখ্যাটিকে ধরতে হবে x। এর বর্গ করলে দাঁড়ায় $x^২$; এর দ্বিগুণ করলে আমরা পাই $২x^২$। তা হলে, আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে আমরা সহজেই বলতে পারি,

$$২x^২ = ৮।$$

তোমরা খুব সহজেই অঙ্ক কষে এর সমাধান বার করতে পার। x এর মান দাঁড়াবে ২।

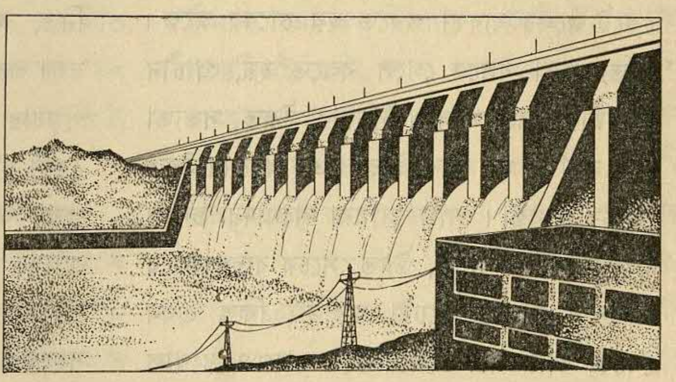
ব্যাবিলনবাসীরা, ঠিক আধুনিক বীজগণিতের সঙ্গে না হলেও, এ জাতীয় সমাধানের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিল। এরা অবশ্য সঠিক কোন প্রতীক বা সিম্বল, যেমন আগের উদাহরণটিতে x,—ব্যবহার করত না। কিন্তু এরই কাছাকাছি কোন উপায়ের সাহায্য নিয়ে অজানা রাশি সহজেই বার করতে পারত। অজানা রাশি কোন কোন ক্ষেত্রে দু'টি বা তিনটি পর্যন্ত হ'ত। এ সব প্রক্রিয়া তারা কি ভাবে উদ্ভাবন করেছিল তার বিস্তৃত বিবরণ অবশ্য পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া "অমূলদ সংখ্যা" সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ছিল

অমূলদ সংখ্যা কা'কে বলে জান তো? ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'ইর‍্যাশনাল নাম্বার', অর্থাৎ এমন সংখ্যা যার বর্গমূল বা অন্য কোন মূল নির্ণয় করলে কোন সম্পূর্ণ সংখ্যা হয় না। যেমন $\sqrt{২}$। ২ এর বর্গমূল করলে আমরা পাই ১·৪১৪২১৪। ব্যাবিলনবাসীরা কোন অমূলদ সংখ্যার কোন মূল বার করতে একটি সূত্র ব্যবহার করত। ঐ সূত্রের সাহায্যে কোন সংখ্যার বর্গমূল যা পাওয়া যেত তা যদিও পুরোপুরি নির্ভুল নয়, কিন্তু অনেকটা কাছাকাছি। তাদের এ সূত্রটি ব্যবহার করে ২ সংখ্যাটির বর্গমূল পাওয়া যায় ১·৪১৬৬৬···; আসলে ২ এর বর্গমূল হ'ল ১·৪১৪২১৪। এর থেকেই বোঝা যায়, ব্যাবিলনবাসীরা এ বিষয়ে কতটা উন্নত ছিল।

জ্যামিতির ক্ষেত্রেও ব্যাবিলনের অধিবাসীরা কম বাহাদুরী দেখায় নি। বিশেষ ভাবে বৃত্ত সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান তুচ্ছ করবার নয়। তোমাদের মধ্যে যারা অঙ্কে একটু বেশী এগিয়ে গেছ তারা 'পাই' (π) কা'কে বলে জান। এটি একটি গ্রীক অক্ষর। কোন বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত সব সময়ই নির্দিষ্ট। বৃত্তের আকার বড় করলে তার ব্যাসও সে অনুপাতে বাড়বে। পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত দেখা যায় ৩·১৪২৮। এ সংখ্যাটি π দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ব্যাবিলনবাসীরা বৃত্তের এ গুণটি জানত। তারা এ সংখ্যাটিও নির্ণয় করেছিল। জ্যামিতি শাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগেও এদের অল্পবিস্তর জ্ঞান ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

প্রাচীন ব্যাবিলনে জ্যোতিষ চর্চা

বিশুদ্ধ গণিতের কথা বাদে ব্যাবিলনবাসীদের জ্যোতিষ সম্বন্ধেও প্রচুর জ্ঞান ছিল। আসলে বিভিন্ন দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা বিশুদ্ধ গণিতের চর্চা করেছিল তাদের নিজেদেরই প্রয়োজনে, আর সে প্রয়োজনটা নিতান্তই প্রাণধারণের। আগেই উল্লেখ করেছি, সেকালের সভ্য জাতিরা ছিল পুরোপুরি কৃষি-নির্ভর আর সে জন্যেই তারা বসতি স্থাপন করেছিল প্রাচীন পৃথিবীর এমন সব অংশে যেখানে কৃষি-কাজের স্বাভাবিক সুবিধা রয়েছে, সুবিধা রয়েছে জলের। আর এই



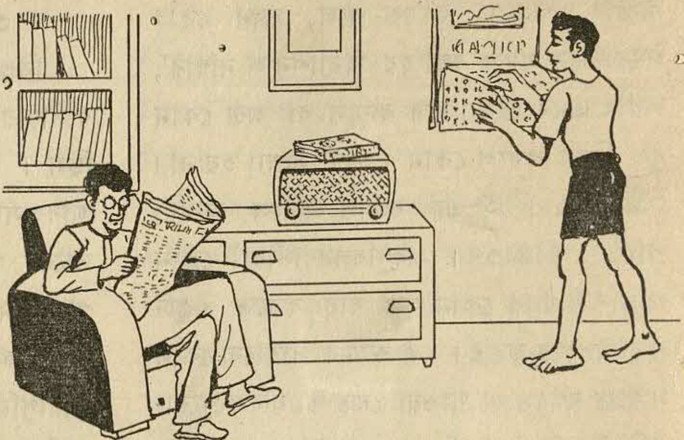
আধুনিক ড্যাম্

জন্যেই যে প্রধানতঃ তিনটি দেশে—সিন্ধু নদের দেশ, নীল নদের দেশ আর ইউফ্রেতিস-তাইগ্রিস নদীর (শাতিল আরব) দেশেই সর্বপ্রথম মানবসভ্যতার উদয় হয়েছিল সে কথাও বলেছি। কিন্তু নদী তো বারো মাস একই ভাবে থাকে না! কখনও নদী যায় শুকিয়ে, জলের অভাব ঘটে কৃষি-কাজের জন্যে। আবার কখনও ঘটে জলস্ফীতি,—নদীতে বান ডাকে, দেখা দেয় প্লাবন। নদী তখন রুদ্রমূর্তি ধরে—চাষের জমি,

বাড়ী-ঘর সব ভাসিয়ে নিয়ে মানুষের চরম দুর্গতি করে। নদীর এই খামখেয়ালী আজ পর্যন্তও অব্যাহত গতিতে চলছে।

প্রাচীন কালের অধিবাসীরা তাই নদীর প্রকৃতিকে নজরে রাখত। তারা লক্ষ্য করেছিল, বছরের একটা বিশেষ সময়ে নদীতে জলস্ফীতি ঘটে, প্লাবন দেখা দেয়—লোকের সর্বনাশ আসে ঐ সময়ে। আবার বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় নদীতে জল কমে যায়, তখন নদী থেকে খাল কেটে জলের ব্যবস্থা করতে হয় চাষের জন্যে। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, প্রাচীন সুমেরীয় এবং মেসোপটেমিয়ার উন্নত সভ্যতা এবং সমৃদ্ধির মূল কারণই হ'ল এই ধরনের উন্নত সেচের ব্যবস্থা। আজ আমরা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বানাচ্ছি, উন্নত সেচের ব্যবস্থা করে খাদ্যশস্য বাড়াতে চেষ্টা করছি; কিন্তু এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেও যে খাল কেটে কৃষির জন্যে জলের ব্যবস্থা করা হ'ত তা ভাবলেও অবাক্ হতে হয় না কি? যাই হোক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে নদীর গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা অতিপ্রয়োজনীয় কাজ ছিল প্রাচীন সভ্য জাতিদের কাছে।

আবার, বছরের কয়েকটা মাস ভীষণ শীত পড়ে, কয়েক মাস আবার বেশ গরম। কখনো বা কয়েক মাস ধরে চলে বৃষ্টিবাদল। আজকের দিনের মত সেকালেও প্রকৃতির এ হেন ব্যবহারের অন্যথা ছিল না। কাজেই আজকের মত বর্ষাকাল সুরু হওয়ার আগেই সেকালের



খবরের কাগজ, ক্যালেণ্ডার, রেডিও, পঞ্জিকা, কত কি!

লোকেরাও বর্ষার বিরুদ্ধে নিজেদের তৈরী করে নিত, ঘরবাড়ী মেরামত করত, ফসল-টসল রক্ষা করবার সুব্যবস্থা করত। তেমনি শীত পড়বার আগেই শীতের সঙ্গে এঁটে উঠবার জন্যে তৈরী হ'ত তারা। কিন্তু কখন শীত আসবে, কখন আসবে নদীতে প্লাবন, কখন সুরু হবে গ্রীষ্মের দাবদাহ? আজকে তোমরা ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টে, পঞ্জিকা বা খবরের কাগজ দেখে সহজেই বলে দিতে পার, অমুক তারিখ থেকে 'মনসুন্' সুরু হবে; অমুক সময় থেকে সুরু হবে শীত, বছরের অমুক দিনটিই ছিল বছরের মধ্যে সবচেয়ে গরমের দিন ইত্যাদি। কিন্তু সেকালের লোকেদের না ছিল ক্যালেণ্ডার, না ছিল পঞ্জিকা বা খবরের কাগজ, না ছিল রেডিও। এ কাজটি তারা করত আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র, সূর্য-চন্দ্রের গতিবিধি এবং অবস্থান দেখে। তারা লক্ষ্য করল, সূর্য-চন্দ্র, আকাশের গ্রহ-তারার ঘুরবার একটা নিয়ম আছে। কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্রের ঝাঁকের কাছে সূর্য বা অন্য কোন তারার আবির্ভাব ঘটলে নদীতে প্লাবন আসে, আবার অন্য কোন

নক্ষত্রের কাছে গেলে কন্‌কনে শীত পড়ে, নদীর জল যায় শুকিয়ে ; তেমনি অন্য আর একটা বিশেষ সময়ে আসে ঝড়-বাদল। কাজেই নিজেদের ধনপ্রাণ রক্ষা করবার জন্যে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে করে ব্যাপারটা থেকে কতগুলি নিয়মকানুন বার করার একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সেকালের লোকদের কাছে। এমনি ভাবেই গড়ে উঠেছিল জ্যোতির্বিদ্যা। আর এই জ্যোতির্বিদ্যার গণনা এবং অন্যান্য হিসাব করবার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল গণিতের। তা ছাড়া ক্ষেতের জমির মাপজোঁক করা, যজ্ঞবেদীর আয়তন বার করা প্রভৃতি কাজের জন্যে গড়ে উঠেছিল জ্যামিতি বিদ্যা। অন্যান্য প্রাচীন সুসভ্য জাতির মত ব্যাবিলনবাসীরাও জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল।

আজ আমরা জানি ৩০ দিনে মাস হয়, ১২ মাসে হয় এক বছর। একবার সূর্যের উদয় থেকে সুরু করে দ্বিতীয় বার সূর্যের উদয় পর্যন্ত সময়টাকে আমরা বলি ১ দিন। একটি দিন-রাত বললেই ঠিক বলা হয় অবশ্য। এ সময়ের মধ্যে রয়েছে ২৪ ঘণ্টা। একটি দিনকে একক হিসেবে ধরে ১২ মাসে দাঁড়ায় ৩৬০ দিন। এ সময়ের মধ্যে পৃথিবী আপন কক্ষপথে একবার সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে। কিন্তু এ কাজটি করতে পৃথিবী সময় নেয় আসলে ৩৬৫·২৪২২ দিন— ৩৬০ দিন নয়। আমরা মোটামুটি হিসেবে বলি, ৩৬৫ দিনে এক বছর। এরই ফলে আমরা দেখি, প্রতি মাসে ঠিক ঠিক ৩০ দিন হচ্ছে না ; আমরা কোন মাসের সঙ্গে ১ দিন যোগ করে, আবার কোন মাসের সঙ্গে ২।১ দিন বিয়োগ করে বছরে মোটের উপর ৩৬৫ দিন করে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের এ হিসেবেও একটু গলতি থেকে যাচ্ছে। প্রতি বছরই একটু একটু বাড়তি সময় জমা পড়ে যাচ্ছে আমাদের হিসেবের খাতায়। আমরা কি ভাবে এ সমস্যার সমাধান করে নিয়েছি তাও তোমাদের অজানা নয়। আমরা প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর ৩৬৫ দিনের বদলে ৩৬৬ দিনে এক বছর বানিয়ে নিয়েছি। আমি লীপ্‌-ইয়ারের কথাই যে বলছি তা তোমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না নিশ্চয়ই।

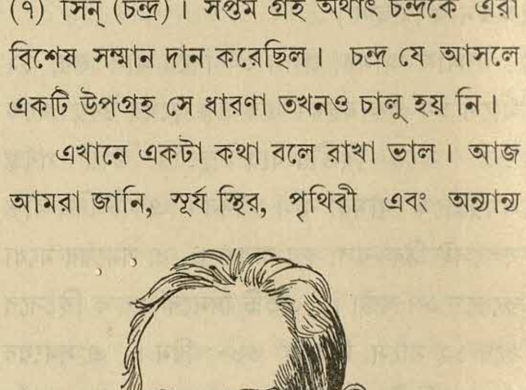
মাস-বছর গণনা করবার আরও একটি উপায় আছে। আগের ক্ষেত্রে আমরা একটি দিনকে একক হিসেবে ধরেছি। এককটি বাস্তবিকই ছোট, তাই এর চেয়ে একটি বড় এককের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অমাবস্যার দিন আকাশে চাঁদ থাকে না, তারপর প্রতিদিন একটু একটু করে চন্দ্রকলার বৃদ্ধি হতে থাকে। তারপর আসে পূর্ণিমা—সেদিন আকাশে শোভা পায় পুরোপুরি একখানা চাঁদ। এর পরের দিন আবার চন্দ্রকলার হ্রাস পেতে থাকে। পরের অমাবস্যায় আবার চাঁদকে আমরা একদম দেখতেই পাই না। প্রাচীন জাতিরা লক্ষ্য করেছিল, যে, এক অমাবস্যা থেকে অন্য অমাবস্যার মধ্যে ৩০ দিন থাকে। একেই আমরা বলি চান্দ্র মাস। চান্দ্র মাসকে একক ধরলে এককটি দিনের মত ছোট হবে না। ফলে এক বর্ষা গিয়ে আর এক বর্ষা আসতে কতটি দিন গত হ'ল তার হিসেবের চেয়ে কতবার অমাবস্যা ঘটল তার হিসেব রাখা অনেকটা সহজ হবে। আমরা আগের উপায়কে অর্থাৎ সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসার

সময়কে বলি সৌর বছর। আর চাঁদের হিসেবের সাহায্যে অর্থাৎ অমাবস্যার সাহায্যে যে বছর গণনা করি তাকে বলি চান্দ্র বছর। হু'ধরনের মাসকে আমরা সৌর মাস এবং চান্দ্র মাস বলতে পারি।

প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীরা ৩০ দিনে মাস ধরে ১২ মাসে বছর গণনা করত। এ কাজটি করতে গিয়ে প্রথম প্রথম ভাল ফলই পাওয়া যেতে লাগল। দেখা গেল, এই হিসেব মতই যথা-সময়ে শীতকাল আসে, আসে বর্ষাকাল। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে নদীতে প্লাবন দেখা দেয়। কিন্তু কয়েক বছর পরই হিসেবে গরমিল দেখা দিতে লাগল। হিসেব মত যে সময়ে শীত পড়ার কথা শীত তো সে সময় পড়ে না! যে সময়ে বর্ষা নামার কথা সে সময় তো তা নামে না! আশা করি গরমিলটার কারণ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? গরমিল তো হবেই—চান্দ্র বছরে যে ৩৬০ দিন, আর সৌর বছরে ৩৬৫·২৪২২ দিন! ব্যাবিলনবাসীরা প্রকৃত পক্ষে প্রতি বছরে ৫·২৪২২ দিন কম গুণেছিল। এর ফলে প্রায় ৬ বছর পরে, শীতকালই হোক বা বর্ষাকালই হোক, অর্থাৎ কোন ঋতু তার নির্দিষ্ট সময় থেকে প্রায় ১ মাস পিছিয়ে পড়ল। যে সময় থেকে শীতকাল সুরু হওয়া উচিত সে সময় তা হ'ল না, হ'ল ১ মাস পরে। এমনি ভাবে ১১।১২ বছর পরে শীতকাল আসবে হিসেব মত সময়ের হু'মাস পরে। ব্যাবিলনবাসীরা কিন্তু এ সমস্যার এক চমৎকার সমাধান করে নিয়েছিল। তারা কয়েক বছর পরে ১২ মাসের বদলে ১৩ মাসে বছর বানিয়ে দিল। এ বাড়তি মাসটিই হচ্ছে আমাদের 'মল মাস'। এমনি করেই সময়ের কাঁটাকে সঠিক রেখেছিল ব্যাবিলনবাসীরা। মল মাসে কোন ধর্মীয় কাজকর্ম করা নিষিদ্ধ হ'ল। কোন্ বছরে মল মাস যোগ করা হবে সেটা আগে থেকেই ঠিক করে নেওয়া হ'ত।

ব্যাবিলনবাসীরা মাসকে সপ্তাহে এবং সপ্তাহকে দিনে ভাগ করে নিয়েছিল। আজকের দিনের মত তাদেরও সপ্তাহে ছিল সাতটি করে দিন। এক একটি দিন এক একটি দেবতার নামে—দেবতারা হলেন ৭টি গ্রহ। এ ব্যাপারে আমাদের বা পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশের সঙ্গে প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীদের কোন পার্থক্য দেখা যায় না। ব্যাবিলনীয় এই সাত দেবতার নাম হ'ল, (১) নিনিব (শনি), (২) মার্হ্ক (বৃহস্পতি), (৩) নের্গাল (মঙ্গল), (৪) শামাশ (রবি), (৫) ইশ্তার (শুক্র), (৬) নাবু (বুধ), ও (৭) সিন্ (চন্দ্র)। সপ্তম গ্রহ অর্থাৎ চন্দ্রকে এরা বিশেষ সম্মান দান করেছিল। চন্দ্র যে আসলে একটি উপগ্রহ সে ধারণা তখনও চালু হয় নি।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। আজ আমরা জানি, সূর্য স্থির, পৃথিবী এবং অন্যান্য



বিজ্ঞানী গ্যালিলিও

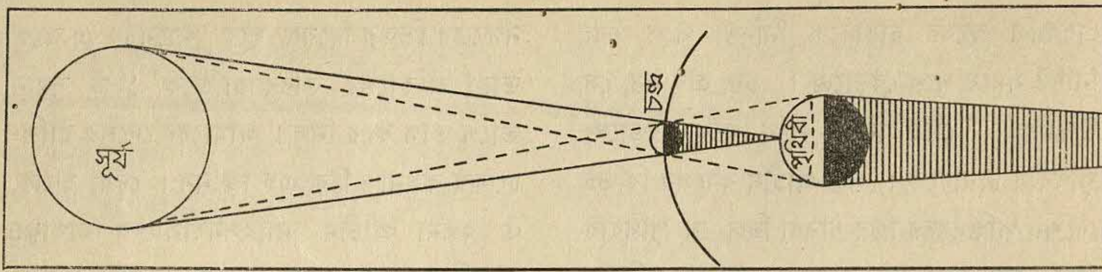
গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চন্দ্র গ্রহ নয়, সে উপগ্রহ। সেও নির্দিষ্ট পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর চারদিকে। কিন্তু প্রাচীন কালের বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের স্থির ধারণা ছিল যে পৃথিবীই স্থির এবং সূর্য ও অন্যান্য গ্রহরা পৃথিবীর চারদিকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত প্রায় পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত প্রায় সর্বদেশেই ছিল এ জাতীয় ধারণা। মাত্র সেদিন, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইটালি দেশের বিজ্ঞানী গ্যালিলিও সর্বপ্রথম বলেন, না, পৃথিবী স্থির নয়। সে-ই ঘুরপাক খাচ্ছে সূর্যের চারদিকে যুগযুগান্ত ধরে। আর এ হেন অশাস্ত্রীয় মত প্রকাশ করবার জন্যে তাঁকে যে কী নিগ্রহ স্বীকার করতে হয়েছিল তাও হয় তো তোমাদের অনেকের জানা আছে। গ্যালিলিওর জীবনী পড়বার সময় তা তোমরা জানতে পারবে।

ব্যাবিলনবাসীরা মাসকে সপ্তাহে এবং সপ্তাহকে দিনে ভাগ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা প্রতিদিনকে আবার ২৪টি সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। তারা মনে করত, প্রতিটি অংশের ওপর তাদের গ্রহ-দেবতারা রীতিমত নজর রাখছেন।

ব্যাবিলনবাসীরা আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল। তারা দেখল, গ্রহরা স্থির নয়, কিন্তু আকাশের পটে রয়েছে স্থির নক্ষত্রের চাঁদোয়া। এই স্থির নক্ষত্রের তুলনায় গ্রহদের একটা গতি আছে, অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহরা কতগুলি স্থির নক্ষত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। তারা আরও লক্ষ্য করল, সূর্য বছরে একবার করে আকাশের সমস্ত নক্ষত্রের ভিতর দিয়েই ঘুরে আসে। এ জন্যে তারা আকাশের তারকারাজিকে ১২টি সমান ভাগে ভাগ করে নিল। আমাদের দেশের রাশি-চক্রের কল্পনাও ঠিক এই জিনিস। দেখা যাচ্ছে, এ কল্পনা প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীদের মাথায়ও এসেছিল। তা ছাড়া এক একটি ভাগের নক্ষত্রদের চিনবার জন্যে তারা ঐ-সব নক্ষত্রের ঝাঁকের সঙ্গে কোন জন্তুজানোয়ারের সাদৃশ্য কল্পনা করে নিয়ে ঐ জন্তুর নামে তাদের নাম-করণ করেছিল। শুধু জন্তুর নাম নয়, কোন কোন তারার ঝাঁককে তারা কোন পৌরাণিক কাহিনীর নামানুসারেও নাম দিয়েছিল। গ্রহদের গতি সম্বন্ধে অতি নিখুঁত যে সব তথ্য ব্যাবিলন-বাসীদের কাছে আমরা পেয়েছি তা ভেবে দেখলে অবাক্ হতে হয়। সে আমলে ঘড়ি ছিল না ; জল-ঘড়ি বা সূর্য-ঘড়ির ব্যবহার ওদের হয়তো জানা থাকলেও তা দিয়ে সময়ের সূক্ষ্ম পরিমাণ নির্ণয় করা একেবারেই সহজ নয়। এ কাজটি ব্যাবিলনবাসীরা করত বিভিন্ন গ্রহের গতিবিধির সাহায্যেই।

আমরা বার বার গ্রহ কথাটি ব্যবহার করছি। ব্যাবিলনবাসীদের মত সূর্য এবং চন্দ্রকে আমরা আপাততঃ গ্রহ পর্যায়ের মধ্যেই ধরে নিয়েছি—বোঝাবার সুবিধের জন্যে।

সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধেও ব্যাবিলনবাসীদের চমৎকার ধারণা ছিল। আমরা জানি, সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে চন্দ্র এসে হাজির হলে পৃথিবী থেকে সূর্যকে সাময়িক ভাবে দেখা যায় না। কখনো সূর্যের অংশ বিশেষ, কখনো বা পুরোপুরি সূর্য ঢাকা পড়ে। একেই আমরা বলি সূর্যগ্রহণ। অমাবস্যায় চাঁদ এসে উপস্থিত হয় সূর্য এবং

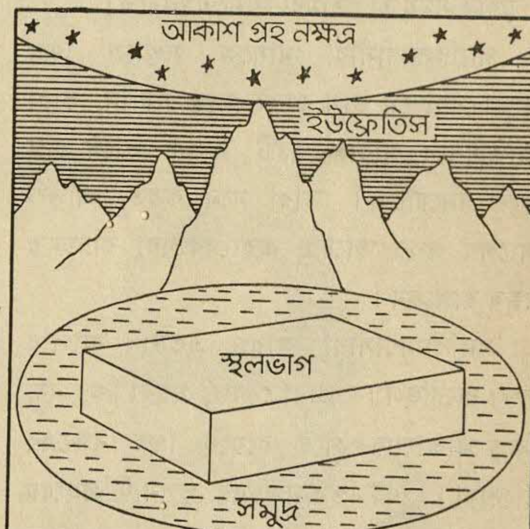


সূর্যগ্রহণ

পৃথিবীর মাঝখানে। কিন্তু প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না কেন? কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, যে, পৃথিবীর গতিপথ এবং চন্দ্রের গতিপথ এক সমতল ক্ষেত্রে নয়। উভয়ের মধ্যে ৫ ডিগ্রী কোণ বর্তমান। কাজে কাজেই চাঁদের আড়ালে পড়বার মত অবস্থা সূর্যের কালেভদ্রে আসে। যখন আসে তখনই হয় সূর্যগ্রহণ। প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীরা সূর্য এবং চন্দ্রের এ হেন গতিপথ সম্বন্ধে অবহিত ছিল, যার ফলে কতদিন পর পর সূর্যগ্রহণ হবে সে সম্বন্ধে তারা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারত। এ জাতীয় ভবিষ্যৎবাণীর পিছনে হয়তো অন্য যুক্তিও খাড়া করা চলে। হয় তো তারা বহুদিন ধরে—বেশ কয়েক শ' বছর ধরে সূর্যগ্রহণের কাল নির্ণয় করে একটা নির্দিষ্ট ধারার সন্ধান পেয়েছিল। যে উপায়ই হোক না কেন, তারা সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারত এবং তা তাদের হিসেব অনুসারে হুবহু মিলে যেত।

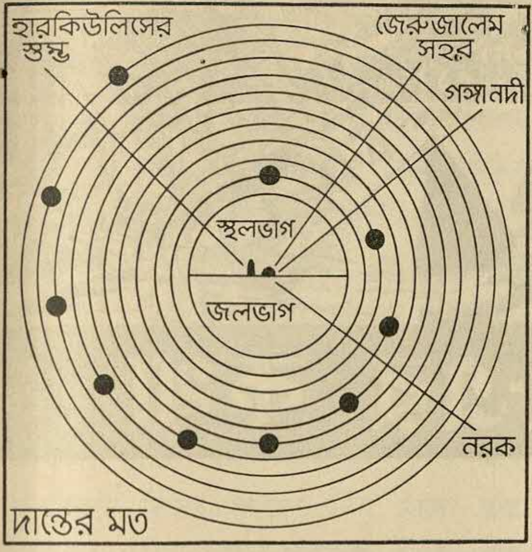
ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় পণ্ডিতদের ধারণা

তবে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহনক্ষত্রদের সম্বন্ধে ব্যাবিলনবাসীদের ধারণা কিছুটা আধুনিক মতের মত হলেও, সব মিলিয়ে তারা যে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে একটি চিত্র আমাদের দিয়েছে তা নেহাৎই ছেলেমানুষি মনে হবে তোমাদের কাছে। তারা পৃথিবীকে ধরে নিয়েছিল একটি বাক্সের মত। এই বাক্সের মাঝখানে রয়েছে পৃথিবীর স্থলভাগ, আর চারদিকে রয়েছে সমুদ্র। স্থলভাগের কেন্দ্র থেকে আকাশে উঠেছে একটা বিরাট পাহাড়। এ পাহাড় থেকেই ইউফ্রেতিস নদীর উৎপত্তি। স্থলভাগের চারদিকে যে সমুদ্র, তার ওপারে আছে অনেকগুলো পাহাড়। এই সব পাহাড়ই হচ্ছে দেবতাদের আবাসস্থল। আর ঐ পাহাড়ের উপরে আছে আকাশ—তার গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিদের নিয়ে।



ব্যাবিলনবাসীদের পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণা

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে এদের ধারণাকে তোমরা হেসে উড়িয়ে দাও আপত্তি নেই, কিন্তু বিখ্যাত

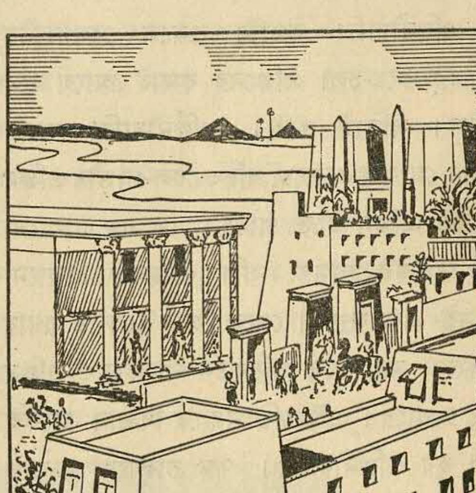


বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে দান্তের ধারণা

দার্শনিক দান্তের নাম শুনেছ নিশ্চয়। তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল শুনবে ?

দান্তে কি বলতেন

দান্তের মতে পৃথিবী হচ্ছে একটি গোলক, আর এই গোলকটি রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঠিক কেন্দ্রে। পৃথিবীর বেশীর ভাগই জলে-ভরা সমুদ্র। উত্তর অর্ধাংশের, অর্থাৎ বিষুবরেখার উত্তর অংশের কিছুটা অংশ মাত্র স্থলভাগ। স্থলভাগের ঠিক কেন্দ্রে রয়েছে জেরুজালেম নগর। নগরটি অতীব পবিত্র। স্থলভাগের পূর্বে রয়েছে গঙ্গা নদী, আর পশ্চিমে হারকিউলিসের স্তম্ভ। জেরুজালেম নগরের ঠিক নীচে মাটির মধ্যে রয়েছে পাপীদের শাস্তি পাওয়ার জায়গা অর্থাৎ নরক। পৃথিবীর ঠিক উল্টো দিকে আছে একটি পাহাড়। সেটিই হচ্ছে প্রেতলোক। পৃথিবীর ওপরে আরও দশটি গোলক পৃথিবীর চারদিকে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা হ'ল চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ধ্রুব, স্ফটিক গোলক এবং স্বর্গ। যত ওপরে ওঠা যাবে ততই গ্রহদের স্বর্গীয় ভাব বাড়তে থাকবে। শনির পরে যে গ্রহটি বা গোলকটি, সেখানে থাকেন ধ্রুব তারকারা। এর পরের অর্থাৎ নবম গোলকটি অনবরত ঘুরছে। আর এর ঘুরবার ফলেই অন্যান্য সব গ্রহ ঘুরবার শক্তি পাচ্ছে। এটা কি ভাবে সম্ভব হচ্ছে তার উত্তরে বলা হয়েছে, দেবদূতরাই এ কাজটি পরিচালনা করে থাকেন। সবচেয়ে ওপরে যে গোলকটি, অর্থাৎ দশম গোলকটি, সেটিই হ'ল স্বর্গ—স্বয়ং ভগবানের আবাসস্থল। একমাত্র সর্বশক্তিমান্ ভগবানের ইচ্ছায়ই সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।



নীল নদের দেশ মিশর

দান্তের ধারণা আর তাঁর সময় থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের ব্যাবিলনবাসীদের ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ধারণার ইতরবিশেষ লক্ষ্য ক'র।

গণিতে ব্যাবিলনবাসীদের অবদান সম্বন্ধে কিছু বললাম। এর পর আমরা বলব নীল নদের দেশ প্রাচীন মিশরের গণিতের কথা।



এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা

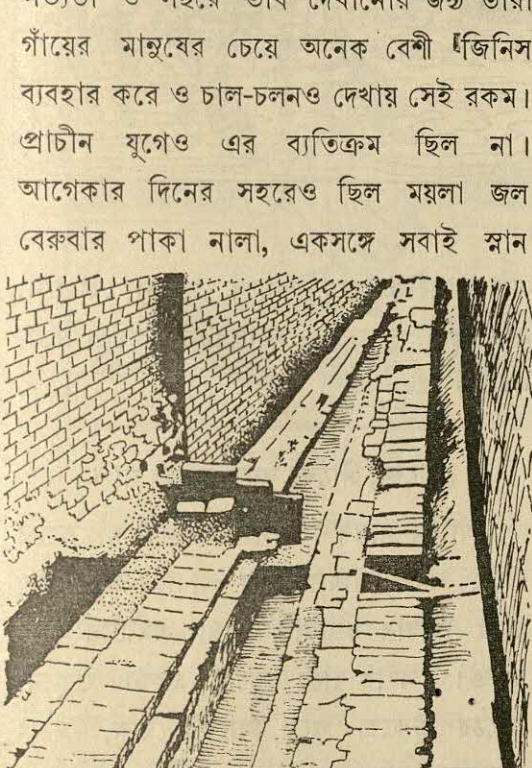
এঞ্জিনীয়ারিং কা'কে বলে

এঞ্জিনীয়ারিং কথাটা শুনলে রেলগাড়ীর ধক্-ধক্-করে-চলা এঞ্জিনের কথাই আগে মনে আসে। সত্যিই তাই। এঞ্জিনীয়ারিং কথাটা এঞ্জিন থেকেই এসেছে, যদিও রেল-গাড়ীর এঞ্জিন ছাড়াও এঞ্জিন হতে পারে। যে যন্ত্র চালানো যায় তাকেই আমরা বলি এঞ্জিন। চালানো মানেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চালানো নয়, স্থান পরিবর্তন না করেও এঞ্জিন চলতে পারে। এই এঞ্জিনের যে বিজ্ঞান তাকেই বলা হয় এঞ্জিনীয়ারিং। যন্ত্র চালানো ছাড়াও ওর আনুষঙ্গিক এবং ঐ জাতীয় বিজ্ঞানকেও বলা হয় এঞ্জিনীয়ারিং। মোট কথা, যেখানেই যন্ত্রের কোন-না-কোন রকম ব্যবহার হয় সেখানেই আমরা ঐ বিদ্যাটিকে এঞ্জিনীয়ারিং বলে থাকি। বাংলায় এর অনেক রকম নাম আছে। কেউ বলেন যন্ত্রবিজ্ঞান, কেউ বলেন নির্মাণ-বিদ্যা। এ ছাড়া প্রযুক্তিবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা, প্রয়োগবিজ্ঞান ইত্যাদি আরও কত কি নাম আছে এর! এঞ্জিনীয়ারিংও তো এক রকমের নয়! যাই হোক, আমরা ওকে বাংলাতেও এঞ্জিনীয়ারিংই বলব। কথাটাকে আমরা এখন প্রায় বাংলাই করে নিয়েছি।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর তিন যুগ

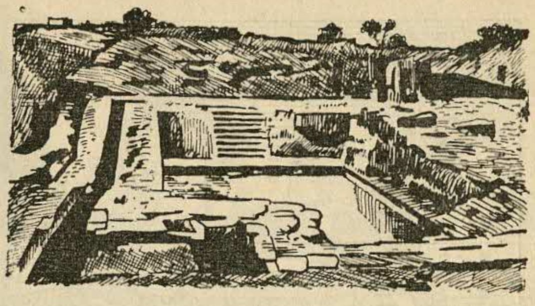
সব জিনিসই জানতে গেলে একেবারে গোড়া থেকে সুরু করা উচিত। আমরাও তাই করব এবং এজন্য আমাদের আলোচনা তিনটি যুগে ভাগ করে নেব। প্রথম হ'ল পৌরাণিক বা প্রাচীন যুগ। প্রাগৈতিহাসিক, অর্থাৎ ইতিহাসেরও আগের যুগ বলা যেতে পারে একে। তার পর ঐতিহাসিক অর্থাৎ মধ্যযুগ, এবং সবশেষে, গত আড়াইশ' বছরকে, আধুনিক যুগ বলব। ভারতবর্ষে সন তারিখ দিয়ে ইতিহাসের আরম্ভ বলতে গেলে সেকেন্দার শাহের অর্থাৎ আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের সময় থেকে অথবা আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেবের জন্মের সময় থেকে ধরা হয়। এর আগেকার যুগকে প্রাচীন যুগ বলতে পারি। তবে এখানে, বুঝবার সুবিধার জন্য আমরা খৃষ্টজন্মের পূর্বের সমস্ত কাহিনীকেই প্রাচীন যুগ বলে মেনে নেব।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর কলাকৌশলের আবিষ্কার মানুষেরই প্রয়োজনে। মানুষই মানুষের প্রয়োজন বাড়িয়ে এসেছে এবং সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্য মানুষই আবার নানা জিনিস উদ্ভাবন করেছে। নিজের অভাব নিজেই বেশী তৈরী করে সভ্য ও সহরের মানুষ। তাদের সভ্যতা ও সহুরে ভাব দেখানোর জন্য তারা গাঁয়ের মানুষের চেয়ে অনেক বেশী জিনিস ব্যবহার করে ও চাল-চলনও দেখায় সেই রকম। প্রাচীন যুগেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আগেকার দিনের সহরেও ছিল ময়লা জল বেরুবার পাকা নালা, একসঙ্গে সবাই স্নান



জল বেরুবার পাকা নালা (মহেঞ্জোদাড়ো)

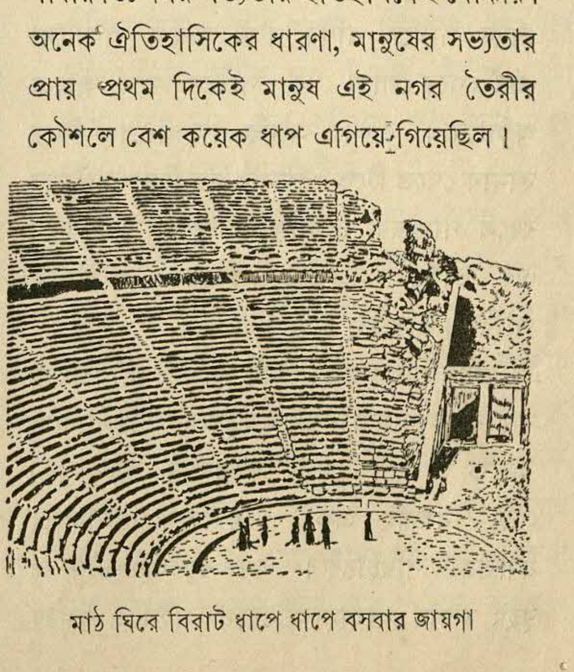
করার জন্য সাধারণ স্নানাগার, একসঙ্গে বহু লোক খেলাধূলো ও আমোদপ্রমোদ উপভোগ করবার জন্য মাঠ ঘিরে বিরাট ধাপে ধাপে বসবার জায়গা, লেখাপড়া শেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সংগ্রহশালা বা যাদুঘর, সহর শত্রুর আক্রমণ হ'তে রক্ষার জন্য পরিখা কাটা এবং পরিখার ওপর চলাচলের জন্য সেতু, এই



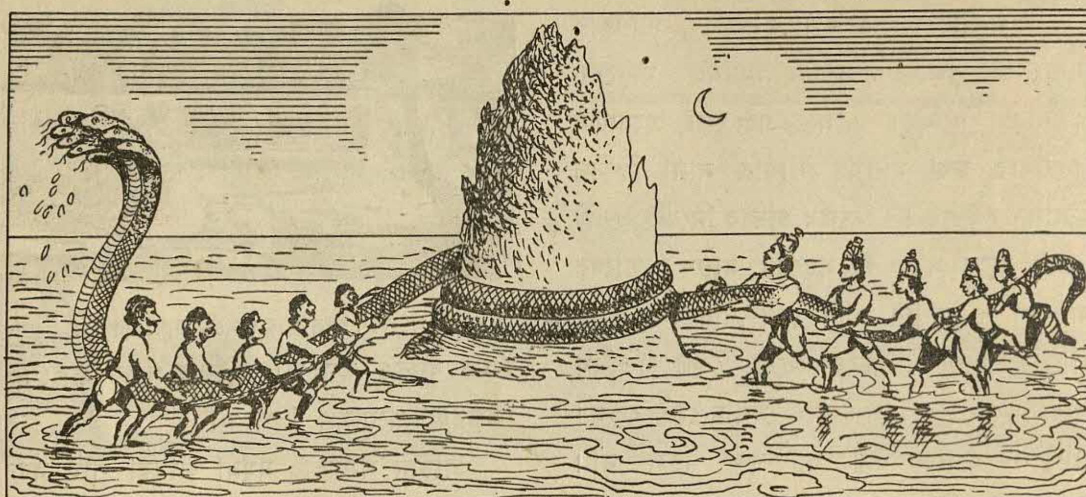
সাধারণ স্নানাগার (মহেঞ্জোদাড়ো)

রকম আরও কত কী! কিন্তু গাঁয়ে এ সবের কিছুরই প্রয়োজন ছিল না।

প্রাচীন সভ্যতার নমুনা আমরা পাই মধ্য এশিয়ায় ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া, ভারতবর্ষ, চীন ও আফ্রিকার মিশর দেশে। "ইতিহাসের কথায়" এর কথা তোমরা আগেই পড়েছ। দক্ষিণ আমেরিকায় 'মায়া' সভ্যতার প্রাচীন কাহিনীও আমরা এখন জানতে পেরেছি। সভ্যতার ইতি-হাসকে কতকটা এঞ্জিনীয়ারিং-এর ইতিহাসও বলা যেতে পারে। আবার, সভ্যতার ইতিহাস বলতে সাধারণতঃ নগর-সভ্যতার ইতিহাসকেই বোঝায়। অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা, মানুষের সভ্যতার প্রায় প্রথম দিকেই মানুষ এই নগর তৈরীর কৌশলে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল।



মাঠ ঘিরে বিরাট ধাপে ধাপে বসবার জায়গা



সমুদ্রমন্থন

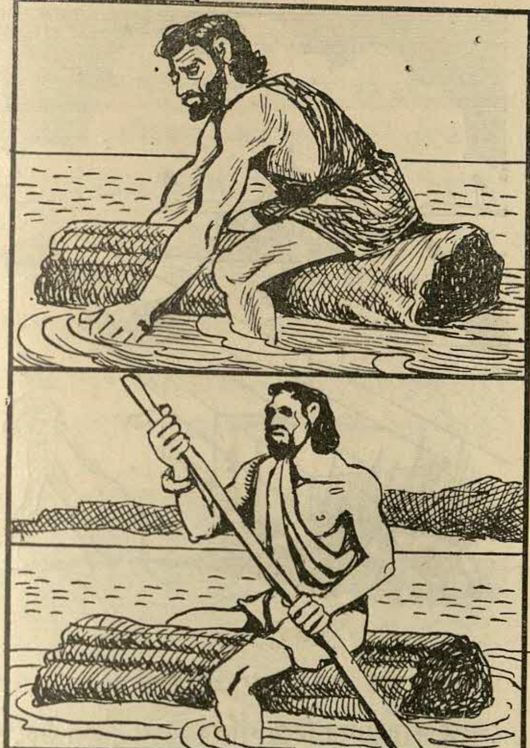
এঞ্জিনীয়ারিং-এর সুরু

প্রাচীন কালে এঞ্জিনীয়ারিং-এর মূল সূত্রগুলি কবে ও কোথায় সুরু হয়েছিল তা আজও সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে, আগেই বলেছি, যে সব বৈজ্ঞানিক সূত্র নিয়ে এঞ্জিনীয়ারিং সুরু তা সবই আবিষ্কৃত হয়েছিল মানুষের প্রয়োজনে। যেমন পাথরে পাথর ঘ'ষে আগুন জ্বালানো এবং পরে লোহা ও পাথরে ঘষে আগুন জ্বালানো। এখনও অনেক পাড়াগাঁয়ে হুঁকোয় তামাক খেতে টিকে ধরানোর জন্য দিয়াশলাইয়ের বদলে পাথরের চক্‌মকি ব্যবহার করা হয়। এই ভাবেই অন্য এক বিশেষ প্রয়োজনে আবিষ্কৃত হয়েছিল চাকা।

আমাদের পুরাণে এমন সব কাহিনী পাওয়া যায় যাকে আমরা নিশ্চয়ই বড়দরের এঞ্জিনীয়ারিং বলতে পারি। যেমন সমুদ্রমন্থন ব্যাপারটি। এটি নিশ্চয়ই একটি বিরাট এঞ্জিনীয়ারিং কীর্তিরই পরিচায়ক। অত বড় এক দীর্ঘ ও বৃহৎ মন্দার পাহাড়কে ঘোল মইবার কাঠির মত নাগরজ্জু দিয়ে সামনে পেছনে ঘোরানো ব্যাপারটা ছুতোরের 'তুরপুণ' চালানোর মতই নয় কি ?

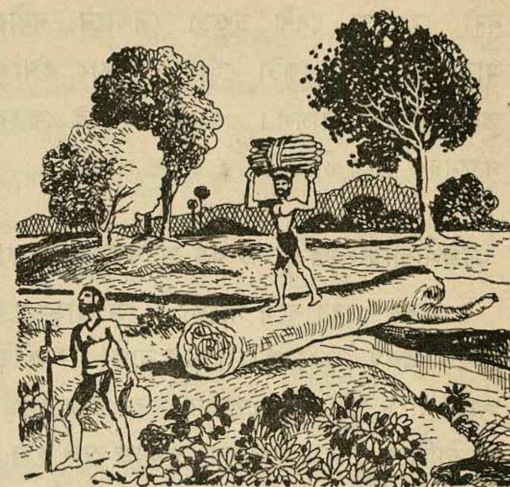
নৌকো, সাঁকো আর জলের মাপ

আদিম মানুষ বসবাস করত নদী বা হ্রদের ধারে, কারণ খাবার জল পাবার জন্য নদীর ধারে বসবাস করাটাই তারা সমীচীন মনে করত। নদীর ধারে হয়তো একটা শুক্‌নো কাঠের টুকরো পড়ে আছে দেখে, হঠাৎ একজনের খেয়াল হ'ল—সে সেটিকে ঠেলেঠুলে এনে ভাসিয়ে দিল জলে, তারপর তার ওপর চড়ে বসে চলতে লাগল। সেদিনই কি নৌকোর আদিপুরুষের জন্ম হ'ল না ? আবার যেদিন যত্ন করে সবাই মিলে ঠেলেঠুলে নদীর দু'পারে উঁচু জমিতে শুইয়ে দিল একটা গাছ এবং তার ওপর দিয়ে হেঁটে এপার থেকে ওপারে চলে এল সেদিনই কি সাঁকো বা সেতুর প্রথম জন্মদিন হ'ল না ?



নৌকোর আদিপুরুষ

কিন্তু একদিন হয়তো দেখা গেল নদীর জল বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে গাছটার, অর্থাৎ শুইয়ে-ফেলা কাঠের কাণ্ডটার ওপরে উঠেছে। তারপর হঠাৎ ভেলার মত সাঁকোর কাঠটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল নদী। তখন আবার মানুষ ভাবতে লাগল, যদি নদীর জল বর্ষার সময় যত ওপরে ওঠে তারও ওপরে কাঠটাকে রাখা যায় বা দু'পারে শক্ত করে সেটা বাঁধা থাকে তা হ'লে হয়তো কাঠটাকে বানের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু কেমন করে জানা যাবে কত উঁচুতে জল উঠবে? অনেকদিন ধরে নদীর জল ওঠার খবর রাখতে হ'ল, কতদূর পর্যন্ত জল ওঠে। তাই থেকে নদীর জলের মাপ রাখার জন্য পাশে পাথরে বা



সাঁকো বা সেতুর জন্ম

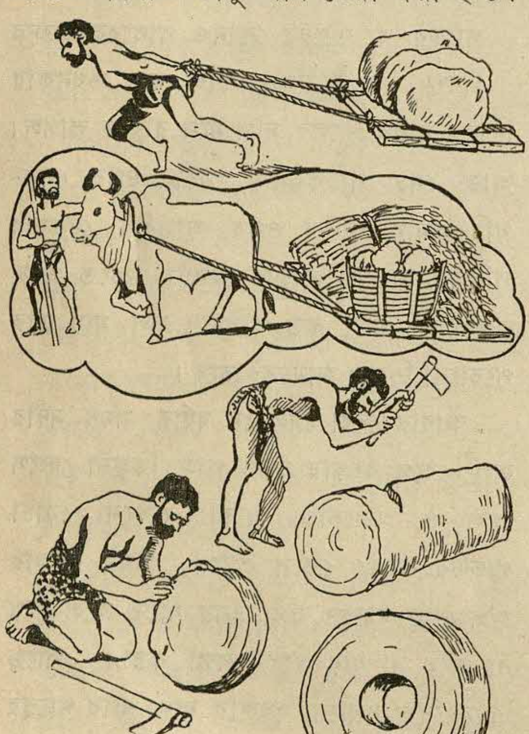
গাছের গুঁড়িতে দাগ দিয়ে রাখার ব্যবস্থাও হ'ল। অর্থাৎ প্রতি বর্ষাতেই পাড়ের কোনও গাছের বা তীরের কোনও পাথরের কতদূর পর্যন্ত জল উঠেছিল তাই দেখে তখনকার দিনের মানুষ জলের মাপ মনে রাখতে লাগল। আজ সেচ পরিকল্পনায়, নদীর ওপর সেতু-পরিকল্পনায়, নদীর ওপর আড়বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনায়- নদীর জল কতটা উঁচুতে ওঠে, কত বেগে যায়, কত পরিমাণ জল যায় তার পুরোনো হিসেব জানতেই হবে।

আবার দেখা গেল যে বর্ষার সময় নদীর জল বেগে বওয়ার দরুণ পাড় কিছুটা ধ্বসে গেল ও আড়ভাবে পাতা শুকনো মোটা গাছটির কাণ্ডও ভেসে গেল। তখন দরকার হ'ল পাড় মজবুত করা আর যাতে জলে ধুয়ে বা ধ্বসে না যায় তার ব্যবস্থা করা। পাড়ে এমন কিছু বসানো দরকার যার ওপর গাছের দু'দিক্ শক্ত ক'রে বেঁধে রাখা যায়। এর ফলে এল পাড়কে মজবুত করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা।

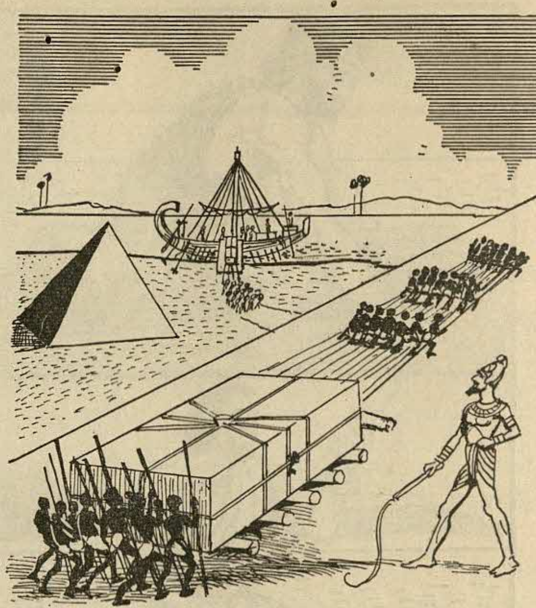
নদী যেখানে বেশী চওড়া সেখানে নদীর মাঝখানেও দু'-একটা খোঁটা পোঁতার কথাও তারা ভাবতে লাগল। এমনি করেই সেতুর গঠনেরও ধীরে ধীরে উন্নতি হ'তে লাগল।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর একটি বড় আবিষ্কার—চাকা

আরও পরের যুগে গাছের গুঁড়ি আড়ভাবে কেটে প্রথম তৈরী হ'ল গোল চাকা। গুঁড়ি আড়াআড়ি কাটাতে, স্লেজের মত টেনে গাড়ী না চালিয়ে চাকার সাহায্যে এ কাজ সুরু হ'ল। মিশরের পিরামিড তৈরী করতে কত উঁচুতে ভারী ভারী পাথর তুলতে হয়েছিল বল তো? কি করে তা তোলা হ'ত শোন। মাটি দিয়ে প্রথমে ক্রমোচ্চ ঢালু জমি তৈরী করা হ'ত।



এঞ্জিনীয়ারিং-এর একটি বড় আবিষ্কার—চাকা



পাথর ঠেলে ঠেলে উঁচুতে তোলা

তারপর তার ওপর কাঠের গোল গোল রলা পেতে তার ওপর দিয়ে পাথর ঠেলে ঠেলে উঁচুতে তোলা হ'ত। মাঝে মাঝে পেছল করার জন্য জলও ঢালা হ'ত ঐ ঢালু জমিতে।

আরো অস্ত্র—আরো যন্ত্র!

এবার দরকার হ'ল কাটবার জন্য অস্ত্রের। এর কথাও তোমরা আগে পড়েছ। যেমন, প্রথমে এল পাথরের বর্শার মত জিনিস, তারপরে কুড়ুল। তারপর ক্রমে ক্রমে পাথরের বদলে ধাতুর আবিষ্কার হ'ল। ধাতুর ব্যবহারের সূত্রপাত বিশেষ করে ধাতুর অস্ত্রশস্ত্রে। এর আদিপর্বে আত্মরক্ষার এবং আহার্য সংগ্রহের জন্য আঘাত করার যন্ত্র, অর্থাৎ খোঁচা দেবার অস্ত্র। পশুর দেহে তা বিঁধিয়ে দেওয়ার ফলে যাযাবর মানুষের আহারের জন্য পশুমাংসের প্রয়োজনে পশুহত্যা সম্ভব হ'ল। মৃত পশুর হাড় এবং গাছের ডালও ঘষে নিয়ে খোঁচাবার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগল।

প্রকৃতির কাছ থেকে শেখা

প্রকৃতির কাছ থেকেও মানুষ কম শেখে নি! গাছপালা, জীবজন্তু—সকলের কাছ থেকেই। যখন জঙ্গলে বেড়াতে যাও সেখানে হয়তো দেখবে এ গাছ থেকে ও গাছে লতা চলে গেছে। রঙিন ফুলে ভরে উঠেছে ওদের চূড়া, হাওয়ায় দুলছে ওদের মঞ্জরী। ভাবতে পার কেমন করে গেল লতা এপার থেকে ওপারের গাছের ডগায়? তোমাদের মধ্যে যদি কেউ



এ গাছ থেকে ও গাছে লতা চলে গেছে।

এঞ্জিনীয়ার হ'তে চাও এপার-থেকে-ওপার-যাওয়া লতা দেখে আবার নতুন করে ঝোলানো সেতুর পরিকল্পনার কথা ভাবতে পার। তেমনি ইঁদুর কি বীবরের গর্ত দেখে সুড়ঙ্গ তৈরীর কথাও ভাবতে পার না কি? নিশ্চয় পার। ছ'-কোণা খোপ পাশাপাশি সাজানো মৌচাকের চেহারা দেখে তোমরা ভবিষ্যতে ছ'-কোণা মজবুত বাড়ীর কথাও হয়তো ভেবে নিতে পার। এমনি ভাবে নানা পাখী আর পতঙ্গদের চেহারা দেখে নানা কায়দার বিমান তৈরীর কথাও ভাবতে পারা অসম্ভব নয়। যাই হোক, এবারে এস একে একে প্রাচীন যুগের এঞ্জিনীয়ারিংএর নানা শাখার একটু আলোচনা করা যাক্। প্রথমে সেতু দিয়েই সুরু করা যাক্, কেমন?

সেতু: প্রাচীন যুগ

মানুষ যেদিন নদী পার হওয়ার জন্য সেই নদীর ওপর আড়াআড়ি এক টুক্‌রো পাথর বা গাছের মোটা ডাল ফেলেছিল সেই দিনই সেতুর জন্মদিন বলা যেতে পারে। ঐ দিনটি নির্মাণ-বিদ্যার ইতিহাসেও একটা বিশেষ মনে রাখবার দিন। কত রকমের যে সেতু আজ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে তা তোমাদের এখন জানবার কথা নয়। কেবল তাদের ছবি দেখা, কোথাও বা চোখে দেখা। আমার এক আমেরিকান বন্ধু অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কলকাতায় তোমার সবচেয়ে কোন্ জিনিসটা মনে লাগে?" তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন,—"কলকাতা থেকে শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যাবার পথে নদীর ওপর বিরাট হাওড়া ব্রীজ।" আমি তাঁকে বলেছিলাম, "যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের একটি ছাড়া এত বড় সেতু আর নেই। আছে কানাডায়, আছে যুক্তরাজ্যে।"

সেতুর সাধারণ আদি পুরুষ হ'ল গাছের ডাল বা পাথরের একটি পাটা। কিন্তু ঝোলানো সেতুর পরিকল্পনা হয়েছে কি ভাবে তা আগেই বলেছি। বনের ভিতর এ গাছ থেকে ও গাছে লতাগুল্মগুলো কি ভাবে ঝুলে চলে যায়! তা



বানরের নদী পার হওয়া

থেকেই ওর ধারণা হয়ে থাকা বিচিত্র নয়। কিংবা, বানরের নদী পার হওয়া দেখেছ কখনও? সামনের বানরের লেজ আর পেছনের পা দু'টো ধরে শিকলের মত করে কী কৌশলে তারা নদী পার হয়! ঝোলানো সেতুর পরিকল্পনা হয়তো এই কৌশল দেখেও হয়ে থাকতে পারে। কী চমৎকার কৌশল! বানরের জলে বেজায় ভয়, তাই কেমন কায়দা ক'রে নদী পার হয়ে পালাচ্ছে ওরা! ভারি মজার নয় কি? আর তোমরা তাই থেকে পেলে কিনা শিকল বেঁধে বেঁধে এক রকম ঝোলানো সেতু তৈরী করার কায়দা!

রামায়ণেও সেতু তৈরীর কথা বলা হয়েছে। সে গল্প তোমরা সবাই জান।

রামায়ণে আছে বিশ্বকর্মাপুত্র নল ছিলেন সুগ্রীবের সহচর। আসলে তিনি কিন্তু একজন মস্ত এঞ্জিনীয়ার। তিনিই গাছের ডাল-পালা আর পাথর ফেলে ফেলে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঐ বিরাট সেতু তৈরী করার পরিকল্পনা করেন। তাই ঐ সেতুটিকে নল সেতুও বলে। রামায়ণে বলা হয়েছে এই সেতুটি লম্বায় হয়েছিল একশ' যোজন। মহাকবিদের লেখায় অঙ্কের খাঁটী হিসেব না মিললেও ঐ সেতু যে খুব লম্বা ছিল সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই। কেন না আজও ভারত ও লঙ্কার দূরত্ব মাপা যায় এবং গেছেও।

একের ওপর আর একটি পাথর সাজাবার সময় ওপরের পাথর নীচের পাথরের চেয়ে একটু এগিয়ে সাজিয়ে সেতু তৈরী করা সম্ভব। দু'দিক্ থেকে একটু একটু করে এগিয়ে যখন মাথায় মাথায় এক হয়ে যাবে তখন তাকে এক রকম সেতু বলা হয়। পাশ থেকে দেখলে তখন অশ্বত্থ পাতার মত দেখতে হবে।

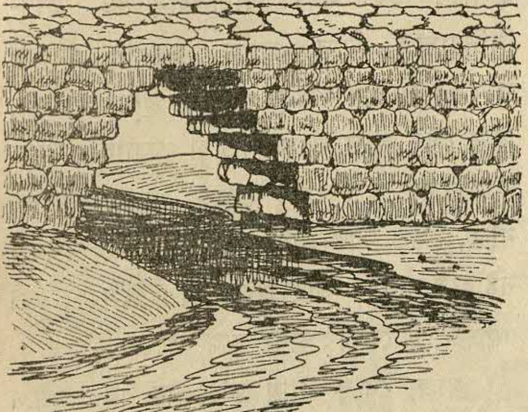
খিলেন-সেতু আর ভাসা-পুল

আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে ইউফ্রেতিস নদীর ওপর ব্যাবিলন বলে এক প্রাচীন সহর ছিল। সেই ইউফ্রেতিস্ নদী পার হবার জন্য ছুঁচালো ধরনের একটি খিলেন-সেতু তৈরী করা হয়েছিল। সেই সেতু নাকি ছিল ৬৬০ ফুট লম্বা অর্থাৎ এখনকার নতুন মাপে



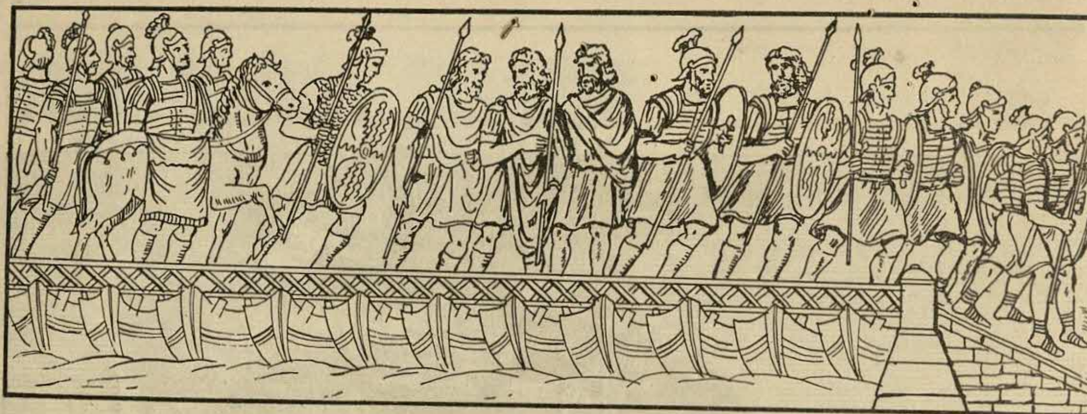
নল সেতু

২০০ মিটারের কিছু বেশী এবং চওড়ায় ৩৬ ফুট বা ১১ মিটার।



পাথর সাজাবার সময় ওপরের পাথর নীচেরটার চেয়ে একটু এগিয়ে সাজিয়ে সেতু তৈরী করা সম্ভব।

কিন্তু সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদী পার হয়ে যাবার সময় খুব-তাড়াতাড়ি-তৈরী-করা ভাসা-পুলই সুবিধাজনক। জানা গেছে অতি প্রাচীন কালে যখন মহাবীর জারেক্সেস্ (Xerexes) হেলেস্পণ্ট প্রণালী পার হবার জন্য পাশপাশি দু'টো আলাদা সেতু নির্মাণ করান তখন একটিতে ৩৬০টি নৌকো ও অপরটিতে ৩১৪টি নৌকো ব্যবহার করেছিলেন। দরায়ুস্ যখন সিরিয়া জয় করতে বেরোন, পথে পড়ল বস্‌ফরস্ প্রণালী ও দানিয়ুব নদী। সেই সময় তিনি নৌকোর ভাসা-পুল তৈরী করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে পার হয়ে চলে যান। তোমরা দেখ নি, কিন্তু এই সেদিনও, যেখানে আজ হাওড়া পুল তার দক্ষিণ দিকে, একটি বিখ্যাত ভাসা-পুল ছিল। সারি সারি নৌকোর ওপর ভাসানো পোনটুন ব্রীজ। সেই পুল দিয়ে হাওড়া থেকে কলকাতায় লক্ষ লক্ষ লোক ও গাড়ীঘোড়া যাতায়াত করত। বিশ্ববিজেতা আলেকজান্দার বা সেকেন্দার শাহ্ একবার সিন্ধুর এক শাখা-নদীর (Oxus) ধারে এসে দেখেন যে খরবেগে জল বয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, কি করা যায়। তখনকার দিনে



মহাবীর জারেক্সেস্ নৌকো দিয়ে ভাসা-পুল তৈরী করে সসৈন্যে নদী পার হলেন।

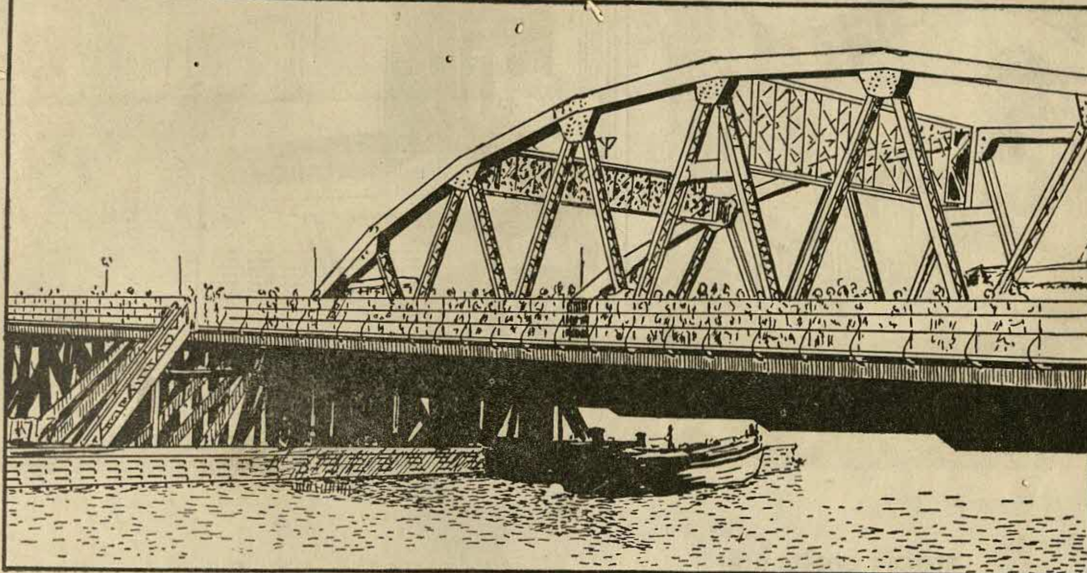
রাতের বেলা সৈন্য থাকার জন্য বড় বড় চামড়ার তাঁবু ব্যবহার করা হ'ত। কাছাকাছি নৌকোর সন্ধান না পাওয়ায় তিনি হুকুম দিলেন যে তাঁবু খুলে, তাঁবুর চামড়ার ভেতর খড় পূরে ভাল করে বেঁধে, যাতে জল ঢুকতে না পারে এমন বিকল্প নৌকো তৈরী করা হোক। তাই করা হ'ল। সেই চামড়ার খড়-পোরা পুঁটুলি ভাসিয়ে নদী পার হয়ে গেল সৈন্যেরা।

কাঠের পুল

আগেকার দিনে সহরকে রক্ষা করার জন্য চারদিকে পরিখা কাটা হ'ত। আবার সেই পরিখা পার হবার জন্য যেখানে সহরের রাস্তা এসে পড়েছে সেখানে কাঠের পুল তৈরী করা হ'ত। কাঠ দিয়ে তৈরী করার প্রধান কারণ হচ্ছে শত্রুর আক্রমণের সময় দরকার হলে যাতে সহজে ভেঙ্গে ফেলা যায় বা পুড়িয়ে দেওয়া যায়। প্রাচীন রোমের এক গাথা থেকে সেই পরিখার ওপর সেতু ফেলার একটি কাহিনী তোমাদের বলছি।

একবার লার্স পোরসেনার সৈন্যেরা রোম আক্রমণ করল। সৈন্যেরা যখন রোমের দিকে এগুচ্ছে, তখন খবর পেয়ে রোমের নগর-পিতারা তাড়াতাড়ি পরিখার ওপরকার কাঠের সেতু ভেঙ্গে ফেলবার আয়োজন করলেন। ঠিক হ'ল বীর হোরেশাস্ ডাইনে ও বাঁয়ে দু'পাশে দুই সঙ্গী লারসিয়াস্ ও হারমিনিয়াসকে নিয়ে রোমে ঢুকবার বিরাট ফটকের সামনে সেতুর ওপর যুদ্ধ করবেন, আর সেই সময় নগর-পিতারা তলায় সেতুর কাঠগুলো কেটে সেতু ভেঙ্গে ফেলে দেবেন নীচে, যাতে তাড়াতাড়ি সহরে ঢোকার পথটি নষ্ট হয়ে যায়। তাই করা হ'ল। সে কাহিনী আজও লোকে বিস্ময়ের সঙ্গে পড়ে।

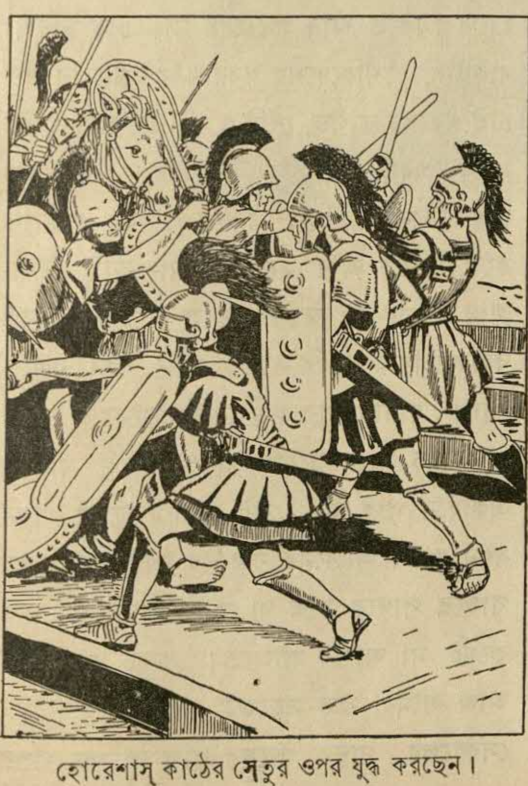
আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে রোমের সর্বাধিনায়ক জুলিয়াস সিজারের রাজত্বকালে মাত্র একদিনে সেয়োন নদীর ওপর একটি সেতু তৈরী করা হয় সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাবার জন্য। তখনকার দিনে সাধারণতঃ সেতু তৈরী করা হ'ত কাঠ দিয়ে। যীশু খৃষ্টের জন্মের ৫৪ বছর আগে সিজারের সৈন্যেরা রাইন নদীর ওপর ১৪০০ ফুট লম্বা এক সেতু



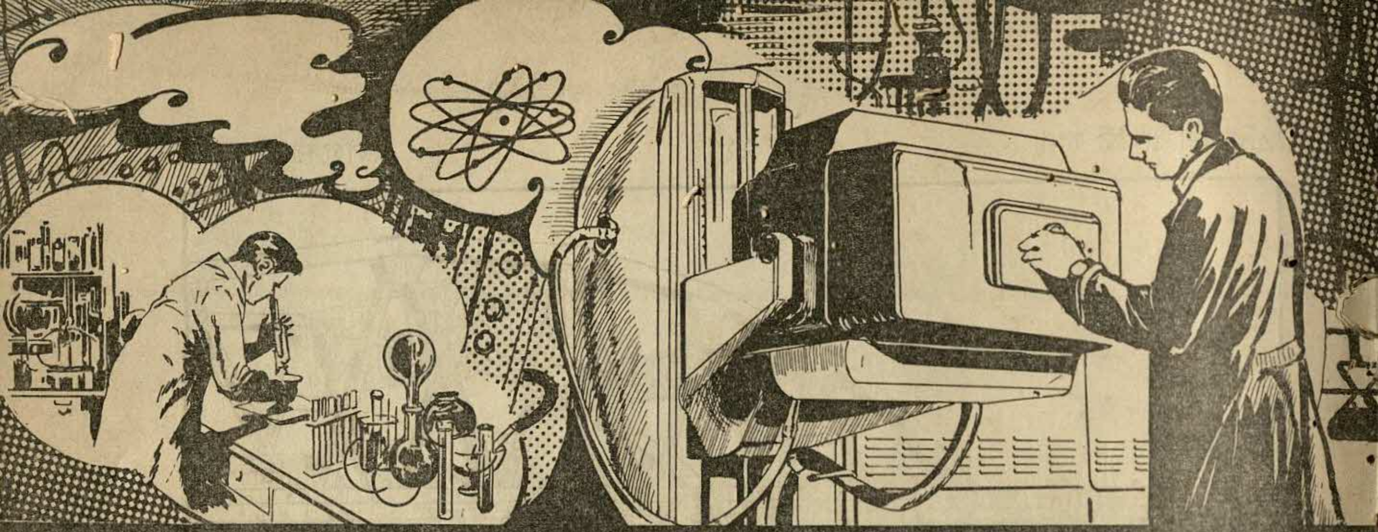
পুরোনো হাওড়ার পুল

তৈরী করেছিল। ১০৮ খৃষ্টাব্দে দানিয়ুব নদীর ওপর ট্রোজানরা একটি সেতু নির্মাণ করে। নদীর জলের ওপর স্তম্ভের সংখ্যা ছিল কুড়িটি। প্রকৃত সেতু-অংশটি নদীর জল থেকে ছিল ১৫০ ফুট উঁচুতে। দুই স্তম্ভের মধ্যেকার ফাঁক ছিল ১৭০ ফুট। সেতুর বেলা একে বলা হয় সেতুর 'উত্তার' বা 'জ্যা'। প্রাচীন কালে বহু পাথরের টুকরো দিয়ে খিলেন-সেতুও তৈরী হ'ত। রিমিনি (Rimini) নদীর ওপর যে পাঁচটি খিলেন দেওয়া সেতু তৈরী হয়েছিল সেই সেতুর ওপর দিয়ে পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তাও চলে গিয়েছিল। মিশর দেশে আলেকজেন্দ্রিয়ার কাছে 'তাওস' নদীর ওপর ছ'টী খিলেনের ওপর ছ'শ' ফুট লম্বা এক সেতু তৈরী হয়েছিল প্রাচীন কালেও।

প্রাচীন কালের সেতু সম্বন্ধে তোমাদের একটু আভাস দিলাম। এর পরবর্তী খণ্ডে আমরা ঐ সময়কার অন্যান্য এঞ্জিনীয়ারিং কৃতিত্বের কথাও শোনাব।



হোরেশাস্ কাঠের সেতুর ওপর যুদ্ধ করছেন।

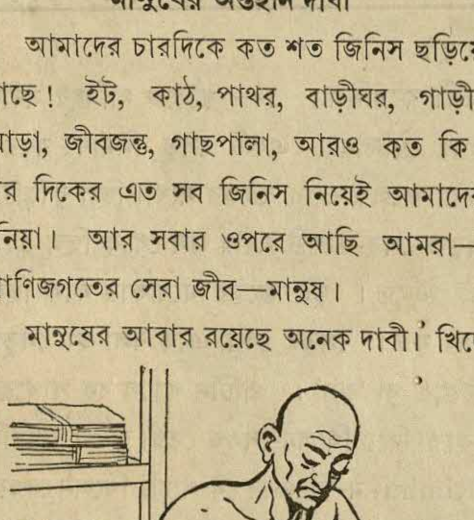


সাধারণ বিজ্ঞানের কথা

মানুষের অন্তহীন দাবী

আমাদের চারদিকে কত শত জিনিস ছড়িয়ে আছে! ইট, কাঠ, পাথর, বাড়ীঘর, গাড়ী-ঘোড়া, জীবজন্তু, গাছপালা, আরও কত কি! চার দিকের এত সব জিনিস নিয়েই আমাদের ছুনিয়া। আর সবার ওপরে আছি আমরা—প্রাণিজগতের সেরা জীব—মানুষ।

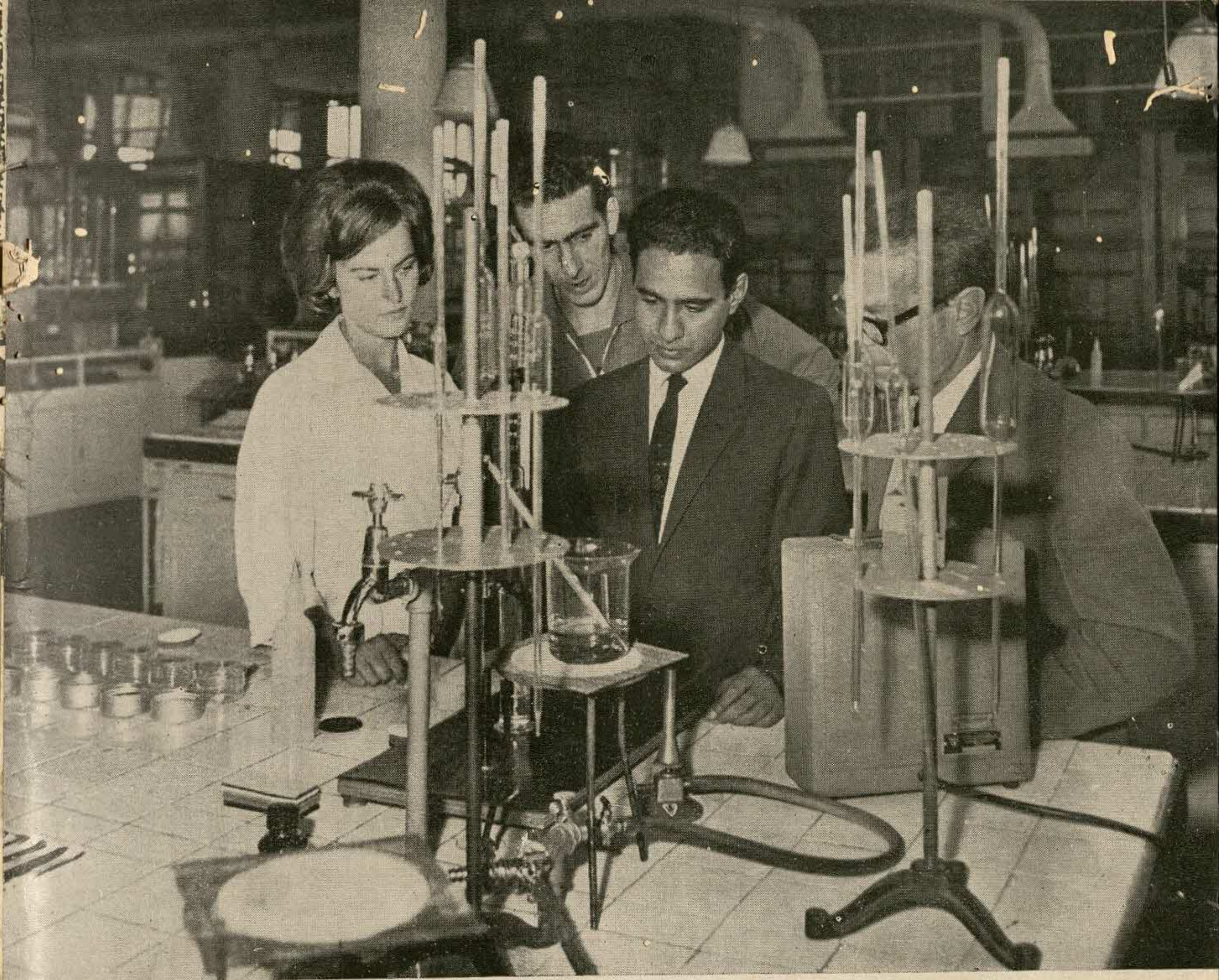
মানুষের আবার রয়েছে অনেক দাবী। খিদে



এখন আর এ ভাবে লিখতে মন চায় কি ?

পেলে খাবার চাই, লজ্জা আর শীত নিবারণের জন্য চাই কাপড়চোপড়, অসুখ করলে চাই ওষুধ, চলাফেরা করার জন্য চাই রকমারি গাড়ী, অন্ধকার তাড়াবার জন্য চাই আলো। হাতে লিখতে আর মন চায় না—চাই টাইপ-রাইটার, দেশবিদেশের খবরাখবর জানবার জন্য চাই খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন। মাঝে মাঝে অবসর-বিনোদনও দরকার। তার জন্য চাই সিনেমা, টকি। বিদেশে খবর পাঠাতে হলে চিঠিতে আর মন ভরে না—চাই টেলি-গ্রাম। তেমন জরুরী হলে টেলিফোনেও কলকাতায় বসে বিলেতের সঙ্গে কথা বলতে পার। দাবীর আর অন্ত নেই মানুষের!

অথচ এত সুযোগ-সুবিধা কিন্তু আমরা একদিনে পাই নি। সেই আদিম যুগের মানুষ যখন প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখল তখন সে পাথরে পাথরে ঠুকে বা কাঠে কাঠে ঘষে কত কষ্টেই না আগুন জ্বালাত! অথচ ও কাজটি আজ আমরা কত সহজেই না করে থাকি! সেকালের মানুষ গাছের ছাল বা বন্য পশুর



একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার



তাই লেখার বদলে এল টাইপ রাইটার।

চামড়া দিয়ে শীত থেকে রেহাই পেত, আর আজ আমরা গরম কোট, গরম স্যুট, শাল-দোশালা, ড্রেসিং-গাউন—কত কি প'রে আরামে চলাফেরা করি! সেকালে অসুখ হলে দেবতার কাছে রোগ নিরাময়ের জন্য পূজো দেওয়া হ'ত, অশিক্ষিত লোকেরা ওঝা ডাকত; আর আজ কত রকম ওষুধই না বেরিয়েছে! পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, অরিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন! দরকার হলে মগজ ফুঁড়ে, হৃৎপিণ্ড কেটে, নকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লাগিয়ে দিতেও ডাক্তারেরা কসুর করেন না। সুবিধা আজকাল আমাদের অনেক। কিন্তু এ সব সুযোগ-সুবিধায় এসে পৌঁছতে বহু লোকের বহু দিনের বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছে। আর ঐ থেকেই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান—এ যুগের মহাশাস্ত্র।

বিজ্ঞান কা'কে বলি

বিজ্ঞান শব্দটির আসল অর্থ কি? বি—কিনা বিশেষ জ্ঞান, তাই হ'ল বিজ্ঞান। এক কথায়, যে ছুনিয়ায় আমরা বাস করি তার প্রতিটি ব্যাপার সম্বন্ধে সুষ্ঠু চিন্তা এবং সে চিন্তানুযায়ী কাজ—এ ছু'টির যোগফলই হ'ল বিজ্ঞান। এর ইংরেজী হ'ল 'সায়ান্স'। এই সায়ান্স শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ থেকে—যার মানে 'জানা'। আমাদের চারদিক্কার ছুনিয়ার ব্যাপারস্যাপার সম্বন্ধে আমরা বহুদিন ধরে সঠিক জানবার চেষ্টা করছি। তাকেই আমরা বলি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাও কিন্তু দিন দিন পালটে যাচ্ছে। কারণ



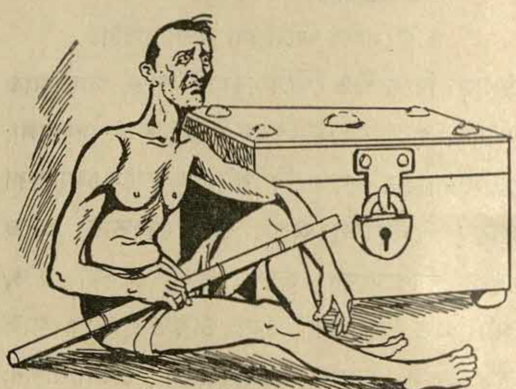


শীত নিবারণ—সেকালে আর একালে

এই চিন্তাধারা ভিত্তি করে রয়েছে কতগুলো বিশ্বাসের ওপর। আর এ সব বিশ্বাস মানুষ ব্যাখ্যা করছে প্রাকৃতিক কতগুলো নিয়ম এবং শৃঙ্খলার সাহায্যে। নতুন-পাওয়া তথ্য এই বিশ্বাসকে মাঝে মাঝে উল্টে দেবে এ আর এমন কি বিচিত্র কথা?

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দু'টি। প্রথম হচ্ছে, জড় এবং জীব সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে হবে, কারণ জড় আর জীব নিয়েই হচ্ছে সৃষ্টি। জড় আর জীব কা'কে বলে তা তোমরা আগেই শুনেছ—গাছপালা, জীবজন্তুর কথায়। সৃষ্টির মূলে রয়েছে বৈচিত্র্য। রসায়নবিদ্ সে বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন যুগযুগান্ত ধরে। তাঁরা বলছেন, যে-কোন বস্তুই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে অণু (বা মলিক্যুল্), পরমাণু (বা অ্যাটম্) আর আয়ন্। এ সবের মধ্যে নানা রকম যোগবিয়োগ ঘটেই তৈরী হয়েছে এই দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু। আবার পদার্থবিদ্ প্রকৃতির নানা শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে চলেছেন। আলো, শব্দ, উত্তাপ, বিদ্যুৎ—এরা নানা ধরনের শক্তি, এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে কাজ করবার ক্ষমতা। শুধু তাই নয়, চেষ্টা করলে এদের যে কোন একটি শক্তিকে অন্য যে কোন একটি শক্তিতে বদলে ফেলা যায়। জ্যোতির্বিদের কাজ এ পৃথিবীকে নিয়ে নয়, তাঁর কাজ-কারবার হ'ল আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, আকাশ-চারী আরও সব বাসিন্দাদের নিয়ে। ভূতত্ত্ববিদ্ ভাবছেন, আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটা কি দিয়ে তৈরী, এর ভেতরে, বাইরে কোথায় কি রয়েছে এ সব কথা। পৃথিবীর চারদিক্কার যে বায়ুমণ্ডল সে সম্বন্ধে খোঁজ করে চলেছেন আবহতত্ত্ববিদ্। জীববিজ্ঞানীর কাজ এই পৃথিবীর জীবজন্তু নিয়ে, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীর কাজ গাছ-পালা নিয়ে। তেমনি মনস্তত্ত্ববিদ্ মানুষের মনের খবর নিয়ে ব্যস্ত। প্রাণিজগতে মানুষ এল কোথা থেকে—ভাবছেন নৃতত্ত্ববিদ্। এমনি ভাবেই গড়ে উঠছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা।

কিন্তু দুনিয়ার সব কিছু সম্বন্ধে শুধু মাত্র জেনেই বিজ্ঞানের কাজ শেষ হ'ল না। যে জ্ঞান অর্জন করা হ'ল তা মানুষের সুখসুবিধার কাজে লাগাতে হবে। এই হ'ল বিজ্ঞানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে একটা গল্প মনে পড়ছে।



দিনরাত পাহারা দিত।

একটা লোকের ছিল কিছু টাকা। লোকটি তা সিন্ধুকে আটকে দিনরাত পাহারা দিত। খাবার নেই, উপোস করে থাক; পয়সা খরচ করা চলবে না। জামা নেই, শীতে কষ্ট পাও; পয়সা খরচ করে জামা কেনা চলবে না। অসুখ করেছে, ভোগ; বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে, মর। কিন্তু ওষুধ কিনতে পয়সা খরচ? নৈব নৈব চ। এ হেন লোকের যা হবার তাই হ'ল। লোকটি সত্যিই একদিন মরল। সংসারের আর সব তো আগেই গেছে, টাকাপয়সা তার কোন্ কাজে লাগল বল তো?

বিজ্ঞানের বেলায়ও ব্যাপার অনেকটা এই রকমই। ছুনিয়ার সব কিছু জেনেশুনেও তা যদি মানুষের সুখসুবিধার কাজে লাগানো না যায় তবে সে জ্ঞানে কি লাভটা হবে বল তো? তাই প্রকৃতির রহস্যের আবরণ খুলে বিজ্ঞানী তাঁর লব্ধ জ্ঞান মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কাজেই লাগান। তাই বলছিলাম, বিজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল এই ভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগানো।

বিজ্ঞানের নানা শাখা ও মূল তত্ত্ব

এই সব রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে এবং তাই থেকে পাওয়া জ্ঞানকে মানুষের হাজারো রকম সুখসুবিধার কাজে লাগাবার জন্য বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে নানা শাখায় ভাগ করেছেন। বর্তমান যুগে মানুষের মত বাস করতে হ'লে এর সবগুলি সম্বন্ধেই খানিকটা মোটামুটি ধারণা থাকা উচিত এবং আমরাও এর আগে তাদের কয়েকটি সম্বন্ধে অল্পস্বল্প আলোচনা করেছি। যত রকম বিজ্ঞান আছে তার মধ্যে গণিত বা অঙ্ক একটি প্রধান স্থান দখল করে আছে। তার সম্বন্ধেও আমরা এর আগে কিছুটা আলোচনা করে নিয়েছি। এবারে "সাধারণ বিজ্ঞান" বলতে আমরা প্রধানতঃ রসায়ন আর পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধেই আলোচনা করব। অবশ্য এ রকম করার পেছনে তেমন চুল-চেরা যুক্তি হয় তো নেই, তবু বিজ্ঞানের এ ছু'টি শাখাকেই বলা হয় মূল বিজ্ঞান বা 'বেসিক সায়ান্স'। অবশ্য অঙ্কও এরই মধ্যে পড়ে। বাকিগুলিকে পণ্ডিতেরা বলেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা 'ন্যাচারাল সায়ান্স'। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, আবহাওয়া-তত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি হরেক রকম বিষয় আছে ওর মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়—বিশেষ করে মূল বিজ্ঞান বা বেসিক সায়ান্সের বিষয়গুলি কারো কারো কাছে একটু কঠিন লাগতে পারে। কারণ এদেশে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সব কথাবার্তা, চলাফেরা, ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তা'তে বিজ্ঞানকে আমরা এ যাবৎ তেমন প্রাধান্য দেই নি। সুতরাং বিজ্ঞানের অতি সাধারণ নিয়মগুলি,—যাকে আমরা বলতে পারি বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ, তার সঙ্গেও আমাদের অনেকের তেমন ভাবে পরিচয় নেই। অথচ বিজ্ঞান বুঝতে গেলে তা নিতান্তই দরকার। এ সম্বন্ধে ইউক্লিডের সেই গল্পটি মনে পড়ছে।

ইউক্লিডের গল্প

ইউক্লিডের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আমাদের স্কুলে আজ পর্যন্ত যে ধরনের জ্যামিতি পড়ানো হয় তা ইউক্লিডেরই আবিষ্কার, তাই তাকে বলা হয় 'ইউক্লিডের জ্যামিতি'। যীশু খৃষ্টের জন্মেরও প্রায় ৩০০ বছর আগে ইনি বিশেষ গণিতজ্ঞ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেকালে আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরটি ছিল জ্ঞান-চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। নগরটির নাম থেকেই তোমরা হয়তো আন্দাজ করতে পারবে যে এ নগরটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী আলেক্‌জান্দার। আলেক্‌জান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য নানা ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

মিশরের অংশ পড়ে ম্যাসিদোনিয়ার একজন সেনাধ্যক্ষের ভাগে। এঁর নাম টলেমী। ইনি যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা বহুদিন মিশরে রাজত্ব করেন। যীশু খৃষ্টের জন্মের ৩০ বছর আগে এই বংশের শেষ রাণী ক্লিয়োপেট্রার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

টলেমী বংশের প্রথম শাসক প্রথম টলেমী সোটার আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরে একটি বিখ্যাত মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সব রকম বিষয় নিয়েই চর্চা হ'ত। এই মিউজিয়ামে ছিল বিরাট একটি গ্রন্থাগার। এখানে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি শিক্ষা এবং গবেষণা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই মিউজিয়ামেরই একজন অধ্যাপক ছিলেন ইউক্লিড। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ (ইংরেজী নাম 'এলিমেণ্ট্‌স্ অফ্ জিওমেট্রী') এখানেই রচিত হয়। এর বিষয়বস্তু এতটা নির্ভুল ছিল যে আজ পর্যন্তও তা আমাদের শিখতে হচ্ছে।

ইউক্লিডের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি মুখে মুখে। তবে সাধারণ লোক তাঁর জ্যামিতি পড়ে রস পায় না, কারণ বিষয়টা বড়ই কাঠখোট্টা। সম্ভবতঃ সম্রাট্ নিজেও তা উপলব্ধি করছিলেন, আর সাধারণ লোকের কথাবার্তাও তাঁর কানে



"শিক্ষার ব্যাপারে রাজকীয় পথ বলে কিছু নেই।"

আসছিল। তাই তিনি একদিন ইউক্লিডকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসলেন, "আচ্ছা, আপনার বই-এ জ্যামিতিটা যে ভাবে লিখেছেন তার চেয়ে সহজ ভাবে ওটা শিখবার কোন উপায় নেই কি?"

ইউক্লিড সবিনয়ে জবাব দিলেন, "না মহারাজ, রাজাদের জন্যও জ্যামিতিতে কোনও সহজ উপায় তৈরী হয় নি। শিক্ষার ব্যাপারে রাজকীয় পথ বলে কিছু নেই।" [ইংরেজ ইতিহাসকার কথাটা এই ভাবে লিখেছিলেন—'In geometry, there is no short cut for kings. There is, Sire, no royal road to learning.']

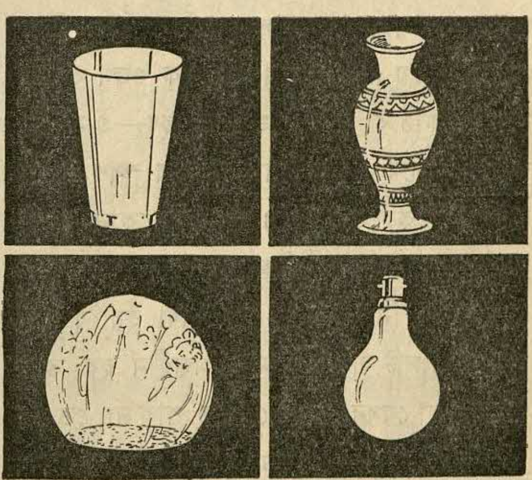
ইউক্লিড তাঁর জ্যামিতি সম্বন্ধেই কথা ক'টি বলেছিলেন, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোন শাখা সম্বন্ধেই কথা ক'টি হুবহু খাটে। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে এর চেয়ে সত্যি কথা আর নেই।

তাই বলছিলাম, বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের কয়েকটি অতি সাধারণ মূল তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। তবেই না জ্ঞান-দুর্গের ফটক আপনা আপনি খুলে যাবে আমাদের কাছে!

পদার্থ ও অপদার্থ

আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়। চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক্। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাকের সাহায্যে গন্ধ পাই, জিভ দিয়ে কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করি আর ত্বক্ দিয়ে আমাদের স্পর্শানুভূতি জাগে। দুনিয়ায় এ ক'টি ব্যাপার ছাড়া আর কিছু আছে কি? আছে, কিন্তু আমাদের ঐ পাঁচটি ইন্দ্রিয় অচল হলে সব কিছুরই অস্তিত্ব অর্থহীন। এই যে বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট ইত্যাদি, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছু—এ সব নিয়েই তো আমাদের দুনিয়া। আর এই দুনিয়াকে ভাল ভাবে বুঝবার জন্যে—এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করবার জন্যেই বিজ্ঞান।

মানুষ, পশু, কাঠ, পাথর, সমুদ্র, বাতাস, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র—এ সবই দেখতে আলাদা। এক টুকরো পাথর আর এক গ্লাস জলের মধ্যে কতই না পার্থক্য! এগুলো আমরা চোখে দেখতে পাই—ছুঁয়ে এদের অবস্থিতি বুঝতে পারি। এই যে দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ আলাদা জিনিস—চেহারায় আলাদা, ব্যবহারে আলাদা—রীতিনীতিতে আলাদা,—বিজ্ঞানীরা কিন্তু এ সব কিছুকেই একটি মাত্র কথার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। কথাটি হ'ল 'পদার্থ'—ইংরেজীতে একে বলে 'ম্যাটার'। ম্যাটারের বাংলা



গ্লাস, ফুলদানী, পেপার-ওয়েট, বিজলি-বাতির বাল্ব্—সবই এক কাচ থেকে তৈরী

প্রতিশব্দ হিসেবে অনেকে 'বস্তু' কথাটিও ব্যবহার করে থাকেন। যেমন কাচ একটি পদার্থ। কাচ দিয়ে একটা গ্লাস তৈরী হ'ল, তৈরী করা হ'ল একটা ফুলদানী, একটা পেপার-ওয়েট, একটা বিজলি-বাতির বাল্‌ব্। এগুলি সবই আলাদা আলাদা জিনিস—চেহারায়, ব্যবহারে, সকল বিষয়ে। কিন্তু এদের সকলেরই মূল পদার্থটি হচ্ছে কাচ। অবশ্য 'মূল' কথাটি ব্যবহার করা এখানে বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। কারণ কাচও আবার তৈরী হয়েছে অন্য কয়েকটি মূল পদার্থ দিয়ে; আবার সে মূল পদার্থগুলোও ভেঙ্গে ফেলে অন্য ধরনের জিনিস মেলে,—যাকে আমরা বলি পদার্থের উপাদান। সে যাই হোক, কাচের কথায়ই আবার ফিরে আসা যাক। ফুলদানী, কাচের গ্লাস, পেপার-ওয়েট—এরা সকলে কাচেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র।

তা হ'লে পদার্থ বলতে আমরা কি বুঝি? বিজ্ঞানী বলেন, পদার্থ খানিকটা জায়গা নিয়ে থাকে; পদার্থকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরাতে হলে খানিকটা শক্তির প্রয়োজন হয়; তা ছাড়া ওদেরকে ওজন করাও যায়। কাঠ বা পাথর, জল বা দুধ—এ সবকে আমরা চোখে দেখতে পাই, আবার স্পর্শ দিয়ে অনুভবও করতে পারি। অবশ্য কোন গ্যাস অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থকে এক কথায় 'পদার্থ' বলে মেনে নিতে একটু অসুবিধা হয় বৈ কি! কারণ গ্যাসটি যদি বর্ণহীন বা গন্ধহীন হয় তবে তা আমরা যেমন চোখে দেখতে পাই না, তেমনি আবার তার গন্ধও পাই না। তবে হ্যাঁ, বায়বীয় পদার্থ যখন চলতে থাকে তখন তার অস্তিত্ব আমরা টের পাই; অনেক সময় বায়বীয় পদার্থ



অনেক সময় বায়বীয় পদার্থ তার অস্তিত্ব ভাল ভাবেই টের পাইয়ে দেয়।

তার অস্তিত্ব আমাদের ভাল ভাবেই টের পাইয়ে দেয়,—যেমন ঝড়ের সময়ে হয়।

পদার্থের আসল রূপ

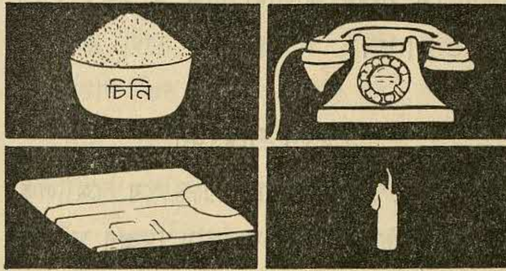
বেশ, এবারে আর কয়েকটি জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখা যাক। আমার সামনে রয়েছে এক বাটি লোণা সমুদ্রের জল, খানিকটা কন্‌ক্রিট, একটুকরো লোহা, একটু দুধ, একটু সাবান, কিছু মাখন, রক্ত, একটি মানুষের দাঁত, একটা ছাগলের চামড়া, আর বাতাস। আগেকার সূত্র অনুযায়ী এগুলির সবই তো পদার্থ। পার্থক্যটা কোথায় তা হলে?

এক বাটি সমুদ্রের জল, দেখলে মনে হয় শুধু জলই, কিন্তু গরম করে জলটা তাড়িয়ে দিলে বাটির তলায় পড়ে থাকে সাদা সাদা নানারকম লবণ—আমরা রান্নাবান্নায় যে লবণ ব্যবহার করি তাও আছে এর মধ্যে। তোমরা বলবে, কেন, পদার্থের তিনটি অবস্থা—কতকগুলি কঠিন, কতকগুলি তরল, কতকগুলি বায়বীয়। এ ভাবেই তো পদার্থের পার্থক্য বোঝা যায়! কিন্তু

লোহা, কন্‌ক্রিট, সাবান, কাঠ—সবই তো কঠিন! তবে কি করে বুঝব এদের তফাৎ কোথায়? সমুদ্রের জলের কথাই ধরা যাক না! বাইরে থেকে সমুদ্রের জলের যে চেহারা দেখা যাচ্ছে সেটাই তার আসল রূপ নয়। বাইরের ও খোলসটার মধ্যে লুকিয়ে আছে তার আর একটি রূপ। সেটাই হ'ল তার আসল রূপ। এই যে লবণ আমরা খাই তা তেমন করে ভেঙ্গে ফেলতে পারলে দেখা যাবে যে ওর ভেতরেও রয়েছে সোডিয়াম নামে একটি কঠিন পদার্থ, আর ক্লোরিন নামে একটি রঙিন গ্যাস।

বিজ্ঞানী পদার্থের এই আসল রূপটাই খুঁজে বেড়ান। বহুদিন ধরে এ খোঁজার কাজ চলছে। তাঁরা খুঁজেটুজে বলছেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এত জিনিস, কিন্তু তার মধ্যে সত্যিকার মূল পদার্থ রয়েছে মাত্র একশ'র কিছু বেশী। তাঁরা এদের নাম দিয়েছেন মৌলিক পদার্থ বা এলিমেণ্ট। আর এই সব মৌলিক পদার্থেরা এক বা একাধিক মিলে-মিশে তৈরী করেছে এই দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থ। লোহা, তামা, সোনা, রূপো, অ্যালুমিনিয়াম, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, পারদ, ক্লোরিন, ব্রোমিন—এরা সকলেই এক একটি এলিমেণ্ট। আমাদের এই পৃথিবীর আবরণটা তৈরী হয়েছে অক্সিজেন, সিলিকোন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, কার্বন, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, নিকেল—প্রধানতঃ এই ক'টি মৌলিক পদার্থ বা এলিমেণ্ট দিয়ে। বায়ুর মধ্যে প্রধানতঃ রয়েছে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন, আর জলের মধ্যে রয়েছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—সব ক'টিই গ্যাস। জ্যোতির্বিজ্ঞানী আকাশের সূর্য-চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যেও এর প্রায় সব রকম মৌলিক পদার্থকেই খুঁজে পেয়েছেন। এখানে আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্য করবার মত। স্বাভাবিক অবস্থায়ই মৌলিক পদার্থের কতকগুলি কঠিন, কতকগুলি তরল আর কতকগুলি গ্যাস।

দু'টি বা তার বেশী মৌলিক পদার্থ একত্রিত হয়ে যে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের পদার্থ তৈরী হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে যৌগিক পদার্থ বা কম্পাউণ্ড। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—দু'টি গ্যাস। কিন্তু দু'ভাগ আয়তনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে একভাগ আয়তনের অক্সিজেন একটা বিশেষ উপায়ে মিলিত হলে তৈরী হয় জল—একটি



চিনি, টেলিফোনের রিসিভার, তুলোর জামা ও মোম—দেখতে কতই না আলাদা, কিন্তু তৈরী হয়েছে একই মৌলিক পদার্থ দিয়ে।

যৌগিক পদার্থ, সাধারণ অবস্থায় যা তরল। আমরা বলতে পারি, যৌগিক পদার্থ তৈরী করতে হলে মৌলিক পদার্থগুলির একটা বিশেষ অনুপাত এবং অবস্থা দরকার। চিনি, ব্যাকেলাইটের তৈরী টেলিফোনের রিসিভার, তুলোর কাপড়-জামা এবং এক টুকরো মোম—দেখতে কতই না আলাদা, আর এদেরকে ব্যবহারও করা হয় এক একটাকে এক একটা বিশেষ ধরনের কাজে। চায়ে চিনি গুলতে হয়, গুললে চা মিষ্টি হয়; কিন্তু চায়ে চিনির বদলে খানিকটা মোমের গুঁড়ো মেশালে চিনির কাজ চলবে কি?

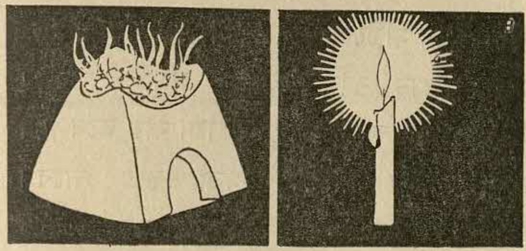
তূলোর তৈরী লেপখানা গায়ে দিলে শীত মানে, কিন্তু লেপের বদলে টেলিফোন রিসিভারটা গায়ে জড়ানো যেমন সম্ভবও নয়, তেমনি তাতে শীতও মানবে না। অথচ, মজার ব্যাপার এই যে, এ চারটি জিনিসই তৈরী হয়েছে একই মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন দিয়ে। একই মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরী, অথচ জিনিসগুলি আলাদা হবার কারণ কি? কারণটা কিন্তু সহজ। ঐ অনুপাতেরই পার্থক্য! ঐ তিনটি মৌলিক পদার্থের অনুপাত এক একটা জিনিসের মধ্যে এক এক রকম। তবে শুধু অনুপাত আলাদা হলেই যে পদার্থ আলাদা হবে তা নয়। অন্য কারণও আছে।

দু'রকম পরিবর্তন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মৌলিক পদার্থের মধ্যে বিশেষ অবস্থায় মিশ্রণ ঘটাতে পারলে যৌগিক পদার্থ তৈরী হয়। এই যে 'বিশেষ' পরিবর্তনটি ঘটে তাকে আমরা বলি রাসায়নিক পরিবর্তন বা কেমিক্যাল চেঞ্জ। একটি বদ্ধ পাত্রে যদি দু'ভাগ আয়তনের হাইড্রোজেন আর একভাগ আয়তনের অক্সিজেন নেওয়া যায় আর তার মধ্যে একটি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ চালানো যায় তবে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটবে,—সঙ্গে আলো, উত্তাপ এবং শব্দের সৃষ্টি হবে,—আর তৈরী হবে সামান্য একটুখানি জল। তা হ'লে আমরা বলতে পারি, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে একটি রাসায়নিক ক্রিয়া হয়ে একটি পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে আমরা পেয়েছি জল। কিন্তু এই যে বিশেষ পরিবর্তনটি তার বদলে যদি সাধারণ ভাবে দু'টি বা তার বেশী মৌলিক পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে তাকে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বলব সাধারণ বা ভৌতিক পরিবর্তন। ইংরেজী করে বলতে পারি 'ফিজিক্যাল চেঞ্জ'। পদার্থের মধ্যে এই জাতীয় পরিবর্তন তোমরা হরদম দেখতে পাচ্ছ। চিনির সঙ্গে খানিকটা বালি মিশে গেছে। মিশ্রণটি নিশ্চয়ই খাঁটি চিনি নেই। তবে তার 'চিনিত্ব' অর্থাৎ চিনি-চিনি মিষ্টি ভাবটাও একেবারে নষ্ট হয় নি। চিনি আর বালির এ মিশ্রণটিকে আমরা ফিজি-ক্যাল বা ভৌত মিশ্রণ বলতে পারি।

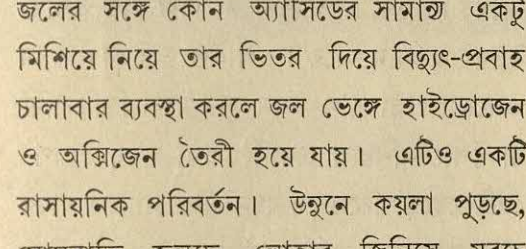
একটা সাইকেলের টায়ারে পাম্প করলে টায়ারটা ফুলে ওঠে, বেলুনে ফুঁ দিলে বেলুনটাও ফুলে ওঠে,—আকারে সে অনেক বড় হয়। আবার এক পেয়ালা জলে খানিকটা চিনি গুললে জলটা মিষ্টি লাগে। যদিও চিনিটা তোমরা দেখতে পাও না, কিন্তু চিনিটা নিশ্চয়ই মিশে আছে জলের সঙ্গে। সুইচ্ টিপলে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে ওঠে। বাতির ভিতর-কার ফিলামেণ্টের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চললেই ফিলামেণ্ট বেশ গরম হয়ে লাল টকটকে হয়ে ওঠে, তারপর সে ফিলামেণ্টই আলো দিতে থাকে আমাদের। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করে দাও, বাতিটা আর আলো দেবে না। ফিলামেণ্ট যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল। এই চারটি ক্ষেত্রেই, পরিবর্তন হ'ল ঠিকই, কিন্তু সেটা স্থায়ী নয়। এদেরই আমরা বলি ফিজিক্যাল চেঞ্জ বা ভৌতিক পরিবর্তন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, রাসায়নিক পরিবর্তনে নতুন পদার্থ তৈরী হয়, কিন্তু ফিজিক্যাল চেঞ্জে অর্থাৎ ভৌতিক পরিবর্তনে সেটি হয় না। বিশেষ ধরনে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশিয়ে



কয়লা পুড়ছে, মোমবাতি জ্বলছে—ছ'টোই রাসায়নিক পরিবর্তন।

যেমন আমরা জল পেয়েছিলাম, তেমনি আবার জলের সঙ্গে কোন অ্যাসিডের সামান্য একটু মিশিয়ে নিয়ে তার ভিতর দিয়ে বিছ্যুৎ-প্রবাহ চালাবার ব্যবস্থা করলে জল ভেঙ্গে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরী হয়ে যায়। এটিও একটি রাসায়নিক পরিবর্তন। উন্নুনে কয়লা পুড়ছে, মোমবাতি জ্বলছে, লোহার জিনিসে মরচে ধরছে—এ সবই রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ। আবার জল ফুটে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে, পাথর পিটিয়ে গুঁড়ো করা হচ্ছে, লোহাকে চুম্বকে পরিণত করা হচ্ছে—এ সবই ভৌতিক পরিবর্তন বা ফিজিক্যাল চেঞ্জ।



জল ফুটে বাষ্প হচ্ছে, পাথর পিটিয়ে গুঁড়ো করা হচ্ছে—ছ'টোই ভৌতিক পরিবর্তন।

পদার্থ কি দিয়ে তৈরী? এ প্রশ্নের জবাব তোমরা পেলে। অর্থাৎ তোমরা বলতে পার, পদার্থ তৈরী হয়েছে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ দিয়ে, যার সংখ্যা একশ'র কিছু বেশী। এরই এক বা একাধিক একটি বিশেষ ধরনে এবং বিশেষ অনুপাতে (ছ'টি বা ছুইএর বেশী মৌলিক পদার্থের মধ্যে যোগাযোগ ঘটলে) মিশে যৌগিক পদার্থ আর সাধারণ ভাবে মিশে সাধারণ মিশ্রণ তৈরী করছে। এই ছুনিয়ার সব কিছুই এমনি ভাবে তৈরী।

তবে এ ব্যাপারের এই-ই শেষ কথা নয়। কিন্তু সে কথা এখন নয়। পদার্থের গঠন-বিধি সম্বন্ধে আমরা পরের একটি খণ্ডে আরও সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করব।

শক্তি—অর্থাৎ কাজ করবার ক্ষমতা

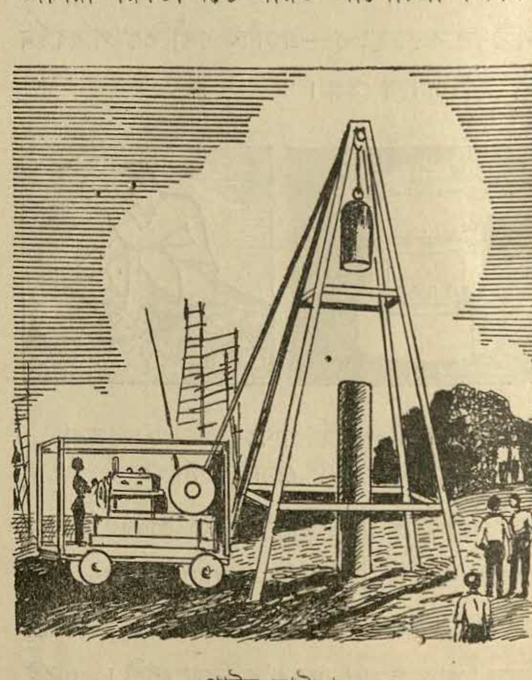
কি দিয়ে সব পদার্থ তৈরী হয়েছে এ জানাটাই কিন্তু আবার যথেষ্ট নয়। রাম বাবু একখানা নতুন মডেলের গাড়ী কিনলেন। গাড়ীটার কোন কোন অংশ ইস্পাত দিয়ে তৈরী। এর সিলিণ্ডারটি নরম লোহার, পিষ্টন-গুলো অ্যালুমিনিয়ামের। তা ছাড়া তামার তার রয়েছে অনেকটা এর বিভিন্ন অংশে। চাকাটি আবার প্লাষ্টিকের তৈরী, টায়ার রবারের। ঝকঝকে তকতকে গাড়ীখানা—চেহারা দেখে রাম বাবু তো মহা খুসী। এতগুলো টাকা খরচ সার্থক হয়েছে, মনে মনে ভাবলেন রাম বাবু। কিন্তু হরি হরি! গাড়ী যে ষ্টার্ট্ নেয় না! তা হলে গাড়ী কিনে লাভ? যদি ছেলেমেয়েরা তাতে চড়ে স্কুলে যেতে না পারল, গিন্নী বিকেলে লেকে হাওয়া খেতে যেতে না পারলেন কিংবা রাম বাবু সন্ধ্যায় তাসের আড্ডায় যেতে না পারলেন তা হলে ও সব মৌলিক পদার্থ, যৌগিক পদার্থ ইত্যাদি বড় বড় কথা শুনে কি হবে?

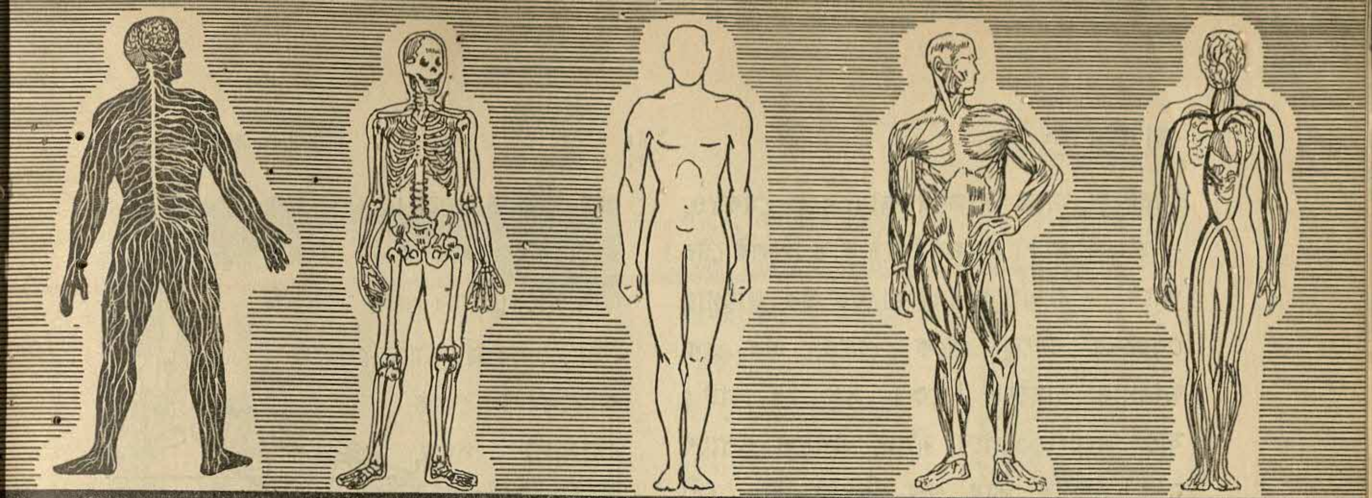
একজন বিজ্ঞানীকে বললে সে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য ভাবে বুঝিয়ে দেবে। বিজ্ঞানীর মতে গাড়ীখানা নিশ্চয়ই চলবে। চলবে, কারণ তার কাজ করবার একটা শক্তি আছে, যেমন রাম বাবুর নিজেরও আছে কাজ করবার শক্তি বা এনার্জি। তাঁর স্ত্রী তো সর্বদাই ঠাট্টা করে বলেন—"কর্তার এনার্জি অফুরন্ত!"

দু' রকমের শক্তি

সুতরাং পদার্থ কাজ করে বা কাজ করবার ক্ষমতা রাখে। এই কাজ করবার ক্ষমতাকেই বলা হয় শক্তি বা এনার্জি। কোন পদার্থ চলতে চলতে যে শক্তি অর্জন করে তাকে আমরা বলি গতিশক্তি বা 'কাইনেটিক এনার্জি'। কাইনেটিক কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'কিনিন' থেকে, কথাটির মানে হ'ল 'চলা'। একটা বন্দুকের গুলি চুপচাপ আছে, কারো ক্ষতি করা তো দূরের কথা, নড়ে বসার ক্ষমতাও নেই। কিন্তু ওকেই আবার বন্দুকে পূরে ছুঁড়ে দাও, তখন ওর তেজ দেখে কে! সে জানালা ফুটো করে দিতে পারে, মানুষ খুন করতে পারে। এ শক্তি সে পেল কোথা থেকে? পেয়েছে ঐ গতি থেকেই।

এ ছাড়া আর এক রকম শক্তিও আছে। একে বলা হয় স্থিতিশক্তি বা 'পোটেনশিয়াল এনার্জি'। এ শক্তি পদার্থের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, সুযোগ-সুবিধা পেলে সময় মত কাজ করতে পারে। ছাদের ওপর একখানা ইট আছে অনেকদিন ধরে—নির্বিরোধী, কিন্তু একটু ঠেলে দিলে ইটখানা নীচে পড়ে কার মাথা ফাটিয়ে দেবে তার কি ঠিক আছে? ইটখানা যখন মাটিতে পড়ে গেল তখন আবার তার মধ্যে কোন কাজ করবার ক্ষমতাই নেই! ইটখানা যদি আবার ছাদে তোলা যায় তবে সে আবার তার আগের ক্ষমতা ফিরে পাবে। আমরা বলতে পারি, ইটখানা তার বিভিন্ন অবস্থানের জন্য কাজ করবার ক্ষমতা বা এনার্জি অর্জন করে আছে। বাড়ী তৈরী করবার সময় পাইল ড্রাইভারের ব্যবহার তোমরা দেখেছ। এতে গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তি উভয়ই বর্তমান থাকে। পাইল ড্রাইভার যখন ওপরে তোলা হ'ল তখন তার মধ্যে স্থিতিশক্তি বা পোটেনশিয়াল এনার্জি জমা হ'ল, তারপর সেটি ছেড়ে দিলে সে যখন নীচে নামতে থাকে তখন তার মধ্যে বর্তমান থাকে দু'রকম শক্তি। পূরোপূরি নীচে নেমে এলে তার মধ্যে তৈরী হ'ল গতিশক্তি বা কাইনেটিক এনার্জি। এই শক্তি নিয়ে আমরা পরবর্তী খণ্ডে আরও আলোচনা করব।


পাইল ড্রাইভার



আমাদের শরীরের কথা

হাড় আর রক্ত-মাংসের মানুষ

জনার্দনের দুঃখের আর অন্ত নেই। সেই ছোটবেলা ফণী ডাক্তারের কথা না শুনে তার মা কেবল খাইয়ে খাইয়ে তাকে সেই যে মোটা করে তুলেছিলেন এখন স্কুলে এসে তার ভোগ সে ভুগছে। সবাই তাকে ডাকে হোঁদল কুৎকুৎ। কী বিশ্রী নাম বল তো! না হয় সে একটু মোটাই, তা বলে সে তো আর জানোয়ার নয় যে যা তা ব'লে ডাকলেই হ'ল! সেও তো রক্ত-মাংসের মানুষ!

হ্যাঁ, রক্ত-মাংসের মানুষ। তার শরীরেও তো হাড়, মাংস সবই আছে। যদিও রবীন সেদিন তাকে বলেছিল, "তুই তো একটা জেলী ফিশ্, থপ্ থপ্ করে চলিস্।"

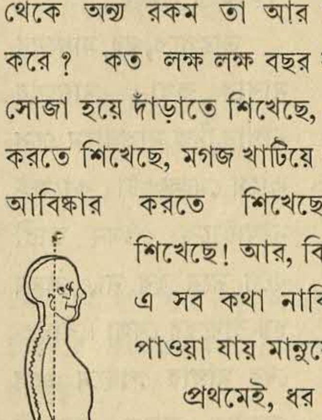
ঠাট্টা? না, না, রবীনটা ভারী বোকা। কিচ্ছু জানে না। আর জানবেই বা কি করে, তার তো আর বিনু কাকা নেই যিনি হাড়-মাংসের কথা বুঝিয়ে দিতে পারেন!

হ্যাঁ, বলুক দেখি রবীন, মানুষ কি চিরকালই মানুষ ছিল?

মানুষের হাড় আর ইতর জন্তুর হাড়

মানুষের হাড় যে আর পাঁচটা জানোয়ারের থেকে অন্য রকম তা আর রবীন জানবে কি করে? কত লক্ষ লক্ষ বছর সাধনা করে মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছে, হাত দিয়ে কাজ করতে শিখেছে, মগজ খাটিয়ে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে শিখেছে, কথা বলতে শিখেছে! আর, বিনু কাকা বলেছেন, এ সব কথা নাকি একটু খুঁজলেই পাওয়া যায় মানুষের হাড়ের মধ্যে।

প্রথমেই, ধর না কেন, মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ানো। এ কি সহজ কথা? মাছ বা কুকুর বা গরুর মত সোজা না হয়ে মানুষের



কুকুরের শিরদাঁড়া হচ্ছে সোজা, কিন্তু মানুষের শিরদাঁড়া দু'পায়ে দাঁড়ানোর সুবিধার জন্য হয়েছে বাঁকা।

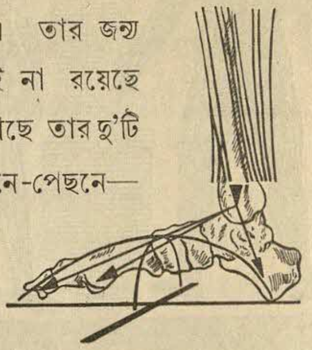
শিরদাঁড়া, যাকে ভালো বাংলায় বলে মেরুদণ্ড, —হ'ল বাঁকা। নিজের পিঠে হাত দিলেই টের পাবে। আমাদের শিরদাঁড়া এক এক জায়গায় পেছনের দিকে বেঁকে গেছে, এক এক জায়গায় সামনের দিকে। শুধু কি তাই? যাতে আমরা ওপরে নীচে, এপাশে ওপাশে নড়তে পারি তার জন্য শিরদাঁড়াটা তৈরী হয়েছে ছোট ছোট হাড় যোড়া দিয়ে। এদের এক একটাকে বলে কশেরু (Vertebræ)। এ সব হয়েছে বলেই না শরীরের ভার বেশ সুন্দর ভাবে শিরদাঁড়ায় ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে!



এ ছবিটা দেখলে আমাদের হাড়ের গল্প ভাল বুঝতে পারবে। দেখ, মাথার হাড়ের ঠিক মাঝখানে এসে লেগেছে মেরুদণ্ডটা, কাজেই আমাদের মাথা সোজা রাখতে কোন অসুবিধা হয় না।

তারপরে, ধর, মানুষের মাথার কথা। মানুষের মাথার ঠিক মাঝখানে এসে লাগে মেরুদণ্ডটা; কাজেই মাথাটাকে তেমন ভারী বলে মনে হয় না, যেমন হয় বাঁদরের বেলা। বাঁদর-দের মাথার পেছনে এসে মেরুদণ্ড লাগে, কাজেই বেচারারা মাথা উঁচু করে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, ঝট্ করে গাছে পা লাগিয়ে একবার ডিগ্‌বাজী খেয়ে নেয়।

এবারে চাই এমন একটা বেদী যে এই মাথা আর মেরুদণ্ডের বোঝা বয়ে বেড়াতে পারে। তার জন্য মানুষের কত কায়দাই না রয়েছে তার পায়ে! পায়ে আছে তার দু'টি স্প্রিং,—একটা সামনে-পেছনে—আঙ্গুলের ডগা থেকে গোড়ালী পর্যন্ত, আর একটা হচ্ছে আড়াআড়ি। এ দু'টো না থাকলে আরাম করে হাঁটা আর চলত না,—গরু-ছাগলের মত চার পায়ে হাঁটতে হ'ত।



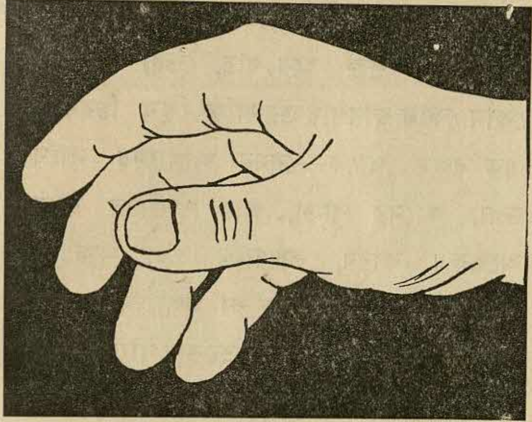
আমাদের পায়ে আছে দু'টি স্প্রিং,—একটা সামনে-পেছনে আর একটা আড়াআড়ি।

এ সব কি আর রবীন জানে? খালি ঠাট্টা আর গালাগাল করলেই তো হয় না!

তারপর দেখ হাতের মজা! জন্তুদের তো চার হাত-পাই লাগে চলবার জন্যে, কিন্তু মানুষের দু'পা-ই যথেষ্ট। কাজেই তার হাতের কত কাজই না বেড়ে গেছে! প্রথমে তার বুড়ো আঙ্গুল তার আদত জায়গা থেকে সরে গেছে—যাতে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে সব আঙ্গুলের মাথাই ছোঁয়া যায়।—পারে? গরুতে কি তা পারে? আরে, রবীনের তো আর বিনু কাকা নেই, সে এ সব জানবে কি করে? হাতের যদি এ সব অদলবদল না হ'ত তা হলে কি আর এ লেখা বেরুত? না শিল্পীর হাতে ছবি হতে পারত? আর ছুতোর-কামার-কুমোরদের হাতের সুন্দর সুন্দর সব জিনিস?

হাড় সাজাবার কৌশল

রবীন কি আর বলতে পারে যে হাড়ের কী মজা? দেখ, মাথায় থাকবে আমাদের দেহের

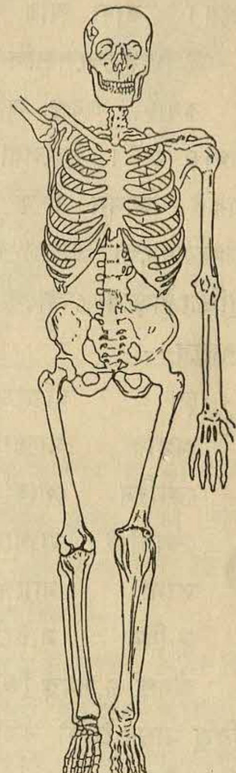


আমাদের হাতের মজা দেখ! আমাদের বুড়ো আঙ্গুল একটু সরে গেছে বলে আমাদের অন্যান্য আঙ্গুল ছুঁতে পারে; তবেই না এ লেখা বেরিয়েছে!

সবচেয়ে দরকারী জিনিস মস্তিষ্ক—'ব্রেন' বা ঘিলু (পণ্ডিত মশায়ের মতে কারু কারু যা শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে যায়)। কাজেই তার জন্য চাই খুব শক্ত ঘর। তাই হয়েছে করোটি বা স্কাল্; কেবল কয়েকটা দরকারী ফুটো ছাড়া চারদিকে বন্ধ—ধরবার ছোঁবার সাধ্য নেই।

তারপর দেখ বুকের মজা! বুকেতে থাকে আমাদের ফুস্ফুস্—হাপরের মত এক একবার ফুলে ওঠে, আবার চুপসে যায়; কাজেই তার খাঁচা হয়েছে তেমনি। সামনে আছে একটা ফলকের মত হাড়, যাকে ভাল বাংলায় বলে উরঃফলক। উরঃ বলতে বোঝায় বুক। ইংরেজীতে এই ফলককে বলে স্টার্নাম্ (Sternum); পেছনে আছে মেরুদণ্ড। আর এই দু' রকম হাড়কে যোড়া দিয়েছে পাঁজরের হাড়গুলি। বারো যোড়া হাড়, তাদের আবার প্রত্যেকটারই আধখানা হ'ল শক্ত হাড়, আর আধখানা হ'ল কোমল হাড়—যাকে বলে কোমলাস্থি বা কার্টিলেজ। এরা যেন স্প্রিংএর মত,—এক একবার বাড়তে পারে, আবার ছোট হয়ে যেতে পারে। এদের ভেতরে ভেতরে হাপরের পর্দার মত আছে মাংসপেশী। কী মজা বল তো!

পেটের বেলায় কিন্তু চাই আর একটু বেশী জায়গা। তাই শিরদাঁড়া থেকে সুরু করে আর ওপরে নীচের হাড়ের সঙ্গে লেগে তৈরী হয়েছে আমাদের পেট—প্রায় সবটাই মোটা মোটা মাংসপেশী দিয়ে তৈরী। তা তুমি আধমণী কৈলাসই হও আর দেড়-ছটাকী কন্যাই হও,—তোমার দরকার মত পেটের পরিধি বাড়বে-কমবে।



আমাদের হাড়ের তিনটি প্রকোষ্ঠ—মাথা, বুক, পেট।

এ সব না হয় হ'ল, কিন্তু হাড় কি দিয়ে তৈরী?

হাড় কি দিয়ে তৈরী

কে যেন একজন লিখেছিলেন ছোট ছোট মেয়েরা কি দিয়ে তৈরী? "ক্ষীর, ছানা, ননী আর ভালো যাহা দুনিয়ার—তাই দিয়ে মেয়েগুলি তৈরী।" আর ছোট ছোট ছেলেরা? ওরা তৈরী হয়েছে যত সব কাদা-মাটি আর ভুযো মাল

দিয়ে। "কাদা আর কয়লা, ধূলোমাটি ময়লা —এই দিয়ে ছেলেগুলি তৈরী।"

কথাটা অবশ্য সত্যি নয়, পক্ষপাতিত্বের কথাও বটে। ছেলেরা আর মেয়েরা সবাই একই জিনিস দিয়ে তৈরী। তবে তা ঐ রকম ভালো ভালো খাবার নয় নিশ্চয়ই। সব পুড়িয়েটুড়িয়ে ফেললে সবার ভেতর থেকেই বেরুবে—

চূণ	অক্সিজেন	হাইড্রোজেন
অঙ্গার	আয়োডিন	পটাসিয়াম্
ক্লোরিন	লোহা	ফস্‌ফরাস্
কোবাল্ট	ম্যাগ্‌নেসিয়াম্	সোডিয়াম্
তামা	ম্যাংগানিজ	গন্ধক
ফ্লুরিন	নাইট্রোজেন	দস্তা

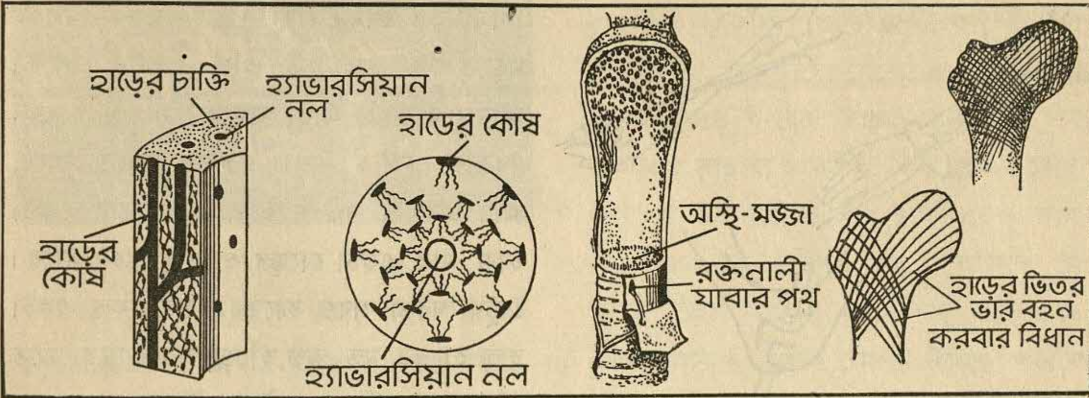
অবশ্য এ সমস্ত জিনিস একত্র করলেই আর কিছু মানুষ তৈরী করা যায় না, তা হলে তো বিজ্ঞানীর রসায়নাগারে আমরা রোজ রোজই তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তৈরী করে ফেলতে পারতাম!

ছোটরা যে মাথায় বাড়ে তার কারণ হচ্ছে তাদের হাড়গুলোও সঙ্গে সঙ্গে লম্বা হয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মোটাও হয়, তা না হলে তো সবাই হ'ত খ্যাংড়া কাঠির মাথায় আলুর দম! প্রথমে কিন্তু হাড়গুলি তেমন কিছু শক্ত থাকে না, বরঞ্চ বেশ নরমই থাকে। তোমরা যখন মাংস খাও তখন নিশ্চয়ই কতকগুলি হাড় দেখেছ যা খাওয়া খুব সহজ—কট্ কট্ করে চিবিয়ে খাওয়া যায়। তাদের নাম হ'ল কোমলাস্থি বা তরুণাস্থি। ইংরেজীতে বলে কার্টিলেজ। এতে কোন ক্যালসিয়াম থাকে না। ক্যালসিয়াম হচ্ছে চূণের প্রধান উপাদান। আস্তে আস্তে তরুণাস্থিতে ক্যালসিয়াম বা চূণ জমা হয়ে শক্ত হয়ে যায়, তৈরী হয় হাড়। কোন কোন জায়গায় তরুণাস্থি কিন্তু চিরকালই এক রকম থাকে—যেমন আমাদের নাকের ডগা, কানের পাতা, আর পাঁজরার হাড়ের অর্দ্ধেক। কারণ, তরুণাস্থি হ'ল শক্ত আর রবারের মত স্থিতিস্থাপক বা ইলাস্টিক। অর্থাৎ দরকার মত ছোট-বড় হতে পারে,—রবার যেমন টানলে বাড়ে-কমে। হাড় তৈরীর আর একটা মজার ব্যাপার হ'ল এই, যে, তরুণাস্থি থাকতে পারে, চূণ থাকতে পারে, কিন্তু ভিটামিন-ডি না থাকলে হাড় তৈরী হবে না—আর সে অবস্থায় চলাফেরা করলেই হাত-পা যাবে বেঁকে। ছেলেমেয়েদের রিকেট্‌স্ নামে যে ব্যাধি হয় তার কারণ হচ্ছে এই রকম অপুষ্ট হাড়।

কাজেই, বুঝতে পারছ, তোমাদের মত ছোটদের হাড় হচ্ছে নরম, আর বড়দের হাড় হচ্ছে শক্ত। কাজেই বড়দের হাড় যত ভাঙ্গে বা ফ্র্যাক্‌চার হয় ছোটদের হাড় ততটা হয় না; আর, হলেও, কঞ্চির মত এক দিক্‌টা মাত্র ভাঙ্গে। এর জন্যই এ রকম ভাঙ্গার নাম হচ্ছে গ্রীন্-স্টিক্ ফ্র্যাক্‌চার বা সবুজ-ডালের মত ভাঙ্গা।

হাড়ের ভিতরকার চেহারা

এবারে যদি একটা হাড়কে কেটে ফেলা যায় তা হলে কি রকম দেখতে হবে তার ভেতরটা, বুঝতেই পারছ। দেখে মনে হবে যেন একটা চাক্তির ওপর আর একটা চাক্তি বসিয়ে বসিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে



আমাদের হাড়ের ভেতরকার ছবি

হাড়গুলিকে। আর প্রত্যেকটা চাক্তির মাঝখানে ছোট্ট ছোট্ট নল—হ্যাভারসিয়ান নল। যে ডাক্তার প্রথম ওটা আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরই নামে নামকরণ হয়েছে এই নলের। এই নলের ভেতরে থাকে রক্তনালী, যা থেকে হাড়েরা খাবার নিয়ে নেয়। দু'টো পাশাপাশি চাক্তির মাঝখানে একটু একটু করে জায়গা থাকে, তার ভেতরে থাকে হাড়ের কোষ। একটা হাড়ের কোষ থেকে আর একটা পর্যন্ত থাকে একটা ছোট নল,—ক্যানালিকিউলি (Canaliculi) বা সরু নালী। কাজেই, দেখতে পাচ্ছ, হাড়কে ঠিক জড় পদার্থ না বলে জীবন্ত পদার্থ বলা যেতে পারে। কারণ, তারা "খেতে" পারে, "বাড়তে" পারে, ভেঙ্গে গেলে আবার নতুন করে "যোড়া লাগতে" পারে। শুধু কি তাই? আমাদের দেহের ভার বহন করতে হবে বলে এঞ্জিনীয়ারদের মত বুদ্ধি খরচ করে যেখান দিয়ে যেখান দিয়ে ভার যাবে সেখানটা দুরস্ত করে দিতে হয় ওদেরকে। ওপরের ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

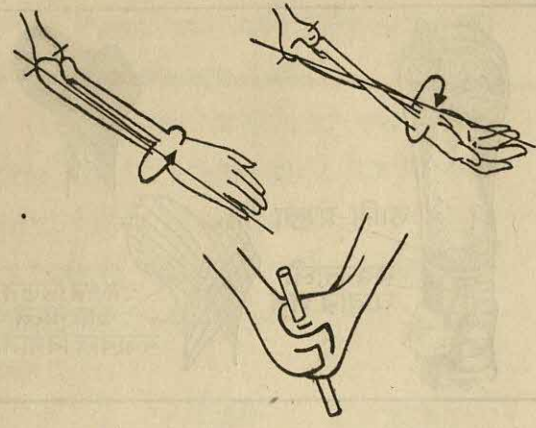
হাড়ের ভেতরটা কিন্তু ফাঁপা। তা না হলে কী ভীষণ ভারী হ'ত ভেবে দেখ! তবে তার ভেতরে আছে মজ্জা। এই মজ্জাতেই তৈরী হয় আমাদের দেহের রক্তকণিকা।

এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, বাবা রে বাবা! কত হাড়ই না আছে আমাদের শরীরে! তা মনে রাখা কিন্তু খুব সহজ; কারণ আমাদের শরীরে আছে ২০০টি হাড়, আর কানে আছে ছোট ছোট ছ'টি—যাদের কাজ হ'ল শব্দ-পরিবহন; অর্থাৎ সবশুদ্ধ ২০৬টি।

এদের ভালো করে দেখলে দেখা যাবে আমাদের শরীরের ডান দিকে যতগুলি হাড় আছে ঠিক ততগুলি হাড়ই আছে বাঁ দিকে। অর্থাৎ দু'-মুখো সাপের মত আমাদের দু'টো অঙ্গ, ডান ও বাঁ ঠিক একই রকম।

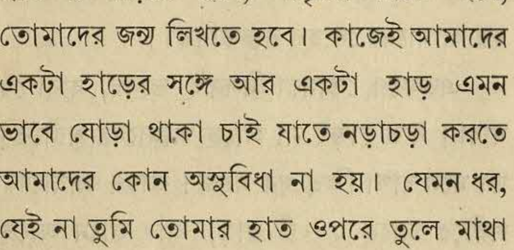
অস্থিসন্ধি

একবার ভেবে দেখ আমাদের শরীরের হাড়গুলো যদি না নড়তে পারত তা হলে কী কাণ্ডই না হ'ত! আমাদের সঙ্গে আর মাটির প্রতিমার সঙ্গে কোনই তফাৎ থাকত না।



এই ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে আমাদের হাত কি ভাবে কাজ করে।

কিন্তু আমাদের চলতে হবে, বলতে হবে, হাত-পা নাড়তে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে, তোমাদের জন্য লিখতে হবে। কাজেই আমাদের একটা হাড়ের সঙ্গে আর একটা হাড় এমন ভাবে যোড়া থাকা চাই যাতে নড়াচড়া করতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়। যেমন ধর, যেই না তুমি তোমার হাত ওপরে তুলে মাথা চুলকোলে অমনি তোমার হাতের ওপর দিক্ অর্থাৎ কাঁধের কাছটা পিঠের হাড়ের মাথার ওপর ঘুরে গেল। যখন তুমি এন্. সি. সি-র



আমাদের কোমরের ও কাঁধের সন্ধিস্থল "বল আর সকেট"-এর মত।

স্যালুট্ কর তখন তোমার কনুইয়ের হাড়গুলিকে নড়তে হয়—একটাকে আর একটার ওপরে। আমাদের কনুই আর আঙ্গুলের সন্ধিগুলি যেন দরজার কব্জার মত। একবার খুলতে পারে, আর একবার বন্ধ হতে পারে, আবার একটা হাড় আর একটা হাড়ের ওপর ঘুরতেও পারে। হাঁটুর অবস্থা অবশ্য হাতেরই মত, কিন্তু একটা হাড় হাতের মত অন্য হাড়ের ওপর ঘুরে যেতে পারে না, যদিও একটু-আধটু পাশে নড়তে পারে।

হাতের কব্জিতে কিন্তু ডবল সন্ধি। সামনে পেছনেও নড়তে পারে, আবার পারে এপাশে ওপাশে। কাঁধের আর কোমরের সন্ধি হ'ল "বল আর সকেট"-এর মত; অর্থাৎ একটা গোল গর্তে একটা হাড়ের গোল মত অংশ ঢুকে যায়। কাজেই এ রকম সন্ধিস্থলে নড়াচড়াটা হতে পারে অনেক বেশী। আমাদের হাত ঘাড় থেকে সামনে আসতে পারে, পেছনে যেতে পারে, এবং দরকার হলে চারদিকে ঘুরেও আসতে পারে। আর পারে বলেই না ক্রিকেট খেলার "বোলাররা" পারে বল ছুঁড়তে! ক্রিকেট খেলায় বল দেবার সময় কি ভাবে হাত ঘোরাতে হয় তা যারা ক্রিকেট খেল তারাই জান।

অবশ্য আমরা যা বললাম তা হচ্ছে মোটা-মুটি খবর। তোমরা বড় হয়ে যখন মস্ত মস্ত বই পড়বে তখন দেখবে হাড় ও অস্থিসন্ধি সম্বন্ধে আরও কত কিছু আছে জানবার। কত রকম ছোট ছোট কত কায়দাই না করতে হয়েছে আমাদের!

পরবর্তী খণ্ডে আমরা শরীরের অন্যান্য গল্প বলব।

দেশবিদেশের সেরা বই

৩

"ফার্নাণ্ড!" বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন মণ্টেক্রিস্টো,—"আমার একশ'টা নাম আছে, কিন্তু তার একটা বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। কিংবা, তারও হয় তো দরকার নেই, এই পোষাকই তা বলে দেবে। তাকাও আমার মুখের দিকে। কেমন লাগছে? প্রৌঢ় কাউণ্টের মুখ—নাকি কোন তরুণের মুখ, যার বাগ্‌দত্তাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে, ভুল মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে বিয়ে করতে তোমার বাধে নি?"

কাউণ্ট মর্সার্ফের মুখ ভয়ে শাদা হয়ে গেল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে, যেন ভূত দেখছে এমনি ভাবে সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এডমণ্ড! এডমণ্ডই তবে আজ কাউণ্ট অব্ মণ্টেক্রিস্টো হয়েছে!

এর কয়েক দিন পরেই সমস্ত প্যারিস স্তব্ধ হয়ে শুনল কাউণ্ট মর্সার্ফ্ আত্মহত্যা করে সমস্ত নিন্দা-অপমান থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, আরও অনেক খবর শুনল তারা। বড় ঘরের বড় খবর। কাউণ্ট ক্যাভালকান্টি তার সহকর্মী কাদেরুসেকে খুন করার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছে। দু'জনে মিলে অনেক কুকর্ম করত তারা। শেষ পর্যন্ত কাদেরুসে নাকি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আরও শুনল, কাউণ্ট ক্যাভালকান্টি আসলে মোটেই কাউণ্ট নয়, তার আসল নাম বেনেদেত্তো—যার কথা বার্তুসিও একদিন মণ্টেক্রিস্টোকে বলেছিল। বেনেদেত্তো ও কাদেরুসেকে লর্ড উইলমোর নামে একজন ইংরেজ প্রচুর অর্থসাহায্য করে পালাবার সাহায্য করেছিল, কিন্তু কেন করেছিল এবং কে এই লর্ড উইলমোর তা কেউ জানত না, এমন কি পুলিশও নয়। আসলে সেই পাদরী, উইলমোর এবং কাউণ্ট অব্ মণ্টেক্রিস্টো একই লোক। কোন গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঐ দু'জনকে ও-ভাবে ছদ্মনামে সাহায্য করেছিলেন কাউণ্ট।

মণ্টেক্রিস্টো ভিলফোর্টের পাশের বাড়ীটি কিনে নিলেন। তার পর সে বাড়ী সংস্কারের নামে এমন ভাবে দরজা-জানালা-দেয়াল ভাঙ্গতে স্থরু করলেন যে দু'বাড়ীর মধ্যে বড় একটা আবরু বা ফাঁক রইল না। শেষে একদিন মণ্টেক্রিস্টো দেখলেন কয়েকখানা ইট সরালেই তিনি একেবারে ভ্যালেণ্টাইনের ঘরে এসে পড়তে পারেন।

একদিন ঐ ভাবে ইট সরিয়ে মণ্টেক্রিস্টো ঘুমন্ত ভ্যালেণ্টাইনকে লক্ষ্য করছিলেন, তাঁকে অবশ্য কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ তিনি দেখলেন ভিলফোর্টের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মাদাম্ ভিলফোর্ট চুপি চুপি ঘরে এসে ঢুকছেন। মাদামের হাতে একটা বোতল। ভ্যালেণ্টাইনের জন্য একটা গ্লাসে খানিকটা ওষুধ রাখা ছিল, মাদাম্ এদিক্ ওদিক্ চেয়ে সে ওষুধটা ফেলে দিয়ে তার মধ্যে বোতল থেকে কি একটা ঢেলে দিলেন। তারপর তেমনি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই ভ্যালেণ্টাইনের ঘুম ভাঙ্গল। সে ওষুধটা খেতে যাবে এমন সময় মণ্টেক্রিস্টো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাকে বাধা দিলেন।



বোতল থেকে কি একটা ঢেলে দিলেন।

ঘরের ভিতর মণ্টেক্রিস্টোকে ও ভাবে আসতে দেখে ভ্যালেণ্টাইন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল; মণ্টেক্রিস্টো তাকে তার সৎমার কীর্তির কথা জানিয়ে দিয়ে গ্লাস থেকে অর্দ্ধেকটা বিষ আগুনে ঢেলে দিয়ে বাকিটা গ্লাসে রেখে দিলেন আর ভ্যালেণ্টাইনকে খেতে দিলেন তাঁর নিজের সেই উগ্র পানীয় হাশিশ। হাশিশ খেয়েই ভ্যালেণ্টাইন নিঃসাড় হয়ে মড়ার মত ঘুমুতে সুরু করে দিল।

খানিক পরে মাদাম্ ভিলফোর্ট আবার ঢুকলেন ঘরে। গ্লাসটায় অর্দ্ধেক বিষ দেখে তিনি ভাবলেন তা হলে ভ্যালেণ্টাইন ওর অর্দ্ধেকটা খেয়েছে এবং সেই বিষেরই জন্য অমন নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে, এখনই মারা যাবে। তা হলে মাদামের একমাত্র ছেলে বাপের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতে পারবে, সে সম্পত্তির আর কোন দাবীদার থাকবে না। তিনি বাকি বিষটা ঢেলে ফেলে দিলেন।

মণ্টেক্রিস্টো কিন্তু আড়াল থেকে সবই দেখলেন আর বিষটা কি বিষ তাও তাঁর চিনতে বাকি রইল না। তিনি আবার সেই বিষ খানিকটা সংগ্রহ করে এনে গ্লাসটা আগের মত অর্দ্ধেক ভর্তি করে রাখলেন।

পরদিন সকালে ডাক্তার এসে বললেন ভ্যালেণ্টাইন মারা গেছে। তার গেলাসের অর্দ্ধেকটা ভর্তি পাওয়া গেল বিষ, আর ঐ বিষই পাওয়া গেল মাদাম্ ভিলফোর্টের ঘরে। মাদাম্ই যে বিষ প্রয়োগ করে সপত্নীকন্যাকে হত্যা করেছেন সে বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না। মাদাম্ও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন যে ছেলের মুখ চেয়েই তিনি ঐ কুকার্য করেছেন।

ভিলফোর্টের পা ধরে ক্ষমা চাইলেন মাদাম্ ভিলফোর্ট। কিন্তু ভিলফোর্ট রাগ দেখিয়ে বললেন, "আমি আইনের দাস—আইনে এর যে বিধান তা আমাকে করতেই হবে। ফিরে এসেও যদি তোমাকে আমি এখানে জীবিত দেখতে পাই তা হলে আমাকেই এর একটা বিহিত করতে হবে।"

আসলে ভিলফোর্টের মতলব ছিল এই সুযোগে কাউণ্ট ক্যাভালকান্টিকে খুনের জন্য দায়ী করা। কিন্তু আদালতে সব উল্টেপাল্টে গেল। উপরন্তু জানা গেল ক্যাভালকান্টির আসল নাম হচ্ছে বেনেদেত্তো—যাকে শৈশবে ভিলফোর্ট জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন বলে তাঁর ধারণা ছিল, আর—আর আসলে সে হচ্ছে তাঁরই ছেলে।

ভিলফোর্টের স্বীকার করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। নতুন পাব্লিক প্রসি-কিউটরকে কোন রকমে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে

তিনি টলতে টলতে বাড়ী ফিরে এলেন। প্যারিসে এর পরেও কি তাঁর মান-ইজ্জৎ বলে কিছু থাকবে?

বাড়ী এসে দেখেন ইতিমধ্যে মাদাম্ ভিলফোর্ট নিজেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আর, কেবল নিজেই খান নি, নিজের শিশুপুত্রকেও খাইয়েছেন। মৃত মায়ের বুকে



বাড়ী এসে দেখেন···

মৃত শিশু তখনও জড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে একখানা ছোট্ট চিঠি—"ছেলের জন্যই আমি ঐ পাপ করেছিলাম। আমি চললাম, কিন্তু ছেলেকে ছেড়ে যেতে পারব না, ওকেও সঙ্গে নিয়ে চললাম।"

ভিলফোর্ট উঠে দাঁড়ালেন, তারপর একটা শাবল নিয়ে বাগানে গিয়ে মাটি খুঁড়তে সুরু করে দিলেন। তিনি তখন বদ্ধ উন্মাদ।

মন্টেক্রিস্টো এইভাবে তাঁর পুরোনো শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে চললেন। কিন্তু এখনও কিছু বাকি। এবার ড্যাংলার্সের পালা। ড্যাংলার্সের শেয়ার বিভ্রাটের মুখেই মন্টেক্রিস্টো তার ব্যাঙ্ক থেকে তাঁর সমস্ত টাকা তুলে নিয়েছিলেন। ফলে ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে ড্যাংলার্স সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও সে হাল ছাড়ে নি। প্যারিস হাসপাতালের কিছু গচ্ছিত টাকা হাতিয়ে নিয়ে সে ফ্রান্স ছেড়ে ইটালিতে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মন্টেক্রিস্টোর কৌশলে সে রোমের কাছে এমন একদল লোকের পাল্লায় পড়ল যারা তার কাছ থেকে সমস্ত অপহৃত টাকা আদায় করে নিল—ঠিক যেন চোরের ওপর বাটপাড়ি। আর ঠিক সেই সময়েই মন্টেক্রিস্টো সেখানে হাজির হয়ে প্রশ্ন করলেন, "দেখ তো এবার আমাকে চিনতে পার কিনা? এডমণ্ডের কথা ভুলে যাও নি নিশ্চয়ই? এতদিন পরে সেই এডমণ্ডেরই হাতের মুঠোয় এসে পড়েছ তুমি।"

একটু থেমে কাউন্ট বললেন, "ভয় নেই, তোমার দুই সহযোগী বন্ধুর একজন আত্মহত্যা করেছে, একজন পাগল হয়ে গেছে। তোমাকে অতটা শাস্তি দেব না, বরঞ্চ কিছু টাকা দিচ্ছি। বাকি জীবনটা এই নিয়ে কোন রকমে সৎ ভাবে কাটাবার চেষ্টা ক'র।"

পরদিন সকাল বেলা ড্যাংলার্স লক্ষ্য করল সে একটা নদীর ধারে অসাড় দেহে পড়ে আছে। তৃষ্ণার্ত হয়ে নিজেই হয়তো সে এখানে এসেছিল। নদীর জলে নিজের ছায়া পড়তেই সে চমকে উঠল। এক রাত্রের মধ্যে তার সমস্ত চুল একেবারে শাদা হয়ে গেছে।

একে একে সব ক'টি শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেল, কিন্তু তখনও মন্টেক্রিস্টোর একটা কাজ বাকি।



নদীর জলে নিজের ছায়া পড়তেই···

ম্যাক্সমিলিয়ান্ জানে যে ভ্যালেন্টাইন মৃত, তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। ম্যাক্সমিলিয়ান্ও ঠিক করেছে সে আর বাঁচতে চায় না। কাউন্ট তাকে একটা বছর অপেক্ষা করে যা হয় করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

মার্সিডিস আর অ্যালবার্ট ফার্নাণ্ডের অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ নিতে ইচ্ছুক ছিল না। তারা সেগুলি নানা সৎ কাজে বিলিয়ে দিল। ইতিমধ্যে এডমণ্ড তার বাবা যে বাড়ীতে থাকতেন সেটা কিনে নিয়েছিল। এই বাড়ীরই বাগানের এক কোণে এক গুপ্ত স্থানে সে কিছু টাকাপয়সা পুঁতে রেখেছিল—মার্সিডিসের সঙ্গে বিয়ে হলে বিয়ের যৌতুক হিসেবে খরচ করবে বলে। সে বিয়ে অবশ্য হয় নি, কিন্তু টাকাটা তো নষ্ট হয় নি! সে টাকাটা সে বলে-কয়ে মার্সিডিসকে নিতে রাজী করাল। সেই টাকা নিয়ে মা আর ছেলে অত্যন্ত সরল ভাবে নতুন জীবন সুরু করল। অ্যালবার্ট কিছুদিন পরে সৈন্য-বিভাগে যোগ দিল এবং তখন আর তাদের কোন অসচ্ছলতা রইল না।

এর পর একদিন কাউন্ট অব্ মণ্টেক্রিস্টো ম্যাক্সমিলিয়ান্‌কে নিয়ে সমুদ্রে হাওয়া খেতে বেরোবার নাম করে মণ্টেক্রিস্টো দ্বীপে হাজির হলেন।

আবার সেই রহস্যময় গুহা। গুহার জাঁকজমক দেখে ম্যাক্সমিলিয়ান্ অবাক্ হয়ে গেল।

"তোমার সেই এক বছর পূর্ণ হতে তো মাত্র তিন ঘণ্টা বাকি। এখনও কি তোমার ভ্যালেণ্টাইনের জন্য মরতে সাধ যায়?"—কাউণ্ট জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ, আমার প্রতিজ্ঞার নড়চড় হবে না। শুধু আপনার অনুরোধে আমি এক বছর অপেক্ষা করে আছি।"

"তা হলে কষ্টদায়ক মৃত্যুর চাইতে কোন সহজ উপায়ে মৃত্যুবরণের কোন পথ যদি তোমাকে বলে দি তা হলে কেমন হয়? যদি এমন কোন ওষুধ দেই—যাতে তোমার কোন মৃত্যুযন্ত্রণা বোধ হবে না—ধীরে ধীরে, মানুষ যে ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে সেই ভাবে, যদি মৃত্যু আসে তবে তুমি তাতে রাজী?"

"নিশ্চয় রাজী।"

কাউণ্ট তখন তাকে একটা পাত্র থেকে একটা চামচের মধ্যে কি যেন খানিকটা ঢেলে দিলেন, বললেন, "এটা খেয়ে ফেল।"

ম্যাক্সমিলিয়ান্ চামচের ওষুধটা মুখে ঢেলে দিল। পরমুহূর্তেই তার মনে হ'ল চোখ যেন তার ঘুমে জড়িয়ে আসছে। কাউণ্ট পাশের ঘরে চলে গেলেন। একটু পরেই ম্যাক্সমিলিয়ানের

মনে হ'ল সে যেন মরে নি, যেন একটা স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু বড় মধুর স্বপ্ন! তার সামনে যেন ভ্যালেন্টাইন এসে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।



এ তো স্বপ্ন নয়!

হঠাৎ ম্যাক্সমিলিয়ান্ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। কই, এ তো স্বপ্ন নয়! আর তার সামনে যে ভ্যালেন্টাইন দাঁড়িয়ে আছে সেও কোন স্বপ্নের জীব নয়—রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ ভ্যালেন্টাইন!

আসলে এও কাঁউন্টের একটা কৌশল। ভ্যালেন্টাইনকে হাশিশ খাইয়ে অসাড় করে দিয়েছিলেন তিনি। ডাক্তারেরা তাকে মৃত ঘোষণা করার পর তাকে কবর দিয়ে গেলে তিনি তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসেন এবং সেই থেকে এই এক বছর ভ্যালেন্টাইন এখানে হাইডির সঙ্গিনী হিসাবে বাস করছে। আর, তার প্রতি ম্যাক্সমিলিয়ানের টানটা কতখানি সত্যি, কাউন্ট এই এক বছর ধরে তা পরখ করে দেখছেন। এখন, দু'জনেই দু'জনের প্রতি তেমনি আকৃষ্ট বুঝতে পেরে, তিনি তাদের বিয়ের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আর কাউন্ট নিজে? তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন যে হাইডিও তাঁকে ঠিক সেই চোখে দেখতে সুরু করেছে যে চোখে ভ্যালেন্টাইন ম্যাক্সমিলি-য়ান্‌কে দেখেছে। কাউন্টের মনে হ'ল তা হ'লে কি প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়াও পৃথিবীতে তাঁর জন্য এখনও কোন নতুন জীবনের দুয়ার খোলা আছে?

পরদিন সকালে ম্যাক্সমিলিয়ান্ আর ভ্যালেন্টাইন সমুদ্রের ধারে আসতেই কে একজন এসে তাদের হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা ম্যাক্সমিলিয়ানের নামে লেখা। তলায় নাম স্বাক্ষর করা আছে এডমণ্ড ডান্টে কাউন্ট অব্ মন্টেক্রিস্টো। চিঠিতে কাউন্ট তাদের বিয়ের ব্যবস্থা কি ভাবে হয়েছে সব খুলে লিখেছেন। ভিলফোর্টের বুড়ো বাবা এখনও বেঁচে আছেন, তিনিই তাঁর নাতনীকে ম্যাক্সমিলিয়ানের হাতে তুলে দেবেন। আর কাউন্ট নিজেও তাঁর নিজের কতকগুলি বাড়ী, শ্যাতু এবং প্রচুর ধনরত্ন ওদের বিয়ের যৌতুক হিসেবে দিয়ে যাচ্ছেন—তাঁর আগেকার মনিব মোরেলের ছেলের বিয়ে, তিনি কি না দিয়ে পারেন? ভ্যালেন্টাইনও পিতার

প্রচুর অর্থের উত্তরাধিকারিণী হচ্ছে। দু'জনে মিলে তারা ঐ ধনসম্পত্তি সৎ কাজে ব্যয় করে সৎ ভাবে জীবনযাপন করুক এই তাঁর আশীর্বাদ রইল।

চিঠির শেষে কাউন্ট লিখেছেন, "তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য যে দেবদূত আসবেন তাঁর কাছে একটি লোকের জন্য প্রার্থনা ক'র তোমরা। এ লোকটি শয়তানের মত নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ ভেবে নানা কাজে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে যে সকলের একমাত্র নিয়ন্তা হচ্ছেন সেই পরমেশ্বর। মানুষ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। মানুষের বিদ্যা যতই বড় হোক, তাঁর কাছে কিছুই না। আমরা শুধু অপেক্ষাই করতে পারি, আর করতে পারি আশা।"

চিঠি পড়া শেষ হলে ম্যাক্সমিলিয়ান্ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু কাউন্ট কোথায়?"

দূরে—বহুদূরে একটা অস্পষ্ট সাদা পাল-তোলা ছোট্ট জাহাজ ভেসে চলেছিল, পত্রবাহক সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল।

"আর হাইডি?"

পত্রবাহক আবার সেই সাদা পালের দিকেই আঙুল দেখাল।

ভ্যালেন্টাইনের চোখ ততক্ষণে জলে ভরে এসেছে। "আর হয়তো জীবনে ওঁদের সঙ্গে দেখা হবে না।"

ম্যাক্সমিলিয়ান্ একবার চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে বলল, "কে বলতে পারে? উনি তো লিখেই গেছেন মানুষের জ্ঞানের শেষ কথা—আমরা আর কিছুই পারি না, কেবল অপেক্ষা করতে পারি, আর করতে পারি আশা।"



সাদা পাল-তোলা জাহাজ ভেসে চলেছিল।

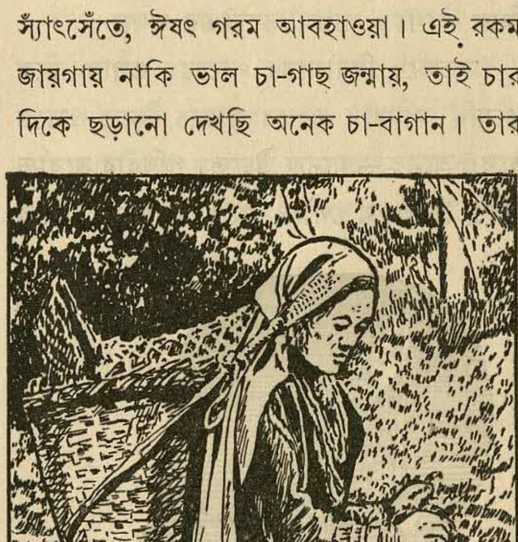


দেশ বিদেশের কথা

চল যাই নতুন নতুন দেশে

আরব্য-উপন্যাসে একটা ম্যাজিক কার্পেট অর্থাৎ যাদু-করা গালচের গল্প আছে। ঐ কার্পেটে আরাম করে তাকিয়া টেনে বসে হুকুম করলেই কার্পেট সাঁ করে ওপরে উঠে যাবে, তার পর উড়ে চলবে আকাশপথে এরোপ্লেনের মত। পায়ের তলায় সিনেমার ছবির মত হু-হু করে ভেসে বেরিয়ে যাবে নদী-সাগর, পাহাড়-মরু, গ্রাম-প্রান্তর, জনাকীর্ণ শহর। কত বিচিত্র তাদের রূপ! সত্যি, ঐ রকম একটা গালচে যোগাড় করতে পারলে কী মজাটাই না হ'ত! কিন্তু না-ই যদি পাওয়া যায়, কল্পনায় ঐ রকম একটা গালচে চড়ে উড়ে যাওয়া যাক না! তাই বা নেহাৎ মন্দ কি? হু-হু করে ছুটে বেরিয়ে যাব আমাদের দেশের ছোট্ট গণ্ডী ছাড়িয়ে দূর দূরান্তরে—দেখব কত নতুন নতুন দেশ, কত বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভা, কত বিচিত্র পোষাকের, বিচিত্র স্বভাবের, বিচিত্র ধরনের লোক! চল, এখনই বেরিয়ে পড়ি।

কলকাতার ওপর দিয়ে গালচে উড়ে চল্‌ল—সোজা উত্তর দিকে। ছোট ছোট নদী, ধানক্ষেত, ছোট ছোট গ্রাম, শহর পেরিয়ে চল্‌ল। অবশেষে সুরু হ'ল বনভূমি। প্রথমটা স্যাঁৎসেঁতে, ঈষৎ গরম আবহাওয়া। এই রকম জায়গায় নাকি ভাল চা-গাছ জন্মায়, তাই চার দিকে ছড়ানো দেখছি অনেক চা-বাগান। তার



চা-বাগান; কুলী রমণী চায়ের পাতা তুলছে।

পরই বন আরও ঘন হতে লাগল, আবহাওয়াও বদলে গিয়ে হতে লাগল ঠাণ্ডা। এরই নাম তরাই জঙ্গল। উঁচু উঁচু ঘন সন্নিবিষ্ট গাছ,

ছায়া দিয়ে নীচেটা অন্ধকার করে রেখেছে। তারই ভিতর দিয়ে কোথাও বা দল বেঁধে চলেছে বুনো হাতীর দল, হরিণের পাল সতর্ক দৃষ্টিতে চার দিকে নজর রেখে চলেছে জলার দিকে। জল না খেলে চলবে কি করে? হঠাৎ একটা বাঘ গুটি গুটি বেরিয়ে এল, মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের একটা হরিণের ওপর। হরিণের আর্ত চীৎকার, বাঘের পৈশাচিক গর্জন, ভয়ত্রস্ত পাখীদের কোলাহল—সমস্ত মিলে কাঁপতে লাগল তরাইএর জঙ্গল।

ততক্ষণে হিমালয়ের পায়ের তলায় চলে এসেছি আমরা। এবারে গালচে উঁচুতে ওঠাতে হবে। অনেক—অনেক উঁচুতে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়ে পৌঁছে গেছি আমরা। নীচে



এভারেষ্টের চূড়ায় জাতীয় পতাকা হাতে তেনজিং

শ্যামল বনভূমি, আর একটু ওপরে পাইন গাছের সমারোহ। দু'-একটা ভাল্লুকও চোখে পড়ল। আরও—আরও ওপরে উঠছি। ভীষণ



প্রথম এভারেষ্ট-বিজয়ী তেনজিং নোরকে

শীত করছে এবার। চারদিকেই কেবল পাহাড় —পাহাড় আর পাহাড়। বরফের চূড়া ঝক্ ঝক্ করছে সূর্যের আলোয়। পার হয়ে এলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা, এভারেষ্ট—পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা—এই সেদিন পর্যন্ত যা ছিল মানুষের কাছে পরম দুর্গম, পরম বিস্ময়ের স্থান। আমাদেরই মত ক্ষীণদেহ কিন্তু অসমসাহসী দু'টি মানুষ—তেনজিং নোরকে আর এডমণ্ড হিলারী যেখানে তাঁদের প্রথম পদচিহ্ন এঁকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আর একবার প্রতিপন্ন করে এসেছেন।

তারপর আবার পাহাড়। প্রচণ্ড শীত। ভারত ছাড়িয়ে তিব্বতের মালভূমিতে পৌঁছে গেছি আমরা। আর একটু গেলেই এসে পড়ব মহাচীনে। কিন্তু সেখানেও থামব না, আরও উত্তরে হাজার হাজার মাইল গেলে পৌঁছে



এভারেষ্টের অপর বিজয়ীবীর এডমণ্ড হিলারী

যাব সাইবেরিয়ায়। সেখানকার অরণ্য আরও গহন, শীত আরও প্রচণ্ড। কিন্তু তাতেও দমলে চলবে না, যেতে হবে আরও উত্তরে। ঠাণ্ডা সমুদ্র, তার পর চিরতুষারের রাজ্য। শেষে পৌঁছে যাব পৃথিবীর শেষ প্রান্তে—মেরুর দেশে।

সত্যি, ভাবতেও অবাক্ লাগে। কী বিচিত্র এই পৃথিবী!

পণ্ডিতেরা এই পৃথিবীকে বড় বড় পাঁচটি মহাদেশে ভাগ করেছেন। এগুলির মধ্যে সব-চেয়ে বড় হচ্ছে এশিয়া। আমাদের ভারত এই এশিয়ারই একটা অংশ। আমরাও তাই 'এশিয়াটিক্'। আর চারটি মহাদেশের একটি হচ্ছে আমেরিকা। তার আবার দু'টি ভাগ—উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা; তার পর আফ্রিকা, ইয়োরোপ আর সবচেয়ে ছোট অষ্ট্রেলিয়া—আশপাশের দ্বীপ নিয়ে তাকে বলা হয় অষ্ট্রেলেশিয়া। এ ছাড়া আছে অ্যান্টার্ক্টিকা।

নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত

নিষিদ্ধ—অর্থাৎ যে দেশে যেতে বারণ। কিন্তু যেখানে যেতে বারণ সেখানেই তো আগে যেতে ইচ্ছে করে। তাই চল তবে। হিমালয় ডিঙ্গিয়ে ভারতের বাইরে প্রথম যে দেশ পড়বে সেই তিব্বতেই আগে নেমে পড়া যাক।

তিব্বতকে নিষিদ্ধ দেশ বলা হয় কেন? ঐ নামকরণের কারণ আর কিছুই না—তিব্বতের লোকেরা কোনদিনই বিদেশীদের খুব সুনজরে দেখত না, সর্বদাই একটা সন্দেহের ভাব, যেন সবাই গুপ্তচর। আর যদি মনে করত তুমি ওদের দেশের ভিতরকার খোঁজ নিতে গেছে, তা হলে তো আর তোমার রক্ষাই নেই, ঘাড়ের ওপর মাথাটি নিয়ে ফিরে আসাই হ'ত দায়। এই জন্যই তিব্বত সম্বন্ধে সঠিক খবরাখবর জানতে অন্য দেশের লোকদের বেশ দেরী হয়েছে।

তা ছাড়া তিব্বতের চারদিকেই প্রায় রয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের প্রাচীর। ভিতরে ঢুকতে হলে কয়েকটি সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে ঢুকতে হয়। দেশটাও সাংঘাতিক উঁচু। আমাদের দার্জিলিং শহর সমুদ্রতীর থেকে যতটা উঁচু ঠিক ততটা উঁচু আর একটা দার্জিলিং শহর দার্জিলিংএর মাথার ওপর বসিয়ে দিলে তবে হয়তো তা তিব্বতে গিয়ে ঠেকতে পারে। কলকাতা থেকে এরোপ্লেন চড়ে তিব্বতে পৌঁছতে হলে খাড়া তিন মাইল ওপরের দিকে উঠে যেতে হবে। তিব্বতের বেশীর ভাগ জায়গাই ষোল হাজার ফুট বা তার চেয়েও বেশী উঁচু। অত উঁচুতে প্রচণ্ড শীত থাকা তো স্বাভাবিকই। কাজেই অন্য দিক্ দিয়ে না হলেও এদিক্ দিয়েও তিব্বত আপনা থেকেই নিষিদ্ধ দেশ হয়ে পড়েছে।

তিব্বত আমাদের প্রতিবেশী

তিব্বতকে কিন্তু আমাদের ভারতের খুব নিকট প্রতিবেশীই বলব। ভারতের উত্তর সীমানা হচ্ছে হিমালয় আর এই হিমালয় পেরোলেই তো তিব্বত—ঠিক হিমালয়েরই উত্তরে। তাই নিষিদ্ধ দেশ হলেও তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ হয়েছে অনেক দিন, —অন্ততঃ ১৩০০ বছর আগে। শোনা যায় তার আগে তিব্বতীরা ছিল খুব জঙ্গী জাত। কথায় কথায় লুঠপাট, লড়াই—এই সবই জানত। ৭ম শতাব্দীতে স্রোন্‌ৎসেন গম্পো নামে এক রাজা ওখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর ছিল দুই রাণী—একজন চীনের রাজকুমারী, আর একজন নেপালের রাজকুমারী। এই দুই রাণীই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিনী। রাণীদের পাল্লায় পড়ে রাজাও শেষে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং শুধু গ্রহণ করা নয়—সারা দেশে ঐ ধর্ম প্রচারের জন্য নানা রকম চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে প্রজারাও ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল, তাদের জঙ্গীপনাটাও কম্‌ল। আজও তিব্বতের বেশীর ভাগ লোকই বৌদ্ধ।

রাজা শুধু ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্মই নিলেন না, ঐ ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজনটাও বুঝলেন। কিন্তু তিব্বতের লোকেরা তখনও কোন অক্ষর বা লিপির সঙ্গে পরিচিত ছিল না; রাজা তাও ভারত থেকে আমদানী করলেন। তাই আজও তিব্বতী লিপির সঙ্গে ভারতের নাগরী লিপির বেশ খানিকটা মিল দেখা যায়।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ ক্রমেই বাড়তে লাগল। ভারতের বৌদ্ধ শ্রমণরা তিব্বতে গিয়ে ধর্মপ্রচারের জন্য দুরন্ত শীত আর দুর্গম পাহাড়ের বাধা তুচ্ছ করে ও-দেশে যাতায়াত সুরু করলেন। এঁদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্করের নাম তিব্বতে অমর হয়ে আছে। তিব্বতীরা তাঁকে প্রায় দেবতার আসন দিয়েছিল। এঁরই



অতীশ দীপঙ্কর



শরৎচন্দ্র দাস

কথা কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন ঃ

"বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি
তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে
বাঙ্গালী দীপঙ্কর।"

পরবর্তী যুগেও পণ্ডিত নয়নসুখ, পণ্ডিত কৃষ্ণ, শরৎচন্দ্র দাস, রাহুল সংকৃত্যায়ন, এমন কি রাজা রামমোহন রায়ও অনেক বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে তিব্বতে গিয়েছিলেন। বিদেশীদের মধ্যে সুইডেনের বিখ্যাত পর্যটক স্বেন হেদিনের তিব্বতভ্রমণ এবং ও-দেশ সম্বন্ধে নানা তথ্য-সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে।



তিব্বতী বেশে স্বেন হেদিন

আমাদের কয়েকটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রও এই তিব্বতের মধ্যেই রয়েছে। দেবাদিদেব মহাদেবের লীলাভূমি কৈলাস পর্বত আর মানস সরোবর দেখতে হলে এই তিব্বতেই আসতে হবে তোমাকে।

ধর্মগুরুই যেখানে রাজা

তিব্বতে ধর্মের প্রভাব খুব বেশী। তিব্বতী সন্ন্যাসীদের বলা হয় 'লামা'। ধরতে গেলে এই সন্ন্যাসীরাই এ যাবৎ সে দেশ শাসন করে আসছিলেন। তাঁরা শুধু ধর্মচর্চার ব্যাপারেই দেশের ওপর কর্তৃত্ব করতেন না, রাজ্য পরিচালনার ভারও নিয়েছিলেন তাঁরাই। পৃথিবীতে বোধ হয় এই একটি দেশই ছিল যেখানে ধর্মগুরুকেই রাজার আসন দেওয়া হ'ত।

লামাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান দলাই লামা। 'দলাই' কথাটার মানে সমুদ্রের মত বিশাল। তিব্বতের অধিকাংশ অংশেরই কর্তৃত্ব ছিল তাঁর হাতে। সম্প্রতি চীনারা এসে তিব্বত দখল করায় তারা দলাই লামার অধিকার কেড়ে নিয়েছে, তিনি ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু এখনও তিব্বতে তাঁর শত শত ভক্ত অনুচর তাঁর পথ চেয়ে আছে সন্দেহ নেই। কারণ তিব্বতীদের বিশ্বাস দলাই লামা ভগবানের অংশ। তিনি আসলে মানুষ ন'ন, মানুষের রূপ ধরে তাদের মধ্যে বাস করেন। তাঁর মৃত্যুও নেই, মাঝে মাঝে শরীর পরিবর্তন করেন মাত্র। এ জন্য দলাই লামার মৃত্যু হ'লে তারা ধরে নেয় যে তাঁর আত্মা অন্য কোন নতুন মানুষের দেহে ঢুকে নতুন করে জন্মগ্রহণ করেছে। তখন চারদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে



শিশু দলাই লামা

যায়। অন্য লামারা সমস্ত দেশ খুঁজে ঐ সময় যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে থেকে তাঁকে বেছে নেবার চেষ্টা করেন। তার পর যে শিশুর মধ্যে দলাই লামার উপযোগী সমস্ত সুলক্ষণ দেখা যায় তাকেই এনে দলাই লামার পদে বসানো হয়। যতদিন না সে সাবালক হয় ততদিন কঠোর ভাবে তার শিক্ষা-দীক্ষা চলে এবং অন্য একজন বয়স্ক কেউ তাঁর অভিভাবক হিসাবে থাকেন। এখন যিনি দলাই লামা, যিনি ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন,—তাঁর বয়স খুব বেশী নয়—বছর ৩০।৩২ বয়সের এক তরুণ যুবক।

দলাই লামা ছাড়া আরও অনেক লামা আছেন যাঁরা পদগৌরবে নেহাৎ কম ন'ন। যেমন তাসি লামা এবং সম্প্রতি-খ্যাত পাঞ্চেন লামা। এঁদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতা নিয়েও যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়।

তিব্বতের নয়া অভিভাবক

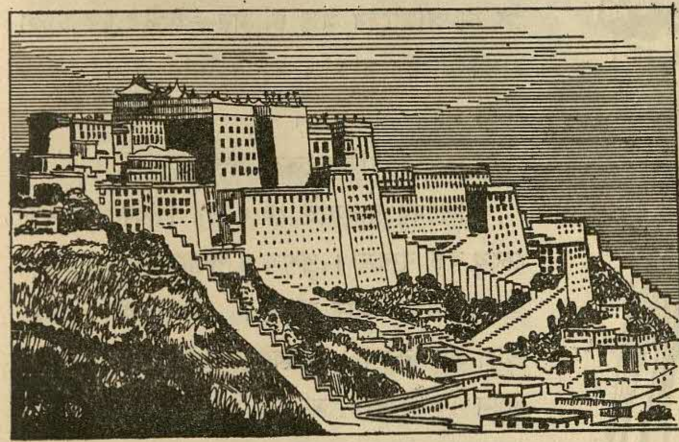
লামাদের অধীনে থাকলেও চীন তিব্বতের ওপর কিছুটা কর্তৃত্ব বরাবরই করে এসেছে। চীন-সম্রাটের আমলেও চীন সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধিকে তিব্বতে রাখা হ'ত—লামাদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখার জন্য। প্রতি তিব্বতী পরিবারকে কিছু কিছু খাজনাও দিতে হ'ত তাদেরকে। চীন সরকার এখন তিব্বতকে চীনেরই অংশ বলে পূরোপূরি দাবী করেছে এবং কয়েকজন খয়েরখাঁ লামাকে হাত করে দলাই লামাকে সরিয়ে দিয়েছে। ফলে



তিব্বতের আর একজন লামা

তিব্বতে এখন পূরোপূরি তাদেরই কর্তৃত্ব। দেশের লোককে শিক্ষিত করবার নাম করে—আধুনিক করবার নাম করে তাদেরকে দিয়ে নিজেদের অনেক বেগারও খাটিয়ে নিচ্ছে। দলাই লামার রাজধানী ছিল লাসা। সেখানে

তাঁর আড়ম্বরপূর্ণ বিখ্যাত প্রাসাদ-দুর্গ "পোতালা প্রাসাদ" এখন চীনাদের একটা সামরিক ঘাঁটি। লামারা সন্ন্যাসী হলেও এ যাবৎ খুব ঐশ্বর্যের



লাসায় দলাই লামার প্রাসাদ-দুর্গ পোতালা প্রাসাদ

মধ্যে থাকতেন। সোনাদানা, রেশম-পশম—আরও কত বিলাসিতার ছড়াছড়ি! এঁদের খরচ যোগাতে সাধারণ লোকদের স্বভাবতঃই বেশ কষ্ট হ'ত।

তিব্বতীরা দেখতে কি রকম

তিব্বতীরা মোঙ্গোলীয় জাতি; অর্থাৎ চীনা, জাপানী, বার্মিজ প্রভৃতির মত পীত জাতির অন্তর্গত। চেহারাও সেই রকম। একটু বেঁটে-খাটো কিন্তু বেশ গাঁট্টাগোট্টা। চ্যাপ্টা নাক, গালের হাড় উঁচু, বাদামী চোখ আর পুরুষদের দাড়ি-গোঁফের বালাই খুবই কম।

বেশীর ভাগ তিব্বতীই বেশ গরীব। তাদের ঘরবাড়ীও সেই রকম। বেশীর ভাগ বাড়ীতেই খান দুই মাত্র ঘর—একটাতে শোয়া, অপরটাতে রান্না, ভাঁড়ার ইত্যাদি যা কিছু। আসবাবপত্র অবশ্য সামান্যই। কিছু বাসনকোশন, কিছু পশমী জামাকাপড় আর ঐ রকম টুকিটাকি। বাড়ীগুলো সাধারণতঃ ইটে তৈরী, কিন্তু আমাদের মত পোড়া ইট নয়—রোদের তাতে শুকোনো ইট। শীতের দেশের লোক বলে তিব্বতীরা খুব কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু তেমনি নোংরা। স্নান করার পাট নেই বললেই চলে। এজন্য এদের গায়ে এত ময়লা জমে যে অনেক সময়ে আসল রং কি বোঝা মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে। গায়ের চামড়াও ঐ কারণে খুব সহজে ফেটে যায়। স্নান যেমন করে না, তেমনি জামা-কাপড় ধোয়ারও পাট নেই। হয়তো একই জামা গায়ে দিয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে—যতক্ষণ না জামা ছিঁড়ে পরবার অযোগ্য হচ্ছে। ধনী তিব্বতীদের অবশ্য পোষাকের জাঁকজমক আছে। উৎকৃষ্ট চীনে সাটিনের ওপর ভাল পশম বসিয়ে তারা গায়ে দেয়। মেয়েদের গায়েও সোনার ছড়াছড়ি। বরফের ওপর দিয়ে চলবার জন্য এরা লম্বা গাম্



তিব্বতী বাড়ী



একটি অবস্থাপন্ন তিব্বতী পরিবার

বুটের মত জুতো পরে। দেশের অনেক জায়গাই তো বেশ কয়েক মাস বরফে ঢাকা থাকে কিনা!

তিব্বত দেশটা দেখতে কেমন

বিরাট দেশ তিব্বত, তাই এর নানান্ অঞ্চলের চেহারাও নানান্ রকমের। কোন কোন জায়গা এত রুক্ষ, এত পাথুরে যে মাইলের পর মাইল হাঁটলেও একটা গাছ চোখে পড়বে না। এ সব জায়গায় মানুষ কমই বাস করে, কিন্তু বুনো ছাগল, বুনো হরিণ, এমন কি চমরী গাইও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কোন কোন জায়গায় গাছপালা এত কম যে লোকে মন্দিরে পূজো দেবার জন্য ফুল পায় না, তার বদলে ব্যবহার করে পাথরের নুড়ি। আবার দক্ষিণ দিক্‌টা বেশ শস্যশ্যামলা। রাজধানী লাসাও এদিক্‌টাতেই। এদিকে নদীটদী আছে, চাষবাসও হয় যথেষ্ট। ভুট্টা, যব, মটর ইত্যাদি ফসল ফলে। অবশ্য ভেড়ার মাংসই ওদের প্রধান খাদ্য। অনেক সময় সে মাংস শুকিয়ে রেখে বহুদিন পর্যন্ত খাওয়া চলে—কাঁচাই। চা খেতেও ওরা ওস্তাদ্। তবে সে চা আমাদের মত চা নয়—ইটের মত চাকা চাকা চায়ের চাকতি মাখন আর নুনের সঙ্গে ঘুঁটে গরম গরম খায়।

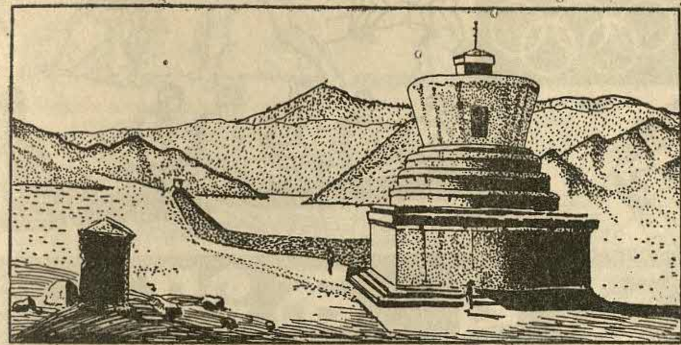
তিব্বতের সম্পদ্

পশমের ব্যবসাই বোধ হয় তিব্বতের সবচেয়ে বড় ব্যবসা। পশম ও পশুলোম। এ ছাড়া আছে সোনা আর রূপো। ভাল ভাল সোনা, ভাল ভাল রূপো। তিব্বতের পাহাড়ে, বালিতে, এমন কি নদীর মধ্যেও প্রচুর সোনার কণা মেশানো আছে। সেই সোনা তুলে ওরা চীনের সঙ্গে কারবার করে বহু টাকা ঘরে তোলে।

তিব্বতীদের কয়েকটি অদ্ভুত প্রথা

আগেই বলেছি ধর্মচর্চার ঝোঁক ওদের মধ্যে প্রবল। সারা দেশ যুড়ে বৌদ্ধমন্দিরের (গুম্বা) ছড়াছড়ি। তেমনি ছড়াছড়ি লামার। অনেক ছেলেকেই শৈশব থেকে শিক্ষা দিয়ে এই রকম লামা তৈরী করা হয়। মন্ত্র জপার ওরা একটা সহজ উপায় বার করে নিয়েছে। একটা চাকার (দেখতে থামের মত) গায়ে মন্ত্র লেখা, সেটা ঘোরালেই মন্ত্র জপ করার কাজ হয়ে যায়। একে বলে ধর্মচক্র। ওদের জপের মন্ত্র হচ্ছে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"।

নানা রকম উৎসবও প্রচলিত ওদের মধ্যে। উৎসবের নামগুলো বেশ মজাদার।—যেমন, ফন্‌স্থূপেচ, চুস্থূপেচ, গেস্থূপেচ, মেস্থূপেচ, গাজিপেচ, লুল্লুপেচ ইত্যাদি। উৎসবের সময়ে এরা বিচিত্র মুখোস প'রে নাচে। ওদের মধ্যে আর একটা নিয়ম বিদেশীদের কাছে খুব অদ্ভুত লাগে। একই মেয়ের অনেকগুলো স্বামী। বড় ভাই যাকে বিয়ে



তিব্বতের বৌদ্ধমন্দির বা গুম্বা

করল, সে নাকি আর সব ভাইদেরও বৌ, তা সে ভাই যত বাচ্চাই হোক না কেন! দেশে পুরুষের সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় কম বলেই হয়তো এই নিয়ম ছিল। অবশ্য এই প্রথা এখন প্রায় উঠে যাচ্ছে।

তিব্বতী ছেলেমেয়ে

অন্য দেশের ছেলেমেয়েদের মত তিব্বতের ছেলেমেয়েরাও খেলাধূলা ভালবাসে। বড়লোকের ছেলেরা জমকালো পোষাক পরে বটে কিন্তু গরীবের ছেলেরা ঠিক উল্টো,— একেবারে কিছুই পরে না। একবার এক ইয়োরাপীয় ভ্রমণকারী চারধারে বরফ-ঘেরা এক জায়গায় এক পাল তিব্বতী ছেলেকে সম্পূর্ণ খালি গায়ে ঘুড়ি ওড়াতে দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন কিন্তু ছেলেদের তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই, তারা ঘুড়ি নিয়েই ব্যস্ত। জন্ম থেকেই ঐ আবহাওয়ায় মানুষ কিনা! এদেরই



ধর্মচক্র



তিব্বতীদের মুখোস নৃত্য

কেউ কেউ হয়তো আর একটু বড় হলে কঠোর ব্রহ্মচর্য শিখে এক একটি লামায় পরিণত হবে। আজকাল তিব্বতী ছেলেরাও অনেকে আধুনিক যুগের উপযোগী শিক্ষাদীক্ষা সুরু করেছে।

তিব্বতের উত্তরে মহাচীন। তার গল্প আমরা পরবর্তী খণ্ডে বলব।



খেলাধূলার কথা

আদ্যিকালের খেলাধুলা

খেলাধূলার প্রতি মানুষের আগ্রহ চিরকালের। পৃথিবীতে খেলাধূলার প্রচলন কি করে আরম্ভ হয়েছিল তার সঠিক কোন হিসেব না থাকলেও সেই আদ্যিকাল থেকেই যে মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য সে যুগে খেলার ধরনটা হয়তো ছিল অন্য রকম। আদিম যুগের গুহামানবের আঁকা যে সব ছবি প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুঁজে বার করেছেন তার মধ্যেও এই সব খেলাধূলার কিছু কিছু নমুনা মেলে। যেমন, একটা ছবিতে আছে, একদল লোক সেজেগুজে, হাতে বর্শা নিয়ে একটা মন-গড়া জানোয়ারের মূর্তির চার পাশে নাচছে আর সেই মূর্তিটার গায়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করছে। এও নিশ্চয়ই এক রকমের খেলা। সে যুগের মানুষ চাষবাসের ধার ধারত না, শিকার-করা পশুমাংসই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। কাজেই এই শিকার করাটা ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা বড় কাজ। মনে হয়, খেলার ভিতর দিয়েও তারা নকল শিকারের অভিনয় করে চিত্তবিনোদন করত।

তারপর ধর মল্লযুদ্ধ, যাকে আমরা চলতি কথায় বলি কুস্তি। এটিও অতি প্রাচীন কালের খেলা। নামে 'যুদ্ধ' হলেও আসলে এটি সত্যিকারের যুদ্ধ নয়, নেহাৎই খেলাচ্ছলে বল পরীক্ষা, সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই! রামায়ণ-মহাভারতেও এই ধরনের নানারকম খেলাধূলার বিবরণ আছে। মল্লযুদ্ধের কথা আছে, তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করার প্রতিযোগিতার কথা আছে। এই রকম কত কি! দ্রোণাচার্য কাঠের শুকপাখী তৈরী করে শিষ্যদের একে একে দূর থেকে তার চোখ বাণবিদ্ধ করতে বললেন,—সেও তো খেলার ভেতর দিয়েই পরীক্ষা নেওয়া! কন্দুক, অর্থাৎ বল ছোঁড়াছুঁড়ি ক'রে খেলার কথাও আছে। সে তো নেহাৎই খেলা! এ ছাড়া বাচ্চা ছেলেমেয়েদের খেলনা নিয়ে খেলা তো ছিলই,—যদিও খেলাধূলার মধ্যে সে আলোচনা আমরা করব না। তবে এ ধরনের খেলনারও নমুনা প্রচুর পাওয়া গেছে। সেই পাঁচ হাজার বছর আগেকার মহেঞ্জোদাড়োর ছেলেমেয়েদের খেলনা, চার হাজার বছর আগেকার মিশর দেশের ছেলেমেয়েদের খেলনা, আড়াই হাজার বছর আগেকার গ্রীস্ দেশের ছেলেমেয়েদের খেলনা! এ থেকেই আন্দাজ



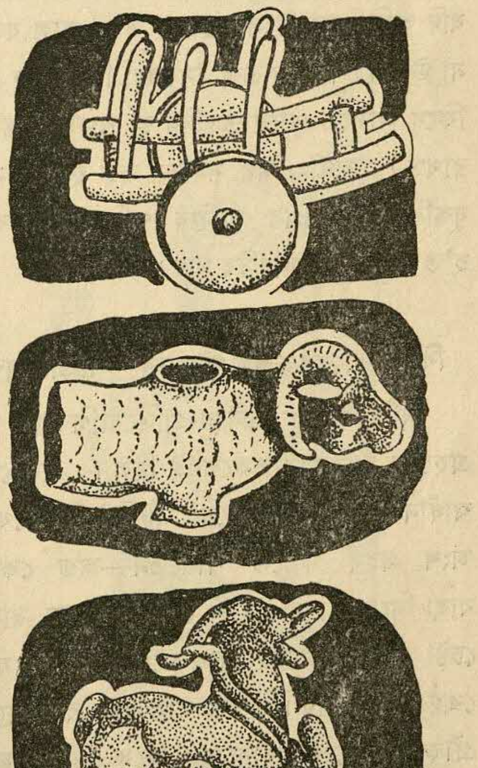
দ্রোণাচার্য শিষ্যদের তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদের খেলা শেখাচ্ছেন।

করা যায় খেলাধূলার প্রচলন পৃথিবীর সর্বদেশেই বহুকাল থেকে সুরু হয়েছে। তবে প্রাচীন কালের খেলাধূলার সবচেয়ে ভাল বিবরণ যা আমরা পাই তা হচ্ছে প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক খেলা।

সে যুগের অলিম্পিক

প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক খেলা—সেও কি আজকের? যীশু খৃষ্ট জন্মাবারও ৭৭৬ বছর আগে এর সুরু। সভ্যতার উষালোকই বলা যেতে পারে সেই যুগকে।

গ্রীসের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ছিল প্রাচীন অলিম্পিয়া নগরী। সেখানে ছিল দেবরাজ জিউসের মন্দির। প্রতি চার বছর পর পর সেই দেবরাজের পূজা উপলক্ষে এখানে হ'ত বিরাট এক উৎসব। দেশবিদেশ থেকে জ্ঞানী, গুণী, মনীষীর সমাবেশ ঘটত। আসত সৌম্যকান্তি, বলিষ্ঠদেহ খেলোয়াড়ের দল। সমস্ত অলিম্পিয়া নগরী পুষ্পপল্লবে সজ্জিত হয়ে এক নয়নাভিরাম রূপ নিত। সুদূর গ্রাম থেকে, অন্যান্য শহর



প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মহেঞ্জোদাড়োর ছেলেমেয়েরা যে সব খেলনা নিয়ে খেলত

থেকে দলে দলে নরনারী এসে মন্দিরের সামনে জড় হ'ত। শহর যুড়ে উৎসবের বন্যা বয়ে যেত যেন! আর এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই হ'ত এক বিরাট ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা—যার নাম ছিল অলিম্পিক্ গেম্‌স্ বা অলিম্পিক খেলা।

অলিম্পিয়া নগরীর এই মহোৎসবকে সে যুগের লোকেরা এত পবিত্র মনে করত যে উৎসবের কয়েকটি দিন কোনও রণাঙ্গনে কোন সৈনিক অস্ত্রধারণ করত না। সে সময়ে গ্রীস ছোট ছোট নগর রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এদের কারো সঙ্গে কারো যুদ্ধ চলতে থাকবার সময়ে যদি অলিম্পিক উৎসব সুরু হ'ত তা হলে যতদিন না উৎসব শেষ হয় এবং সৈন্যেরা নিজ নিজ দেশে ফিরে আসতে পারে ততদিন দু' পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ রাখত। অর্থাৎ, অল্প সময়ের জন্য হলেও, সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের ওপর শান্তির পবিত্র বারি বর্ষিত হ'ত দেবতার পুষ্পবৃষ্টির মত।

বিজয়ী বীরের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—পাতার মুকুট

অলিম্পিয়ার ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অধিকার সকলেরই ছিল। যে কোন স্বাধীন গ্রীক দশ মাসের 'ট্রেনিং' নিয়ে খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারতেন—অন্য কোনও বাধা-নিষেধ ছিল না। তবে প্রত্যেক রাজ্যই চেষ্টা করত তাদের নিজের দেশের লোক যাতে শ্রেষ্ঠ আসন পায়। এ জন্য সাত বছর বয়স হলেই গ্রীক বালকদের শরীরচর্চার দিকে ভীষণ ভাবে নজর দেওয়া হ'ত।

সিসিলি থেকে আরম্ভ করে এশিয়া মাইনর অবধি যেখানে যত খেলোয়াড় সবাই এসে সমবেত হতেন অলিম্পিয়ায়—পেন্থালন, প্যান-



প্রাচীন অলিম্পিকের একটি দৃশ্য
একজন প্রতিযোগী রথের দৌড়ে অংশ নিচ্ছেন।

ক্রেসিয়া, কুস্তি, ডিস্‌কাস ছোঁড়া, জ্যাভেলিন ছোঁড়া, দৌড় এবং রথ-দৌড়ে অংশ গ্রহণ করতে। বিজয়ী বীরকে পরিয়ে দেওয়া হ'ত অলিভ পাতায় গাঁথা উজ্জ্বল সবুজ রঙের অপূর্ব-সুন্দর বনমুকুট। স্বদেশে ফিরে এলে দেশের রাজা দিতেন বহুমূল্য উপহার। যোগ্য সম্মানে ভূষিত করতেন দেশের বীর সন্তানকে।

প্যানক্রেসিয়ান্ প্রতিযোগিতায় যিনি সাফল্য অর্জন করতেন তাঁর সম্মানের বুঝি তুলনা ছিল না! কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, পদাঘাত এবং শ্বাসরোধের মাধ্যমে এই খেলায় জয়লাভ করতে হ'ত। খেলাটি অবশ্য ছিল নিদারুণ। বিজয়ীর হাতে বিজিতকে প্রাণ দিতে হ'ত। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই খেলাটির পরিসমাপ্তি ঘোষিত হ'ত।

পেন্থালন প্রতিযোগিতায় যিনি চ্যাম্পিয়ন তাঁকে জয়ী হতে হ'ত উচ্চ লম্ফ, দৌড়, ডিস্‌কাস্ ও জ্যাভেলিন নিক্ষেপ এবং 'ষ্ট্যাণ্ড-আপ্' কুস্তিতে।

আজকাল মুষ্টিযোদ্ধাদের তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়। লাইটওয়েট্, মিডলওয়েট্ এবং হেভিওয়েট্। কিন্তু প্রাচীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আমলে এমন কোন শ্রেণীবিভাগ



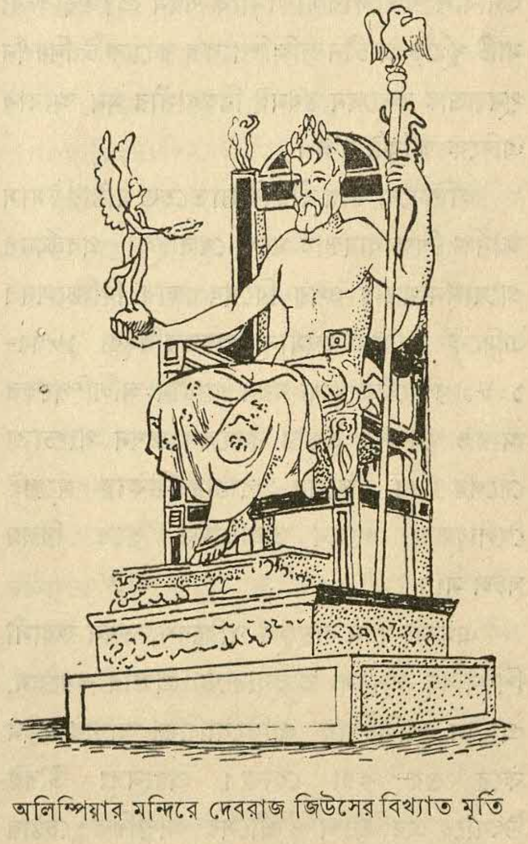
প্রাচীন অলিম্পিকের একজন খেলোয়াড় ডিস্‌কাস্ ছুঁড়ছেন।

ছিল না। ফলে, ওজনে যিনি সবচেয়ে ভারী হতেন, মুষ্টিযুদ্ধের বিজয়মুকুট সাধারণতঃ তাঁরই মাথায় শোভা পেত।

অলিম্পিক উৎসবে কিন্তু শুধু খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতাই হ'ত না। কবি, গায়ক, শিল্পী—সকলের মধ্যেই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। তাঁরাও দলে দলে এসে যোগ দিতেন এবং বিজয়ী হলে পাতার মুকুট মাথায় নিয়ে সগর্বে দেশে ফিরতেন।

কেন বন্ধ হ'ল

৩৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ওপর যবনিকাপাত ঘটান রোমের সম্রাট্ প্রথম থিওডেসিয়াস। কোন খেলাধূলোকেই তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। শরীরচর্চাকে মনে করতেন নিছক পাগলামি। তাঁর মনের মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে সভ্য ক্রিশ্চিয়ান জগতে আদিম বর্বর যুগের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার কোন স্থানই থাকতে পারে না। শুধু অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করেই তিনি খুসী হন নি, অলিম্পিক স্টেডিয়াম এবং অলিম্পিক মন্দির ধ্বংস করে ফেলারও নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁরই নির্দেশে প্রাচীন বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য—হাতীর দাঁত, সোনা এবং এবনীতে তৈরী—অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার মূর্ত্য প্রতীক গ্রীক দেবতা জিউসের বিরাট মূর্তি কন্‌ষ্ট্যান্‌টিনোপ্‌লে স্থানান্তরিত করে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে প্রাচীন ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন এই জগৎবিখ্যাত মূর্তিটি আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।



অলিম্পিয়ার মন্দিরে দেবরাজ জিউসের বিখ্যাত মূর্তি

৪২৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় থিওডেসিয়াস্ আরো এককাঠি অগ্রসর হন। তাঁর নির্দেশে গ্রীক

দেবদেবীর সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে ফেলা হয়, ধ্বংস করে ফেলা হয় অলিম্পিয়ায় অবস্থিত জিউসের বিরাট মন্দির। এবং তারপর, ধ্বংসের যেটুকু বা বাকি ছিল, বন্যায় এবং ভূমিকম্পে তার ষোলকলা পূর্ণ হয়।

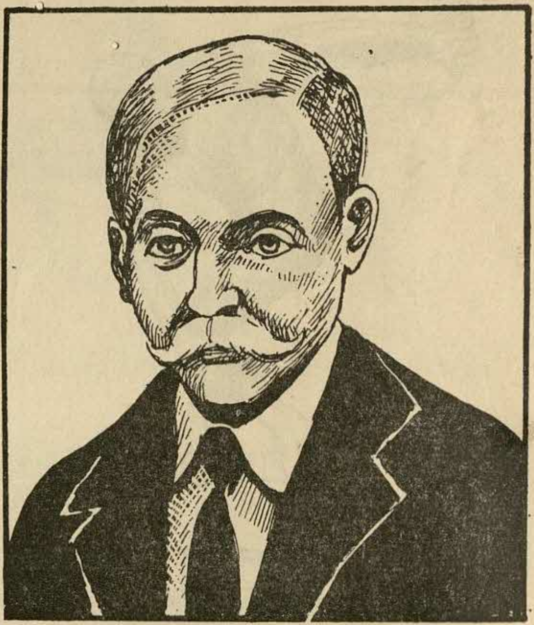
এই ভাবেই শেষ হয় প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক।

অলিম্পিকের পুনর্জাগরণ

পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাচীন শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি নতুন করে আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু খেলা-ধূলা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন অলিম্পিকের কয়েকটি নিদর্শন পুনরুদ্ধার করলেন তখনই বিশ্ববাসীর মন আবার এদিকে আকৃষ্ট হ'ল।

ইতিমধ্যে রাগ্‌বীর বিখ্যাত হেড মাষ্টার টমাস আর্নল্ড শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে খেলাধূলা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছিলেন। এদিকে আবার জার্মান্ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা ১৮৭৫-১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যখন প্রাচীন অলিম্পিকের আরও নিদর্শন উদ্ধার করলেন তখন পাশ্চাত্য দেশের সব স্কুলের পাঠ্যতালিকার মধ্যেই খেলাধূলার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে বিলম্ব ঘটল না।

এমনই যখন অনুকূল পরিবেশ, তখন ফরাসী শিক্ষাবিদ্ ব্যারন দ্য কুবারতেঁ প্রস্তাব করলেন, প্রাচীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা আবার নতুন করে শুরু করা হোক। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে এবং ফ্রান্স ও গ্রীসের আন্তরিক চেষ্টায় বহুদিনের ফেলে-আসা গৌরবোজ্জ্বল অতীত আবার পুনরুজ্জীবিত হ'ল।



ব্যারণ দ্য কুবারতেঁ

ব্যারন কুবারতেঁই নতুন করে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁরই আহ্বানে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-কংগ্রেসের অধিবেশন বসল প্যারিসে, এবং সভায় স্থির হ'ল—নতুন করে আবার বিশ্বব্যাপী অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হবে। পরে এই কমিটি আরও সম্প্রসারিত হ'ল। বর্তমানে ৪৭টি স্বাধীন দেশের ৭৬ জন সভ্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত।

এথেন্সে প্রথম অলিম্পিক

এইভাবে আধুনিক অলিম্পিক প্রতি-যোগিতার গোড়াপত্তন হ'ল, এবং অলিম্পিয়ার দেশ গ্রীসের বর্তমান রাজধানী এথেন্স শহরে ১৮৯৬ সালে প্রথম অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হ'ল। অবশ্য প্রথম বারের খেলায় ততটা জাঁক-

জমক সম্ভব হয় নি এবং মাত্র ১২টি দেশ এতে অংশ গ্রহণ করেছিল। সে সময়ে আমেরিকারও ধারণা ছিল যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা কেবল মাত্র ইয়োরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ফলে আমেরিকা এতে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করে নি। কেবলমাত্র বোস্টন্ অ্যাথলেটিক্ অ্যাসোসিয়েশন থেকে দশজন খেলোয়াড়কে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পাঠানো হয়, তাও আবার এই দশজন খেলোয়াড়কেই নিজ নিজ খরচ বহন করতে হয়।

প্রথম বছরের ডিসকাস্ থ্রো প্রতিযোগিতায় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যারেট জয়লাভ করেন; ২৬ মাইল দৌড়-প্রতিযোগিতা ম্যারাথন রেসে গ্রীসের স্পিরিডন লুই জয়লাভ করে নিজের দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। সে বার ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম তিনটি স্থানই গ্রীকরা অধিকার করেন। অবশ্য পরে তাঁদের এই রেকর্ডের আর পুনরাবৃত্তি ঘটে নি।

ম্যারাথন রেস

ম্যারাথন রেসটা আসলে কি জিনিস্? এর উত্তর পাওয়া যাবে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার এক ঘটনায়।

যীশু খৃষ্ট জন্মাবারও ৪৯০ বছর আগেকার কথা। গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের কিছু দূরে প্রাচীন এক গ্রাম,—নাম এটিকা। সেই গ্রামে একবার পারস্যের সেনাবাহিনীর সঙ্গে গ্রীসের সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই বাধে। এই যুদ্ধের নাম ম্যারাথনের যুদ্ধ। মিলিটিয়াডেসের অধিনায়কত্বে গ্রীস এই যুদ্ধে জয়লাভ করে।

তখনকার দিনে না ছিল বেতার যন্ত্র, না ছিল



ফেইডিপিডিস যুদ্ধজয়ের খবর দেবার জন্য ম্যারাথন থেকে এথেন্সে ছুটলেন।

দ্রুতগামী বিমানপোত। এটিকার আনন্দবার্তা এথেন্সে বহন করে নিয়ে যাবে কে? তখন অলিম্পিক দৌড়বীর ফেইডিপিডিস্ বল্লেন—"আমার ওপর দায়িত্বটা দিন, আমিই খবরটা পৌঁছে দেব।"

এটিকা থেকে এথেন্স অবধি ফেইডিপিডিস্ প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে এলেন। এথেন্স পৌঁছেই বিজয়-উল্লাসে ঘোষণা করলেন, "আনন্দ করুন, আনন্দ করুন, আমরা জিতেছি", তারপরই মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লেন, আর উঠলেন না।

এটিকার ম্যারাথন মাঠ থেকে এথেন্সের দূরত্ব হচ্ছে ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। এই গোটা পথটা ফেইডিপিডিসকে দৌড়তে হয়। এই ঘটনাকে স্মরণ করেই ম্যারাথন রেসের প্রবর্তন করেন ব্যারন কুবারতেঁ। অলিম্পিক প্রতিযোগিতাতেও ম্যারাথন দৌড়ের দূরত্ব হচ্ছে ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ।

প্রতি চার বছর পর পর

ব্যারন কুবারতেঁর সম্মানে ১৯০০ সালের অলিম্পিক্স্ অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে। সে বছর

প্যারিসে ঐ একই সময়ে একটা বিরাট প্রদর্শনী হচ্ছিল, তাই অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জৌলুষ কিছুটা ম্লান হয়ে যায়, উদ্বোধন-অনুষ্ঠানও পিছিয়ে দিতে হয় কয়েকদিনের জন্য। তারপর রবিবার কয়েকটি খেলার ফাইন্যাল থাকায় একজনও আমেরিকান সেদিন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আসেন নি। দর্শকদের মধ্যে এক বিরাট অংশই চলে যান সীন নদীর তীরে, মৎস্য-শিকার প্রতিযোগিতা দেখতে। সুপরিচালনার অভাবে ম্যারাথন দৌড়ও প্রহসনে পরিণত হয়। অনেককেই বলাবলি করতে শোনা যায় যে প্যারিসের একজন রুটিওয়ালার ছেলে, মাইকেল থিয়াটো, অসাধুতার আশ্রয় নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছেন।

আমেরিকার সেন্ট লুইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিক্‌সও প্যারিসের অনুরূপ আর একটি প্রদর্শনীর বিরাটত্বের মধ্যে আপনার জৌলুষ অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। ইয়োরোপ থেকে খুব অল্পসংখ্যক প্রতিযোগী খেলায় অংশ গ্রহণ করতে আসেন। এমন কি আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের অনেক প্রতিযোগীও এতে অংশ গ্রহণ করেন নি। অ্যাথলেটিক্‌স্ প্রতিযোগিতা বলতে গেলে কেবল নিউইয়র্ক অ্যাথলেটিক ক্লাব এবং চিকাগো অ্যাথলেটিক ক্লাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিউবার পোষ্টম্যান—ফেলিক্স কারভাজাল ম্যারাথন রেসে চতুর্থ স্থান অধিকার করেও নাম করেন সবচেয়ে বেশী। ফেলিক্সের কোন স্পোর্ট-শার্ট ছিল না। লং প্যান্ট এবং লম্বা হাতের শার্টকে কাঁচি দিয়ে কেটে ইনি ম্যারাথন রেসে দৌড়ান। আমেরিকার হিকস্ ম্যারাথনে চ্যাম্পিয়ন হন। তিনি শেষ সীমায় পৌঁছে দেখেন—তাঁর আগেই আর একজন প্রতিযোগী সেখানে পৌঁছে গেছেন এবং তাঁকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পরে জানা যায়, এগারো মাইল মোটরে করে এসে তিনি জয়লাভ করেছেন। তাঁকে এর পর চিরদিনের জন্য খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, এবং হিকস্‌কে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

১৯০৮ সালের প্রতিযোগিতা রোমে হওয়ার কথা ছিল; শেষ মুহূর্তে স্থান বদল করে লণ্ডন করা হয়। পরিচালনার ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি হয় এবার, কিন্তু হলে কি হবে—দু'-একটি অসুবিধা থেকে যায়। স্টেডিয়ামে আমেরিকা ও ফিনল্যাণ্ডের পতাকা খুঁজে পাওয়া যায় না। অবস্থা চরমে ওঠে ৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যালের সময়। একজন আমেরিকান প্রতিযোগী অন্যায় ভাবে দৌড়েছেন—এই অভিযোগে বিচারক নির্দেশ দেন—রেসটি আবার হোক। আমেরিকান প্রতিযোগীরা দৌড়তে অস্বীকার করেন, ফলে ওয়াক্-ওভার পেয়ে উইণ্ডহ্যাম হ্যালস্‌ওয়েল স্বর্ণপদক লাভ করেন। অলিম্পিকের ইতিহাসে ওয়াক্-ওভারের ঘটনা আর কখনও ঘটে নি।

খেলাধূলার মান এবং পরিচালনা-ব্যবস্থা—সব কিছু বিচার করে দেখতে গেলে, ষ্টকহল্‌মে অনুষ্ঠিত ১৯১২ সালের অলিম্পিক্‌স্ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নর্থ আমেরিকান ইণ্ডিয়ান জিম থর্প, ফিনল্যাণ্ডের কোহলে মেইনেন এবং হাওয়াইএর ডিউক কাহানামাকোকু—এই তিনজন বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন ষ্টকহল্‌ম্ অলিম্পিক্‌স্‌এ। থর্প ডেকাথ্‌লন এবং পেন্টাথ্‌লনএ,

কোহলে মেইনেন ৫,০০০ এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়ে এবং ডিউক কাহানামাকোকু সাঁতারে সাফল্য লাভ করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিক্স্ অ্যান্টওয়ার্পে অনুষ্ঠিত হয়। সে বছর পোল ভল্ট এবং ৪০০ মিটার হার্ডল্স্এ বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং পাঁচটি অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। বেলজিয়াম বনাম চেকো-শ্লোভাকিয়ার ফুটবল ফাইন্যালের দিন, বেলজিয়াম যখন ২—০ গোলে অগ্রগামী, তখন চেকোশ্লোভাকিয়া মাঠ ত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বেলজিয়ামকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

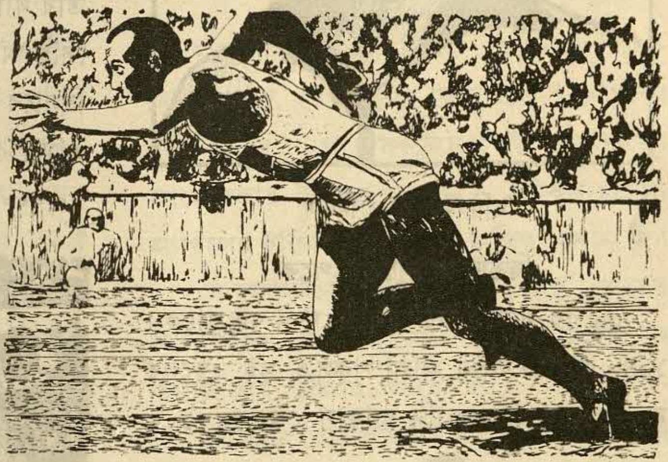
অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হলে তাকে দেওয়া হয় স্বর্ণপদক, দ্বিতীয় হলে রৌপ্যপদক এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করলে তাকে দেওয়া হয় ব্রোঞ্জের পদক।

১৯২৪—আবার প্যারিস। এবারে আমেরিকা ৪৫টি স্বর্ণ, ২৭টি রৌপ্য এবং ২৭টি ব্রোঞ্জের পদক পেয়ে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। ফিনল্যাণ্ডের দৌড়বীর প্যাভো নুরমী ১৫০০, ৫,০০০ এবং ১০,০০০ মিটার ক্রস্ কান্ট্রি রেসে এবং ৩,০০০ মিটার টিম রেসে প্রথম হয়ে চার চারটি স্বর্ণপদক পান।

ভারতও যোগ দিল

১৯২৪ সালে ইংল্যাণ্ডের লোয়ে ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছিলেন, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমষ্টারডামেও আবার তিনি ঐটিতে প্রথম হন; আমষ্টারডাম অলিম্পিকেই ভারতবর্ষ প্রথম তাদের হকি দল পাঠায় এবং প্রথম বছরেই অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে হকির বিজয়-মাল্য লাভ করে। মাত্র একবার পাকিস্তান ছাড়া সেই বিজয়মাল্য আজ পর্যন্ত অন্য কোন দেশের পক্ষেই ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হয় নি।

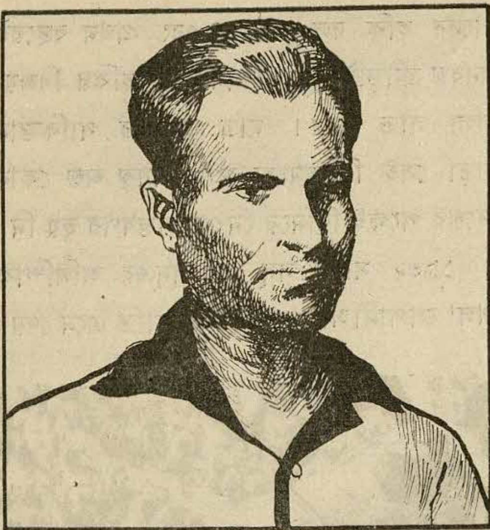
১৯৩২ সালে লস্ এঞ্জেল্স্এর অলিম্পিক খেলা জাপানী সাঁতারুদের বিশ্বখ্যাতি এনে দেয়।



জেসি আওয়েন্স

একমাত্র ৪০০ মিটার ছাড়া পুরুষদের সকল বিভাগেই জাপান সাফল্যলাভ করে।

বিরাট আড়ম্বরের মধ্যে ১৯৩৬ সালের অলিম্পিক্স্ অনুষ্ঠিত হয় বার্লিনে। হিটলার তখন বার্লিনের কর্তা। আমেরিকান নিগ্রো জেসি আওয়েন্স ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড়ে, লং জাম্পে এবং ৪ × ১০০ মিটার রীলে রেসে দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। বার্লিনের খেলায় হকিতে ভারতের কৃতিত্বে সবাই আবার মুগ্ধ হয়। ভারতের হকি-ক্যাপ্টেন ধ্যানচাঁদের নাম দেওয়া হয় 'হকি-ফকির' ধ্যানচাঁদ।



"হকি-ফকির" ধ্যানচাঁদ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে

এরপর যুদ্ধের জন্য দু'বার খেলা বন্ধ থাকে। ১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিক্‌স্‌এ দুই ছেলের মা—ডেনমার্কের ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন ১০০



এমিল জেটোপেক সকলের আগে আগে দৌড়চ্ছেন।

এবং ২০০ মিটার দৌড়, ৮০ মিটার হার্ডল্‌স্‌ এবং মেয়েদের রীলেতে বিজয়ী হয়ে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেক ১০,০০০ মিটারে জয়লাভ করেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়া লাভ করে তাদের প্রথম স্বর্ণপদক।

এমিল জেটোপেকই হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত ১৯৫২ সালের অলিম্পিকে সবচেয়ে নাম করেন। তাঁর খ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়ে যে অনেকেই হেলসিঙ্কি অলিম্পিককে "জেটোপেকের অলিম্পিক" হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর্মি মেজর এমিল জেটোপেক রেকর্ড সময়ে ৫,০০০ এবং ১০,০০০ মিটার দৌড় এবং ম্যারাথনে বিজয়ী হন।



জেটোপেকের পত্নী ড্যানা বর্শা ছুঁড়ছেন।

অলিম্পিকের দূর পাল্লার দৌড়বীর হিসাবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জেটোপেকের পত্নী ড্যানাও এই প্রতিযোগিতায় জ্যাভেলিন ছোঁড়ায় স্বর্ণপদক পান। স্বামীস্ত্রী একসঙ্গে অলিম্পিকের ইতিহাসে নাম রেখে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়!

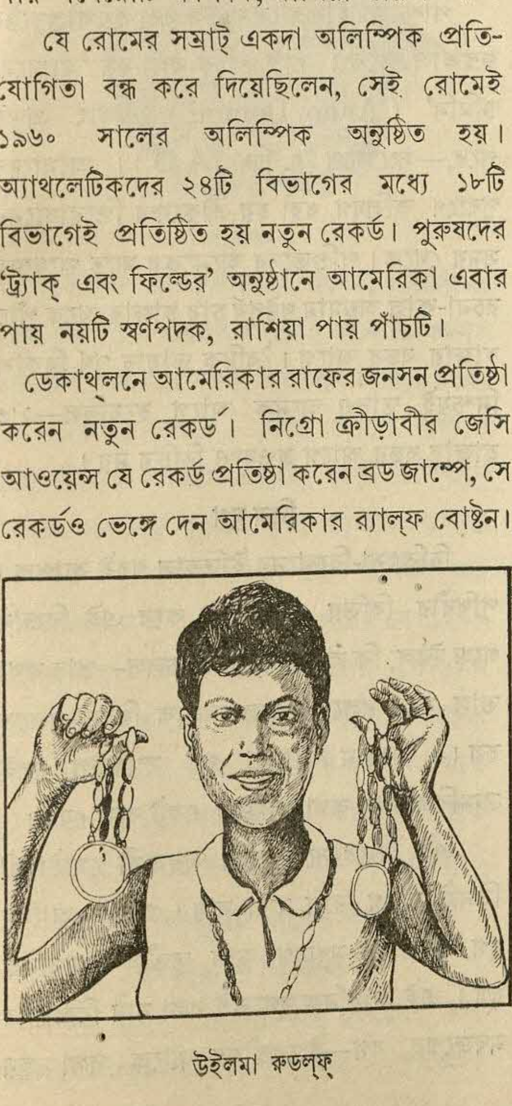


মহিলা অ্যাথ্‌লেট ইরিনা প্রেস হার্ড্‌ল্‌ রেসের বেড়া ডিঙিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৫৬ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। প্যারি ও'ব্রায়ান (আমেরিকা) এবং চার্ল্‌স্‌ ডুমা(আমেরিকা) যথাক্রমে শট্‌ পাটে এবং হাইজাম্পে বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যারাথনে চ্যাম্পিয়ন হন এলেন মিমোঁ। 'ট্র্যাক এবং ফিল্ড ইভেন্টের' পুরুষদের বিভাগে আমেরিকা পায় পনেরোটি স্বর্ণপদক, রাশিয়া পায় তিনটি।

যে রোমের সম্রাট্‌ একদা অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেই রোমেই ১৯৬০ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাথলেটিকদের ২৪টি বিভাগের মধ্যে ১৮টি বিভাগেই প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন রেকর্ড। পুরুষদের 'ট্র্যাক্‌ এবং ফিল্ডের' অনুষ্ঠানে আমেরিকা এবার পায় নয়টি স্বর্ণপদক, রাশিয়া পায় পাঁচটি।

ডেকাথ্‌লনে আমেরিকার রাফের জনসন প্রতিষ্ঠা করেন নতুন রেকর্ড। নিগ্রো ক্রীড়াবীর জেসি আওয়েন্স যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন ব্রড জাম্পে, সে রেকর্ডও ভেঙ্গে দেন আমেরিকার র‍্যাল্‌ফ বোষ্টন।



উইলমা রুডল্‌ফ্‌

মহিলাদের মধ্যে তিনটি স্বর্ণপদক (১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড় এবং ৪০০মিটার রীলে দৌড়) পেয়ে সবচেয়ে বেশী নাম করেন আমেরিকার উইলমা রুডল্‌ফ্‌। চৌকস মহিলা অ্যাথ্‌লেট ইরিনা প্রেসও কম কৃতিত্ব দেখান নি।

যে ভারত হকিতে অপরাজেয় ছিল, রোমের অলিম্পিকে পাকিস্তানের কাছে ফাইন্যালে তাকে হার স্বীকার করতে হয়।

ম্যারাথন রেসে ইথিওপিয়ার বিকিলা আবিবি খালি পায়ে দৌড়িয়ে রেকর্ড সময়ে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হন এবং অলিম্পিকের ইতিহাসে ইথিওপিয়া পায় তাদের প্রথম স্বর্ণপদক।

১৯৬৪ সালে জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে অলিম্পিকের ব্যবস্থা হয়। এশিয়ায় এই হচ্ছে প্রথম অলিম্পিক খেলা। এবারকার ব্যবস্থাই কিন্তু হ'ল সর্বাঙ্গসুন্দর। এবারে সবশুদ্ধ ৮৪টি দেশ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়।

সবচেয়ে বেশী স্বর্ণপদক অবশ্য অধিকার করে আমেরিকা, কিন্তু তিন রকম পদক মিলে মোট পদক সবচেয়ে বেশী পায় রাশিয়া,—সব শুদ্ধ ৯৬টি। এবারেও বহু বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ হয়, আর হকিতে ভারত পাকিস্তানকে ফাইন্যালে হারিয়ে দিয়ে তার হারানো গৌরব আবার ফিরে পায়।



চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা

চিকিৎসা-বিজ্ঞান কবে থেকে সুরু হ'ল

চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস আর মানুষের সভ্যতার ইতিহাস প্রায় একই সময় থেকে সুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। মানুষ যেদিন থেকে পশুজীবন অতিক্রম করে সত্যিকার মানুষ হয়ে বাস করতে শিখল সেদিন থেকেই সে শরীরের নানারকম উপসর্গ, আধিব্যাধি থেকে আরোগ্য-লাভ করবার কথা ভেবে আসছে এবং তার জন্য নানা উপায়ও উদ্ভাবন করতে ছাড়ে নি। বিশেষ করে নানা রকম গাছগাছড়া—গাছের পাতা, শিকড়, ছাল, ফুল, ফল—সব কিছু নিয়েই সে পরীক্ষা করে দেখেছে, তার পর তা থেকে বাছাই করে চিকিৎসা-বিদ্যায় প্রয়োগ করেছে। তাই দেখা যায় যে দেশের সভ্যতা যত পুরোনো সে দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রও তত পুরোনো।

এ সম্পর্কে স্বভাবতঃই আমাদের নিজেদের দেশ ভারতবর্ষের কথা আগে মনে পড়ে। আমাদের এই ভারতবর্ষের সভ্যতা যে কত পুরোনো তা ভাবলে অবাক্ হতে হয়। যদি পুরাণের হিসেব ধরি তা হলে আজকে, যখন এই বই লিখছি, সেই সালটাকে বলতে হয় কলিযুগের ৫০৬৭ বছর। তারও আগে ছিল সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ—যার কথা রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে লেখা আছে।

পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসে খৃষ্টাব্দ ধরা হয় যীশুখৃষ্টের জন্মকাল থেকে। তাই তাকে বলা হয় 'অ্যান্‌নো ডমিনি' (Anno Domini) অর্থাৎ প্রভুর পরে,—সংক্ষেপে এ. ডি. (A.D.)। আমাদের পুরাণে কলিযুগ ধরা হয় শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সময় থেকে। পণ্ডিতদের অনেকের মতে ঋগ্বেদের রচনা-কাল অনুমান খৃষ্টপূর্ব চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। বৈদিক ভাষার পূর্ণ বিকাশ নিশ্চয়ই তারও অনেক আগে হয়েছিল—২।৩ হাজার বছর আগে হওয়াও বিচিত্র নয়।

তিন যুগ

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস খুবই ব্যাপক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কি করে এই বিজ্ঞান গড়ে উঠল, কি করে তা এগিয়ে চলল—তার কথা ভাল করে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়। এখানে আমরা খুব সংক্ষেপে সেই ক্রমবিকাশের কথা গোড়ায় একটু বলে নেব।

এই ইতিহাসকে সময় অনুযায়ী মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম—আদিম যুগ, দ্বিতীয়—মধ্যযুগ আর তৃতীয়—আধুনিক যুগ। এই আধুনিক যুগকেই বলা যায় বিজ্ঞানের নবজন্মের যুগ—ইংরেজীতে যাকে বলা হয়

"রেনেশাঁস্"। এর আগেকার যুগকে অন্ধকার যুগ বা 'ডার্ক্ এজেস্' বলা যেতে পারে।



গ্যালেন

পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকরা বলেন, গ্যালেনের পরের প্রায় ১২০০ বছর কালটাই হচ্ছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্ধকার যুগ। গ্যালেন হচ্ছেন ১৩২-২১০ খৃষ্টাব্দের লোক। তাঁর আগে বিখ্যাত গ্রীক্ চিকিৎসক হিপোক্র্যাটিস্ ছাড়া চিকিৎসা-শাস্ত্রের অত বড় ধুরন্ধর আর কাউকে পাওয়া যায় না। গ্যালেনকে বলা হয় "পরীক্ষামূলক চিকিৎসার জনক"। গ্যালেনের পরের যে ১২০০ বছরের কথা বলছি—ঐ সময়টায় গোঁড়ামি আর অন্ধসংস্কারের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোন উন্নতি তো হয়ই নি, উল্টে তার অগ্রগতি পদে পদে ব্যাহত হয়েছিল। কাজেই তাকে অন্ধকার যুগ বলা হবে না তো কি বলা হবে ?

ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কথা ঃ

বেদ-পুরাণে কি বলে

বেদের কথা তোমরা এই বইয়েরই অন্য জায়গায়—বিশ্বসাহিত্যের কথায় পড়েছ। বেদকে বলা হয়েছে অপৌরুষেয়, অর্থাৎ বেদ নাকি কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রণীত গ্রন্থ নয়। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রকে বলা হয় আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদও বেদেরই অংশ, কাজেই ওটিকেও আমরা মোটামুটি বেদেরই সমসাময়িক বলে ধরে নিতে পারি। ঋগ্বেদের একটি সূত্রে রুদ্রকে বলা হয়েছে, "ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি"। ভিষক্ মানে যে চিকিৎসক তা নিশ্চয়ই জান। যজুর্বেদে এই আয়ুর্বেদের বিবরণ বিশেষ করে দেওয়া আছে। সেখানেও আয়ুর্বেদ-প্রণেতাকে দেবতা বলা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালন-কর্তা বিষ্ণু এবং সংহারকর্তা রুদ্র বা মহেশ্বর —সকলের ওপরই বেদের বিভিন্ন জায়গায় আয়ুর্বেদের কর্তৃত্ব চাপানো হয়েছে আর আয়ুর্বেদকে বলা হয়েছে ঋগ্বেদের উপবেদ।



হিপোক্র্যাটিস্

—"ঋগ্বেদস্য আয়ুর্বেদ উপবেদঃ" বাক্যটি থেকেই এর অর্থ উপলব্ধি করা যায়। যে জ্ঞানের সাহায্যে আমরা আয়ু লাভ করতে পারি, তাই হ'ল আয়ুর্বেদ।

গ্রীক্ দেশেও ঠিক এই রকম চিকিৎসা-বিদ্যার মূলে দেবতাদের কর্তৃত্বের উল্লেখ দেখা যায়—মহাকবি হোমারের ইলিয়াড্ মহাকাব্যে।



অ্যাস্‌লিপিয়াস্‌

গ্রীক দেব অ্যাপোলোর পুত্র অ্যাস্‌লিপিয়াস্‌কে বলা হয়েছে এই বিদ্যার জনক এবং তিনি আমাদের দেশের ধন্বন্তরির মতই দেবতা বলে স্বীকৃত হয়েছেন।

এবারে আসা যাক ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। তার এক জায়গায় লেখা হয়েছে প্রজাপতি ব্রহ্মা চতুর্বেদ প্রণিধান করলেন এবং তার অর্থ চিন্তা করে প্রণয়ন করলেন আয়ুর্বেদ নামক পঞ্চম বেদ। তারপর তা দিলেন ভাস্করদেবকে। ভাস্কর তাই নিয়ে নিজের নামে রচনা করলেন ভাস্কর-সংহিতা। এর পর শিষ্য পরম্পরায় রোগ আরোগ্যের জন্য ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশিরাজ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নকুল, সহদেব, অত্রি, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, গৈল, করথ, অগস্ত্য—এঁরা প্রত্যেকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ১৬টি সংহিতা রচনা করে প্রচার করলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে আরও একটি ধারার উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মা আয়ুর্বিদ্যা দান করলেন দক্ষ প্রজাপতিকে। তিনি দিলেন তাঁর ছেলেকে। তারপর সূর্যদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ইন্দ্র উক্ত বিদ্যা লাভ করলেন। ইন্দ্রের কাছ থেকে পেলেন ভরদ্বাজ ঋষি, যিনি নাকি অথর্ববেদের দশম মণ্ডলের ১২শ সূক্ত রচনা করেছিলেন। ভরদ্বাজ এই বিদ্যা দিলেন ঋষি আত্রেয়কে।

পুরাণ থেকে এবার আমরা ইতিহাসের পাতায় চলে এলাম। কারণ এই আত্রেয়কে আমরা ঐতিহাসিক যুগের লোক বলে ধরে নিতে পারি। ইনিই প্রথম পদ্ধতিমত পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন তক্ষশিলায় খৃঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। আত্রেয়ের ছয়জন শিষ্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল ভেল বা ভেদ-রচিত 'ভেলসংহিতা' এবং অগ্নিবেশ-রচিত 'অগ্নিবেশ-সংহিতা'ই পাওয়া গেছে। এই অগ্নিবেশ-সংহিতাই পরে কাশ্মীরের চরক ঋষি সংকলন ও সংস্কার করে সুবিখ্যাত 'চরক-সংহিতা' রচনা করেন, যদিও কেউ কেউ অনুমান করেন —চরক তাঁর কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি। যাই হোক এই চরকের নাম আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে হয়তো তোমরা অনেকেই শুনেছ। এঁর সেই চরক-সংহিতা এখনও চলিত আছে এবং সুষ্ঠুভাবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিখতে হলে এখনও এ বই না পড়ে উপায় নেই। কাজেই চরককেই বোধ হয় আমরা ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীনতম আয়ুর্বেদ-গ্রন্থকার বলে ধরে নিতে পারি। অবশ্য চরকের সেই সংহিতা তাঁর পরবর্তী কালে



আত্রেয় শিষ্যদের আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন।

দৃঢ়বল নামে আর একজন কাশ্মীরী ভিষক্ সযত্নে সম্পাদনা করে সম্পূর্ণ করেন। দৃঢ়বল এই সম্পাদনার সময়ে বাগ্ভট ও মাধবের সংহিতা ও নিদান গ্রন্থেরও সাহায্য নিয়েছিলেন। চরকসংহিতা বলতে এখন এই দৃঢ়বল-সংকলিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থখানিই বোঝায়। আয়ুর্বেদ বিদ্যার কায়চিকিৎসার (মেডিসিন) এটিই প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

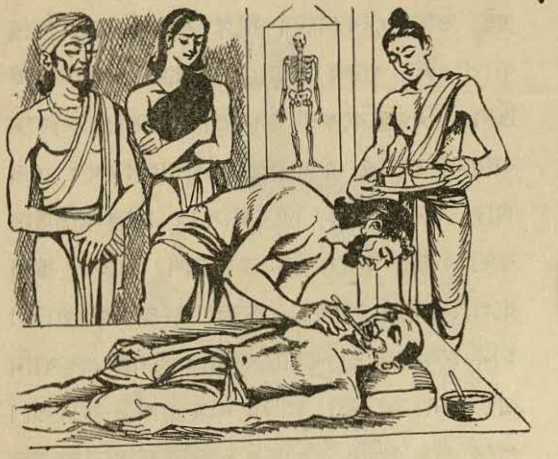
সুশ্রুত থেকে ভাবমিশ্র

তোমাদের অনেকের হয়তো ধারণা যে অস্ত্র-চিকিৎসা বা সার্জারী জিনিসটা একেবারে নতুন যুগের আমদানী। এ যুগে অস্ত্রচিকিৎসায় যে অদ্ভুত রকম উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহ নেই, কিন্তু সেকালে—চিকিৎসার সেই আদিম যুগেও যে এদেশে অস্ত্রচিকিৎসার যথেষ্ট প্রচলন ছিল তা কি ভাবতে পার? আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই অস্ত্র বা শস্ত্রচিকিৎসাকে (যাকে আমরা বলি 'সার্জারী') বলা হ'ত শল্যতন্ত্র।

পুরাণে আছে, ইন্দ্রই ধন্বন্তরিকে শস্ত্র-চিকিৎসায় শিক্ষা দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, এই ভাবে দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক যুড়ে দিয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব বাড়ানোর প্রথা সব দেশেই ছিল। ধন্বন্তরিকেও কতকটা দেবতার আসনে বসানো হলেও এঁর জন্ম কাশীরাজবংশে। এঁর আর এক নাম দিবোদাস। চরকসংহিতার কথা বলতে গিয়ে যে অগ্নিবেশ ঋষির কথা বলেছি, ইনি সম্ভবতঃ তাঁরই সময়কার লোক। ইনি শল্যতন্ত্র বা শস্ত্রচিকিৎসার ওপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বইটির নাম সুশ্রুত-সংহিতা। পরে এতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কায়চিকিৎসার কিছু কিছু অংশ যুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন যে বইখানি সুশ্রুত-সংহিতা নামে পরিচিত তা হচ্ছে সেই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।

আমরা আজ জানি যে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। অ্যানোফেলিস জাতের মশা ম্যালেরিয়ার বীজাণু বয়ে বেড়ায়,—সেই মশার কামড়ই ম্যালেরিয়ার বিভিন্ন ধরনের জ্বরের কারণ। বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের বহু পরে (১৮৯০-১৯০৫) এই সত্যটি আবিষ্কার করেন। অথচ, শুনলে অবাক্ হবে, সেই কোন্ আদ্যি-কালে রচিত সুশ্রুত-সংহিতায় লেখা আছে মশার কামড়ে জ্বর রোগ হয়।

জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে সুশ্রুত-সংহিতায় এমন অনেক খাঁটি কথা লেখা আছে যা পড়লে আজও আমাদের মনে সম্ভ্রম জাগে। চিকিৎসার অনেক শাখা আছে। চিকিৎসকের এর সবগুলি সম্বন্ধেই মোটামুটি জ্ঞান থাকা উচিত। ঐ বইএ এ সম্পর্কে এক জায়গায় লেখা আছে —যে চিকিৎসক শুধু নিজের শাখার সংকীর্ণ জ্ঞানটুকু ছাড়া অন্য শাখাগুলি শেখেন নি তিনি



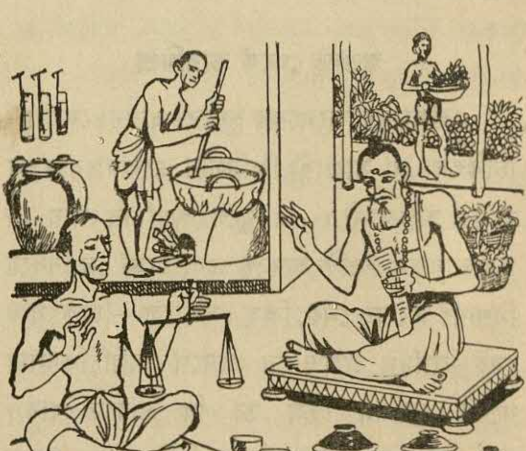
আয়ুর্বেদ চিকিৎসক রোগীর মুখে অস্ত্রোপচার করছেন।

চিকিৎসক ন'ন—হাতুড়ে, অশিক্ষিত চিকিৎসক। এঁদের বর্জন করতে হবে।—"বর্জয়েৎ তান্ ভিষক্পাশান পাশান্ বৈবস্বতানিব"। এই হাতুড়েদের দোষে কারও মৃত্যু ঘটলে অপরাধের গুরুত্ব বিচার করে রাজার উচিত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া।

এর পরের নামকরা বই বাগ্ভটের 'অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ'। বাগ্ভট সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। এঁকে বৃদ্ধ বাগ্ভটও বলা হয়, কারণ এঁর পর আর একজন তরুণ বাগ্ভট 'অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহের বিষয়বস্তুকে আটটি বিশেষ শাখায় ভাগ করে 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়' নামে একখানি বই তৈরী করেন। এই ৮টি ভাগ হচ্ছে ঃ কায়-চিকিৎসা (যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'ইন্টার্নাল মেডিসিন), শল্যতন্ত্র (মেজর সার্জারী), শালাক্য-তন্ত্র (মাইনর সার্জারী—যেমন নাক, কান, গলা ইত্যাদিতে অস্ত্রোপচার), অগদতন্ত্র বা বিষ-চিকিৎসা (টক্সিকোলজি), রসায়ন (টনিক্স্ অ্যাণ্ড স্টিমুল্যান্ট্স্), বাজীকরণ (অ্যাফ্রো-ডিসিয়াক্), কৌমারভৃত্য অর্থাৎ শিশুচিকিৎসা (পেডিয়াট্রিক্স্)।

এ ছাড়া মাধব কর লিখেছিলেন রোগ-নিদান বা 'প্যাথলজীর' বই। এঁকে বৃদ্ধ বাগ্ভটের সমসাময়িক লোক বলে মনে করা হয়। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বেশ ক'খানি ভাল ভাল বই লেখা হয়েছিল, যেমন—চরক-সংহিতা, সুশ্রুত-সংহিতা, অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা, মাধব-রচিত নিদান ইত্যাদি।

এর পর আসেন একদল পণ্ডিত যাঁদের কাজ হ'ল এই মূল বইগুলির ভাষ্য তৈরী করা। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুশ্রুতের ভাষ্যকার ভাস্করভট্ট (১১শ শতাব্দী) ও ডল্লন (১২শ শতাব্দী), চরকের ভাষ্যকার চক্রপাণি দত্ত (১১শ শতাব্দী), বাগ্ভটের ভাষ্যকার অরুণ দত্ত (আনুমানিক ১২২০ খৃঃ) ও মাধবের টীকাকার বিজয় রক্ষিত (আনুমানিক ১২৪০-১২৬০ খৃঃ)।



প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসকেরা রোগীর জন্য ওষুধ তৈরী করছেন।

১৬শ শতাব্দীতে ভাবপ্রকাশ নামে একখানি আয়ুর্বেদের সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন ভাবমিশ্র। তাঁর আগে যাঁরা আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে নানা মত ও উপদেশ দিয়েছিলেন—তাঁদেরই রচনার সার-সংগ্রহ হচ্ছে এই ভাবপ্রকাশ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সাফল্য

ভারতীয় চিকিৎসকেরা কি কি রোগের চিকিৎসায় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, কি কি উপায়ে ঐ সব চিকিৎসা করতেন শুনলে বিস্ময় বোধ হয়। মধুমেহ (যাকে আজকাল আমরা বলি ডায়াবেটিস), রক্ত-আমাশয়, রক্ত-অতিসার, বিসূচিকা বা কলেরা, রাজযক্ষ্মা, ক্রিমি, বাত, মৃগী, উন্মাদরোগ, চর্মরোগ, কুষ্ঠ, বিষক্রিয়া—সবেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। এমন কি কর্কট রোগ বা ক্যান্সারও বাদ যায় নি। কোন্ কোন্ রোগ ছোঁয়াচে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রোগীকে সুস্থ লোকদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে হবে—এ সবও তাঁরা বলে গেছেন।

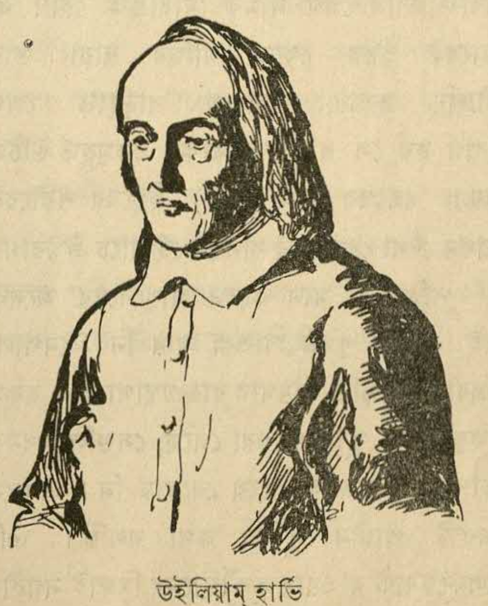
রোগনির্ণয় অর্থাৎ কি রোগ হয়েছে বার করবার জন্য তাঁরা যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন তার অনেকগুলি আজও আমরা ব্যবহার করছি। যে সব ওষুধ তাঁরা ব্যবহার করতেন তাদের সংখ্যাই শুধু নয়, গুণ দেখেও এ যুগের বিজ্ঞানীরা অবাক্ হয়ে গেছেন। এ নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে, আরও হচ্ছে।

বায়ু, পিত্ত, কফ—একে বলা হ'ত ত্রিদোষ, আর সমস্ত চিকিৎসা ব্যাপারটাই মোটামুটি এই তিনটির ওপর নির্ভর করত। এই তিনটি দোষ পরীক্ষা করে দেখাকে বলত 'ত্রিদোষ-বিচার'। রোগীর পথ্য কি হবে তাও ঠিক করা হ'ত এই বিচার অনুযায়ী।

কি ভাবে চিকিৎসা করতে হবে সে সম্বন্ধেও প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নানা উপদেশ দেওয়া হয়েছে বেশ সরস ভাবেই। শাস্ত্র শুধু পড়লেই হবে না, যুক্তিপূর্ণ বিচারের সাহায্যে তার মর্ম গ্রহণ করে তাকে কাজে প্রয়োগ করতে হবে। আর তা যদি না করা হয়? তা হলে সে চিকিৎসকের অবস্থা হবে রান্নার হাতার মত—যা নাকি অবিরত মুখরোচক খাবারের মধ্যে ডুবে থেকেও তার রসের কণামাত্র গ্রহণ করতে পারে না। শ্লোকটি এই রকম ঃ

"যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলং তু বহুশ্রুতঃ
শাস্ত্রার্থং ন বিজানাতি দর্বী সূপরসং যথা।"

পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে উইলিয়াম্ হার্ভির দান অবিস্মরণীয়। হৃদ্‌যন্ত্র



উইলিয়াম্ হার্ভি

ও শিরা-উপশিরা দিয়ে রক্ত চলাচল সম্পর্কে এঁর আবিষ্কার চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর এনেছিল। কিন্তু মনে হয় এর মূল কথা তাঁর অন্ততঃ দু' হাজার বছর আগেও আয়ুর্বেদের ঋষিরা জানতেন।

তবে ২।১ জায়গায় তাঁদের জ্ঞান অনেকটা কাল্পনিক ছিল, বললে ভুল হবে না,—বিশেষ করে শারীরস্থান বিদ্যা বা অ্যানাটমির কোন কোন ব্যাপারে। যেমন মানুষের শরীরে ৩৬০ খানা হাড় আছে, বন্ধনী বা স্নায়ু (লিগামেন্ট) আছে ৮০০, শিরা আছে ৩০০ ইত্যাদি। এগুলো কাল্পনিক ছাড়া কিছু নয়, এবং সত্যিও নয়। তবে মশার কামড় থেকে যে জ্বর হতে পারে এ রকম জ্ঞান ছিল। ইঁদুর থেকেও যে মারাত্মক অসুখ হতে পারে এ তথ্যও তাঁরা আবিষ্কার করে গেছেন। যদি কারও বাড়ীতে ইঁদুর ধড়ফড় করে পড়ে আর মারা যায় তা হলে সে বাড়ী সদ্য ত্যাগ করার উপদেশ আছে। আজ আমরা সবাই জানি প্লেগ নামক মারাত্মক রোগ ঐ ভাবেই ইঁদুর থেকে মাছির দ্বারা তার বীজাণু ছড়ায়, আর যে বাড়ীতে প্লেগ রোগ হয় সে বাড়ীতে থাকা একমুহূর্ত উচিত নয়। প্লেগের মাছি (ফ্লী) ইঁদুরের শরীরেই প্রথম দেখা দেয় আর অসম্ভব ছোঁয়াচে ঐ রোগ।

পণ্ডিতেরা মনে করেন আয়ুর্বেদের অনেক বই এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। নেপাল, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি জায়গার রাজগ্রন্থাগারে এ রকম কিছু কিছু পুঁথি পাওয়া গেছে, সেগুলি এখনও ছাপার অক্ষরে বই হয়ে বেরোয় নি। এখানে একটি প্রাচীন পুঁথির কথা বলছি। এটি লেফ্‌টেনান্ট বাওয়ার তুর্কীস্থানের মিঙ্গাই নগরীর ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কার করেন। ভূর্জপাতার ওপর লেখা পুথি। হর্নেল নামে এক পণ্ডিত ১৮৯০ সালে এটি কিনে নিয়ে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এতে বর্ণিত অনেক ভৈষজ্যের বিবরণ চরক, সুশ্রুতের সঙ্গে আশ্চর্য রকম মিলে যায়। ভেলসংহিতা বইটি চরকের চেয়েও প্রাচীন। এটি আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে লেখা হয়।

যন্ত্রপাতি, হাসপাতাল, সেবাকেন্দ্র

সুশ্রুত প্রায় ১২১ রকম শল্যশস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন যা নাকি অস্ত্রোপচারের সময়ে কাটা-ছেঁড়ার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। আলেক্‌জান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন (৩২৭ খৃঃ পূঃ) তখনই ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান খুব উন্নত অবস্থায় এসে গেছে। এর খ্যাতি তখন এত বেশী ছিল যে সুদূর গ্রীস, রোম ও মধ্য এশিয়ায়ও এর প্রভাব দেখা যেত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্তেসিয়াস্‌ (অনুমান ৪০০ খৃঃ পূঃ) এবং মেগাস্থিনিস (অনুমান ৩০০ খৃঃ পূঃ) এঁরা দু'জনে প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধানে ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন। এঁরা দু'জনেই ছিলেন চিকিৎসক, এবং দু'জনেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। গ্রীস ও ভারতের মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদানের অনেক প্রমাণ এই সব বিবরণ থেকে পাওয়া যায়।

রোগীর চিকিৎসা ভাল করে করার জন্য আজকাল সব দেশেই হাসপাতাল তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু, তোমরা শুনে অবাক্ হবে, যে

যীশু খৃষ্টের জন্মেরও প্রায় শ' পাঁচেক বছর আগে বৌদ্ধযুগে ভারতে এবং ভারত থেকে সিংহলে হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল। সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুরেও রোগী ও বিকলাঙ্গদের জন্য এই রকম হাসপাতাল ও শুশ্রূষাকেন্দ্র ছিল। প্রতি দশখানি গ্রামে একটি করে এই রকম হাসপাতাল বা সেবাশ্রম শিক্ষিত চিকিৎসকদের অধীনে থাকত এবং তাতে প্রধানতঃ গরীব রোগীদেরই চিকিৎসা করা হ'ত। তা ছাড়া এই সব হাসপাতালের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ বিভাগও থাকত বিচক্ষণ চিকিৎসকদের অধীনে। এই বিভাগের কাজ ছিল রাস্তাঘাট, বাজার, পুকুর, নালা, নর্দমা, খাদ্য, পানীয়, বাতাস এই সব সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, যাতে রোগ না হতে পায় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

অস্ত্র-চিকিৎসার অবনতি

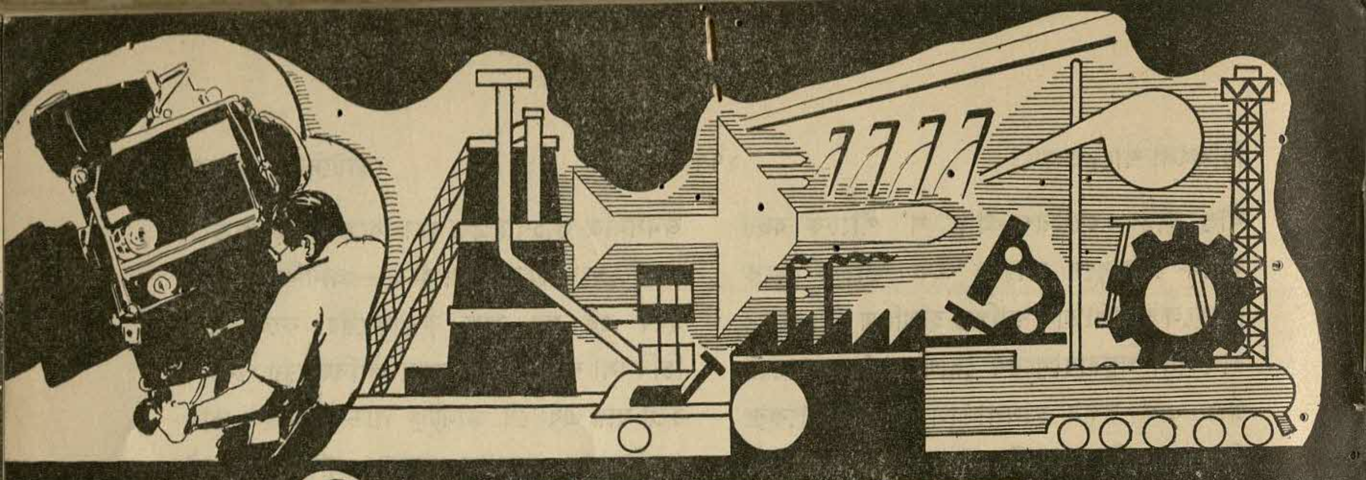
বৌদ্ধ শাসনকালে অহিংসা সম্বন্ধে বড়ই বাড়াবাড়ি করা হয়, ফলে সার্জারী বা শস্ত্র-চিকিৎসা মোটেই অগ্রসর হতে পারে না। শস্ত্রচিকিৎসার (অপারেশন) পরে রোগী মারা গেলে অনেক সময় চিকিৎসকের গুরুতর দণ্ডবিধান করা হ'ত এবং সার্জারী হিংস্র চিকিৎসা বা দানবীয় চিকিৎসা বলে বিদ্বেষ করা হ'ত।

পরবর্তী হিন্দু শাসনকালেও গোঁড়ামির ফলে জনসমাজ শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মড়া কাটলে অশুচি হতে হবে, পাপ হবে,—প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এই সব অন্ধ কুসংস্কারের ফলে শস্ত্র-চিকিৎসা বাধা পায়—নতুন আবিষ্কারের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং যে জ্ঞানটুকু লাভ হয়েছিল তাও অনুশীলনের অভাবে ক্রমশঃ মলিন ও নষ্ট হয়ে যায়।

এল অন্ধকার যুগ

সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে মুসলমানদের প্রভাব আস্তে আস্তে সুরু হয়। ৭১১ সালে সিন্ধুর রাজা দাহির মহম্মদ বিন্ কাশেমের কাছে পরাজিত হ'ন। তারপর থেকেই ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশেষ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চর্চা কমতে থাকে এবং শেষে একেবারে থেমে যায়। স্বাধীনতা হারাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের অর্জিত জ্ঞানও ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলি এবং এই অবস্থা চলতে থাকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত —যতদিন না পশ্চিমের নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো অন্যান্য দেশের মত এদেশেও ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আজ তোমাদের খানিকটা বললাম, পরবর্তী খণ্ডে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি ভাবে এই বিজ্ঞান গড়ে উঠল তার কাহিনী শোনাব।



বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

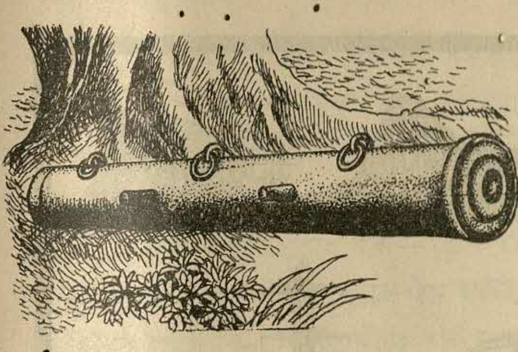
সভ্যতার নতুন যুগ

এর আগে মানুষের সভ্যতার গল্প শুনতে গিয়ে তোমরা প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ—ইত্যাদি আদ্যিকালের গল্প কিছু কিছু শুনেছ। এবারে শোন সভ্যতার নতুন যুগের কথা—যাকে বলা হয় লৌহযুগ। মানুষ যেদিন লোহার আবিষ্কার করে তাকে কাজে লাগাতে শিখল সেদিন থেকেই এ যুগের সূচনা, আর সে যুগ এখনও চলছে। শুধু চলছেই না, এত দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে যে ভাবলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তাই সেই লোহার কথা দিয়েই এ যুগের কাহিনী সুরু করি।

লোহার ব্যবহার মানুষ কবে থেকে শিখল সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখন পর্যন্ত একমত ন'ন। কেউ কেউ বলেন, তামার ব্যবহার শেখার আগেও মানুষ লোহার সঙ্গে পরিচিত ছিল, কিন্তু লোহার জিনিস সহজেই মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যায়, তাই সে যুগের লোহার কোন চিহ্ন এখন আর নেই। তবে প্রায় হাজার চারেক বছর আগেও যে প্রাচীন মিশরে লোহার অস্ত্র-শস্ত্র ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আমাদের ভারতবর্ষের লোকেরাও অনেক দিন আগে থেকেই লোহার সঙ্গে পরিচিত ছিল। পুরাণের অনেক কাহিনীতে লোহার অস্ত্রশস্ত্রের কথা আছে। তোমরা, যারা দিল্লীর কুতুব মিনার দেখেছ, তারা তার পাশেই রাজা পৃথ্বীরাজ বা রায় পিথোরার মন্দিরের সামনে যে বিরাট লোহার থামটি বসানো আছে তাও নিশ্চয়ই দেখেছ। এটি প্রায় দেড় হাজার বছর আগের তৈরী। কিন্তু, আশ্চর্য, আজও এর গায়ে একটু মরচে পড়ে নি! এ রকম প্রাচীন লোহার তৈরী থাম, কড়ি-বরগা এদেশের আরও কোন কোন জায়গায় পাওয়া গেছে। এ সম্পর্কে কোণারকের সূর্যমন্দিরের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। তখনকার দিনে এখনকার মত বড় বড় কল-কারখানার চল হয় নি, তা সত্ত্বেও এ সব বিরাট্ বিরাট্ লোহার থাম কি করে তৈরী করা হয়েছিল ভাবতে অবাক্ লাগে।

২।৩ শ' বছর আগেও তো লোহার কারখানা ছিল না, কিন্তু তখনও এদেশের কামাররা লোহার তৈরী রকমারি জিনিস,—এমন কি বড় বড় ভারী ভারী কামান পর্যন্ত গড়ে গেছে! মুর্শিদাবাদ নবাববাড়ীর সামনে 'জাহানকোষা' নামে বেশ বড় একটা লোহার কামান পড়ে আছে। এটিও নবাবী আমলে তৈরী। যে



জাহানকোষা কামান

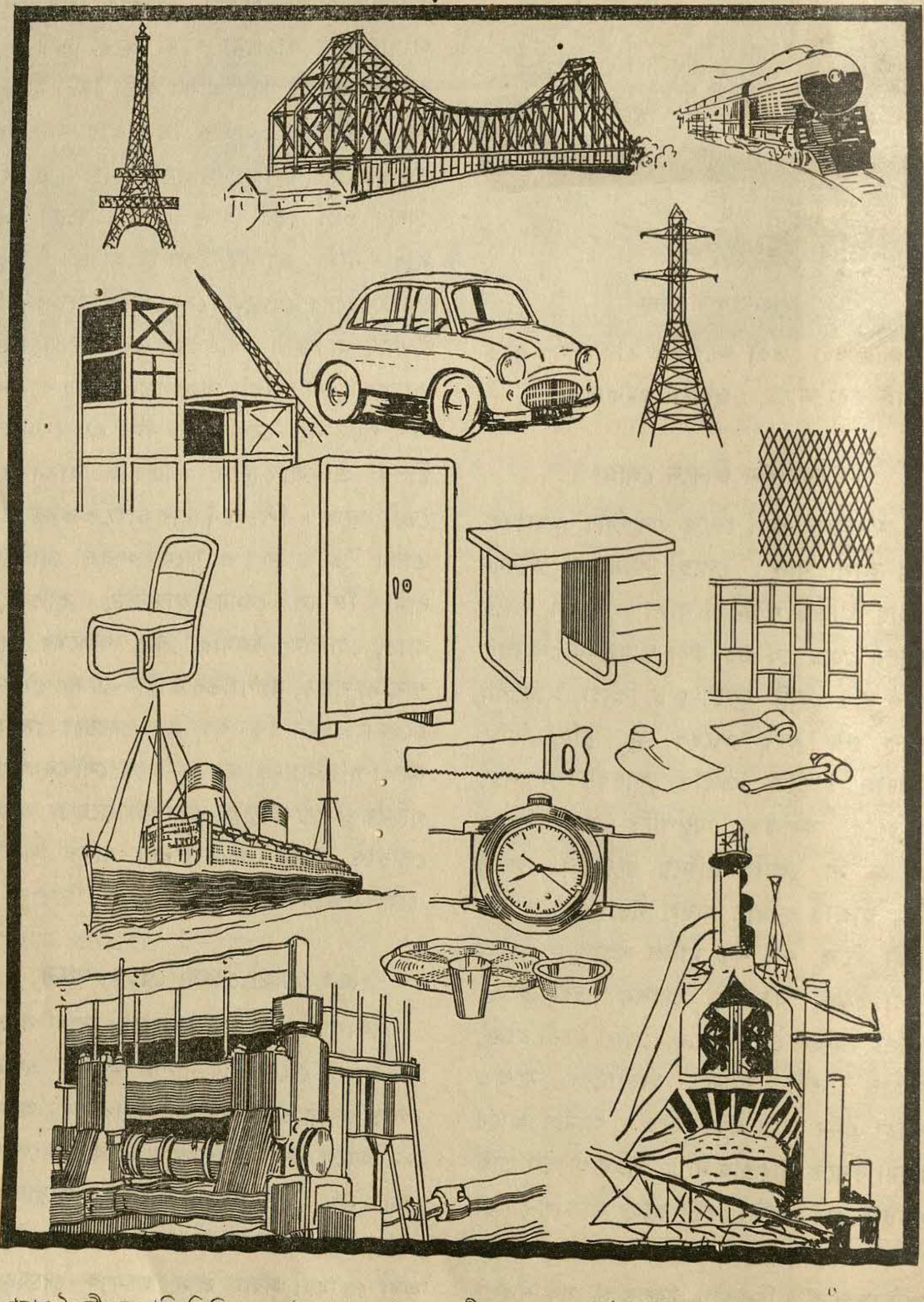
কারিগর ওটা তৈরী করেছিল তার নামও ওতে খাদাই করা আছে,—জনার্দন কর্মকার।

দৈনন্দিন জীবনে লোহা

সেকালের কথা ছেড়ে একালের কথাতেই চলে আসা যাক। লোহা আমাদের জীবন-যাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে ওর কথা আমাদের খেয়ালই থাকে না। ছোট্ট একটা ছুঁচ কিংবা আলপিন থেকে সুরু করে পেরেক, স্ক্রু, ছুরি, কাঁচি, কোদাল, হাতুড়ি প্রভৃতি ছোটবড় অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি—কত কিছুর মধ্যেই না লোহা ছড়িয়ে রয়েছে! লোহা দিয়ে হাজার হাজার মাইল লম্বা রেল লাইন তৈরী হচ্ছে, শত শত মাইল লম্বা পুরু পাইপ তৈরী হচ্ছে, বড় বড় মেশিন তৈরী হচ্ছে, রেলের এঞ্জিন তৈরী হচ্ছে, পোল তৈরী হচ্ছে, জাহাজ তৈরী হচ্ছে। বাড়ীঘরের মধ্যেও লোহা এমন ভাবে এসে ঢুকছে যা আমরা আগে কল্পনা করতে পারতাম না। শহর অঞ্চলে তাই একটার পর একটা তৈরী হচ্ছে আকাশ-ছোঁয়া (বা আকাশ-চাঁছা?) বাড়ী—যাকে বলে "স্কাইস্ক্রেপার"। বিশতলা, ত্রিশতলা, পঞ্চাশতলা বা আরও উঁচু বাড়ী। লোহার ফ্রেম দিয়ে আগাগোড়া কাঠামো খাড়া করে, তার পর কন্‌ক্রিট্ ঢালাই করে এ সব বাড়ী তৈরী হচ্ছে। শুধু বাড়ীই নয়, বাড়ীর ভিতরকার আসবাব-পত্র—চেয়ার, টেবিল, আলমারী, খাট—এ সবও বেশীর ভাগ তৈরী হচ্ছে লোহা দিয়ে। এর মধ্যে নানা জাতের লোহা আছে। একটু উন্নত ধরনের যেগুলো সেগুলোকে আমরা বলি ইস্পাত বা ষ্টীল। আজকাল এই ষ্টীলও খুব উঁচু জাতের তৈরী হচ্ছে। যেগুলোতে মরচে পড়ে না, দাগ পড়ে না—সেগুলোকে বলা হয় স্টেন্‌লেস্ ষ্টীল। এগুলো দিয়ে আজকাল বাসনপত্রও তৈরী হচ্ছে। পিতল-কাঁসার চাইতে কদর বেশী তার। তা ছাড়া ও দিয়ে আরও ছোটখাট দামী জিনিস—যেমন হাতঘড়ি, হাতঘড়ির ব্যাণ্ড, বোতাম, চশমার ফ্রেম, কলমের নিব, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতির কাঁটা—এ সবও তৈরী হচ্ছে। এমন কি আধুনিক মেয়েরা সোনা-রূপো-প্ল্যাটিনামের মত এ দিয়ে সৌখীন গয়না গড়িয়েও পরতে সুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ, লোহাও এখন জাত-বনেদী ধাতুর পর্যায়ে এসে ঠেকেছে।

এত লোহা কোথা থেকে আসে

লোহা যে সব খনিজ পদার্থের মধ্যে পাওয়া যায় নানান্ দেশে তার নানান্ নাম। এদেশে চলতি কথায় ওকে বলা হয় লোহাপাথর। অনেক দিন আগে, যখন লোহাপাথরের কথাও লোকে জানত না, তখন নাকি তারা তাদের প্রয়োজনীয় লোহা সংগ্রহ করত উল্কাপিণ্ড থেকে। উল্কার কথা তোমরা সবাই জান, অনেকে দেখেছও।



লোহার তৈরী রকমারি জিনিস : লোহা আজ আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে জড়িয়ে গেছে।

কলকাতার যাদুঘরেই তো অনেকগুলি আছে! এগুলি কিন্তু পৃথিবীর বাসিন্দা নয়—পৃথিবীর মত ওরাও মহাশূন্যে ছুটে বেড়ায়, আর কখনও কখনও পৃথিবীরই টানে পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে। আমরা দেখতে পেলে বলি—"ঐ তারা খ'সে পড়ল!" জ্বলে উঠলে দেখতে ঠিক হাউই বাজীর মত লাগে কিনা! ইংরেজীতে তাই বলে "শুটিং স্টার"।

উল্কাগুলো বেশীর ভাগই ছুটতে ছুটতে বাতাসের ঘষা লেগে আকাশেই জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। যেগুলো মাটিতে এসে পড়ে সেগুলিকেই বলা হয় উল্কাপিণ্ড বা 'মিটিয়র'। এই উল্কাপিণ্ডের মধ্যে প্রচুর লোহা থাকে। বলতে কি, ওর বেশীর ভাগই লোহা দিয়ে তৈরী এবং সে লোহা প্রায় খাঁটি লোহা। উল্কাপিণ্ড থেকে লোহা নিয়েই সে যুগের মানুষ তার লোহার চাহিদা মেটাত। বলা বাহুল্য উল্কাপিণ্ড-গুলো বেশীর ভাগই পুড়তে পুড়তে যখন পৃথিবীতে এসে পড়ে তখন বেশ ছোট হয়েই পড়ে। সুতরাং তার পক্ষে খুব বেশী লোহা যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য, তখনকার দিনে সব লোহাকেই খুব দামী জিনিস মনে করা হ'ত। অবশ্য বড় উল্কাও যে মাঝে-সাঝে পড়ে না এমন নয়। একবার সাইবেরিয়ার এক জঙ্গলে একটা উল্কা পড়েছিল—সেটার ওজন ছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার মণ। মাইলের পর মাইল গোটা জঙ্গলকে জঙ্গল পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল সেই উল্কা। তার পর যখন ঠাণ্ডা হ'ল তখন সে অঞ্চলের লোকদের তো মহা সুবিধে! তারা ঐ থেকে লোহা কেটে নিয়ে নিয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র বানাতে লাগল। এই ভাবে এক-আধদিন নয়, এই উল্কাটি নাকি তাদের কয়েক শ' বছর ধরে লোহা যুগিয়েছিল!

এখন অবশ্য মানুষকে লোহার জন্য উল্কার মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় না। লোহাপাথর থেকেই তারা তাদের লোহা বার করে নেয়। দেওঘর, গিরিডি, মধুপুর, রাঁচী প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও ওখানকার আদিবাসীরা অনেকে তাদের দরকারের লোহা এই সব লোহাপাথর থেকে নিজেরাই বার করে নেয়। ছেলেবেলা আমরা ওদের গাঁয়ে গিয়ে এ দৃশ্য অনেক বার দেখেছি। আসলে ঐ সব পাথরে লোহার সঙ্গে থাকে অক্সিজেন মেশানো। মাটির চুল্লীতে কাঠকয়লা আর এই পাথর স্তরে স্তরে সাজিয়ে চামড়ার হাপরের সাহায্যে গণ্‌গণে আগুন জ্বালিয়ে ঐ পাথর গালিয়ে ফেলা যায়। লোহাপাথরের অক্সিজেনটুকু কয়লার সঙ্গে মিশে প্রথমে কার্বন মোনো-অক্সাইড (বা মোনক্সাইড) ও শেষে কার্বন ডাই-অক্সাইড (হু'টোই গ্যাস) হয়ে বেরিয়ে যায়,—পড়ে থাকে ফোঁপরা চেহারা নিয়ে আসল লোহা আর পাথরের ময়লা—ধূলোবালি ইত্যাদি, যাকে বলা হয় গাদ। গরম অবস্থায় এই লোহা পিটিয়ে এই গাদ বা ময়লা অনেকটাই বার করে দেওয়া যায়। তখন যা পড়ে থাকে তা একেবারে খাঁটি লোহা না হলেও লোহা ছাড়া আর কিছু নয়। তা দিয়ে হাতিয়ার গড়াও কিছু কঠিন নয়। আদিবাসীরা প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক দিক্‌টা না বুঝলেও দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকেই প্রক্রিয়াটি শিখে নিয়েছে। মনে হয় সেকালেও হয়তো অনেকটা এই ধরনের কোন প্রক্রিয়ার সাহায্যেই বিশুদ্ধ লোহা তৈরী করার ব্যবস্থা ছিল।

এখন অবশ্য লোহা বার করার প্রক্রিয়া অত ছোটখাট ব্যাপার নয়। বিরাট বিরাট কারখানায় বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে লোহা বার করা বা 'তৈরী' করা হয়। শত শত মণ লোহা—শত শত টন লোহা—হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ টন লোহা!

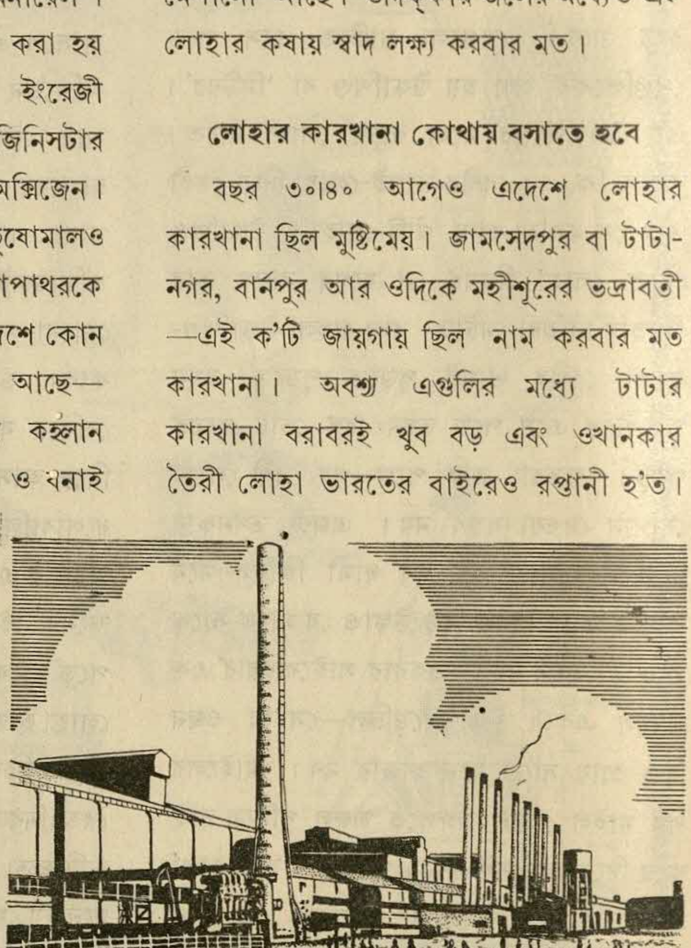
লোহাপাথর বা লোহার আকর

এদেশে যাকে লোহাপাথর বলা হয় তা আসলে এক রকম খনিজ পদার্থ বা 'মিনারেল'। যে মিনারেল থেকে কোন ধাতু বার করা হয় তাকে বলে সেই ধাতুর আকর বা, ইংরেজী করে বললে, "ওর্"। আগেই বলেছি জিনিসটার মধ্যে আছে প্রধানতঃ লোহা আর অক্সিজেন। অবশ্য সেই সঙ্গে কিছু ময়লা বা ভুষোমালও মেশানো থাকে। ইংরেজীতে এই লোহাপাথরকে বলা হয় "হিমেটাইট"। আমাদের দেশে কোন কোন জায়গায় প্রচুর হিমেটাইট আছে—বিশেষ করে বিহারের সিংভূম আর কহ্লান জেলায়, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্জর ও বনাই প্রভৃতি অঞ্চলে। এ ছাড়া মধ্য প্রদেশের বস্তার জেলায় এবং মহীশূরের ভদ্রাবতী অঞ্চলেও প্রচুর হিমেটাইট জমে আছে। হিমেটাইট ছাড়া আরও কয়েক রকম মিনারেল থেকে লোহা বার করা যেতে পারে। যেমন ম্যাগনেটাইট, সাইডেরাইট ইত্যাদি। তবে আমাদের দেশে হিমেটাইটই লোহার প্রধান আকর বা ওর্। অবশ্য এ ছাড়াও প্রায় দু'শ' রকম মিনারেলের মধ্যে কিছু-না-কিছু লোহা আছে। কিন্তু তাদের পরিমাণ বেশী নয়, তাই সেগুলি থেকে লোহা বার করা লাভজনক নয়।

মাটির সঙ্গে লোহা মিশে থাকলে মাটির রং লালচে দেখায়। বাংলা দেশের পশ্চিম অঞ্চলটা এই রকম লাল মাটি বা রাঙ্গামাটির দেশ। তারপর সাঁওতাল পরগণা, উড়িষ্যা এবং বিহারেরও কতকটা ঐ রকম। তার মানে ওখানকার মাটিতে বেশ খানিকটা লোহা মেশানো আছে। ওদিক্‌কার জলের মধ্যেও এই লোহার কষায় স্বাদ লক্ষ্য করবার মত।

লোহার কারখানা কোথায় বসাতে হবে

বছর ৩০।৪০ আগেও এদেশে লোহার কারখানা ছিল মুষ্টিমেয়। জামসেদপুর বা টাটা-নগর, বার্নপুর আর ওদিকে মহীশূরের ভদ্রাবতী—এই ক'টি জায়গায় ছিল নাম করবার মত কারখানা। অবশ্য এগুলির মধ্যে টাটার কারখানা বরাবরই খুব বড় এবং ওখানকার তৈরী লোহা ভারতের বাইরেও রপ্তানী হ'ত।



দুর্গাপুরের লোহার কারখানার একটি দৃশ্য

কিন্তু এখন, দেশ স্বাধীন হবার পর, লোহার কারখানার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। নতুন কারখানা বসেছে পশ্চিম বাংলার দুর্গাপুরে, উড়িষ্যার রাউরকিলায়, মধ্য প্রদেশের ভিলাইতে। আগের চলতি কারখানাগুলোও ইতিমধ্যে বেশ বাড়ানো হয়েছে।

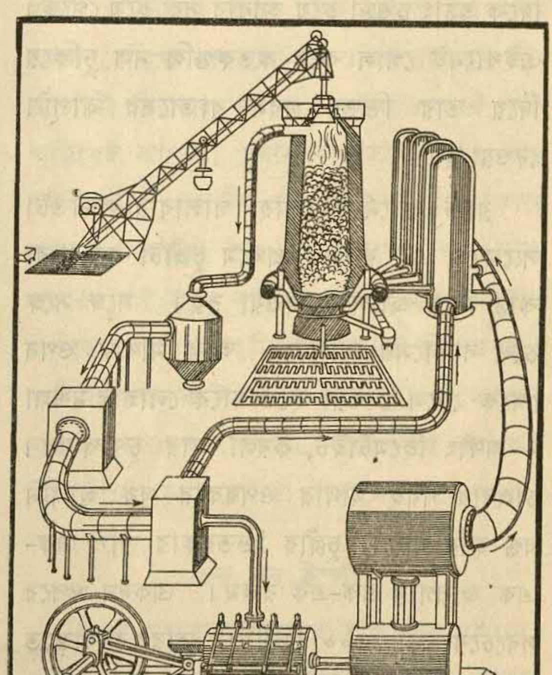
একটু লক্ষ্য করলে কিন্তু দেখবে ২।১টা বিশেষ অঞ্চল ঘেঁষে এর প্রায় সব কারখানাগুলোই বেশ কাছাকাছি জায়গায় বসানো হয়েছে। কেন বল দেখি ?

কারণ আর কিছুই নয়, লোহা তৈরী করতে হলে শুধু হিমেটাইট যোগাড় করলেই হয় না, সেই সঙ্গে প্রচুর কয়লা আর চূণাপাথরও লাগে। যে অঞ্চলে এই তিনটি জিনিসই প্রচুর পরিমাণে আছে তারই কাছাকাছি লোহার কারখানা বসানো লাভজনক। নইলে, ঐ সব জিনিস দূরে টেনে নিয়ে যেতে হ'লে, খরচ অনেক বেড়ে যায়। যেখানে হিমেটাইট বেশী পাওয়া যায় বলেছি তার কাছেই ভিড় করে রয়েছে অগুণতি কয়লা-খনি, আর কাছাকাছি রয়েছে অনেক চূণাপাথরের পাহাড়। কাজেই সবগুলি কাঁচামাল হাতের কাছে পাওয়া যাবে বলেই লোহার কারখানাগুলোও ঐ অঞ্চল ঘেঁষে বসানো হয়েছে।

আগেই বলেছি আজকালকার লোহার কারখানা নেহাৎ ছোটখাট ব্যাপার নয় মোটেই। এক-একটা কারখানায় হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করে। যেখানেই লোহার কারখানা বসানো হয় তার আশপাশে দেখতে দেখতে একটা ছোটখাট শহর গড়ে ওঠে। কারখানায় যারা কাজ করে তারা ছাড়াও আসে ব্যবসাদারেরা, আরও কত রকম স্বার্থের লোক। এই রকম শহরকে বলা হয় ইস্পাত-নগরী। টাটানগর, বার্নপুর, দুর্গাপুর, রাউরকিলা, ভিলাই—এগুলি সবই ঐ রকম ইস্পাত-নগরী বলা যেতে পারে।

লোহা তৈরীর প্রথম ধাপ—ব্লাস্ট ফার্নেস

লোহা সাধারণতঃ তিন রকমের হয়—কাঁচা লোহা (পিগ্ আয়রন্), পেটা লোহা (রট্ আয়রন্) আর ইস্পাত (ষ্টীল)। লোহা তৈরীর প্রথম ধাপ হচ্ছে কাঁচা লোহা তৈরী। যে চুল্লীতে এই হিমেটাইট গালিয়ে কাঁচা লোহা তৈরী হয় তাকে বলা হয় ব্লাস্ট্ ফার্নেস। ব্লাস্ট্ মানে বাতাসের ঝাপ্টা। এই চুল্লীতে তাপ



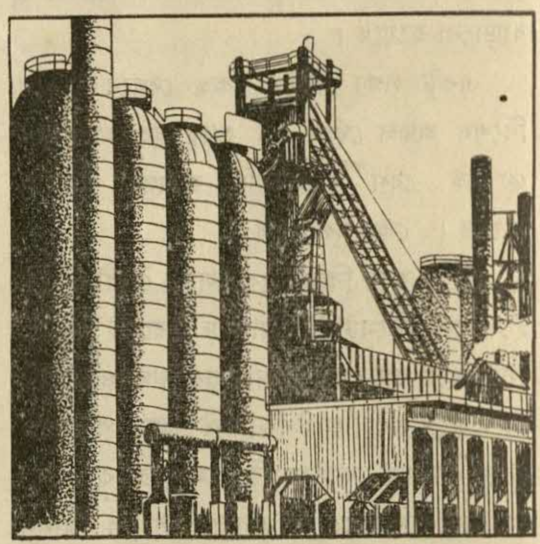
ব্লাস্ট ফার্নেসে কি ভাবে কাঁচা লোহা তৈরী হয়।

স্বষ্টির জন্য বাতাসের ঝাপ্‌টা ব্যবহার করা হয়, তাই এই নাম।

নামে চুল্লী হলেও ব্লাস্ট্‌ ফার্নেস আকারে হয় বিরাট। উঁচুতে নব্বই—একশ'—এমন কি সময় সময় দেড়শ' ফুটেরও কাছাকাছি যেতে পারে। বহুদূর থেকে উঁচু চুল্লী দেখেই ইস্পাত-নগরী চিনে নেওয়া যায়।

এই চুল্লীগুলিতে ১৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ তৈরী করা যায়। অত গরমে যাতে চুল্লী ফেটে না যায় সে জন্য চুল্লীটা তৈরী হয় ইস্পাতের খোল দিয়ে। ভেতরে থাকে তাপ সহ্য করার উপযোগী সাদা ইট বা ফায়ার-ক্লের আস্তর। দেখতে জিনিসটা অনেকটা উঁচু চিমনীর মত, তবে মাঝখানটার একটু নীচের দিকে হঠাৎ চওড়া হয়ে আবার সরু হয়ে গেছে। এইখানেই গোল করে কতকগুলি নল ঢুকিয়ে দিয়ে তার ভিতর গরম বাতাসের ঝাপ্‌টা দেওয়া হয়।

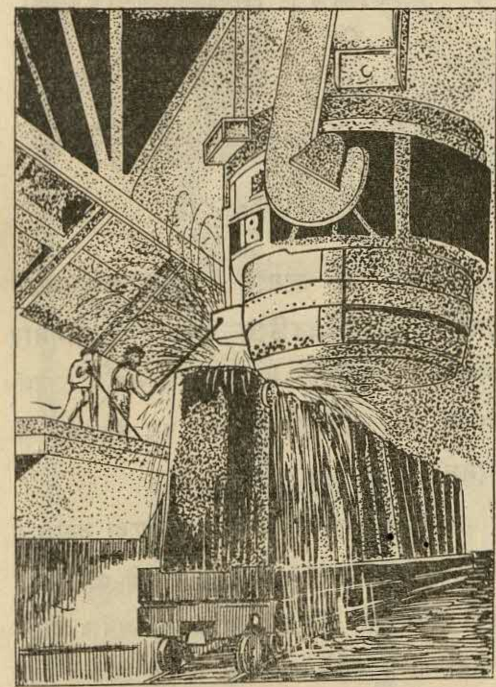
ব্লাস্ট্‌ ফার্নেসে লোহা গালাবার পদ্ধতিটা সংক্ষেপে এই রকমঃ প্রথমে চুল্লীটা কয়লা বা কাঠ দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে চলে বাতাসের ঝাপ্‌টা। আর মাথার ওপর থেকে ঢেলে দেওয়া হতে থাকে লোহার মশলা—অর্থাৎ হিমেটাইট, কয়লা আর চূণাপাথর। ঢালবার পরই মাথার ওপরকার মুখ আপনি বন্ধ হয়ে যায়। চুল্লীর ভিতরকার তাপ এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। একদম ওপরে সবচেয়ে কম, ৩০০ ডিগ্রী। তারপর বাড়তে বাড়তে একদম নীচে ১৫০০ ডিগ্রী। ওপর থেকে লোহার মশলা নীচে নামবার সময় বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া চলতে থাকে। হিমেটাইটের অক্সিজেন কয়লার কার্বনের সঙ্গে মিশে প্রথমে তৈরী হয় কার্বন মোনক্সাইড। সেটাও ফের আবার হিমেটাইটের অক্সিজেনের সঙ্গে মেশে—তৈরী হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড।



ব্লাস্ট ফার্নেস—বাইরে থেকে যেমন দেখায়

ফলে হিমেটাইটের সমস্ত অক্সিজেন বেরিয়ে গিয়ে সেটা পরিবর্তিত হয় খাঁটি লোহায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত খাঁটি থাকে না, আবার খানিকটা কার্বন ও অন্যান্য পদার্থ গিয়ে ঐ লোহার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওদিকে চূণাপাথরও ভেঙ্গে প্রথমে হয় চূণ। সেই চূণ ভূষো মালের সঙ্গে মিশে তাকে গালিয়ে আলাদা করে ফেলে,—তৈরী হয় গাদ। এই গাদকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় "স্ল্যাগ্‌"। চুল্লীর একদম তলার দিকে যে উত্তাপ তাতে লোহা এবং স্ল্যাগ্‌ দু'টোই গলে তরল হয়ে যায়। লোহা বেশী ভারী, তাই সেটা থাকে তলায়, আর তার ওপর ভাসতে থাকে তরল গাদ

—স্ল্যাগ্। চুল্লীর এইখানে দু'টো নালা বসানো থাকে, একটা ওপরে একটা নীচে। ওপরের নালার মুখ খুলে তরল স্ল্যাগ্ বার করে নেওয়া হয়, আর নীচেরটার মুখ খুলে বার করে নেওয়া হয় তরল লোহা। তরল বটে, কিন্তু দু'টোই তখন ভীষণ গরম। আগুনের মত গরম। দেখলে মনে হয় বুঝি আগুনকেই কেউ গালিয়ে ফেলেছে। যখন বিরাট বালতিতে ঢালা হয়, বিশেষতঃ রাত্রে, তখন সেই 'তরল আগুনের' দৃশ্য সত্যি



তরল আগুনের মত তরল লোহা বিরাট বালতি থেকে ছাঁচে ঢালা হয়।

একটা দেখবার জিনিস। বালতি থেকে সেই লোহা ছাঁচে ঢেলে জমিয়ে নিলেই কাঁচা লোহা তৈরী হ'ল। এরই নাম পিগ্ আয়রন্।

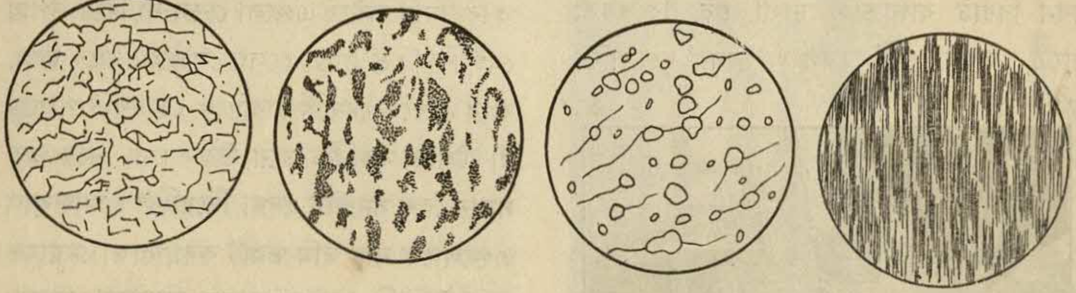
কাঁচা লোহা কিন্তু খাঁটি লোহা নয়। এর মধ্যে শতকরা আড়াই থেকে চার ভাগ কার্বন বা অঙ্গার থেকেই যায়। তা ছাড়া ওর মধ্যে বেশ কিছু ভেজালও থাকে, যার ফলে এ লোহা তেমন মজবুৎ হতে পারে না। মজবুৎ লোহা হচ্ছে ইস্পাত।

যাই হোক, লোহা তো তৈরী হ'ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এল প্রচুর গাদ—যাকে আমরা বলেছি স্ল্যাগ্। এগুলো নিয়ে কি করা যায়? কারখানার বাইরে এগুলো ঢেলে না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু ঠাণ্ডা হলেই সেগুলো যাবে জমে, আর দেখতে দেখতে চারদিকে ছোটখাট পাহাড় বা টিলার মত উঁচু হয়ে উঠবে। এ নিয়ে এক সময়ে বেশ সমস্যাই দেখা দিয়েছিল। আজকাল এগুলোকে নীচু জমি ভরাট করা, রাস্তা মেরামত করা ইত্যাদি নানান্ কাজে লাগানো হচ্ছে। ব্লাস্ট ফার্নেসের ওপর দিক্ থেকে যে গরম গ্যাস বেরিয়ে যায় সেটাকেও নষ্ট করা হয় না। জ্বালানী হিসেবে ওর দাম আছে এবং ঐ গ্যাস পুড়িয়েই ঝাপ্টা দেবার বাতাসকে গরম করা হয়। ব্লাস্ট্ ফার্নেস একবার জ্বালালে তা আর সহজে নেভানো হয় না,—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর রাবণের চিতার মত দিবারাত্র জ্বলতে থাকে। হঠাৎ নিভিয়ে দেওয়া বিপজ্জনকও বটে, সবশুদ্ধ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। মেরামত করতে হলে খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে ঠাণ্ডা করে, তবেই তা নেভানো যেতে পারে।

এর পর ইস্পাত

পিগ্ আয়রন্‌কে আমরা বলি কাঁচা লোহা। নাম শুনেই বোঝা যায় জিনিসটি কাঁচা, অর্থাৎ তেমন মজবুৎ নয়। ও দিয়ে ঢালাই করা যায়, সস্তা লোহালক্কড়ের কাজও চালানো যায়, কিন্তু

ভারী ভারী কলকব্জা, ধারাল অস্ত্রশস্ত্র বা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরী করা যায় না। এ সব করতে হলে চাই ইস্পাত, আর ঐ কাঁচা লোহা থেকেই সে ইস্পাত তৈরী করতে হবে। ইস্পাতও কিন্তু একেবারে খাঁটি লোহা নয়। ওর মধ্যেও খানিকটা ভেজাল বা খাদ মেশানো থাকে। খানিকটা কার্বন বা অঙ্গার তো রাখতেই হবে,



বিভিন্ন ধরনের লোহা ও ইস্পাত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেলে দেখলে কেমন দেখায়।

তবে তার পরিমাণ খুব কম—শতকরা ০·২৫ থেকে ১·৫ ভাগের বেশী নয়। তা ছাড়া খুব সামান্য পরিমাণ অন্য ধাতুও খাদ দিতে হয়। কিন্তু খাদ হলেও ওটা ইস্পাতের দোষ না হয়ে গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদম খাঁটি লোহাকে আমরা বলি পেটা লোহা—'রট্ আয়রন্'। এগুলি ইস্পাতের তুলনায় অনেক নরম, আর গুণেও ইস্পাতের মত নয়। তবে কোন কোন ব্যাপারে এদেরও কদর আছে। এর আর একটা বিশেষ গুণ—এতে সহজে মরচে ধরে না।

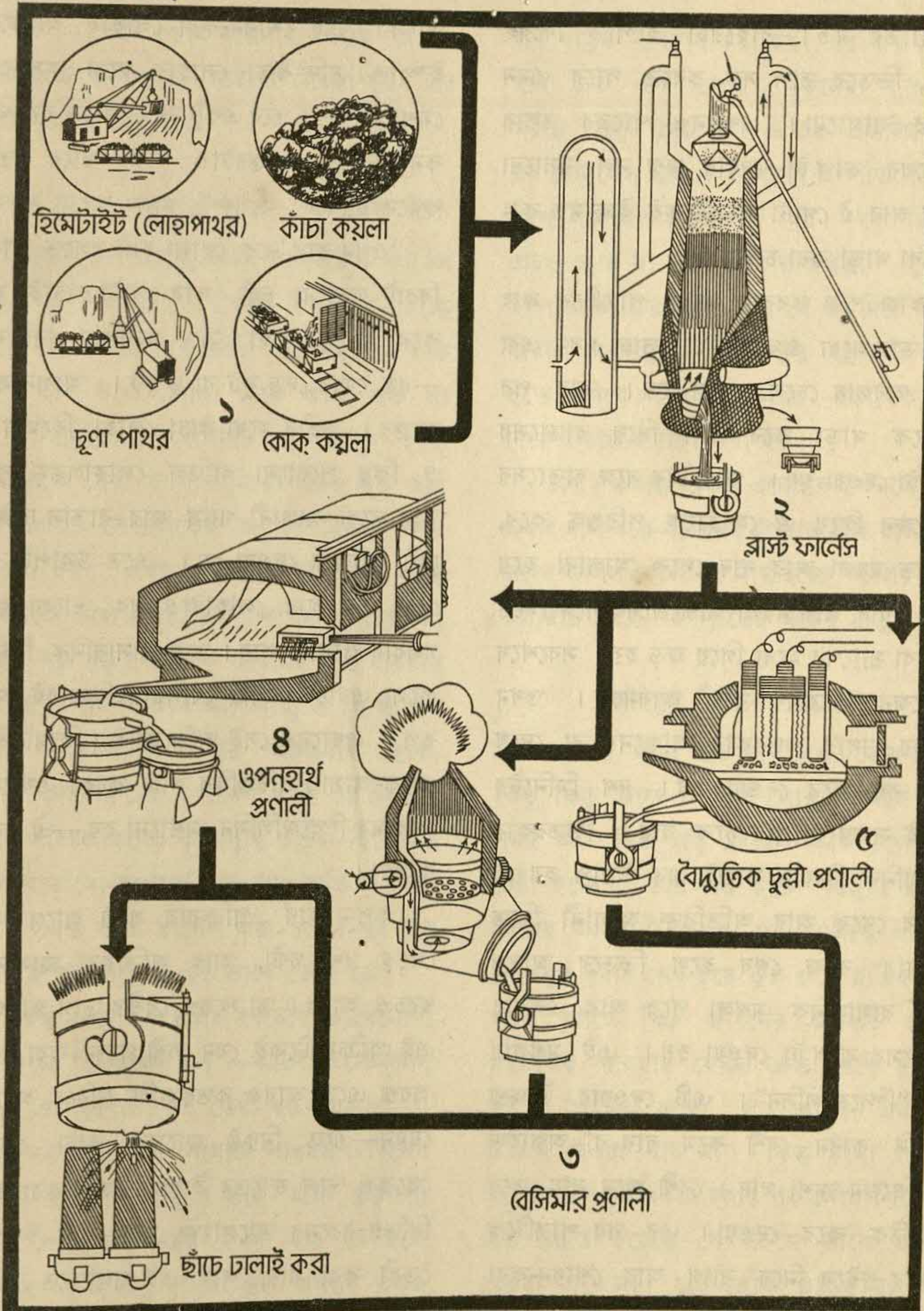
ইস্পাতেরও আবার ভালোমন্দ আছে। সস্তা ইস্পাত আছে, দামী ইস্পাত আছে, অসম্ভব দামী ইস্পাতও আছে। ইস্পাতের এই গুণগুলি সাধারণতঃ নির্ভর করে কি ধরনের কাঁচা লোহা থেকে ইস্পাত তৈরী হচ্ছে কতকটা তার ওপর, আর কি প্রক্রিয়ায় সে ইস্পাত তৈরী হচ্ছে তার ওপর।

তিন রকম প্রক্রিয়া

সাধারণতঃ তিন রকম প্রক্রিয়ায় ইস্পাত তৈরী করা যেতে পারে। অবশ্য এগুলিরও রকম-ফের করে আজকাল প্রক্রিয়ার সংখ্যা আরো বাড়ানো হয়েছে; তবে ঐ তিনটিই আসল। এদের একটিকে বলা হয় বেসিমার প্রণালী, একটিকে বলা হয় ওপ্‌ন্ হার্থ্ প্রণালী আর তৃতীয়টিকে বলা হয় ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেস বা বৈদ্যুতিক চুল্লী প্রণালী।

বেসিমার প্রণালী হচ্ছে এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো আর গুণের দিক্ দিয়ে এই প্রক্রিয়ায় তৈরী ইস্পাতই সবচেয়ে সাধারণ, অর্থাৎ যাকে আমরা বলি নিকৃষ্ট। কিন্তু নিকৃষ্ট হলেও এই ইস্পাত বেশ সস্তায় তৈরী করা যায় এবং লোককে দেওয়াও যায় সস্তায়।

যে পাত্রে এই ইস্পাত তৈরী করা হয় তাকে বলে 'কন্‌ভার্টার'। বেসিমার সাহেব, যিনি এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁরই নাম থেকে একে বলা হয় 'বেসিমার কন্‌ভার্টার'। পাত্রটি দেখতে বিরাট একটা



লোহা ও ইস্পাত তৈরীর বিভিন্ন প্রণালী

(১) লোহা তৈরীর কাঁচা মাল, (২) ব্লাস্ট ফার্নেস, (৩) বেসিমার প্রণালী, (৪) ওপ ন্ হার্থ প্রণালী, (৫) বৈদ্যুতিক চুল্লী প্রণালী।

নাসপাতির মত। বাইরেটা ইস্পাত দিয়েই তৈরী, ভিতরে তাপ সহ্য করতে পারে এমন আস্তর লাগানো। এখানেও পাত্রের তলায় বাতাসের ঝাপ্‌টা দেবার জন্য নল বসানো থাকে আর ঐ গোটা পাত্রটিকেই ইচ্ছামত কাৎ করা বা খাড়া করা চলে।

কাজ সুরু করবার সময়ে পাত্রটিকে কাৎ করে তার মধ্যে প্রথমে কাঁচা লোহা গরম এবং তরল অবস্থায় ঢেলে দেওয়া হয়। তার পর সেটাকে খাড়া করে তলা দিয়ে বাতাসের ঝাপ্‌টা দেওয়া হয়। ঝাপ্‌টার সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন গিয়ে ঐ লোহাকে পরিশুদ্ধ করে, ইস্পাত ময়লা আর খাদ থেকে আলাদা হয়ে যায়। খাদ আর ময়লা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে গাদ বা স্ল্যাগের মধ্যে গিয়ে জড় হয়। সবশেষে অক্সিজেন আক্রমণ করে কার্বনকে। তখন পাত্রের মাথার ওপরকার আগুনের রং দেখে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দশ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার চুকে যায়। ভিতরকার রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই এত উত্তাপ হয় যে বাইরে থেকে আর অতিরিক্ত জ্বালানী দিতে হয় না। কাজ শেষ হলে ভিতরে আরও কিছু রাসায়নিক মশলা পূরে আর একবার বাতাসের ঝাপ্‌টা দেওয়া হয়। এই মশলার নাম "স্পিজেলিসিন"। এটি দেওয়ার উদ্দেশ্য —যদি কার্বন বেশী কমে যায় বা অক্সাইড (অক্সিজেন-মেশা খাদ) বেশী জমে যায় তবে তা ঠিক করে দেওয়া। এর পর পাত্রটিকে আবার নুইয়ে নিয়ে স্ল্যাগ্‌ আর শোধন-করা লোহা আলাদা করে ঢেলে ফেলা হয়। (কারণ একটা আর একটার চেয়ে হাল্কা, তাই ওপরে ভাসে।) এই শোধন-করা লোহাই আমাদের ইস্পাত। যদি কাঁচা লোহার মধ্যে ফস্‌ফরাস্‌ মেশানো থাকে তবে একটু চূণ মেশাতে হয় আর কন্‌ভার্টারের আস্তরটাও অন্য ভাবে তৈরী করতে হয়।

'ওপন্‌ হার্থ্‌'-কে খোলা চুল্লী বলতে পার। বিরাট ছড়ানো চুল্লী, তার পাটাতনটাই কম করে ত্রিশ ফুট লম্বা। তবে গভীরতা খুবই কম —বড় জোর দেড় ফুট বা দু'ফুট। আগুন-সহা আস্তর। চুল্লীর মধ্যে কাঁচা লোহা, হিমেটাইট ও কিছু পুরোনো বাতিল লোহালক্কড় পূরে তার মধ্যে জ্বালানী গ্যাস আর বাতাস ঢুকিয়ে চুল্লী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এতে উত্তাপটা খুব বেশী হয় আর লোহাটাও খুব ভালো করে গলবার সুযোগ পায়। তবে রাসায়নিক ক্রিয়াগুলো এখানেও প্রায় বেসিমার ক্রিয়ারই অনুরূপ। এখানেও সেই অক্সিজেনই (হিমেটাইট-থেকে-আসা) পরিশুদ্ধির কাজ করে। এখানেও শেষমেষ স্পিজেলিসিন মেশানো হয়,—ঐ একই কারণে।

ওপ্‌ন্‌ হার্থ্‌ প্রক্রিয়ায় সময় লাগে আট থেকে দশ ঘণ্টা, আর অতিরিক্ত জ্বালানীর খরচও আছে। তা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ জায়গায় এই প্রক্রিয়াটিকেই যেন বেশী পছন্দ করা হয়। অবশ্য এতে আরও কতকগুলি সুবিধা আছে। যেমন—এতে নিকৃষ্ট জাতের কাঁচা লোহা থেকেও ভাল জাতের ইস্পাত তৈরী করা যায়, বিভিন্ন ধরনের ভালোমন্দ, সস্তা-দামী ইস্পাত তৈরী করা যায়, আর এই পদ্ধতিতে তৈরী ইস্পাত গুণে বেসিমার পদ্ধতিতে তৈরী ইস্পাতের চেয়ে অনেক দিক্‌ দিয়েই বেশী

উৎকৃষ্ট। কোন কোন জায়গায় আবার পর পর এই হু'টি প্রক্রিয়ারই সাহায্য নেওয়া হয়। এর নাম ডুপ্লেক্স প্রণালী।

নতুন যুগের নতুন ইস্পাত—স্টেন্‌লেস্ ষ্টীল

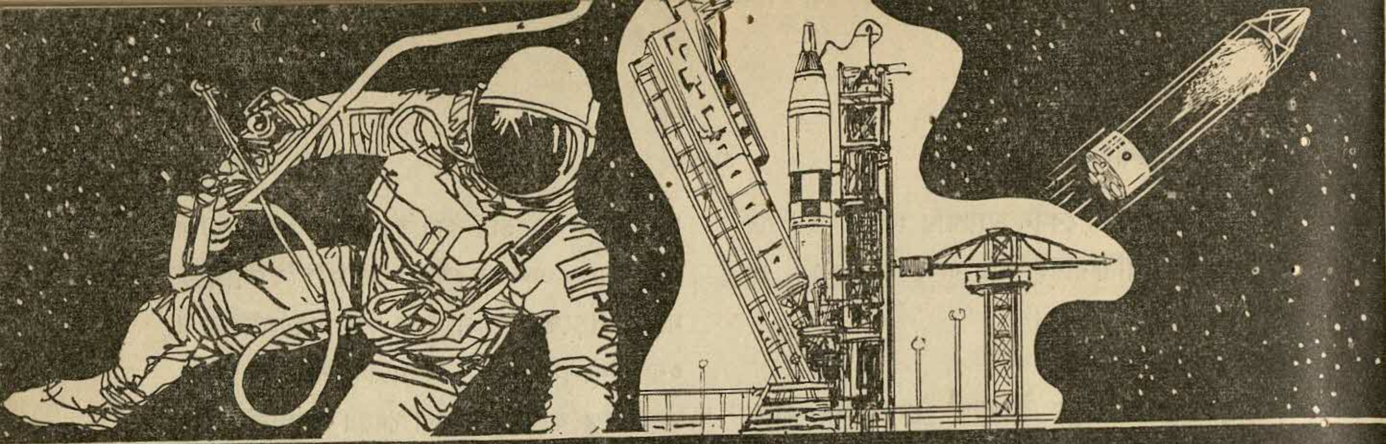
তৃতীয় প্রণালীতে, অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেস বা বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তৈরী ইস্পাতই হচ্ছে গুণে সব ইস্পাতের সেরা। তবে এখানে খরচ বেশী বলে কাঁচা লোহা দিয়ে কাজ সুরু না করে সাধারণতঃ বেসিমার বা ওপ্‌ন্ হার্থ্ পদ্ধতিতে তৈরী ইস্পাত নিয়েই কাজ সুরু করা হয়—অর্থাৎ সেগুলিকেই আরো বিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়। এখানে, নাম শুনেই বুঝছ, সমস্ত কাজটাই চলে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে। এজন্য বড় বড় বৈদ্যুতিক কার্বনের খুঁটি ব্যবহার করা হয়। পৃথক্ কোন জ্বালানীর, তা সে গ্যাসই হোক বা তরল কিংবা শক্ত জ্বালানীই হোক, কোন কারবার নেই এখানে। সমস্ত প্রক্রিয়াটির ওপর পরিচালকদের পূরোপূরি কর্তৃত্ব—ইচ্ছেমত তাপ বাড়ানো-কমানো যায় আর অতি পরিচ্ছন্ন ভাবে সমস্ত কাজ হাসিল করা চলে। খুব উচু দরের ইস্পাতগুলোই এই ভাবে তৈরী হয়।

কিন্তু বৈদ্যুতিক চুল্লীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান হচ্ছে "স্টেন্‌লেস্ ষ্টীল্"—কারণ ঐ স্টেন্‌লেস্ ষ্টীলও এই প্রণালীতেই তৈরী হয়। খুব ভালো ইস্পাতের সঙ্গে যদি সামান্য পরিমাণে বিশেষ বিশেষ কতগুলি ধাতু (তার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য ধাতুও আছে) মিশিয়ে দেওয়া যায় তা হলে ঐ মিশ্র বা সংকর ধাতুর গুণ অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। সাধারণতঃ নিকেল, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, মলিব্‌ডেনাম, নিওবিয়াম—এই সব ধাতুই ব্যবহার করা হয়। এর এক-একটার গুণ এক এক রকম। কোনটা ইস্পাতকে মরচে পড়তে দেয় না ; এ জন্য এগুলিকে বলা হয় স্টেন্‌লেস্ ষ্টীল। কোনটা ইস্পাতকে প্রচণ্ড তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা দেয়। কোনটা দেয় প্রচণ্ড ভার বা চাপ বইবার ক্ষমতা। কোনটা ইস্পাতকে এত শক্ত করে যে তা দিয়ে অসম্ভব ধারাল অস্ত্রশস্ত্র বা অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরী হতে পারে। অনেক সময় একাধিক ধাতু দিয়েও কাজ হাসিল করা হয়।

চলতি কথায় আমরা এদেরকে স্টেন্‌লেস্ ষ্টীল অর্থাৎ দাগ-ধরে-না-এমন ইস্পাত বলি বটে, কিন্তু এদের আসল বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে 'অ্যালয়-ষ্টীল'। কথাটার মানে—ইস্পাতের সংকর ধাতু।

লৌহযুগ কি শেষ হচ্ছে ?

লোহার নানা গুণ থাকলেও দোষ-ত্রুটীও কিছু কিছু আছে। তাই লোহার বদলে সময় সময় অন্য মিশ্র-ধাতু দিয়েও কাজ চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। তার পর হালে বহুমুখী প্লাষ্টিক শিল্পের আমদানী হবার পর অনেকে বলছেন লৌহযুগ এবার শেষ হয়ে সুরু হবে প্লাষ্টিক যুগ। আর, বলতে কি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্লাষ্টিকের ব্যবহার যেমন দ্রুত বেড়ে চলেছে তাতে 'প্লাষ্টিক যুগের' সম্ভাবনাকে মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু নানা ধরনের অ্যালয়-ষ্টীল আবিষ্কার হবার পর লৌহ-শিল্পেরও এত উন্নতি হয়েছে যে সহজে তাকে হটিয়ে দেওয়া যাবে না। যাই হোক, প্লাষ্টিক যুগ যদি এসেই পড়ে, তবুও লোহাও যে তার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবে এতে কোন সন্দেহ নেই।



মহাশূন্যের পথে

মহাশূন্য কাকে বলি

মহাশূন্য! কোথায় তার সুরু আর কোথায়: তার শেষ?

মহাশূন্য, মহাকাশ ইত্যাদি শব্দগুলি আমরা হামেশাই ব্যবহার করি কিন্তু বিজ্ঞানীর চোখে সত্যি মহাশূন্য বা মহাকাশ বলতে কি বোঝায়?

আমাদের পৃথিবীর ওপরে রয়েছে বায়ুস্তর—যাকে আমরা ভাল বাংলায় বলি বায়ুমণ্ডল। বিজ্ঞানীরা একে মোটামুটি তিন ভাগ করে নিয়েছেন। সবচেয়ে নীচের অংশ,—সমুদ্রের পিঠ থেকে দশ মাইল উঁচু পর্যন্ত হচ্ছে "ট্রপোস্ফিয়ার"। পৃথিবীর বাতাসের দশ ভাগের ন'ভাগই রয়েছে এই জায়গায়। তার পরের আন্দাজ চল্লিশ মাইল, অর্থাৎ দশ থেকে পঞ্চাশ মাইল উঁচু পর্যন্ত হচ্ছে "স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার"। এখানেও বাতাস আছে, কিন্তু খুবই কম। এর পরের স্তর হচ্ছে "আয়নোস্ফিয়ার"—পঞ্চাশ থেকে ছ'শ' মাইল পর্যন্ত যার বিস্তৃতি। এখানে বাতাস বা অক্সিজেন নেই বললেই চলে। ৬০০ মাইলের ওপরে উঠলে বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমাও পার হয়ে গেলে। এখানে বাতাস নেই, নেই সূর্যের আলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রঙের খেলা দেখাবার মত ধূলিকণার দল। এখান থেকেই প্রকৃত মহাশূন্য বা মহাকাশের সুরু বলা যেতে পারে।

কিন্তু সুরু তো হ'ল, শেষ কোথায়? বিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের সঠিক জবাব এখনও দিতে পারেন নি। এ পর্যন্ত মহাকাশের সবচেয়ে দূরের যে জিনিসটি তাঁরা আবিষ্কার করতে পেরেছেন সেটি একটি নীহারিকা। সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে ১৫ কোটি বছর। আর আলোর গতিবেগ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। পার তো অঙ্ক কষে হিসেব করে নাও এই নীহারিকাটি কত দূরে আছে। কিন্তু ওখানেই মহাশূন্যের শেষ নয়। সে সীমা খুঁজতে গেলে ওর পরেও কতদূর যেতে হবে তা কেউ বলতে পারে না।

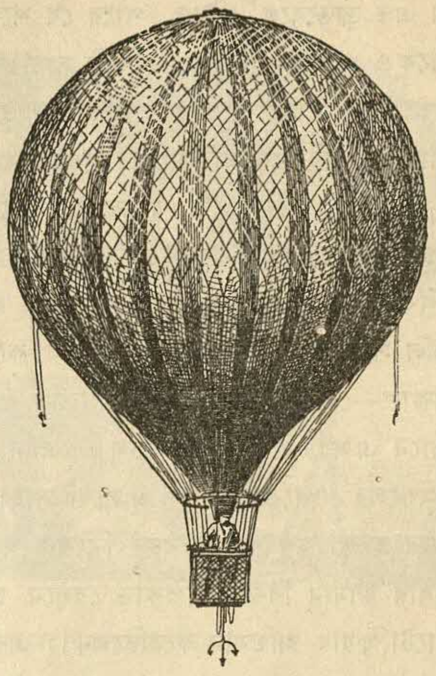
মানুষ আকাশে উড়তে শিখল

এমন যে মহাশূন্য সেখানে একবার ঘুরে আসবার শখ হওয়া মানুষের পক্ষে বিচিত্র কি? মানুষের দুর্ভাগ্য, পাখীর মত তার অন্ততঃ এক জোড়া পাখাও নেই যা দিয়ে সে, মহাকাশ না হলেও, অন্ততঃ নীল আকাশের নীচে খানিকটা ঘুরে আসতে পারে। কিন্তু পাখা না দিলেও ভগবান মানুষকে আর একটা জিনিস দিয়েছেন—

যার নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধির বলেই মানুষ পাখা ছাড়াই আকাশে ঘুরে বেড়াবার ব্যবস্থা করে নিল।

গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার চেয়ে হাল্কা। শক্ত কাপড় দিয়ে একটা গোল ফাঁপা বলের মত তৈরী করে যদি তার মধ্যে গরম বাতাস ভরে দেওয়া যায় তা হলে তা আপনি আকাশে উড়ে যাবে, সে বাতাস ঠাণ্ডা হলে আবার তা নীচে নেমে আসবে। অবশ্য কাপড়ের বলটা এমন হওয়া দরকার যার মধ্যে বাইরের বাতাস ঢুকতে না পারে। যদি গরম বাতাসের বদলে ঐ রকম বাতাসের চেয়ে হাল্কা কোন গ্যাস, যেমন ধর হাইড্রোজেন গ্যাস, ভরে দেওয়া যায় তা হলে তা আরও সহজে ওপরে উঠে যাবে। আর ঐ ফাঁপা বলটা যদি আকারে খুব বড় হয় তা হলে তার তলায় দড়ি দিয়ে একটা ঝুড়ি বা বসবার কিছু বেঁধে দিলে সেটাও ঐ সঙ্গে ওপরে উঠে যাবে। ঐ ঝুড়ি বা বসবার জায়গায় যদি কোন মানুষ উঠে বসে তা হলে সেও ঐ সঙ্গে আকাশে উঠে যেতে পারে। এই ভাবেই প্রথম মানুষ আকাশে উঠবার উপায় বার করল। ঐ ফাঁপা বলটির নামই বেলুন। আগেকার দিনে আকাশে উড়তে হলে এই ভাবেই উঠতে হ'ত। যারা বেলুনে উঠত তাদেরও খুব সাহস ছিল বলতে হবে, কেন না ঐ বেলুনের ওড়া নির্ভর করত বাতাসের গতিবিধির ওপর।

তারপর, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, আবিষ্কার হ'ল এরোপ্লেনের—বাংলায় যাকে আমরা বলি উড়োজাহাজ। এ ব্যাপারে আমেরিকার দু'টি ভদ্রলোক—দুই ভাই,—যাঁদের বলা হয় রাইট্ ব্রাদার্স,—তাঁদের



বেলুনের নীচে ঝুড়ি বেঁধে···

কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশী, এবং আরও অনেকে এই নিয়ে চেষ্টা করলেও প্রথম সাফল্যের সঙ্গে আকাশে এরোপ্লেন ওড়ানোর গৌরব এই রাইট্ ভাইদেরকেই দিতে হবে। এরোপ্লেন একেবারেই কলের গাড়ী। কলের গাড়ীর মতই এঞ্জিনের সাহায্যে তেল পুড়িয়ে তা চালাতে হয়। অধিকন্তু ওর আছে অনেকটা পাখীর অনুকরণে তৈরী এক জোড়া ডানা বা পাখা। এরোপ্লেন ইচ্ছেমত আকাশে তোলা যায়, ইচ্ছেমত নামানো যায়, যেদিকে খুশী চালানো যায়। এক কথায় সত্যিই একে বলা যায় আকাশের জাহাজ—উড়োজাহাজ। অবশ্য প্রথম যখন এরোপ্লেনের আবিষ্কার হয়েছিল তখনকার এরোপ্লেন আর এখনকার এরোপ্লেনে "আশমান-জমিন" প্রভেদ। কী অসম্ভব উন্নতিই না হয়েছে এই যন্ত্রযানের! কোন কোন এরো-

প্লেন এত দ্রুতবেগে ছুটতে পারে যে শব্দের গতিকেও হার মানায়। শব্দের গতি সাধারণতঃ সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট বা তার কাছাকাছি। এমন এরোপ্লেন বেরিয়েছে যার গতিবেগ এর দ্বিগুণ। এই ধরনের গতিবেগকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'সুপারসোনিক' অর্থাৎ শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী।

কিন্তু বেলুনই বল আর এরোপ্লেনই বল, এগুলি সবই চলে বাতাসের ওপর ভর করে। মহাকাশ—যেখানে এক ফোঁটা বাতাস নেই সেখানে এ সব একেবারেই অচল। এমন কি বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিকেও এ সবের সাহায্যে হাজির হওয়া মুশ্‌কিল। বছর ত্রিশেক আগে একবার জার্মান্ বিজ্ঞানী পিকার্ড বেলুনে চড়ে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অভিযান করেছিলেন। একটা বিরাট বেলুনের সঙ্গে একটা এয়ার-টাইট গোলাকৃতি অ্যালুমিনিয়ামের ঘর তৈরী করে তার মধ্যে অক্সিজেন এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম নিয়ে তিনি গিয়ে উঠেছিলেন এবং ডাঙ্গা থেকে দশ মাইল উঁচুতে গিয়ে সেখান-কার আবহাওয়ার নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তখন লোকের ধারণা হয়েছিল মানুষের পক্ষে আকাশের যতটা ওপরে ওঠা সম্ভব তার সীমা পিকার্ডই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

মহাশূন্যের সওয়ার—রকেট

কিন্তু পৃথিবী থেকে মাত্র দশ মাইল উঠেই কি মানুষের চিরকালের কামনা অতৃপ্ত থেকে যাবে? তা হলে তো অন্যান্য গ্রহ দূরের কথা, চাঁদেও মানুষ কোন দিন গিয়ে হাজির হতে পারবে না! এমন কি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে যে বিরাট মহাশূন্য সেখানেও যদি মানুষ গিয়ে হাজির না হতে পারে তবে আর বিজ্ঞানের উন্নতি নিয়ে মানুষ বড়াই করে কোন্ যুক্তিতে?

তা হলে? —তা হলে আরও দ্রুতগামী সওয়ার চাই। যে সওয়ার বাতাসের ওপর নির্ভর করবে না, এতদিন যে গতিবেগ আয়ত্ত হয়েছিল তার চেয়েও বহু—বহু গুণ বেগে যে সওয়ার ছুটে চলতে পারবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, সেই রকম সওয়ার চাই মহাশূন্যে হাজির হতে হলে।

তোমরা দেওয়ালীর সময়ে নানা রকম বাজী পোড়ান দেখেছ, হাউই বাজীও দেখেছ। একটা সরু লম্বা লাঠির মাথায় বাজীর মশলা-ভরা একটা চোঙ্গা। তাতে আগুন লাগালেই সেই চোঙ্গা শোঁ শোঁ করে আকাশে উঠে যায় আর অনেক উঁচুতে উঠে, পুড়ে গিয়ে, আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে নীচে ঝরে পড়ে। এরই নাম হাউই বাজী—ইংরেজীতে বলে 'রকেট'। রকেট কথাটা এখন বাংলাতেও চল হয়ে গেছে, কাজেই আমরাও হাউই না বলে রকেটই বলছি।

রকেট প্রথম কে আবিষ্কার করেন তা নিয়ে এখনও তর্কাতর্কি চলছে, তবে সম্ভবতঃ চীনেরাই প্রথম এটির ব্যবহার সুরু করে। ১২৩২ খৃষ্টাব্দে কাইফুংফুতে মোঙ্গোলদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য যে এই রকেট অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চীন থেকে ইয়োরোপেও এই রকেটের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। ১৩-১৪ শতাব্দীতেও সেখানে মাঝে মাঝে যুদ্ধে এই রকম রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল বলে শোনা যায়। ১৮ শতাব্দীতে মহীশূরের রাজা টিপু সুলতানের সঙ্গে যখন ইংরেজদের লড়াই বাধল তখন টিপুও এই রকম



১২৩২ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গোলদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল রকেট।

রকেট ছুঁড়ে ইংরেজ সৈন্যদের ঘায়েল করে দিয়েছিলেন। অবশ্য ইংরেজরা, এই নতুন অস্ত্রের মুখোমুখি হয়ে প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও, কৌশলটা শিখে নিয়ে উল্টে নিজেরাও ওটি প্রয়োগ করতে ছাড়ে নি। শুধু এ দেশেই নয়, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ফোর্ট ম্যাক্ হেনরী দুর্গ আক্রমণ করবার সময়েও তারা এই রকেট ব্যবহার করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতেও যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে রকেটের ব্যবহার বড় কম হয় নি। ফ্রান্সের মহাবীর নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যখন ইংরেজ ও ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিরা যুদ্ধে নামল তখন তারাও এই আগ্নেয়াস্ত্রটিকে পূরোপূরি কাজে লাগিয়েছিল। অর্থাৎ রকেট শুধু মজার বাজী হিসেবেই নয়, মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবেও তখন প্রচুর ব্যবহার করা হ'ত।

এর পর অনেক দিন কেটে গেল। ১৯৩৯ থেকে সুরু হ'ল বিশ্বযোড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এত দিনে রকেটের অনেক উন্নতি হয়েছে। ১৯৪৫ সালে জার্মান্ বিজ্ঞানীরা এমন এক নতুন ধরনের রকেট বানালেন যা গুণে এবং তেজে এতাবৎ কালের যাবতীয় রকেটকে হার মানিয়ে দিল। ওঁরা তার নাম দিলেন 'ভি-টু'।

এক-একটা ভি-টু লম্বায় ছিল ৪৫ ফুটেরও বেশী, ওজনে কম করে ১২ টন। যখন ছাড়া হ'ত, আকাশে ৫৫ মাইল উঁচুতে উঠে শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটে চলত। ২০০ মাইল রাস্তা পার হওয়াও এই রকেটের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। জার্মান্‌রা এই রকম কতকগুলি ভি-টু রকেট ছুঁড়ে লণ্ডন শহরটাকে প্রায় তছ্‌নছ্ করে ছেড়েছিল।

কিন্তু এ তো গেল যুদ্ধাস্ত্র বা মারণাস্ত্র হিসেবে রকেটের ব্যবহার। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে রকেটকে এমন আর একটা কাজে

লাগাবার কথা চিন্তা করছিলেন যা সম্ভব হলে বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর আনতে পারবে। এঁদের মধ্যে জার্মেনীর হেরমান্ ওবের্থ ও আমেরিকার গডার্ড সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দু'জনেই অধ্যাপক এবং দু'জনেই অক্লান্তকর্মী। ওবের্থ গানিতিক দিক্ দিয়ে রকেট সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছিলেন; গডার্ডও কি করে রকেটকে মহাশূন্যে, এমন কি চাঁদে পর্যন্ত ঠেলে তোলা যায় সে সম্বন্ধে উপায় খুঁজছিলেন। এঁদের দু'জনেই মহাশূন্যে রকেট পাঠাতে হলে তার জন্য তরল জ্বালানী ব্যবহারের প্রস্তাব করেছিলেন।



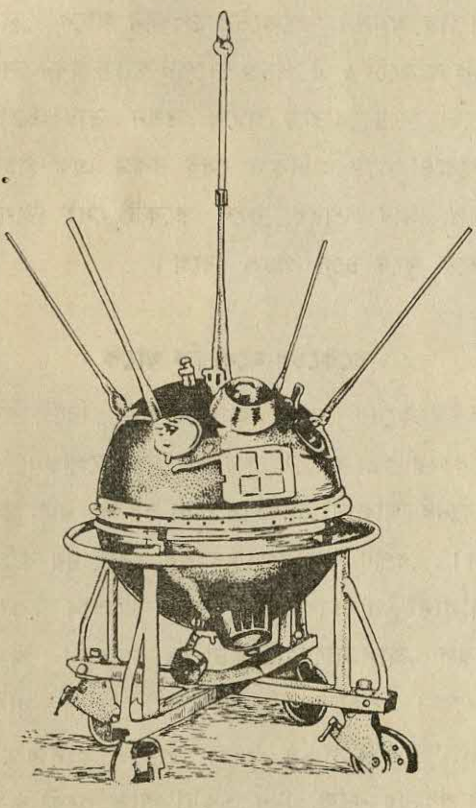
রকেট-বিজ্ঞানী ডক্টর রবার্ট গডার্ড

গডার্ড শুধু প্রস্তাবই করেন নি, ১৯২৬ সালেই তিনি সত্যি সত্যি তরল জ্বালানীর সাহায্যে শূন্যে রকেট ছুঁড়েও দেখিয়েছিলেন। সে রকেট অবশ্য খুব উঁচুতে ওঠে নি, কিন্তু ভবিষ্যতের এক বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়েছিল তার মধ্যে। ১৯৩৫ সালেই এই রকেট মাটি থেকে সাড়ে সাত হাজার ফুট ওপরে উঠতে পেরেছিল, আর তার গতিবেগ হয়েছিল ঘণ্টায় ৭০০ মাইল।

জার্মান্‌রা ভি-টু রকেট বার করল, কিন্তু আমেরিকান্‌রা সেটাকেই কাজে লাগাল মহাশূন্য অভিযানে। যুদ্ধে-দখল-করা একটা ভি-টু রকেটের মধ্যে নিজেদের তৈরী আরও একটা রকেট (ডব্লিউ. এ. সি. করপোরাল) ভরে তারা সেটা আকাশে ছেড়ে দিল। ভি-টু রকেট ওপরে উঠে যখন প্রচণ্ডতম গতিলাভ করল ঠিক তখনই তার ভিতরকার করপোরাল রকেট সুরু করল নিজের কাজ। ফলে রকেটের গতিবেগ গেল আরও বেড়ে। তার পর ভি-টু রকেটের জ্বালানী নিঃশেষ হলে সেটা যখন নামতে সুরু করল তখন করপোরাল রকেট ঠেলে উঠতে লাগল আরও ওপরে। এইভাবে ডাঙ্গা থেকে আড়াইশ' মাইল ওপরে গিয়ে হাজির হ'ল সেই রকেট।

এদিকে সোভিয়েৎ বিজ্ঞানীরাও এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা চালাচ্ছিলেন। তাঁরা যে এ ব্যাপারে কতটা এগিয়ে গেছেন তা বাইরের লোকে আগে টের পায় নি। টের পেল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। রাশিয়ার তৈরী একটি রকেট সেদিন ভীম বেগে ছুটে বেরিয়ে সত্যি সত্যি মহাকাশে প্রবেশ করল, তার পর চাঁদের মতই পৃথিবীর টানে পৃথিবীর চার দিকে ঘুরতে সুরু করে দিল। আকারে ছোট্টটি হলে কি হবে, সেও তখন চাঁদেরই মত একটি উপগ্রহ,—মানুষের তৈরী পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা ওর নাম রেখেছিলেন 'স্পুৎনিক'। পৃথিবীর ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন।

পরে রুশ বিজ্ঞানীরা আরও অনেক স্পুৎনিক মহাকাশে পাঠিয়েছেন, তাই সবপ্রথমটিকে বলা হয় স্পুৎনিক-১। এদিকে



কৃত্রিম উপগ্রহ—স্পুৎনিক

আমেরিকান্‌রাও পিছিয়ে রইলেন না। তাঁরাও পাল্লা দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই আর একটা নকল উপগ্রহ পাঠিয়ে দিলেন মহাকাশে। প্রথম মহাশূন্যে যাবার গৌরব অর্জন করতে না পারলেও তাঁদের এই কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১ বিজ্ঞান-জগতে কম আলোড়ন তুলল না।

রকেট কি ভাবে চলে

এবার তোমাদের মনে স্বভাবতঃই যে প্রশ্ন আসবে তা আমি আন্দাজ করতে পারছি। রকেট যে ঐ ভাবে ছুটে চলে তার কারণ কি? কিংবা, একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, রকেটের কৌশলটা কি?

ব্যাপারটা কিন্তু তেমন জটিল নয় মোটেই, এবং একটু চেষ্টা করলে রহস্যটা সহজেই বুঝতে পারবে। নিউটনের তিনটে নিয়ম বা সূত্রের কথা তোমরা অনেকেই হয়তো জান,—যাকে ইংরেজীতে বলা হয় "নিউটন্‌স্ ল'জ্ অব্ মোশান"। এই তিনটে সূত্রের তৃতীয় সূত্র হচ্ছে—"প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি করে প্রতিক্রিয়া আছে—যা নাকি ঐ ক্রিয়ার ঠিক ঠিক সমান, কিন্তু যা কাজ করে উল্টো দিকে।" ইংরেজীতেও এটা তোমরা হয়তো অনেকে পড়েছ—"ফর এভরি অ্যাক্‌শন্ দেয়ার ইজ্ অ্যান্ ইকোয়াল বাট্ অপোজিট্ রি-অ্যাক্‌শন্।" নিউটন দেখিয়েছিলেন যে এই নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য। তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছ, যখন কেউ বন্দুক ছোঁড়ে তখন সে বন্দুকের কুঁদোটা কাঁধের সঙ্গে লাগিয়ে নেয়। কেন অমনটা করে? যদি ও রকম না করা হয় তা হলে বন্দুক থেকে যখন গুলি বেরোবে তখন ঠিক উল্টো দিকেও ঐ রকম সমান বেগে একটা চাপ পড়বে, ফলে যে বন্দুক ছুঁড়ছিল সে তো কুঁদোর আঘাত পাবেই, এমন কি উলটে ছিটকে পড়ে যাওয়াও তার পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়। কাঁধে বন্দুকের কুঁদো চেপে ধরে বন্দুক ছুঁড়লে ঐ চাপটা ঠেকিয়ে দিয়ে তা সহ্য করা তার পক্ষে অনেক সহজ হয়। রকেট ছোঁড়া ব্যাপারটাও অনেকটা এই রকম। একটা ছোট খেলবার বেলুন নিয়ে পরীক্ষা করলেই কৌশলটা তোমরা বুঝতে পারবে।

ছোট একটা খেলবার বেলুন নিয়ে তার মধ্যে বেশ চাপ দিয়ে কিছু বাতাস বা অন্য গ্যাস ভরে দেওয়া হ'ল। ঐ আবদ্ধ বাতাস বা গ্যাস তখন বেলুনের ভিতরকার দেয়ালে সর্বত্র সমান ভাবে চাপ দিতে থাকবে। এবারে যদি একটা আলপিন দিয়ে বেলুনের গায়ে ছোট্ট একটা ফুটো করে দেওয়া যায় তা হলে ঐ ফুটো দিয়ে ভিতরকার বাতাস বা গ্যাস বেরিয়ে আসবে। ফলে ঐ ফুটোটির আশ-পাশে বেলুনের ভেতরের দেয়ালের গায়ে বাতাস বা গ্যাসের চাপ একটু কমে যাবে আর ঠিক তার উল্টো দিকে ঐ চাপ যাবে বেড়ে। ফলে যে দিকে চাপ বেশী সেই দিকেই বেলুনটা ঠেলে এগিয়ে চলবে।

রকেটের বেলায়ও ঠিক এই হয়। রকেটের মধ্যে পোরা থাকে জ্বালানী বা বিস্ফোরক—



বেলুন উল্টো দিকেই ঠেলে উঠবে।

তা সে তরলই হোক কি কঠিনই হোক। রকেট ছুঁড়বার সময় সেটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ওর ভিতরে তৈরী হয় প্রচণ্ড চাপের গ্যাস। রকেটের পেছনে থাকে ছোট একটা ফুটো। ঐ প্রচণ্ড চাপের গ্যাস যখন সেই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন তার উল্টো দিকেও পড়ে অবিকল সেই রকম এক প্রচণ্ড চাপ, আর তারই ফলে রকেট সেই উল্টো দিকে ছুটে চলে প্রচণ্ড বেগে।

রকেটের মধ্যে কি থাকে

রকেটের মধ্যে জ্বালানী বা বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয় সে কথা আগেই বলেছি। কি ধরনের জ্বালানী ব্যবহার করা হয় তা বলা হয় নি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় তরল, নয় কঠিন জ্বালানী ব্যবহার করা হয়। কোন কোন তরল জ্বালানীতে একটা মাত্র তরল পদার্থ থাকে। পলতে (ফিউজ) বা স্পার্ক প্লাগ্ জ্বালিয়ে দিলে ঐ তরল পদার্থ রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে এমন একটা গ্যাস তৈরী করে যা নাকি রকেটের পেছন দিক্‌কার ফুটো দিয়ে জোরে বেরিয়ে আসতে পারে। তবে বেশীর ভাগ তরল জ্বালানীর ক্ষেত্রেই অন্ততঃ ছু'টো তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়। ছু'টি পৃথক্ ট্যাঙ্কে এ ছু'টি রাখা হয়। যখন ছু'টো একত্র করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তখন ঐ ছুই পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরী হয় একটা গ্যাস—যা নাকি গরম হলে আয়তনে অনেক বেড়ে যায়। আয়তনে বাড়লেই তা বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজবে আর, আগেই বলেছি, রকেট থেকে বাইরে বেরোবার একমাত্র পথ হচ্ছে



ভ্যালেন্‌টিনা তেরেস্‌কোভা মহাকাশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

—ইউ. এস. এস. আর, তথ্য বিভাগের সৌজন্যে

ওর পেছন দিক্‌কার ফুটো। ঐ ফুটো দিয়েই সেই গরম গ্যাস প্রচণ্ড চাপে বেরিয়ে আসবে। ফলে রকেটও অনুরূপ চাপে এগিয়ে চলবে—উল্টো দিকে। তরল পদার্থ হিসাবে কখনও কখনও ব্যবহার করা হয় অ্যালকোহল আর তরল অক্সিজেন, কিংবা গ্যাসোলিন আর নাইট্রিক অ্যাসিড, কিংবা রিফাইন-করা কেরোসিন আর তরল হাইড্রোজেন ইত্যাদি।

কঠিন জ্বালানী বা বিস্ফোরকের বেলা কতকগুলো রাসায়নিক মশলা একত্র মিশিয়ে গুঁড়ো করে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে গরম গ্যাস প্রচণ্ড চাপে বেরিয়ে এসে রকেটের পেছনের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায় আর রকেটকে ঠেলে দেয় সামনের দিকে। তরলই হোক কি কঠিনই হোক, রাসায়নিক মশলাগুলোর একটা এমন হওয়া দরকার যার মধ্যে আছে প্রচুর অক্সিজেন, আর যে অক্সিজেন সহজেই বেরিয়ে এসে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে পারে। কারণ তা না হ'লে জ্বলবে কি করে? সাধারণতঃ রকেটের মধ্যে তিনটে কামরা থাকে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় এদের বলা হয় ওয়ার হেড, ফিউজ আর মোটর।

আজকাল অবশ্য বিজ্ঞানীরা আরও শক্তিশালী বিস্ফোরকের কথা ভাবছেন এবং তা নিয়ে গবেষণাও চালাচ্ছেন। কারণ খুব দূর পাল্লায় পাড়ি দিতে হলে,—যেমন ধর অন্য কোন গ্রহে যেতে হলে, রকেটের শক্তি এবং গতিবেগও তেমনি বেশী হওয়া চাই। এজন্য পারমাণবিক বা অ্যাটমিক চুল্লীকে কাজে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে। পারমাণবিক চুল্লীর সাহায্যে তরল হাইড্রোজেনকে উত্তপ্ত করলে যে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হবে তারই সাহায্যে এই সব রকেটের গতিও হবে প্রচণ্ড। তবে একটা কথা, রকেটের ভিতর পারমাণবিক চুল্লী ব্যবহার করলে তাতে এত বেশী উত্তাপ সৃষ্টি হতে পারে যা নাকি মহাকাশযাত্রীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। তবে চুল্লীকে যদি এমন কৌশলে রাখা যায় যাতে তার তাপ বাইরে আসতে না পারে—বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা যাকে বলি 'ইন্‌সুলেট্‌' করে নেওয়া,—তা হলে এ সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

এখন, কথা হচ্ছে, এত করেও রকেট কি এত শক্তিসম্পন্ন হতে পারে যে সে মহাশূন্যে ইচ্ছেমত পাড়ি দিতে পারবে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, পারবে; তবে একটা রকেটে নয়—রকেটের রিলে করে।

কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বলি। তোমরা অনেকেই স্পোর্ট্‌স্‌এ অংশ গ্রহণ কর। অনেকে ভাল দৌড়তে পার; যারা পার না তারা অন্ততঃ স্পোর্ট্‌স্‌ দেখতে ভালবাস। স্পোর্ট্‌স্‌এ রিলে রেস দেখেছ তো? এক-এক দলে হয় তো চারজন করে প্রতিযোগী আছে, আবার ঐ রকম দল হয়তো রয়েছে ৪টি। প্রথম বার চার দলের চার জন দৌড়বাজ নিশান হাতে দৌড় লাগাল। গন্তব্য স্থলে পৌঁছে তারা নিজের নিজের দলের প্রতিযোগীর হাতে নিশান গুঁজে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দ্বিতীয় প্রতিযোগীর দল তখন নিশান হাতে ছুটল তৃতীয় প্রতিযোগীদের দিকে, এবং তাদের কাছে নিশান পৌঁছে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল; এবার তৃতীয় প্রতিযোগীদের দৌড়বার পালা। অর্থাৎ এক-একটা দলের একজনই সমস্তটা পথ দৌড়চ্ছে না,

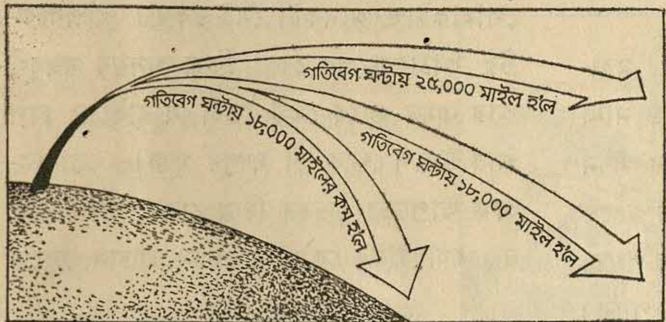
একজনের দৌড় শেষ হলে আর একজন তার হয়ে দৌড়চ্ছে। রকেটের রিলেও ঠিক এই রকম। সোভিয়েৎ বিজ্ঞানীরা যখন প্রথম স্পুৎনিক পাঠিয়েছিলেন মহাকাশে তখন তাঁরাও এই কৌশলই অবলম্বন করেছিলেন। রকেট ছুটল। খানিকটা গিয়ে তার গতিবেগ যখন কমে এল তখন তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় রকেট। এবার সেটা নতুন করে যাত্রা সুরু করল নতুন জ্বালানীর সাহায্যে। প্রথম রকেটটা ততক্ষণে খসে ঝরে পড়েছে। ঠিক অমনি ভাবে দ্বিতীয় রকেটের গতিবেগ যখন ফুরিয়ে এল তখন তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আরও একটি নতুন তাজা রকেট—তৃতীয় রকেট। এবার নতুন জ্বালানী নিয়ে তারও যাত্রা সুরু, দ্বিতীয় রকেটের আয়ু তখন ফুরিয়ে গেছে। এইভাবে, ঠিক স্পোর্ট্‌স্‌এর রিলে রেসের মতই দল বেঁধে, একটার পর একটা রকেট যদি ছুটে বেরিয়ে আসতে পারে তবে মহাশূন্যে কে তার গতি রোধ করবে? রকেটের কতক অংশ খসে পড়লেও আসল মহাকাশ-যানটি এমন ভাবে বসানো থাকে যে সেটার গতি বন্ধ হয় না। সেটা সমানে ছুটে চলে মহাশূন্যে।

মহাশূন্যে উঠবার বাধাবিপত্তি

বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছেন, মানুষও ইতিমধ্যে অনেক বার মহাকাশ ঘুরে এসেছে। কিন্তু, এই সব ব্যবস্থা করতে বিজ্ঞানীকে কম মাথা ঘামাতে হয় নি, কম হয়রানিও ভোগ করতে হয় নি। বাধাবিপত্তি কি কম? তুমি-আমি সাধারণ লোক সে সব হয়তো কল্পনাও করতে পারব না।

প্রথমেই ধর, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাধা। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে পুরোপুরি কাটিয়ে আরও বাইরেকার রাজ্যে মানুষ এখনও সশরীরে যেতে পারে নি, তবে রকেটে করে যন্ত্রপাতি পাঠিয়েছে এবং তার কোন কোনটা চাঁদে গিয়েও ঠেকেছে। একটা তো মঙ্গল গ্রহের পাশ কাটিয়ে তার আট হাজার মাইল দূর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে! পণ্ডিতেরা হিসেব করে দেখেছেন, যদি রকেটের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইলের কম হয় তা হলে সে রকেট পৃথিবীর টানে আবার পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে। ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে ছুটতে পারলে পৃথিবীর টান অনেকখানি অগ্রাহ্য করতে পারা যায় বটে, কিন্তু পুরোপুরি নয়। সে অবস্থায় রকেটটি পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে—একগাছা দড়ির মাথায় একটা ঢিল বেঁধে ঘোরালে তা যেমন করে ঘোরে অনেকটা সেই ভাবে। এ পর্যন্ত যে ক'জন মহাকাশযাত্রী মহাশূন্যে ঘুরে এসেছেন তাঁরা এইভাবেই পৃথিবীকে দ্রুত চক্কর দিয়ে দিয়ে ঘুরেছেন, কিন্তু তার টানের গণ্ডীর বাইরে কেউ যেতে পারেন নি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে হ'লে আরও গতিবেগ-সম্পন্ন রকেট দরকার। ঘণ্টায় অন্ততঃ ২৫ হাজার মাইল বেগে ছুটতে পারলে তবেই সত্যি সত্যি পৃথিবীর টান এড়িয়ে মহাশূন্যে ছিটকে পড়া যায় এবং কেবল মাত্র এই ভাবেই চাঁদে বা অন্য গ্রহে যাওয়া সম্ভব।

আগে দ্রুতগামী সওয়ার বলতে মানুষ ঘোড়াকেই বোঝাত। তারপর যখন রেলগাড়ীর আবিষ্কার হ'ল তখন লোকে অবাক্ হয়ে ভাবল,



মহাশূন্যে ছিটকে বেরোতে হলে কত জোরে রকেটকে যেতে হবে।

তা হলে এত জোরেও ছোটা সম্ভব! অবশ্য তখনও একদল লোকের ধারণা ছিল যে ঘণ্টায় ২৫ মাইলের বেশী জোরে ছুটলে মৃত্যু অনিবার্য—কারণ ঐ অসম্ভব বেগের সঙ্গে তাল রেখে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়—ঐ গতিবেগে শরীর ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এখন ভাবতে হাসি পাচ্ছে, কিন্তু দেড়শ' বছর আগেও অনেক লোকে ঐ রকমই ভাবত। কিন্তু সেই ঘণ্টায় ২৫ মাইল যদি হাজার গুণ বেড়ে ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল হয় তবে বিজ্ঞানীদেরও ভাবতে হবে বৈকি! কেন না তখন ব্যাপারটার মধ্যে সত্যিই এমন সব সমস্যা এসে পড়বে যা বৈজ্ঞানিক কারণেই সত্যিকার সমস্যা।

আমাদের মাথার ওপর বাতাস সর্বদাই চাপ দিচ্ছে। যত ওপরে উঠবে ততই সে চাপ কমতে থাকবে। মাত্র ২৫ হাজার ফুট, অর্থাৎ পৌনে পাঁচ মাইল উঠলেই সে চাপ এত কমে যাবে যে আমাদের রক্তে যে অক্সিজেন আছে তা বুদ্বুদের মত বাষ্পাকারে বেরিয়ে আসতে চাইবে। যদি আরও ওপরে, ধর ৫০ হাজার ফুট ওঠা যায়, তা হলে রক্তের ভিতরকার ঐ অক্সিজেন আরও হাল্কা গ্যাসে পরিণত হবে—তার মানেই তার আয়তন এত বেড়ে যাবে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আমাদের শরীরে রক্ত যতটা জায়গা যুড়ে থাকত অন্ততঃ তার ৮৫ গুণ বেশী জায়গা লাগবে রক্তের সেই বর্ধিত-আয়তন অক্সিজেনকে জায়গা করে দেবার জন্য। সত্যিই যদি ও অবস্থা হয় তা হলে সত্যি সত্যিই আমাদের শরীর ফুলতে ফুলতে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

তারপর ধর, উত্তাপ। যতই ওপরে উঠতে থাকবে ঠাণ্ডা ক্রমেই বাড়তে থাকবে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা নয়,—হিমের মত—বরফের মত—না, তার চেয়েও তীব্র ঠাণ্ডা! ও-রকম ঠাণ্ডার মধ্যে এক-বার পৌঁছলে শরীর জমে শুকিয়ে পাঁপর ভাজার মত মুচ্‌মুচে হয়ে যাবে।

আরও একটা ব্যাপারের কথা বলি। পৃথিবীর আকর্ষণ এড়াবার জন্য, ধর, ঘণ্টায় যদি ২৫ হাজার মাইল বেগেই যেতে হয়, রকেট যখন হঠাৎ ছুটে বেরুবে,—অর্থাৎ বিমান-যাত্রার ভাষায় "টেক্ অফ্" করবে,—তখন পৃথিবীর আকর্ষণও হঠাৎ সেই মাত্রায় বেশী মনে হবে। পদার্থবিদ্যার এটি একটি নিয়ম। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর এই আকর্ষণকে অঙ্কের ভাষায় বলেন 'জি' (g)। এই 'জি' হয়তো তখন দ্বিগুণ—তিনগুণ—সাতগুণ—এমন কি চল্লিশগুণও বেশী মনে হতে পারে। তার মানে যে জিনিসের ওজন হয় তো ২ মণ, তা তখন হঠাৎ মনে হবে ৪ মণ—৬ মণ—১৪ মণ—এমন কি ৮০ মণ! কারণ এই 'জি'র জন্যই তো আমাদের ওজন! হঠাৎ যদি দু'মণ ওজনের একজন মানুষ নিজেকে আশি মণ ভারী বলে বোধ করে তা হলে তার অবস্থাটা কি হবে?

আরও নানা রকম সমস্যা

তার পর বাইরের সমস্যাও আছে। মহাশূন্যে অনবরত ছুটে বেড়াচ্ছে ছোট-বড় নানা রকম উল্কা। মহাকাশ-জাহাজের ওপর যখন তখন সেগুলো প্রচণ্ড বেগে এসে আঘাত করতে পারে; তেমন বড় হলে ফুটো করে দিতে পারে, তুবড়ে দিতে পারে, ভেঙ্গে ফাটিয়ে দিতে পারে। আছে বিষাক্ত কস্‌মিক্ রে বা ব্যোমরশ্মি—তেজস্ক্রিয় রশ্মির মতই যা ক্ষতিকর। আছে চামড়া-পোড়ান প্রচণ্ড আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, ইন্‌ফ্রা রশ্মি। এই রকম কত কি! এ সমস্ত বাধাবিপত্তির নিরাপদ প্রতিষেধক ঠিক করে নিয়ে তবেই না মহাশূন্যে ছুটবার সাহস করা যেতে পারে! মহাকাশ-জাহাজকে ভাল করে বর্ম পরিয়ে—যাকে বলে 'ইন্‌সুলেট' করে নিয়ে, তবেই মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হবে।

এই সব ছোটবড়, খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে চেষ্টা করে করে আজ এতটা এগিয়ে এসেছেন। মহাশূন্যের যে পরিবেশ তা কৃত্রিম উপায়ে বিশেষ-ভাবে-তৈরী ল্যাবোরেটরীর মধ্যে নকল করে তাঁরা এই সব পরীক্ষা চালিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি পাঠিয়েও অনেক তথ্য জেনে নিয়েছেন।

মহাশূন্যের হাল্কা চাপ, প্রচণ্ড শীত ও প্রচণ্ড উত্তাপ ইত্যাদির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এক রকম বিশেষ ধরনের পোষাকের ব্যবস্থা হয়েছে—যার নাম দেওয়া হয়েছে স্পেস্-স্যুট অর্থাৎ মহাশূন্যের পোষাক। শীতের দেশের লোকেরা যেমন হাতে দস্তানা পরে—হাতের চামড়া আর দস্তানার মধ্যে একটু ফাঁক রেখে, এ পোষাকটাও অনেকটা সেই রকম। পোষাকটির কাঠামো খুব হাল্কা, কিন্তু অসম্ভব মজবুৎ, আর এমন ভাবে সেটি তৈরী যে বাইরের চাপ আর উত্তাপ থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ের ভেতর দিয়ে যেমন জল ঢোকে না, এয়ারটাইট্ কৌটোয় যেমন বাতাস ঢোকে

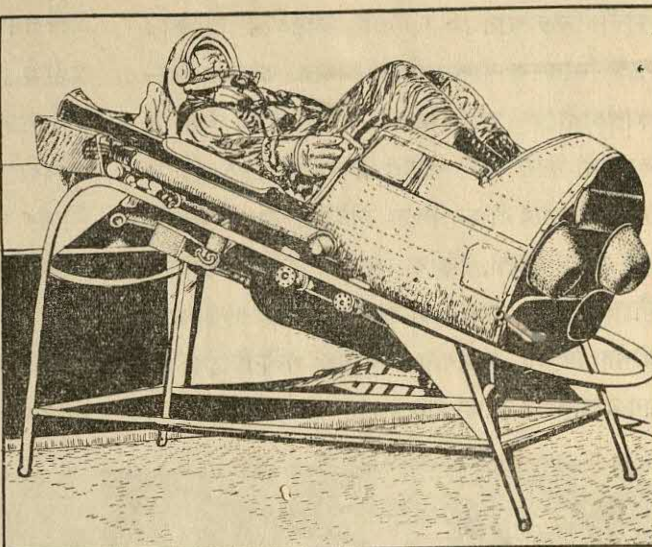


মহাকাশ-অভিযাত্রী স্পেস্-স্যুট পরে তৈরী হচ্ছেন।

না, এই অদ্ভুত পোষাকেও তেমনি বাইরের চাপ আর উত্তাপ ঢুকতে পারে না। আবার এই পোষাকের সঙ্গেই নল দিয়ে যুক্ত থাকে কয়েকটা ট্যাঙ্ক। তার কোনটির সাহায্যে বাতাসের চাপকে ঠিক রাখা হয়, কোনটার ভিতর দিয়ে নিঃশ্বাসের জন্য শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেন

সরবরাহ করা হয়, আবার কোনটা দিয়ে নিঃশ্বাসের-সঙ্গে-বেরিয়ে-আসা কার্বন্‌-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বার করে দেওয়া হয়।

'জি'র উৎপাত থেকে মহাকাশচারীকে বাঁচাবার জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছে তা ভারী মজার। অভ্যাস করাবার জন্য মহাকাশচারীকে একটা নকল রকেট-কক্ষে বা কেবিনে বসিয়ে সেটি যুড়ে দেওয়া হয় একটা বিরাট সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের সঙ্গে। সেই বিরাট সেন্ট্রিফিউজ মেশিন নকল রকেট-কক্ষটিকে ক্রমাগত ঘোরাতে থাকে। প্রথমে একটু জোরে, তার পর আর একটু জোরে, তার পর আরও জোরে, শেষে বন্‌ বন্‌ করে। এই ভাবে নকল 'জি'র পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে মহাকাশচারীর ওপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়। দেখা গেছে, কোন কোন ছ'-মণী লোক আশি-মণী অবস্থায় এসেও সম্বিৎ হারায় না, আবার অনেকে প্রথম চোটেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আরও দেখা গেছে, বসে না থেকে শুয়ে থাকলে এই 'জি'র প্রভাব অনেকটা সহজ-সহ্য হয়। তাই মহাকাশচারীর কেবিনে ঈজি-চেয়ারের মত শোবার ব্যবস্থা রাখা হয়।



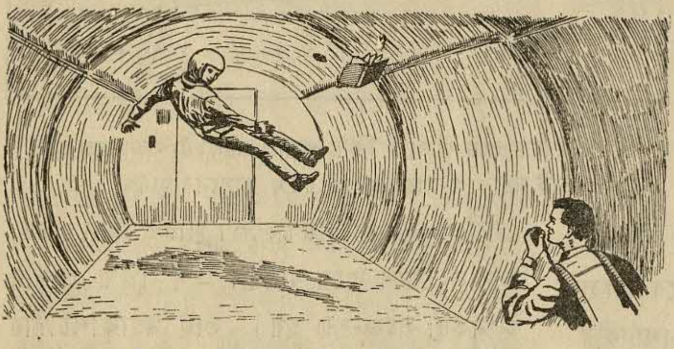
বসে না থেকে শুয়ে থাকলে 'জি'র প্রভাব অনেকটা সহজ-সহ্য হয়, তাই মহাকাশ-জাহাজে এই রকম আসনের ব্যবস্থা।

মহাকাশের আর একটা সমস্যা হচ্ছে ভারহীন অবস্থা। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে এড়িয়ে মহাশূন্যে উঠতে উঠতে একটা সময় আসে যখন মানুষের শরীরের আর কোন ভার থাকে না, কারণ আমাদের ওজনটা তো পৃথিবীর আকর্ষণ ছাড়া কিছু নয়। ভারহীন অবস্থায় এলে তখন আর মানুষ ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকে না, পেঁজা তূলোর মত শূন্যে ভাসতে থাকে। নিজেকে স্থির রাখতে হলে তখন একটা কিছু আঁকড়ে থাকতে হয়, অনেকটা জলের নীচে সাঁতার



মহাকাশ-যাত্রার প্রস্তুতিঃ সেন্ট্রিফিউজ-যন্ত্রের সাহায্যে ঘুরপাক খাওয়া।

কাটার মত আর কি! এই ভারহীন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যও মহাকাশচারীকে আগেভাগে খানিকটা অভ্যাস করানো দরকার। প্রচণ্ড দ্রুতগামী জেট প্লেনে চাপিয়ে হঠাৎ নীচের দিকে ডাইভ দিলে অনেকটা এই রকম লাগে, কিংবা লিফ্‌টে করে দ্রুতবেগে নীচে নামবার সময়ে বা শ্যাফ্‌টে চড়ে দ্রুতবেগে খনির ভিতর নামবার সময়েও শরীরটাকে ঐ রকম অসম্ভব হাল্কা লাগে।



যে অবস্থায় মানুষের আর কোন ভার থাকে না

বিজ্ঞানীরা বলেন, আমরা চোখে যা দেখিঁ, কানে যা শুনি বা অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুঁভব করি তা মগজে পৌঁছতে সাধারণতঃ এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের তিন ভাগ সময় লাগে। দূরে গাড়ী আসতে দেখছ, ছুটে রাস্তা পার হতে হবে। গাড়ী দেখার পর কি করতে হবে সেটা বুঝতে তোমাকে অন্ততঃ এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের তিন ভাগ সময় দিতে হবে। তেমনি গরম চায়ে চুমুক দিলে, ঠোঁট পুড়ে গেল; ঠোঁট যে তাড়াতাড়ি সরানো দরকার এ ধারণা তোমার মগজে আসতে ঠিক ঐ সময় লাগবে। এখন, ধর, রকেটে চড়ে তুমি মহাকাশে ছুটছ, তোমার গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল। হঠাৎ কিছু একটা ঘটলে সেটা তোমার মগজে পৌঁছতে পৌঁছতে তুমি দু'মাইলেরও বেশী পথ পার হয়ে যাবে। মহাকাশচারীকে হামেশাই পৃথিবী থেকে বেতারে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী যদি সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোন যন্ত্রের বোতাম টিপতে হয় তা হলে সেই সময়টুকুর মধ্যে সে দু'মাইল পেরিয়ে যাবে। একটু দেরী করে ফেললে তো কথাই নেই! কাজেই, কোন সংকেত পেলে, কত তাড়াতাড়ি সে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারবে তা আগেভাগেই দেখতে হবে এবং অভ্যাসের দ্বারা হাত পাকাতে হবে।

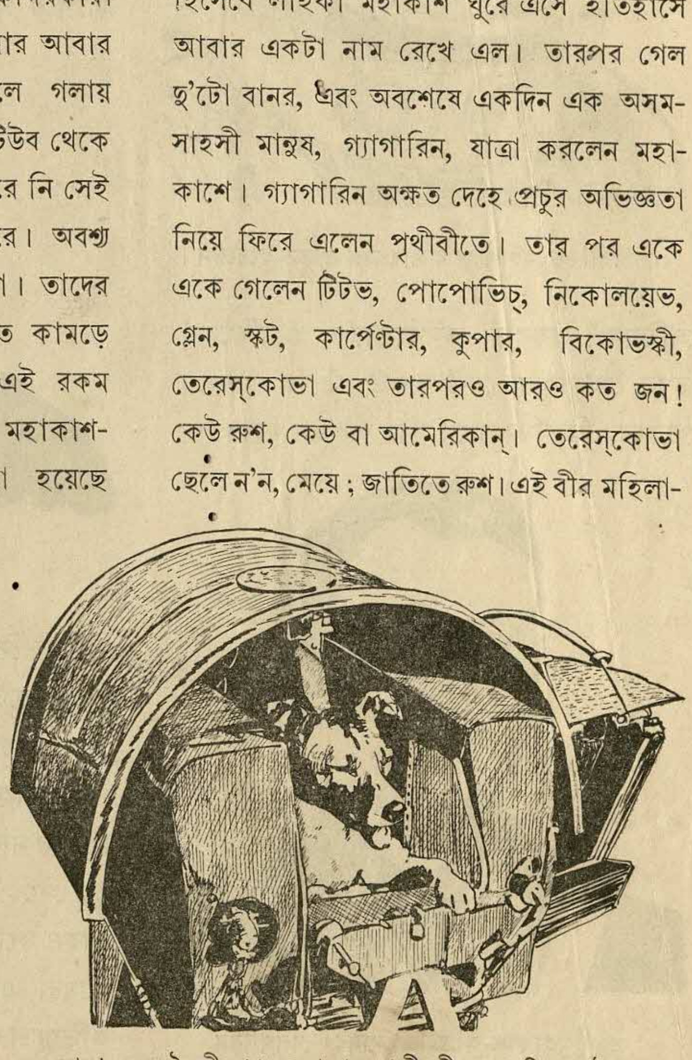
এই রকম আরও কত কি গোলমাল আছে! মহাকাশের বিষাক্ত কস্‌মিক্ রে বা ব্যোমরশ্মির কথা, উল্কার কথা তো আগেই বলেছি। এ ছাড়া আছে অনন্ত অন্ধকারের একঘেয়েমি। ২।৪ ঘণ্টা বা ২।৪।১০ দিন হয়তো কোন রকমে সে ভাবে কাটানো যায়, কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যদি ঐ ভাবে কাটাতে হয় তা হলে মানুষের মনের ওপরেও তার প্রবল প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এ রকম অবস্থায় মানুষের পাগল হয়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। সুতরাং মনস্তত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানীদের এখন এ নিয়েও প্রচুর গবেষণা করতে হচ্ছে।

এ ছাড়া আরও একটা বড় সমস্যার কথা বলা হয় নি। মহাকাশে খাদ্যসমস্যা। দীর্ঘ দিন মহাশূন্যে থাকতে হলে মহাকাশযাত্রীর প্রয়োজনীয় খাবার তাকে সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে হবে। খুব অল্প জায়গার মধ্যে আঁটে

অথচ খাদ্যগুণে টৈটুম্বুর এ রকম খাদ্যই সঙ্গে দেওয়া চাই। তা ছাড়া সে খাবার মুখরোচকও হওয়া দরকার। যে খাবার খেতে অরুচি হয় সে খাবারে কোন কাজ হয় না। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, নভোচারীর খাদ্য এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যা থেকে তাঁরা দৈনিক অন্ততঃ আড়াই হাজার কি আরও কিছু বেশী ক্যালরি শক্তি পেতে পারেন। এর মধ্যে প্রোটিন, শ্বেতসার, স্নেহজাতীয় খাদ্য—সবই থাকা দরকার। আর থাকা চাই প্রচুর ভিটামিন। খাবার আবার শক্ত হলেও হবে না—গিলতে গেলে গলায় আটকে না যায়। কোলাপ্‌সিব্‌ল্ টিউব থেকে যেমন আমরা টুথপেস্ট টিপে বার করে নি সেই ভাবে এই খাবার দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য সবাই এ ভাবে খাওয়া পছন্দ করে না। তাদের জন্য টুকরো টুকরো খাবার, যা দাঁতে কামড়ে ছোট করে নিতে অসুবিধা না হয়, এই রকম খাবার হলেই ভাল হয়। এ পর্যন্ত মহাকাশ-যাত্রীদের সঙ্গে যে সব খাবার দেওয়া হয়েছে তা বেশ লোভনীয়ই বলতে হবে। যেমন ধর—ভাজা মাংস, কাটলেট, মাংসের কিমা, স্যাণ্ডউইচ্, ফাউল কারি, প্যাটিস, আলুসিদ্ধ, পুডিং, ঘন দুধ, কমলা লেবু, আপেল, পাতি লেবু, অন্য নানা রকম ফলের রস ইত্যাদি। অবশ্য সবই খুব ঘনীভূত অবস্থায়।

মানুষের মহাকাশ-যাত্রা

প্রথম যখন বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠালেন তখন সারা বিশ্ব যুড়ে কি রকম সোরগোল পড়ে গিয়েছিল সে কথা তো আগেই বলেছি। এর পর যখন একের পর এক কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া হতে লাগল তখন লোকের কৌতূহলটাও ধীরে ধীরে কমতে লাগল। কিন্তু তার পরেই ঘটল আবার এক আশ্চর্য কাণ্ড। রুশ বিজ্ঞানীরা এবার আর ওতে শুধু যন্ত্রপাতি ভরেই ক্ষান্ত রইলেন না, সেই সঙ্গে পাঠানো হ'ল একটা কুকুর—লাইকাকে। প্রথম জীবন্ত প্রাণী হিসেবে লাইকা মহাকাশ ঘুরে এসে ইতিহাসে আবার একটা নাম রেখে এল। তারপর গেল দু'টো বানর, এবং অবশেষে একদিন এক অসম-সাহসী মানুষ, গ্যাগারিন, যাত্রা করলেন মহা-কাশে। গ্যাগারিন অক্ষত দেহে প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন পৃথীবীতে। তার পর একে একে গেলেন টিটভ, পোপোভিচ্, নিকোলয়েভ, গ্লেন, স্কট, কার্পেণ্টার, কুপার, বিকোভস্কী, তেরেস্‌কোভা এবং তারপরও আরও কত জন! কেউ রুশ, কেউ বা আমেরিকান্। তেরেস্‌কোভা ছেলে ন'ন, মেয়ে; জাতিতে রুশ। এই বীর মহিলা-



যাত্রার জন্য তৈরী প্রথম মহাকাশ-যাত্রী জীবন্ত প্রাণী—লাইকা



পোপোভিচ্ মহাশূন্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

অভিযাত্রী একবার কলকাতায়ও এসেছিলেন, তখন তোমাদের কেউ কেউ তাঁকে দেখেও থাকবে। কিছুদিন আগে আর একজন মহাকাশ-



প্রথম মহাকাশ-অভিযাত্রী মানব—গ্যাগারিন

চারী, নিকোলয়েভের সঙ্গে ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন এবং এঁদের একটি সন্তানও হয়েছে।

আজ আর মানুষের মহাকাশ-যাত্রার কথা শুনলে আমরা মোটেই অবাক্ হই না। ইতি-মধ্যে আরও নতুন নতুন ঘটনা ঘটেছে—ঘটছে। একাধিক মহাকাশযাত্রী একসঙ্গে মহাশূন্যে উঠেছেন, মহাকাশ-জাহাজ থেকে মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মহাশূন্যে হেঁটে বেড়িয়েছেন



ভ্যালেন্‌টিনা তেরেস্‌কোভা

(বা ভেসে বেড়িয়েছেন), দুই মহাকাশ-তরীর মিলন ঘটেছে মহাশূন্যে, একটা থেকে বেরিয়ে এসে শূন্যে পা ফেলে ফেলে অপরটায় ঢুকে পড়াও সম্ভব হয়েছে। মহাকাশ থেকে টেলি-ভিশনে নানা রকম ছবি পাঠানো হয়েছে, মহা-শূন্য থেকে আমাদের ভারতবর্ষকে কেমন দেখায় তারও ফটো পেয়েছি আমরা। পরবর্তী খণ্ডে আমরা এই সব বিচিত্র অভিযানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী আরও ভাল করে শোনাব।